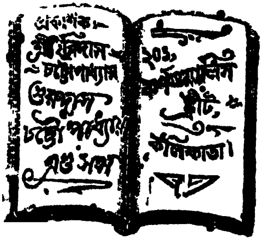
মা

(উপন্যাস)

শ্রীঅনুরূপা দেবী

শ্রাবণ—১৩২৮

মূল্য ৩৲ টাকা



দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
"সিদ্ধেশ্বর প্রেস"
৭৭নং, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

জগতের সমুদয় মাতৃবৃন্দের
কর-কমলে অর্পণ করিলাম।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

পোষ্যপুত্র (উপন্যাস)	...	...	২৷৹
বাগ্দত্তা ঐ	...	...	২৲
জ্যোতিঃহারা ঐ	...	...	২৲
মন্ত্রশক্তি ঐ	...	...	২৲
মহানিশা ঐ	...	...	২৲
রামগড় ঐ	...	...	২৲
উল্কা ঐ	...	...	১৲
চিত্রদীপ (ছোট গল্প)	...	...	১৲
মধুমল্লী ঐ	...	...	৷৹
রাঙ্গাশাখা ঐ	...	...	৸৹
বিদ্যারণ্য (নাটক)	...	...	১৲

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত

স্পর্শমণি (উপন্যাস)	...	...	২৲
সৌধরহস্য ঐ	...	...	১৲
নির্ম্মাল্য (ছোট গল্প)	...	...	১৷৹
কেতকী ঐ	...	...	১৲
ফুলের তোড়া ঐ	...	...	৷৹

রায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রণীত

সর্ব্বজন প্রশংসিত উচ্চাঙ্গের পুস্তক বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন, মহাত্মা এবং মহাপুরুষগণের অতি সুন্দর চিত্র সম্বলিত।

সদালাপ ১ম ভাগ ১৲ সদালাপ ২য় ভাগ ৸৹ সদালাপ ৩য় ভাগ ৸৹

নেপালী ছবি [সচিত্র, নেপালের সম্বন্ধে বহুবিধ নূতন তথ্যপূর্ণ উপন্যাসবৎ সরল ও সুখপাঠ্য ইতিহাস] ৸৹

অনাথবন্ধু (উপন্যাস) ১৷৹

আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যে যে স্বদেশ-হিতৈষণার আদর দেখা যায়, "অনাথবন্ধু"কেই তাহার পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। এরূপ উচ্চাদর্শের সুলিখিত উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যে অধিক নাই।

মা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্।

—মেঘদূত।

প্রতিবেশী ঘোষেদের বাড়ী হইতে নিতান্ত অসময়ে বাড়ী ফিরিয়া সেদিন মিত্র-গৃহিনী দুর্গাসুন্দরী মেয়েকে ডাকিলেন; "মনু, ও মনু, একবার এসে শুনে যা' দেখি মা।"

কন্যা মনোরমা উপরে কি একটা কাজ করিতেছিল, মায়ের ডাক কাণে ঢুকিতেই, হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, শশব্যস্তে নীচে নামিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় ডাক্‌চো কেন মা?"

"শুনেছিস্, তোর শ্বশুর মিন্‌ষে যে মারা গেল।"

"সত্যি! কে তোমায় বল্লে মা? চিঠি এসেছে বুঝি?"

মাতা জিহ্বা ও অধরৌষ্ঠ সংযোগে উপেক্ষাসূচক একটা শব্দোচ্চারণ করিয়া উত্তর করিলেন, "পোড়া! তারা আবার চিঠি লিখবে! তেমনিই বটে!—নিতাই আজ সকালের গাড়িতে বাড়ী এসেছে কি না,—সেই তার মাকে এসে বলেছে; ওদের বাড়ী থেকে এই শুনে এলাম।"

মনোরমা বিষণ্ণমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে একটা

নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কবে গ্যাছেন?—কি হয়েছিল, তা' কিছু বল্লে?"

"আজ এই তিন দিন হয় আর কি। কি হয়েছিল, তা' কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। ব্যারাম না কি অনেক দিন ধরেই হয়েছিল।"

মাতাপুত্রী উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন। দু'জনেই হয় ত এক সঙ্গে এই এক ঘটনায় একই কথা—অনেক দিনের এক চির অবিস্মৃত পুরাতন কথা ভাবিতেছিলেন। কিছু পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া মাতা কহিলেন, "পাতান না, গ্রাম সম্পর্ক নয়—নিজের শ্বশুর—সাক্ষাৎ আপনার পিতামহ,—ওদের আক্কেল যাই হোক্, তোমাদের কাজ তোমাদের কর্‌তে হবে। অজিতকে আর এ অবেলায় 'চান' করিয়ে কাজ নেই, গা-হাত ধুয়ে মাথায় একটু গঙ্গাজল দিয়ে দাও,—আর নিজে তুমি 'চান' করে এসোগে। আজ আর কিছু না, শুধু দুধ গঙ্গাজল,—কাল থেকে মালসা পোড়াতেও হবে। তাদের ব্যাভার মন্দ বলে, তুমি তোমার ধর্ম্ম ছাড়বে কেন,—যাও আর বেলা কাটিও না।"

"যাই"—বলিয়া মনোরমা খোঁপা খোলার ছলায় আরও কিছুক্ষণ সচিন্তিতচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন কতকটা আত্মগতই কহিল,—"আমার শাশুড়ীর এই বয়সে কত কষ্টই হবে। আমার শ্বশুর এদিকে লোক বড় মন্দ ছিলেন না, না'মা?"

"হাঁ—আঁা, ভাল ছিলেন বই কি! ভাল নইলে আর তোমার এমন দশা করে রেখেচেন। তবে, অমন ভাল ভগবান বেশী গড়েন নি তাই রক্ষে! শ্বশুরের গুণের ব্যাখ্যা আর ক'রে কাজ নেই বাছা।"

এই বলিয়াই মা কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন, মেয়ে লজ্জিত সঙ্কোচে নতমুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আত্মসংবরণ করিতে লাগিল।

শিশির-মথিতা পদ্মিনীর ন্যায় পরিম্লান এই নারীটি একজন পতি-ত্যক্তা দুর্ভাগা স্ত্রী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তদেষ সর্গঃ করুণার্দ্রচিত্তৈর্ন মে ভবদ্ভিঃ প্রতিষেধনীয়ঃ।
যদর্থিতা নির্হৃতবাচ্যশল্যান্ প্রাণান্ ময়া ধারয়িতুং চিরং বঃ॥

—রঘু।

মৃত্যুঞ্জয় বসু ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। চিরদিন সেইখানেই কাটাইয়া, এই সবে কয়দিন মাত্র তাঁহার ৺গঙ্গালাভ হইয়াছে। বসু মহাশয় ওকালতী কার্য্যে উপার্জ্জন বড় মন্দ করেন নাই। দুই পুত্রের মধ্যে একটী তাঁহার জীবদ্দশাতেই গতাসু হয়। সেইটি কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ অরবিন্দের দুই সংসার। সে বারকয়েক 'ল' এতে ফেল করিয়া, এখন কলিকাতায় কোন প্রধানতম সরকারী অফিসে বেশ বড় রকম মোটা মাহিনায় একটা চাকরী করিতেছে। পদ ও প্রতিষ্ঠা তাহার মন্দ নয়। বয়স এই বৎসর আটাশ উনত্রিশ—এম্‌নি হইবে। আজকালকার কালে কোন শিক্ষিত যুবকের যে দুই সংসার হইতে পারে, এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। হয় ত ইতঃমধ্যেই কেহ কেহ এই কথা শুনিয়া চমকিয়াও উঠিয়াছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াও সে বেচারার এইরূপই ললাটলিপি।

মৃত্যুঞ্জয় বসুর মৃত্যুর পর দুইদিন অতিবাহিত হইয়াছে। মৃতের জন্য শোকে মৃতব্যক্তির গৃহ সমাচ্ছন্ন থাকিলেও, বড়লোকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বড় ঘটার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনার্থ সে শোক বাধাহীন হইয়া শোকাচ্ছন্নদের অধিক কাল অভিভূত থাকিতে দেয় না। কাল চতুর্থ শ্রাদ্ধের দিন, পিতৃবিয়োগ-ব্যাকুলা কন্যাদ্বয়—শরৎশশী ও ঊষাবতী পাঁচজনের সান্ত্বনা-উপদেশে ধৈর্য্যাবলম্বনের চেষ্টা করিয়া পিতৃকৃত্যের উদ্যোগে মনোযোগী হইয়াছে। বড় মেয়ে শরৎ ঘরণী গৃহিণী ডাগর মেয়ে—সে ইহাকে সংসারের

অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জানিয়া যথাসাধ্য শান্ত থাকিয়া পিতৃঋণ মোচনের চেষ্টা করিতেছিল। ঊষা সবার ছোট—বাপের বড় আদরের মেয়ে, বয়সেও সে বালিকা। এত বড় প্রচণ্ড শোকে কেহ তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না।

মৃত্যুন্ বোস—এই নামেই তাঁহার প্রসিদ্ধি,—তা তিনি এতটা বয়সে মরিয়াও একটী বিধবার সৃষ্টি না করিয়া যাইতে পারেন নাই। বৃদ্ধা গৃহিনীর চিরদিনের সিন্দুর শোভিত টাকের রক্তিমা এখনও নিজের প্রাচীনত্ব জানাইয়া দর্শকদের সমবেদনা আকর্ষণ করিতেছিল। হাতভরা স্বর্ণালঙ্কার, কস্তাপাড়ের সাড়ী—সে সব যাঁর কল্যাণ, তাঁহারই সঙ্গে দিয়া, অপরিচিত বিধবা মূর্ত্তিতে তিনি দৌহিত্রদলের বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক একটী পাশে পড়িয়া আছেন। বুকের মধ্যে যে একটা দীর্ঘকালের অভ্যাস ভঙ্গের মহাশূন্যতা পড়ো বাড়ীর মত খাঁ-খাঁ করিতেছিল, তাহা যেন আর কিছুতেই পূর্ণ হইবার নয়।

পুত্র আসিয়া বলিল, "মা, তুমি যদি এমন করে পড়ে থাক, তবে আমি কি করি?" বলিয়া মায়ের শ্রীহীন মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মাকে তাহার 'পাকা-মাথা'র সিঁদূরে কস্তাপাড়ের সাড়ীতে যে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি দেখাইত! ক্ষণকাল পুত্রের সহিত অশ্রুজলের বিনিময়ে গুরু হৃদয়ভার কথঞ্চিৎ লঘু করিয়া মাতা কহিলেন, "আমায় কি বলছিস্ বাবা, আমার হয়ে গ্যাছে, তোরা যা পারিস্ কর্; শরৎকে বল্।"

ছেলে বলিল, "মা, বাবা নেই, তুমি কিছু দেখবে না, শরৎই বলো, আর আমিই বলো, আমরা কবে কি করেছি? মানটা তো রাখতে হবে দশের কাছে। তুমি ওঠো মা, না হলে কিছুই হবে না। আমার বড্ড ভয় হচ্চে।"

সন্তানের এই নৈরাশ্যজনক উক্তি ও হতাশাব্যঞ্জক মুখ,—আপনার যত দুঃখই থাক,—মা কখনও উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভগ্ন দেহ মনে যথাসাধ্য বল সংগ্রহ করিয়া, কর্ণধারহীন তরণীর কাণ্ডারীরূপে গৃহস্বামিনী আবার স্বীয় গৃহরাজ্যের অধিকার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু বুঝি ঠিক আর

তেমনটি হইল না। সে মন, সে আগ্রহ, সে সব; সেই যে একজনের সঙ্গেই চলিয়া যায়, আর তাহাকে শত আরাধনায়ও ফেরান যায় না। এখন শুধু থাকিতে হয় তাই থাকা,—করিতে হয় তাই করা।

নৌকাযোগে রাশিকৃত জালা, ভাঁড়, খুরি, মাটির থালা-বাসন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জিনিসপত্র রক্ষার জন্য বড় বড় 'ওড়া' ধামাকাঁধারি, সিদা-সাজাই-বার মাঝারি ছোট ডালা প্রভৃতির বোঝাইও পৌঁছাইল। সেই সব তোলা পাড়া করিতে করিতে শরৎশশী এক আত্মীয়ার প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে নিজেরই হৃদ্গত ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া কহিল, "বড় বউ আসবে বই কি,—আসবে না, এত বড় কাজ!"

আত্মীয়া কহিলেন, "তাই তো আমরাও সবাই বল্‌চি মা, হাজার হোক্ সেই তো বড়, সর্ব্বেসর্ব্বা ঘরণীগিন্নি, বেটার মা,—তা সে না এলে কি মানায়, না ভালই দেখায়? পাঁচজনেই বা বল্‌বে কি? আহা তা, তাকে এইবার আন্‌বে বই কি।"

ঊষা গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়া একপাশে কোন্ কোণে শুইয়া ছিল, কোন কাজে কর্ম্মেই সে ধরা দেয় না। কিন্তু এই কথাটা কেমন করিয়া কাণে পৌঁছিতেই সে ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"দিদি! বড় বউ আস্‌বে, এ কেমন কথা? জান না কি, যে, তাকে আন্‌তে বাবার নিষেধ আছে, বড় বউ বাবার এ বাড়ীতে আস্‌বে না।"

শরৎ প্রশ্ন করিল, "তার কি অপরাধটা শুনি, যে সে আস্‌বে না?"

"বাবার বারণ।"

"বাবা রাগের উপর যদি একটা ভুলই করে যান্, ধর্ম্মের দিকে না চেয়েও সেইটেকেই কি চিরদিন মান্‌তে হবে?"

"হ্যাঁ হবে,—তাঁর বাড়ীতে, তাঁর ভাত খেয়ে, তাঁর ভুল ত্রুটি সব মান্‌তে হবে। যে না মান্‌বে সে—"

"কি? বল্ না, থাম্‌লি কেন?"

উষা জিহ্বাগ্রে সমাগত বড় কঠিন কথাটাই কোনমতে সংযত করিয়া ফেলিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল। গভীর শোকাচ্ছন্ন কোপের মধ্য হইতে শুধু কহিল, "কখ্খনো সে আস্তে পাবে না,—বাবা যেতে না যেতেই বাবাকে যে এমন করে তুচ্ছ করা হবে, সে আমার কোন মতেই সহ্য হবে না।"—এই বলিয়াই সে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল।

শরৎ কিছু লজ্জিত, কিছু বিরক্ত হইয়া "তোর সকলি বাড়াবাড়ি বাবু"—এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘর হইতে এক রকম পলাইয়া গেল। এই ছোট বোনটির জন্ম হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বরাবরই ইহার নিকটে তাহার পরাজয় ঘটিয়াই আসিতেছে। যেহেতু এই অভিমানিনী মেয়েটী তাহার বাপের বড় আদরের। শরৎশশী মায়ের 'সো'।

অরবিন্দ চারিদিকের বিশৃঙ্খলায় তিক্ত-বিরক্ত হইয়া, এক সময় শরৎকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোদের বউ কোথায় রে? তাকে যে কোন কাজেই দেখছিনে?"

শরৎ অত্যন্ত গম্ভীরমুখে জবাব দিল, "কবেই বা তিনি সর্ব্বদা খেটে খুন হন্?"

অরবিন্দ কহিল, "ডেকেই নে'না কেন? এত কাজ, কেউ কিছু না কর্‌লে হবে কি করে?"

"বাবা! আমার অত বড় বুকের পাটা নেই! তোমার থাকে তুমি ডেকে আনগে যাও।"

বোনের উত্তরে অপ্রসন্নচিত্ত অধিকতর অপ্রসন্ন করিয়া স্ত্রীর খোঁজে আসিয়া অরবিন্দ দেখিল, পত্নী ব্রজরাণী জটাজালসংবদ্ধ রাশি রাশি রুক্ষ চুল বালিসের উপর ছড়াইয়া দিয়া বিছানায় পড়িয়া একখানা নভেল পড়িতেছেন। দেখিয়া তাহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। স্বভাবের বিপরীত ঈষৎ রুক্ষ-স্বরেই সে কহিয়া উঠিল—"এখন কি বই মুখে দিয়ে শুয়ে থাকবার সময়? শরৎ একা কত দিক সাম্‌লাবে বলো দেখি।"

"কেন, একা কেন? আর একজন যাঁর আস্‌বার কথা ছিল, তিনি এলেই তো ওঁর দোসর হতে পারবেন।"

"কে? কার আবার আস্‌বার কথা ছিল? তা সে যেই যত আসুক, তোমার ঘর-সংসার, তুমি এমন নির্লিপ্ত হয়ে আজকের দিনে শুয়ে থাকলে কি চলে রাণি?"

"আমার আবার ঘর-সংসার কি রকম শুনি? আমি কে? সর্ব্বেসর্ব্বা ঘরণী গৃহিণী বেটার মা যিনি, তিনিই যখন আস্‌ছেন, তখন মাঝখান থেকে আমায় নিয়ে আর টানাটানি কেন? আমি যেমন আছি, একটা পাশে পড়ে থাকি না,—তায় কার কি ক্ষতি?—" ইহা বলিয়া পঠিত গ্রন্থের পৃষ্ঠ উল্টাইয়া ব্রজরাণী সেই ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসখানির উপর গভীর মনোযোগ প্রদান করিলেন। সেখানে তাঁহার নিজের সমস্যার চেয়েও বড় ভীষণ সমস্যার সংঘর্ষ চলিতেছে। এই খোঁচাটা খাইয়া স্বামীর মুখের ভাবখানা কি প্রকার হইল, তাহা পর্য্যবেক্ষণের ইচ্ছা সত্ত্বেও চাহিয়া দেখিবার সাহস হইল না। যদি সে দৃষ্টিটুকু ধরা পড়িয়া যায়!

এই অনুযোগে অরবিন্দর মুখের ভাব কিরূপ হইল, তাহা আমরাও দেখি নাই; তবে গলার স্বরে অনেকখানি বিরক্তি ভরিয়াই যে সে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, তাহা শুনা গিয়াছে। সে কহিল, "কে তোমায় এই সব আজগুবি খবর দিয়েছে শুনি?"

ব্রজরাণী বই হইতে মুখ তুলিল না, পঠনশীল মেধাবী ছাত্রীর ন্যায় পুস্তকের পৃষ্ঠায় অখণ্ড মনোযোগ রাখিয়াই তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "খবরটা তার আমায় হঠাৎ দেওয়াই অন্যায় হয়ে গ্যাছে না?"

"এসব কথা নিয়ে যারা ঘোঁট করে বেড়ায় তাদের—"

"ওগো, তাদের মিথ্যে শাপ-শাপান্ত করো না, আমায় কেউ খবর দেবার জন্য বাইরে থেকে বার্ত্তাবহ আসেনি; বাড়ীর মধ্যে রয়েছি, সবই তো কানে যায়, আমিও তো আর নেহাৎ ধান খাইনে।"

"না,—ধান তুমি থাবে কেন, আমিই থাই। তা যাক্, এখন ওসব বাজে কল্পনা নিয়ে শুয়ে না থেকে, সংসারের কাজকর্ম্ম একটু দেখ শোনগে। মার কোমরে এখন এত বল নেই যে এই বিরাট ব্যাপার তিনি ঘটিয়ে তুল্বেন। শরতের নিজের কাচ্চা বাচ্চা আছে, সে-ই বা কত পারে।"

"ওঃ, তিনি তা'হলে এসব চুকে বুকে গেলে আস্বেন? তার কি দরকার ছিল? আস্চেনই যখন, তখন দু'দিন আগে এলেই ত হোত।—আমার কি?—" এইবার, হাতের বইখানা সশব্দে বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ব্রজরাণী উঠিয়া বসিল।—"আমি বাবা কি দাদা কারুকে লিখ্লেই, কেউ এসে সেই দিনেই আমায় নিয়ে যাবে'খন।"

নিজের অশেষবিধ ভয় ভাবনায় অস্থির অরবিন্দ আর একটা নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়াই তথা হইতে নিরুত্তরে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কেচিন্নিনিন্দুর্নৃপমপ্রশান্তং বিচক্রুশুঃ কেচন সাশ্রমুচ্চৈঃ।
উচুস্তথান্যে ভরতস্য মাতাং ধিক্কেকয়ীমিত্যপরো জগাদ।

—ভাট্টি।

সন্ধ্যার পর ছাদের উপরের সান ঝিয়েরা ধুইয়া দিয়া আসিয়াছিল। আলিসার ধারে ধারে পাতা-বাহার মল্লিকা বেল যুঁই ও রজনীগন্ধার মাটির টব সারি সারি সাজান। ফুলের গাছে কতকগুলি করিয়া ফুল ফুটিয়া বেশ একটা সুগন্ধ উত্থিত হইতেছিল। সেই ছাদের এক ধারে মেঝের উপর শয়ন করিয়া নব-বিধবা আজিও সকলের অজ্ঞাতে বালিকার ন্যায় শোকাশ্রু-

পাত করিতে করিতে দূর অতীতের সুদীর্ঘকাল-বিস্মৃত কতই না ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। নাতিনাতিনীগণ—শরতের পুত্র-কন্যা,—পূর্ব্বের ন্যায় গল্প বলিবার জন্য 'দিদিমণি'কে কিছুক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া, তালরূপ কৃতকার্য্য না হওয়াতে, ক্ষুণ্ণচিত্তে নীচে নামিয়া গিয়াছে। বাহিরে ধৈর্য্যাবলম্বনের অশেষবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও ভিতরের ভাঙ্গাটা লইয়া ঠিক সেই চিরাভ্যস্ত স্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলা এখন পর্য্যন্ত সহজ হইতেছিল না। তা' হউক, কালে আবার সকলই ঠিক হইয়া যাইবে। শুধু দুটো দিনের অবসর চাই। ছেলেরা নামিয়া গেলে পুরাতন দাসী কদম আসিয়া পা লইয়া বসিল, বারণ করিলেও সে মানিল না। অগত্যাই তাহার এ স্নেহের অত্যাচার সহিয়া লইতে বাধ্য হইয়াই গৃহিণী চুপ করিয়া গেলেন। তা ভিন্ন, চিরদিনের অভ্যাসটাও ঠিক মৌতাতের মত। সে সময় হইলে আপনি আসিয়া খোঁচা দেয়।

"মা! মা, কোথায় গা?"—ডাক দিয়া অরবিন্দ উপরে উঠিয়া আসিল। ছাদ অন্ধকার, আলো হইতে আসিয়া প্রথমটা সে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। মাতা সস্নেহে ডাক দিয়া বলিলেন, "এই যে বাবা আমি, আয়।"

মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া—যে পা-খানা খালি ছিল, সেই-খানাকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া পুত্র জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ মা?"

"ভাল আছি বাবা। তোমার আজ কতদূর অবধি সারা হ'লো? কোথায় কোথায় 'দ্বারস্থ' হওয়া বাকী?"

দুইহাতে মায়ের পা টিপিতে টিপিতে ছেলে একটা ক্লান্তিসূচক নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিল, "বাকী এখনও ঢের মা, এখনও কল্‌কাতার বাইরের প্রায় সবই বাকী। ভবানীপুর, সালকে, কাশীপুর এই ক'জায়গা শুধু সেরে ফেলেছি।"

"শরতের শাশুড়ীর ওখানে গেছলে? উষাদের বাড়ী?"

"হ্যাঁ মা, ও দুটো হয়ে গ্যাছে। শরতের শাশুড়ী অনেক দুঃখ করলেন, কাঁদলেন,—বলেছেন একদিন আসবেন।"

"ঊষার শ্বশুর কিছু বল্লেন টল্লেন?"

"উনি যেমন সুবিধা পেলে দু'কথা শোনাতে চান, তেমনি দু'একটা কথা অবশ্য না বল্লেন তা নয়। তবে মণীন্ ছেলেটা ভাল, সে একরকম কেঁদে ফেল্লে। দেখা হয়নি বলে অনেক দুঃখ করলে। এখানে ছিল না, এই পরশু এসেছে। আসবে একদিন।"

"তা ওঁদের এখন কথা শোনাবার মতন কি এমন ঘট্লো শুনি?"

"কথা আর এমন কি, এই বাবা মেয়েদের মোটে দশ হাজার টাকা করে দিয়েছেন, সেইটি তেমন ভাল লাগেনি, এই আর কি।—যাক্ ও কথা যেতে দাও।—ও অমন একটু আধটু কুটুমের কাছে শুনতেই হয়।"

গৃহিণী উপযুক্ত সন্তানের এই সদ্যুক্তি মানিয়া লইয়া এইখানেই ও আলোচনায় ইতি করিলেন। কুটুমের নিকট যে কতখানি শুনিতে বা সহিতে হয়, তাহা তাঁহার বোধ করি সকল দিক্ দিয়াই বেশ ভাল রকম একটু অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকিবে! কিছুক্ষণ মাতা পুত্র উভয়েই নীরব অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার পর, একসঙ্গে উভয়ের অধিকার হইতে দুই পা টানিয়া লইয়া গৃহিণী কহিলেন—"আর কাজ নেই, হ'য়েছে। কানু তুই নীচে যা, দেখ্‌গে ছেলেরা কি করচে। অরু, আয় বাবা, পায়ের তলায় কেন,—কাছে এসে বোস্। জল খেয়েছিস্?"

"না মা, খাইনি,—আর একটু পরে তোমার সঙ্গে একসঙ্গে খাব।"

"সে কি রে! সারাদিন কত জায়গায় ঘুরেছিস্—ক্ষিধে তেষ্টায় প্রাণ টা-টা করচে, এখনও তোকে খেতে দেয়নি। যা তো কানু, শরিকে বউমাকে বল্‌গে তো। কেমন ধারা আক্কেল তাদের?—"

"ওদের দোষ নেই মা, শরৎ আমায় খেতে ডেকেছিল, আমিই তোমার সঙ্গে খাব বলে খেলুম না।"

"আমার যে মোটেই ক্ষিধে তেষ্টা নেই। তুই যা বাবা, একটু জল মুখে দিয়ে আয়। যাও, গোপাল আমার যাও।"

মাতা উঠিয়া বসিয়া, পুত্রের শুষ্ক মুখে, ললাটে সস্নেহে বারংবার হাত বুলাইয়া, সেই হস্তের অঙ্গুলী কয়টি চুম্বন করিলেন।

"না মা, কালি আবার একাদশী, আজ তোমায় কিছু খেতেই হবে।"

"আমার যে গলা বুজে আছে বাবা, তুই আর মিথ্যে দেরী করিস্‌নে অরু, কথা শোন্‌, ওঠ্‌—"

"আমারও আজ খেতে ইচ্ছে করচে না মা, তার চেয়ে এইখানে একটু শুয়ে পড়ি।—কাদু, আমার বিছানাটা একটু ঠিক করে দিগে তো।"

এই বলিয়া অরবিন্দ মায়ের কোল ঘেঁসিয়া তাঁহার গায়ে হাত রাখিয়া মেঝের উপরেই শুইয়া পড়িল। কাদু চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল,—"ওমা, ও কি গো! শুলে কি গো দাদাবাবু! সেই সকালে কখন ভুটো মাল্‌সা-পোড়া কাঁচকলা ভাতে ভাত মুখে দিয়েছ। সেই কি ভাল করে খেতে পেরেছিলে! তা'রপর সারাদিন এই ঘুরান্তি পোড়ান্তি,—ন্যাও, ন্যাও—ওঠো, জলটল খেয়ে তখন আবার মায়ের কাছে এসে বসতে হয় বসো। না হয় মা তুমিই উঠে এসো না বাবু! মা নৈলে যখন খাবেই না।"

মাতাকে আর এত কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না। মাতৃবৎসল পুত্রের এ স্নেহের অত্যাচারে তাঁহার সদ্য শোকক্ষত অন্তর যেন শীতল প্রলেপে জুড়াইয়া আসিতেছিল। পুনশ্চ স্নেহ হস্তখানি তাহার মাথায় মুখে মর্ষণ করিয়া তিনি তখন হাসি কান্নায় মিশাইয়া স্নেহগভীরকণ্ঠে কহিলেন, "তবে চল বাবা, তুমি শুন্‌বে না যখন, তখন যাই। কাদু, যা' দিতে বল্‌গে যা।"

আহারে বসিয়া মাতা নিজের বাটির ঘন দুধ ও অর্দ্ধেকগুলি ফলমূল ছেলের বারংবার উত্তেজনাপূর্ণ আপত্তি সত্ত্বেও, তাহার পাতে তুলিয়া দিয়া, আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অরবিন্দ শরৎকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, "এই

ভাঙ্গা শরীর মনে কাল আবার নির্জ্জলা উপোস্ করতে হবে, দেখ্ দেখি মায়ের কাণ্ড!"

মা কহিলেন—"তুই অত করে ভাবছিস্ কেন অরু, উপোসে আমার কিছুই করতে পারবে না দেখিস্। কত কচি কচি দুধের মেয়ে এই কাজ করে জন্ম গোঙাচ্চে—আমাদের ত এ বুড়ো হাড়।"

শরৎ কহিল, "বয়েসের জোরে অনেকখানি কষ্ট সহ্য হয়ে যায় মা—তোমাদেরই এই বয়সে বেশি লাগবার কথা।"

"না রে না, আমার ওতে কিছুই হবে না; শরীরের আমার কি ঠিক আছে যে, উপোস্ কি খাওয়া কিছু বোঝাবে। হ্যাঁরে অরু, তোর শ্বশুরবাড়ী গেছ্‌লি তো?"

"গেছলুম বই কি,—কাল সেখানে আর ভবানীপুরের সব সেরে এসেছি যে।"

"বর্দ্ধমানে গেছ্‌লে দাদা?"

"শরৎ! ওকে খাবার জল দিলিনে?"

"দিয়েছি বই কি, ওই যে মার রূপোর ঘটিতে গঙ্গা-জল আছে?—হ্যাঁ দাদা, বর্দ্ধমানে যাওনি?"

"জিনিষ যা আস্‌ছে, ফর্দ্দ মিলিয়ে তুল্‌ছিস্ ত? এর পর যেন বল্‌তে বসো না—এ এলো না,—তা এলো না।"

"না গো না, সে সব ঠিক হচ্চে।—তোমায় যা জিজ্ঞাসা করচি, তার জবাব দাও না?"

অরবিন্দ আখের টিক্‌লি চর্ব্বণে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিল। তার পর মাতাকে শুদ্ধ জিজ্ঞাসু দেখিয়া, কি ভাবিয়া উত্তর করিল, "না।"

"না যাওয়াটা কি ভাল হয়েছে? হ্যাঁ মা, তুমিই বলো দেখি,—দাদার তাঁদের একবার বল্‌তে যাওয়া কি উচিত নয়?"

মায়ের চিত্তেও বোধ করি এ সম্বন্ধে চিন্তার স্রোত কয়দিন হইতেই বহিতেছিল; প্রকাশ করিতে হয়ত বা সাহস হইতেছিল না। এখন মেয়ের কথায় জোর পাইয়া ঈষৎ যেন আগ্রহের সহিতই কহিয়া উঠিলেন, "উচিত বই কি। তা' যাবেই তো। ওদের যে আন্‌তে হবে,—অমনি সঙ্গে করেই নিয়ে আসিস্ না, বাবা!"

"কাদের মা?"

"বউমা আর আমার খোকাধনকে।"

"সে কি! তুমি এ কি বল্‌চো মা?"

"কিছু অন্যায় তো বলিনি বাবা! এত বড় বৃহৎ ব্যাপার, দেশ-বিদেশের সবাই আস্‌বে—শুধু তারাই আস্‌বে না? তা ছাড়া এতে সবাইকে একসঙ্গে এক ঘাট কর্‌তে হয় যে।"

অরবিন্দ হাতে নজির থাকা সত্ত্বেও মায়ের বিরুদ্ধে বেশি কথা কহিল না, সংক্ষেপে কেবলমাত্র উত্তর করিল, "সে হয় না মা।"

"কেন হয় না বাবা; এ যে হতেই হবে। নৈলে দশের চক্ষে বাছাকে নিরপরাধে যে চিরদিনের মতই কালো করে রাখা হয়। তা' ছাড়া সেখানে যে আমার বংশধর ছেলে রয়েছে।"

"মা, বাবা এই ক'দিন গেছেন—আজ আমায় তুমি শুদ্ধ তাঁর বিদ্রোহী হ'তে বল্‌চো? বাবা বেঁচে থাকতে একদিনের জন্য যা বল্‌তে পারোনি, আজ তিনি সাম্‌নে নেই বলে, কি হিসেবে সেই কাজ আমায় কর্‌তে বলো?"

"তিনি ঝোঁকের মাথায় একটা অনুচিত কাজ করে গেছেন। তুমি যোগ্য সন্তান, তাঁর ভুল থাকলে, তোমার তা শুধ্‌রে নেওয়াই উচিত। তাতে তাঁর পরলোকের পক্ষে ভালই হবে অরু! আমার মন এই কথা চিরদিনই বলে এসেছে—শুধু ভয়ে কখন দু'ঠোঁট এক করিনি।"

"তবে আজও কোরো না মা। যা' তাঁর সাম্‌নে কর্‌তে পারিনি,—তুমিও সাহস করে বলোনি,—আজও তুমি তা আমায় বোলো না। আমিও

পার্‌বো না। আমায় এই দুটো দিন পরে তাঁর কাজ কর্‌তে হবে। তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহ্বান করে তৃপ্ত কর্‌তে হবে। তাঁর এতবড় অপ্রিয় সাধন করে কোন্ মুখে তাঁর কাছে মুখ তুলে দাঁড়াব মা? আমার হাতের জল ঘৃণা করে যদি তিনি না নিয়েই ফিরে যান!—না, মা, না, কাজ নেই।"

যে আবেগ-গাঢ় অকৃত্রিম স্বরে এই কথা উচ্চারিত হইল, ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করা অসম্ভব! মাতাপুত্রী উভয়েই এই সুদৃঢ় যুক্তির অখণ্ডনীয়তা অনুভব করিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা না কহিয়া নীরবে আহার সমাধা করিয়া উঠিলে পর, আচমনান্তে অরবিন্দ চলিয়া যায়,—কন্যার ইঙ্গিতে জননী তাহাকে পুনরাহ্বান করিয়া, আবার একবার অনুরোধ অনুজ্ঞামিশ্রিত কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন,—

"কোন অপরাধে অপরাধী নয়, কোন পাপে পাপী নয়; একজনের দোষে আর একজনকে শাস্তি দেওয়া, এই কি ধর্ম্মসঙ্গত বাবা? আচ্ছা, তাও যদি হলো, এখন আমিই তো তোমার গুরু, আমি বল্‌ছি, আমার আদেশ মেনেও তুমি তাদের নিয়ে এসো। এতে যা পাপ অর্শায়, আমায় অর্শাবে। সতী-লক্ষ্মীর চোখের জল চিরদিন ধরে ঈশ্বর বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌বেন কেন অরু?"

"সে হয় না মা! বাবা ভবানীপুরের ওদের কথা দিয়েছিলেন; তার পর তাঁর শেষ-মুহূর্ত্তেও তো শরৎ একবার চেষ্টা করেছিল; সে বলেছিল, 'বাবা আপনি বড় বউদিদিকে আন্‌বার অনুমতি দিয়ে যান'—তাতে কি উত্তর দিয়েছিলেন, তা কি এরই মধ্যে তুই ভুলে গেছিস্ শরৎ?"

গৃহিণী এ সংবাদ জানিতেন না। কন্যার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলেছিলেন রে?"

অপ্রসন্ন-মুখে শরৎশশী উত্তর দিল, "যা বরাবর বলেছেন, অনুমতি দেবেন না। ছোটবউএর বাপের কাছে তা'হলে জোচ্চোর হ'তে হবে।"

"তবে আর আমায় তোমরা কি বল্‌চো মা?"

অরাবন্দ প্রস্থানোদ্যত হইয়া মার মুখের দিকে চাহিল।…

"কি আর বল্‌বো বাবা, যা তোমাদের ধর্ম্ম হয়, তোমরাই করো। তবে সে নিতান্তই ভালমানুষ, নিরপরাধা,—জানিনে, বাছা আমার কোন্ জন্মে কার কি মর্ম্মান্তিক করেছিলেন, তাই এই এতবড় অভিশাপ নিয়ে ভারতে এসে মেয়ে হয়ে জন্মেছেন।"—

গৃহিণী সুদীর্ঘ-সঞ্চিত সমবেদনার উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। অরবিন্দ মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

শরৎশশী প্রস্থানশীল জ্যেষ্ঠের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, পরে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া, মাতার দিকে চাহিয়া, কণ্ঠস্বর নত করিয়া কহিল, "ও আর কি করবে মা, যত না বাবার—তার চেয়ে বউএর ভয়ই বেশি। দত্তবাড়ীর মেয়ে, ঐ বউটি তো আর তোমার বড় কম মেয়ে ন'ন।"

মাতার বেদনাভারাতুর চিত্তমধ্য হইতে আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস উত্থিত হইল। তিনি নিজের শুষ্ক ললাটে হস্ত প্রদান করিয়া সবচেয়ে যে উপায় অবলম্বনে মানুষ পরের উপর বিদ্বিষ্ট হওয়ার পাপ মুক্ত হইয়া মনের মধ্যে সান্ত্বনা, এমন কি শান্তি অবধি লাভ করিতে পারে, সেই নিরীহ পথাশ্রয় করিয়াই আপনাকে এবং কন্যাকেও শান্ত করিতে চাহিলেন, বলিলেন, "সবই বরাত মা! না হ'লে এমনটাই বা ঘট্‌বে কেন? ছেলে নিজে দেখে শুনে মনের মত বউ আন্‌লে, ছেলের ইচ্ছা বুঝে তখন কর্ত্তাও তো একরকম করে মত দিলেন। তারপর কোথা থেকে কি?—বউ আট্‌কে রাখ্‌লেন। তা আছে, না হয় থাক্, সুখে বই মেয়ে কিছু দুঃখে নেই। তা হলো না, মা মাগির মেয়ের জন্যে রস অমনি টসিয়ে পড়লো। বাপ মিন্‌সে ভালমানুষ,—আনাগোনা করে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে ফেল্লে।—শেষে দুই বেয়ায়ে ঝগড়া গালমন্দ হ'য়ে জন্মের মত ঘরের লক্ষ্মী আমার, ঘরের বা'র হলেন।"

শরতের চিত্ত আজ বলিয়া নয়—সেই প্রথম যেদিন তাহার প্রথম

কৈশোর-সঙ্গিনী অকস্মাৎ তাহাদের উভয়ের নিবিড় প্রণয়বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া মমতাবিহীন নিষ্ঠুর অকালবিসর্জ্জনে বিসর্জ্জিতা হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই এই দীর্ঘকাল ধরিয়া এই অবিচারের বিরুদ্ধে জ্বলিয়া আসিয়াছে। আজ আবার শেষ আশাভঙ্গে সে জ্বালা বর্দ্ধিতবেগ হইয়া উঠিয়াছিল। সে মায়ের মত অদৃষ্টের ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বরং ঈষৎ ঝঙ্কার করিয়াই বলিল, "তা তাতেও তাদের চেয়ে আমাদেরই দোষ বেশি ছিল। মুখের উপর চৌদ্দপুরুষ তুলে গাল দিলে কোন্ ভদ্র-লোকের ছেলে সইতে পারে মা? হলেই বা মেয়ের বাপ। বড়ঘরে মেয়ে দিয়েছে না হয় সে-ই অপরাধী, তার বাপ পিতামহ কি করেছে, বল তো? তা' সে যা'হোক, দাদারও আবার সকলই বাড়াবাড়ি। যাঁদের মধ্যে ওসব ঘটেছিল, তাঁরা দু'জনেই তো আর এখন বর্ত্তমান নেই; তোমার সঙ্গে তো কিছু হয়নি। তোমার অত ভয় কেন বাবু?"—এই বলিয়া বিরক্তিভরে শরৎশশী বিশেষ একটা ইঙ্গিত দ্বারা কোন ব্যক্তিবিশেষকে পূরাপূরি দায়ী করিয়া, পাশের ঘর হইতে ঘুমন্ত খোকার সহসা জাগিয়া উঠিবার সাড়া পাইয়া, সসব্যস্তে ওঘরে চলিয়া গেল। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া গৃহিণীও উঠিয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্।

—অভিজ্ঞান শকুন্তল।

বর্দ্ধমানেরই প্রান্তভাগে দীননাথ মিত্রের একতালা কোঠাবাড়ীখানি ইদানীং বহুদিন সংস্কারাভাবে জীর্ণাবস্থ হইলেও, অতীতে একদিন যে গৃহস্বামীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না;—তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন আজিও ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

গৃহসংলগ্ন বড় বড় স্তম্ভযুক্ত চণ্ডীমণ্ডপ এবং মোটা মোটা লোহার গুলে বসান প্রবেশদ্বার এখনও ইঁহাদের পূর্ব্ব সমৃদ্ধাবস্থার সাক্ষ্য দেওয়া ভিন্ন আর কোন উপকারে লাগিতেছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, দারিদ্র্যে পতিত ধনী-বংশীয়গণের পক্ষে গত গৌরবের অস্তোন্মুখ স্মৃতিটুকুর মূল্য কোন ভাগ্যবানের সুসজ্জ প্রাসাদাপেক্ষা অল্প নয়।

গৃহস্বামী এক্ষণে স্বর্গীয়। গৃহস্বামিনী দুর্গাসুন্দরী প্রতিনিধিত্বে এই পতনোন্মুখ গৃহরাজ্য পরিচালনা করিতেছেন। কয়েক বিঘা ধান জমি ও গৃহ-সংলগ্ন ফলপাকড়ের সামান্য একখানি বাগান মাত্র এই অনাথ পরিবারের সম্বল। জমিগুলির উৎপন্ন নেহাৎ অল্প নয়; অন্নাভাব ঘটে না,—মোটা ভাত কাপড় এক রকম করিয়া চলিয়া যায়। গৃহে পোষ্যের সংখ্যাও বেশী নহে। বিধবা নিজে, শ্বশুর-পরিত্যক্তা একমাত্র যুবতী কন্যা এবং বালক দৌহিত্র; তদ্ভিন্ন রাখু কৃষাণ, মুংলি গাই, সোহাগী নাম্নী তস্য কন্যা এবং একটা পোষা টিয়া, এই কয়টি অনন্যসহায় প্রাণী,—মানব মানবী শিশু এবং পশু।

বর্দ্ধমানের এই অংশ লোকবিরল, প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ। সামান্য একটু দূরে অনেক উচ্চ জাতীয়ের নিবাস থাকিলেও খুব নিকটে বড় একটা লোকালয় ছিল না। এই নিরভিভাবক ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিবেশী-সংখ্যাও সেই হেতু বড় কম। ছিদাম মুচি, হাড়ি বউ, অঘোর পোদ, আতুরি গয়লানি এই প্রকার দু' পাঁচঘর দরিদ্রের দু' পাঁচখানা মেটে ঘর ব্যতীত আর তিনখানি পাকা বাড়ীমাত্র সেই বনাকীর্ণ ফল ও আগাছাপূর্ণ বাগান বাগিচার মধ্য হইতে দৃষ্ট হইত। এই বাড়ী তিনখানির মধ্যে একখানি ইঁহাদেরই স্বজাতীয়ের,—একখানি চাটুয্যে পরিবারের, এবং তৃতীয়খানিতে একটী মুসলমান পরিবার বাস করিয়া থাকেন। শেষোক্ত পরিবার অতি সম্ভ্রান্ত-বংশীয়;—শুনা যায়, সুপ্রসিদ্ধ টিপু সুলতানের অতি নিকট আত্মীয়ের বংশোৎপন্ন, ইদানীং হীনাবস্থ।

যে সময়ের কথা হইতেছিল, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে পৃথিবী ফাটিতেছে। কলিকাতার রাস্তায় এ সময় অনেক প্রকার বরফ সরবতের হাঁক শুনা যায়; এখানে সে পাঠ নাই—তাহার পরিবর্ত্তে বরং আকাশে উধাও একটা পাখী আকুল স্বরে 'ফটিক্ জল' হাঁকিতেছিল। মিত্রদের একতালার ঘেরা দালানে জটাবাঁধা রুক্ষ চুলের রাশি জড়াইয়া মনোরমা হবিষ্য সারিয়া, আসন মাজিয়া সবেমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহার বাল্য সখী রাবেয়া আসিয়া হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মনো, কি হচ্চে ?"

নসিরউদ্দীনের দুই স্ত্রী; রাবেয়া প্রথমা বড়বিবির জ্যেষ্ঠা কন্যা, মনোরমারই সমবয়স্কা। আজ এই অনাদৃতার রূপ যৌবন সকলই মেঘচ্ছায়ান্ধকারে মসীময় হইয়া গেলেও একদিন সৌন্দর্য্যের বলেই না ঐ হতভাগিনী অহঙ্কৃত ধনিগৃহের বধূরূপে আজীবনব্যাপী মহা দুঃখ ক্রয় করিয়াছিল। আজও সে সৌন্দর্য্যের সমস্তটাই হয়ত নিঃশেষ হইয়া না-ও গিয়া থাকিবে,—মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত তাহার কতকটা আভাস তৈলসম্বন্ধ-বিহীন ঘন চিকুরজালের মধ্য দিয়া, অযত্নরক্ষিত দেহলতা হইতে চ্ছুরিত হইয়া আজিও সহসা দর্শকের বিস্মিত দৃষ্টিতে বেদনা ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু সেই মনোরমা প্রতিমাও এই বনালয়নিবাসিনী সুলতানবংশীয়ার নিকট দীপের নিকট খদ্যোতিকার মতই মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। চন্দ্রকরের মতই স্নিগ্ধ, লতার মতই কোমল, স্থির বিদ্যুৎলেখার ন্যায় উজ্জ্বলদর্শনা এই নারীটি বাস্তবিকই বিধাতার সৃজনকলার অপূর্ব্ব গৌরব !

মনোরমা ঈষৎ হাসির সহিত সখীকে সম্বর্দ্ধনা করিল, "এই খেয়ে উঠ্‌নুম, ক'দিন এসোনি কেন ভাই রাবেয়া ?"

"ছোটমার শরীরটা বড় ভাল ছিল না, খুকিরও বড় জ্বর গেল, এই সব ঝঞ্ঝাটে আসতে পারিনি। হ্যাঁ মনো, তোমার না কি শ্বশুর মারা গ্যাছে ?"

"হ্যাঁ, ভাই।"

"তাহলে এইবার বোধ করি বেহেস্তের পরী শাপান্ত হয়ে বেহেস্তে প্রতিগমন করবেন ?"

মনোরমা এই কাজ্ক্ষিত পরিহাসে মুখ নত করিয়া, সলজ্জ মৃদুহাস্যে সেই নত মুখ ঈষৎ রঞ্জিত করিয়া, অস্ফুট-কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "কি জানি ভাই।"

কথা শেষে মৃদু সংশয়শঙ্কিত জড়িমা তাহার কণ্ঠ কম্পিত করিল। এই একটী মাত্র চিন্তা; এই সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই মিত্র পরিবারের অল্প কয়টি প্রাণীই যেন এ কয়দিন তলাইয়া রহিয়াছে। কৃষাণ রাখু একমুখ হাসি ভরিয়া আনিয়া, যখন পাঠশালা প্রত্যাগত অজিতকে দুই হাতে ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে, শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া বলিতেছিল, "এইবারে আমার দাদাঠাকুর নিজের রাজ্যিপাটে বসতে যাবেন; আমি আর লাঙ্গল ঘাড়ে করবো না তো, দাদুর কাছে গিয়ে দাদুর ফিটিন হাঁকাবো।"—তখন অত্যন্ত শৈশবাবস্থা হইতে অনির্দ্দেশ্য পিতৃগৃহের অজস্র সুখসৌভাগ্যের সহিত বিশেষ করিয়া ইহারই মুখে মুখে পরিচয় থাকা প্রযুক্ত, বালক অজিতকুমারের কর্ণে ইহার এইরূপ আকস্মিক আনন্দোচ্ছ্বাসটুকু কিছুমাত্র অসঙ্গত বা অসম্ভব না ঠেকিলেও এবং পুত্রের উদ্দেশ্যে আগতা মনোরমার কর্ণেও প্রগল্‌ভ বৃদ্ধের এই সরল বিশ্বাসের সহজ অভিব্যক্তিটুকু নিশ্চিত সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও, সংসারের কূটতত্ত্বে একান্ত অভিজ্ঞা বুদ্ধিমতী দুর্গাসুন্দরী ঈষৎ বিকৃত-মুখে অবিশ্বাসের রেখা আঁকিয়া সরিয়া গেলেন। যখন জামাতার পিতৃ-বিয়োগের সংবাদ পরের মুখে শুনিতে হইয়াছে, তখনি তাঁহার অন্তরস্থ ক্ষীণ আশাদীপটুকু চিরতিমিরগর্ভশায়ী হইয়াছে। পুত্র পিতার পথানুসরণ করিবেন। পিতার শাসনে পত্নীত্যাগ করিলেও, পিতা অবর্ত্তমানেও আর তিনি পরিত্যক্তাকে ফিরিয়া গ্রহণ করিবেন না। ইহা এক প্রকার স্থির! বিষম ক্রোধে ও অপমানের

আগুনে দুর্গাসুন্দরী বাজপড়া তালগাছের মত ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িতে লাগিলেন। বৈবাহিকের অপেক্ষা শতগুণ ক্রোধে জামাতার প্রতি মন তাঁহার এতদিন পরে অকস্মাৎ এক নিমেষের মধ্যে বিষতিক্ত হইয়া উঠিল। বেহায়ে বেহায়ে ঝগড়া হইয়াছিল, তাহার সহিত তো কিছুই হয় নাই। সে কি বলিয়া নিজের শাস্ত্রানুশাসনে গ্রহণ করা, সন্তান-জননী পত্নীর আজ স্বেচ্ছায় এই অবমাননা করে? অপাঙ্গে চাহিতে চাহিতে কন্যার শুষ্ক মুখে নবীন আশার বড় উজ্জ্বল দীপ্তি চোকে পড়িল; নিজের জিহ্বাগত অবজ্ঞা-সূচক কথাকয়টা অমনি সংযত করিয়া ফেলিলেন। সংসারের একটীমাত্র অবলম্বন এই মুখখানিতে এতটুকু আশার আলোও আজ যে সুদীর্ঘ সাতটী বৎসর ধরিয়া তাঁহার এই দুইটী অশ্রু-অন্ধ নেত্র দর্শন করিতে পায় নাই! তিনি বুঝিলেন, কন্যা আশা করিতেছে। দীর্ঘশ্বাস গোপনেই মোচন করিলেন,—মনেমনেই বলিলেন, বৃথা আশারে! শুধু দুঃখ পাইবি, এ আশা তোর পূর্ণ হবে না বাছারে আমার!

এখন সখীর প্রশ্নে মনোরমা যে এমন অর্দ্ধ অবিশ্বাসে উত্তর দিয়াছিল, ইহার কারণ—তাহারও চিত্তের নিশ্চয়তা এক্ষণে কতকটা অনিশ্চিতের মধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া। মাস পূর্ণ হয়, অশৌচান্তকাল নিকটবর্ত্তী; তথাপি এ পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। যে ছেলেটি বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটে অরবিন্দের সহিত, অবশ্য তাহার অনেক নীচে, চাকরি করে, তাহার মুখে শুনিয়া ঘোষ-গৃহিণী একদিন খবর দিয়া গিয়াছেন যে, বসু মহাশয়ের শ্রাদ্ধে বড় ঘটা,—দানসাগর হইবে। আরও যে কি-কি হইবে, সে সব খবর এখনও জানা যায় নাই।

এই ছেলেটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইতেই, অরবিন্দ একটী সহপাঠির জন্য এই গরীব গৃহস্থের কন্যাটিকে 'কনে' দেখিতে আসিয়া, নিজের জন্য পছন্দ করিয়া যায়, এবং ইহারই সহায়তায় তীব্র অভিমানের ক্রোধে ক্ষুব্ধ পিতার অর্দ্ধ-সম্মতি আদায় করিয়া মনোরমার পাণিগ্রহণ করে। পিতার মনে পুত্রকৃত কর্ত্তৃত্ব-

খর্ব্বতাজনিত ক্রোধ স্ফুলিঙ্গ রূপ হইতে কোন্ সহায়ক পবন স্পর্শে জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার পিতৃত্ব-শক্তিকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা বলা গিয়াছে। পুত্রকে যখন উত্তমরূপেই বুঝাইয়া দেওয়া হইল, যে, গ্রহণ করায় তাঁহার ইচ্ছা কিছু কার্য্য করিলেও সেই গৃহীত পণ্য গৃহে রাখা না রাখা সম্বন্ধে তাহার পিতার ইচ্ছাই একমাত্র কার্য্যকারক; তখন একান্ত কষ্টকর হইলেও, পিতৃ-আদেশে নিরীহ অরবিন্দ যে বন্ধনে নিজেকে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহা নিজের জীবন হইতে খুলিয়া ফেলিয়া দিল। পিতৃ-কর্ত্তৃত্বের অবমাননা-ক্ষোভ শান্ত হইল। এই পিতৃ-কর্ত্তৃত্ব লঙ্ঘনরূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তার্থে যাহাকে উৎসর্গ করা হইল, তাহার কথা?—কে ভাবিবে?

রাবেয়া প্রখর বুদ্ধিশালিনী, কৃত-বিশ্বাসার সেই ক্ষুদ্র সংশয়-কণ্টকে তাহার সন্দেহ কুণ্ঠিত চিত্ত বিদ্ধ হইল। কিন্তু সে তাহা অপ্রকাশ রাখিয়া পূর্ব্ববৎ অসংশয়ের স্বরে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "অজুর বাবা এসেছিলেন?"

মনোরমাও তেমনি সলজ্জস্মিত হাস্যে উত্তর দিল, "না ভাই, এখনও আসেন নি। বোধ করি কাজের ভিড়ে পারেন নি।"

"চিঠিপত্র লিখেছেন তো?"

"ন্-না।"

এবার রাবেয়ার সদাহাস্যবিমণ্ডিত সদ্যফোটা পদ্মের মত সুন্দর মুখ গম্ভীর হইল। আকস্মিক বিস্ময়ের সংশয়ে স্তম্ভিত হইয়া সখী শুধু ব্যথাভরা মৌন-চক্ষে সখীর দিকে চাহিল।

মনোরমা মেয়েটি বড়ই সরলা। সন্দেহের ঘোর তাহার চোখে লাগাইয়া দিলেও লাগে না। বিশ্বাস ভক্তিতে প্রাণটি তাহার নিটোল শুভ্র মুক্তাটির মতই আপন গৌরব নির্ম্মলতায় আপনি টল্‌টল্ করিতেছে। সে বাল্যসখীর এই অস্পষ্ট সন্দেহ বিস্ময়কে আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় ভুল করিয়া, তাহার জন্য অনেকখানি সহানুভূতিজড়িত ব্যথাবোধের সহিত অনুচ্চ মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"তোর আমাদের কথা খুব মনে পড়বে, না ভাই রেবা? আমারও

খুব মন কেমন করবে। এতখানি বয়সের মধ্যে ক'দিনই বা আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'য়েছে। সেই বিয়ের পরে যখন বছরখানেক শ্বশুরবাড়ী গেছলুম, সেই যা।"

রাবেয়ার গাম্ভীর্য্যময় বদনে ঈষৎ হাসির বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিয়া গেল। শ্যামসুন্দরের বর্ণসম্পদে গৌরবান্বিত জলভারবিনম্র কাদম্বিনী মধ্যে বিজলী চমকের ন্যায় তাহাতে আবার নূতন সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইল। সে কহিল, "আর সেই যখন আমরা আজমীর যাই—তা' তার জন্য ভাবছিনে মনো! বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক বলে গেছেন, 'বিচ্ছেদেই প্রেমের পরিণতি।' তা আমাদের প্রেমও না হয় এবার বিচ্ছেদের আগুনে গলে খাদ-শূন্য সোনার মত খাঁটি হয়ে দাঁড়াবে।—অজু! তুমি আজ এরই মধ্যে এলে যে?"

শ্লেট ও পাতাছেঁড়া দু'তিনখানি বই বগলে করিয়া একটী সাত বৎসরের বালক দুই পা ধূলা লইয়া ঘর্ম্মাক্ত শরীরে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেটিকে দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। কৃশ গৌর তনু, কুঞ্চিতালক, মুখশ্রী বড় উজ্জ্বল, বড়ই পরিষ্কার। এত রূপ যেন সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষ তাহার চোখ দুটি! বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, দীর্ঘায়ত গভীর কৃষ্ণ তারক—ঠিক যাহাকে হরিণাক্ষ বলা যায়। বালক আসিয়াই বই-খাতা প্রভৃতি নিকটস্থ কুলুঙ্গির মধ্যে বেগে নিক্ষেপ করিল। তারপর মায়ের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া আসিতে আসিতে উত্তর দিল, "ছুটী হ'য়ে গেল।"

"ওঃ, আজ যে শনিবার। হামিদও তো তা'হলে এতক্ষণ এসে থাকবে। আজ তা'হলে আসি মনো! অজু, তোমার বাবা তোমাদের নিয়ে গেলে, তুমি সেখান থেকে হামিদকে চিঠি লিখ।"

"বাবা কি এসেছেন মাসিমা?"

"না, এখনও আসেন নি,—তা আসবেন তো শীঘ্রই।"

"বাবা কবে আসবেন মাসিমা?" বালক মাতার হাত ছাড়াইয়া শুভ-সংবাদদাত্রীর নিকট ছুটিয়া গেল। মনোরমা আঁচল দিয়া পুত্রের অজস্র

ঘর্ম্মশ্রুতি মুছাইয়া দিতেছিল, ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া নিম্নস্বরে কহিয়া উঠিল, "কত ঘেমেছিস্ অজু! আয় মুছিয়ে দিই।"

"থাক্‌গে—" বলিয়া অজিত মাতৃ-সখীর মুখের উপর আগ্রহভরা সেই দুই অদ্ভুত চক্ষু সংস্থাপন পূর্ব্বক এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "বাবা কবে আস্‌বেন মাসিমা?"

রাবেয়া পিতৃস্নেহে বঞ্চিত বালকের মুখের এই একান্ত ব্যগ্রতাপূর্ণ পিতৃমিলনের আকাঙ্ক্ষার পরিচয়ে অন্তস্তলে সহসা একটা তীব্র বেদনা অনুভব করিল। কি জানি, সে নির্ম্মম জনক যদি না-ই আসে। নাঃ—এমন কি ঘটিতে পারে? আসিবে বই কি! এই পতিপ্রাণা সাধ্বীর একনিষ্ঠ একাগ্র সাধনার কি কোনই মূল্য নাই? নিরপরাধ, নিষ্পাপ এই শিশু—ইহাকে খোদা কিসের জন্য চিরদুঃখী করিয়া রাখিবেন? মানুষ নিষ্ঠুর হইতে চাহিলেও, তিনি চিরদিনই বা তাহার সমর্থন করিবেন কেন? প্রকাশ্যে বালকের ঘর্ম্মবিজড়িত কেশগুলি ললাট হইতে সরাইয়া দিয়া, স্নেহপূর্ণ-নেত্রে নিতান্তই সেই ভালবাসিবার মত সুন্দর কোমল মুখখানি দেখিতে দেখিতে উত্তর করিল, "কবে আস্‌বেন, তা তো ঠিক জানিনে, অজু—তবে আজ কালের মধ্যেই আস্‌বেন তিনি। তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবে না ত অজুমণি?"

"নাঃ, আমি, আপনাদের—কক্ষণো ভুলবো না,—দেখবেন, রোজ একটা করে চিঠি লিখবো'খন।"

"রোজ পারবে না, মধ্যে মধ্যে লিখ।"

"নিশ্চয় লিখবো। হ্যাঁ মা! কবে আমরা যাবো মা? যাই দিদি-মণিকে বলে আসিগে।"

বলিতে বলিতে উৎসাহভরে লাফাইয়া উঠিয়া রেলের হুইসিলের অনুরূপ হর্ষধ্বনি সহকারে বালক এঞ্জিনের মত তীব্রবেগে সুসংবাদ প্রদান করিতে মাতামহীর উদ্দেশ্যে ছুটিল।—অকস্মাৎ মনোরমার অন্তর্মধ্যস্থ গোপন

আনন্দের অন্তঃসলিলা নদীস্রোতে বিরুদ্ধ বায়ুর স্রোত সবেগে আঘাত করিল। মাতার নামে তাহার অধরপ্রান্তস্থিত মৃদুমন্দ হাস্যবিন্দু চকিতে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে চমকিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "অজি!—অজিত, শুনে যা।"

ততক্ষণে অজিত অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতলের সিঁড়িতে দুপ্‌দাপ্ পায়ের শব্দ এবং 'দিদিমণি! দিদিমণি!' উচ্চ চীৎকারে দ্বৈপ্রহরীক নিস্তব্ধতাকে সে তখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খানখান করিতেছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অদ্যাপি তামর্হিতাং মনসাপি নিত্যং
সংচিন্তয়ামি সততং মম জীবিতেশাম্॥

—চৌর-পঞ্চাশৎ।

মনোরমা যে ভয় করিতেছিল, ঠিক সেরূপ না ঘটায়, সে কিছু বিস্ময়ানুভব করিলেও, মনে মনে অবশ্য হৃষ্টই হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে এই শিশুটি সংসারের যাবতীয় নিঃসম্পর্ক লোকের মতই, অপরিচিত পিতার সম্বন্ধে মায়ের মুখে শোনা কথা যদি কখনও বড় উৎসাহসহকারে তাহার এ জগতের মধ্যে এই দ্বিতীয় আপনার জনকে জানাইতে গিয়াছে, তখনই সেখান হইতে প্রতিদানে হয় নীরব ঔদাস্য, অথবা ঈষৎ বিরক্ত হাস্য—এবং ইহারই পরে মনোরমা একটুখানি অতি তীক্ষ্ণ তিরস্কার লাভ করিয়া লজ্জায় মরিয়া গিয়াছে। অবশ্য তিরস্কারটায় শাক দিয়া মাছ ঢাকা হইত; কিন্তু সে ছলটুকুর [illegible] দিয়া প্রকৃত গূঢ় কারণটা প্রায়ই অব্যক্ত থাকিত না। জামাই বা জামাই-বাড়ীর নামটাই যেন দুর্গাসুন্দরীর সর্ব্বদেহে বিষজ্বালা মাখাইয়া দিতে থাকে,—এ

জিনিষটাকে তিনি একেবারেই বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারেন না,—কারবেনই বা কি করিয়া? মায়ের ভিতরের এই দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া মনোরমাও যথাসাধ্য এ বিষয়ে মাতাকে সাহায্য করিয়াই চলিত,—এই নিতান্ত অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা সহজে সে ঘটিতে দিত না। তবে বিষয়টা তো এমন নয় যে, মুখে না ফুটিলেই মাতার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া, অথবা অন্যের দ্বারা উত্থাপিত না হওয়া সম্ভব। কাজেই সময় অসময় তাঁহাকে এ লইয়া উত্ত্যক্ত হইতেই হইত।

আজ যখন মনোরমা ছেলের জলখাবার লইয়া মায়ের নিকট সশঙ্ক-চিত্তে গিয়া দাঁড়াইল, তখন সেখান হইতে কোন বিদ্বেষ-কষার আঘাত আসিয়া তাহার উপর পতিত হইল না, বরং জলখাবারের রেকাব টানিয়া লইয়া তাহার উপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "একটু সন্দেশ করে দিয়েছিস্? বেশ করেছিস্। বাজারের খাবার খাবে না, না দিলে খায় কি! লোকেদের ছেলের মত তো নয়, যে কতকগুলো ফলপাকড় যা পেলে হাঁস্ হাঁস্ করে খেলে। সেখানে যে শালা বড় লোকের নাতি! নে,—হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বোস্ অজিত!"

অজিতের মন তখন খাবারের উপর ছিল না, সে সেই ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান রঙ্গিন লাটাই ও ঘুড়ি পাড়িবার জন্য একখানা ভারি টুল কোথা হইতে হাঁফাইতে হাঁফাইতে টানিয়া আনিতেছিল। আহূত হইয়া সবেগে মস্তক আন্দোলন করিয়া আহারে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল; কহিল, "এখন ও থাক্, আগে আমার জিনিষ-পত্তরগুলো গুছিয়ে নিই। দিদিমণি! তুমি আমার বাক্স টাক্স সব সাজিয়ে দিবে? মা-মণি গো! যাও তো,—আমার কাপড় চোপড় সব এইখানে আন তো।"

দিদিমা ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া সেই মুহূর্ত্তে সমাগতা প্রতিবেশিনী শ্যামের পিসিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "দেখ্‌চ দিদি! এত দিন ধরে মানুষ করার ফলটা দেখ! তা, হবে না। কেমন ঘরের ছেলে!"

শ্যামের পিসি সহানুভূতির সহিত কহিলেন, "ওতো কথাই আছে বোন্। বলে,—'ঘরের ছেলে খায়, ঘর পানে চায়; পরের বেটা খায়, আর বন পানে চায়'" এই বলিয়া নিজের কথার হাস্যরসে মাতিয়া উঠিয়া নিজেই হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু অপর কেহই হাসিল না।

অজিতের সেদিন টিকি দেখাই ভার হইল। সে নিজের সেখানকার যা জিনিষপত্র টানিয়া আনিয়া দিদিমা ও মাকে বাঁধাছাঁদা করিতে দিয়া এবং ত্বরা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়া সেই যে বাহির হইয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘোরালো না হওয়া পর্য্যন্ত আর বাড়ীই ফিরিল না। রাখু যেখানে স্তূপীকৃত খড়ের গাদায় কাস্তেবঁটি পাতিয়া খড় কুচাইতেছিল, সেইখানে গিয়া সর্ব্বপ্রথম সে দর্শন দিল। দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়াই, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিয়া, চীৎকার শব্দে ডাকাডাকি করিয়া বলিতে লাগিল, "রাখুদা' --রাখুদা', আমি ভাগলপুর যাব।"

"যাবি দাদা! পত্তর এয়েছে?" বৃদ্ধের কুঞ্চিত কুৎসিত মুখ অকৃত্রিম আনন্দের স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।"

"উহুঁঃ, বাবা নিজে যে আসবেন।"

"আসবেন বই কি দাদামণি; বাবা এসে তোমাদের নে' যাবেনই তো। আমায়ও তুই সঙ্গে করে নে' যাবি তো ভাই?"

"হুঁ-উ; তুমি যাবে, আমি যাব, মা যাবেন, দিদিমণি—"

রাখাল আনন্দাতিশয্যে শিশুর মতই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে মুক্তকণ্ঠে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বাধা দিল, "দিদিমা যাবে কির রে পাগলা? দিদিমা কি কুটুমবাড়ী যায়?—মা যাবে, তুমি যাবে, আর আমি তোমার চাকর কি না—তাই ঘাড়ে লাঠি নিয়ে এই এমনি করে আমার খোকাবাবুর পিছু পিছু যাবো।—"এই কথা বলিতে বলিতে উৎসাহভরে বিচালি-কর্ত্তন রহিত করিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং দেওয়ালের কোণ হইতে নিজের মোটা লাঠিগাছা টানিয়া লইয়া, কাঁধে তুলিয়া, কেমন

করিয়া লাঠি ঘাড়ে লইয়া সঙ্গে যাইবে—তৎক্ষণাৎ তাহারই 'রিহার্শেল' দিয়া দেখাইয়া দিল।

অজিতের ইহাতে আমোদ ধরিতেছিল না। সে কলকণ্ঠে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে, রাখুদা' ঠিক যেন রাজবাড়ীর সিপাই হয়ে গেছে রে!"

"সিপাইর মত আমায় দেখাচ্চে দাদা? তবু তো ভাই, আর কাকাল সোজা করে দাঁড়াতেই পারি নে' তা হলে আরও কত—" এই কথা আনন্দ-স্মিত মুখে বলিতে বলিতে "আরও কত"র পর সেই কি যে এক অপূর্ব্ব দর্শন ঘটিতে পারিত, সে কথাটা উহ্য রাখিয়াই বৃদ্ধ রাখাল, শিশু অজিতকে কোলে টানিয়া তুলিয়া লইয়া, মনের আনন্দ আবেগে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল।

"আঃ, কি পাগলামি করচো রাখুদা'? থাম, আমায় নামতে দাও। বাবা এসে যদি কোলে চড়েচি দেখে ফেলেন, বল্‌বেন কি বল দেখি? মনে কর্‌বেন যে, অজিত এখনও বুঝি খুব ছোট্ট আছে। হয় ত খোকা বলেই ডেকে ফেল্‌বেন। হাঁ, বেশ কথা রাখুদা', বাবার সাম্‌নে খবরদার আমায় যেন খোকাবাবু বলে ডেকে ফেলো না,—তা' হলেই সব মাটি কর্‌বে! দেখো, ঠিক মনে থাকে যেন।—মুংলি! মুংলি! ওরে, মাথা নেড়ে নেড়ে তুই দেখছিস্ কি? আর তো আমরা চল্লুম রে! হাঁ ভাই রাখুদা'। আমরা চলে গেলে মুংলিকে কে খেতে দেবে—কে দুধ দুইবে, দুধ কে খাবে?"

রাখাল নিজের আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়া এ সকল অবশ্য-চিন্তনীয় ব্যাপারের সম্বন্ধে কিছুমাত্রও চিন্তা করে নাই। এক্ষণে শিশুর এই দূর-দর্শন শক্তিতে একদিকে যেমনি বিস্মিত, অপর দিকে তেমনি বিব্রত হইয়া পড়িল। তাই তো! তাহারা দু'জনে চলিয়া গেলে মুংলিদের গতি কি হইবে? তারপর মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিল, 'তা বলিয়া কি আমি যাইব না? আর একজন কৃষাণ দুধ দুইয়া দিবে, খোল বিচালি খাওয়াইবে,

কিন্তু 'দুধ খাইবার লোক কই ?' অজিতও নূতন কৃষাণের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়া, ভোক্তার অভাবে কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িল। "তবে কি দুধে রাখুদা' ? দিদিমণি তো দুধ বেশী খায় না। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ? হামিদদের গোরু তো বেশী দুধ দেয় না—ওদের দিলেই ত হয় ?"

দুগ্ধ দান সম্বন্ধে অজিতের ন্যায় রাখালের মত যদিও কোন দিন যথেষ্ট উদার ছিল না, তথাপি আজ অপর কোন পন্থা না পাইয়া, সে এই প্রস্তাবই অনুমোদন করিল। অজিত বলিল, "মুণ্ডুলিমণি! বুঝেছিস্ ভাই, বাবা আস্‌বেন রে! আমরা বাবার সঙ্গে এখান থেকে চলে যাব, তুই বোকা মানুষ, কিচ্ছুই জানিস্‌নে ত ? রাখুদা', তোমার কাপড় চোপড় সব ঠিক্ ঠাক্ করে রেখ ভাই। আমি হামিদকে, আর ছোট্টুকে, আর বিশুদা'কে, বিশুদা'দের খুকুমণিকে—সব্বাইকে বলে আস্‌তে যাচ্ছি, যে, বাবা আমাকে নিতে আস্‌বেন। আর কেউ আমাকে একদিনও দেখ্‌তে পাবে না।"

"আমি যাব সে কথাটাও বলিস্ ভাই!"

"ঠিক্ বল্‌বো! তুমি কিচ্ছু ভেবো না।"

বলিয়া বালক লাফাইতে লাফাইতে, বাগানের বেড়া ডিঙাইয়া প্রায় পুরাদমে চালান পঞ্জাব-মেলের গতিতে চলিয়া গেল। রাখু সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিহাসি-মুখে স্নেহ-বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার উৎসাহপূর্ণ, দ্রুত অদৃশ্য সুঠাম ক্ষুদ্র মূর্ত্তিখানি দেখিতে দেখিতে—ইহার আসন্ন সুখের চিত্র মনে মনে আঁকিয়া ফেলিয়া, আহ্লাদে অধীর হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, "আহা, আমার সোণার কুশী এবার অযুধ্যেয় রাজা হবেন! মা জানুকী আমার অরণ্য ত্যাজ্য করে নিজের রাজ্যিপাটে ফিরে যাবেন। হে মধুসূদন! তুমিই সত্তোর!"

সেদিন বর্দ্ধমানের সেই পাড়াটিতে এমন কোন মানুষ, এমন কোন জীব ছিল না,—অজিতের পিতা আসার বার্ত্তা যাহার অজ্ঞাত রহিয়া গেল। হামিদদের গাভী রোমজান, তাহাদের হীরামন পাখী, ঘোষেদের পুঁটি নাম্নী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেড় বৎসরের শিশু; চাটুয্যেদের সৈরভী ঝি, মুড়িওয়ালি অন্ধ গদায়ের মা, অঘোর পোদের দিদিশাশুড়ী, ছিদাম মুদির নাত্‌বৌ,—সকলকেই এই সুসংবাদের অংশভাগী করিয়া অভুক্ত বালক যখন ঘরে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা প্রায় অতীত হইয়া গিয়াছে। জলখাবারের রেকাব হাতে করিয়া মনোরমা ক্রমাগত ঘর বা'র করিতে করিতে উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া, এইবার রাখালকে ডাকিয়া ছেলের তল্লাসে পাঠাইবে স্থির করিতেছিল। দুর্গাসুন্দরী জপে বসিয়াও বেশ সুস্থ হইতে না পারিয়া, উঠিউঠি মন হইলেও, মনকে টানিয়া থামাইতে চাহিতেছিলেন। এমন সময় পরিচিত পদধ্বনির সহিত সুপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসিল। মনোরমা ছুটিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা! কি ছেলেই তুই হয়েছিস্!"

অজিত সে কথায় কাণ দিল না;—সে তখন তাহাদের বহির্দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থিত কদম্ব ও চাঁপা গাছের একতম,—বোধ করি চাঁপা গাছেরই মধ্যে লুক্কায়িত, অনবরত রবকারী কোকিলটাকে গায়েপড়া হইয়া ডাকাডাকি করিয়া বলিতেছিল, "ওরে কু-কু-কু! আমার বাবা আস্‌বেন রে, বাবা আস্‌বেন। আমরা যখন চলে যাব, তখন তুই কাকে কু-কু-কু করে ডাকবি, তাই বল দেখি রে কালো ভূত?" মনোরমা এতক্ষণকার উদ্বেগের পরিশোধে পুত্রকে কিছু ভৎসনা করিবে মনে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু কণ্ঠ তাহার শব্দ হারাইয়া ফেলিল। দুই চোখ মাটীর দিকে করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সহসা সেই গূঢ় অন্ধকারের মধ্যে সর্ব্বশরীর কণ্টকিতকারী চঞ্চলস্পর্শ সহিত ঈষৎ বিস্মিত সুপ্রচুর আনন্দব্যক্ত-কণ্ঠে মধুর 'মা' নামে সম্বোধন করিয়া শিশু আসিয়া যখন তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তখন কোন কথাটি না কহিয়া, সে ক্ষণকাল, সেই স্পর্শে সেই আদরে নিজেকে মগ্ন করিয়া রাখিয়া, পরক্ষণে তাহার মুখখানা দুই ব্যগ্র করতলে টানিয়া লইয়া, অহাতে প্রগাঢ় চুম্বন আঁকিয়া দিল এবং তার পর গভীর স্নেহে উহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

এই ঘটনার পর তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। অজিতের পিতৃগৃহ-গমনের আর কত বিলম্ব, এ সংবাদ লইতে নেহাত্ অপারগ বলিয়াই, নাসিরুদ্দিন সাহেবের রুগ্না স্ত্রী বড়-বিবি, পিঞ্জরাবদ্ধ হীরামন পাখী এবং এই জাতীয় আরও দু'চারিটি প্রাণীই মিত্রবাড়ী আসিয়া পৌছে নাই; তা ভিন্ন আর সকলেই একে একে বা দুইয়ে তিনে আসিয়া দুর্গাসুন্দরীর ঔদাস্যপূর্ণ অনিশ্চিত উত্তরে মনঃক্ষুন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতঃমধ্যে 'বাবাঠাকুর'টির জন্য দু এক স্থান হইতে বিদায় ভোজের ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছিল। বাগ্‌দী-বুড়ি একপোণ কই মাছ, গদাইয়ের মা গরম গরম মুড়ী, এবং হামিদ নিজেদের গাছের চারিটা কাঁচা আনারস দিয়া গিয়াছে। পাকাইয়া দিবার ত্বরা সহে নাই, যেহেতু তৎপূর্ব্বে অজিতের পিতা আসিয়া অজিতকে লইয়া গেলে, এই অপূর্ব্ব বস্তু আর তো তাহাকে খাওয়ান হইবে না। আর, তা না হইলে, হামিদের নিজ মুখে সে জিনিষ কেমন করিয়া রুচিবে? বিশেষতঃ হামিদ জানে, এই জিনিষটা অজিতের প্রিয়।

ঘোষ-গৃহিনী ও চাটুয্যে-গৃহিনী একসঙ্গে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এমন সময় যাওয়া যে, মেয়েটাকে একটা দিন দুটো মাছ ভাত খাইয়ে পাঠাব, তার যোটি হলো না। আহা, বাছা এতদিন পরে নিজের ঘরে যাবে,—তা না একটু সিঁদুর ছোঁয়ান,—যেন মা ভগবতীর তপস্যা করা ক্লেশ করেই যেতে হবে। মাগীর উচিত ছিল, মিন্‌ষের অন্তর্জলের সময়ও

অন্ততঃ বউ নিয়ে যাওয়া ; তা হলে ত আর এমন সন্ন্যাসী-বেশে মেয়ে পাঠাতে হতো না। ঢের ঢের মানুষ দেখেছি, মনোর শাশুড়ী মাগীর মত এমন আক্কেল থেকো মানুষ কিন্তু বাপের জন্মে দেখলুম না বাপু।”

দুর্গাসুন্দরী এ সমস্ত আলোচনায় প্রায়ই যোগ দেন না ; অন্ততঃ যতটা সম্ভব সংক্ষেপেই সারিতে চেষ্টা করেন। আজও নীরব ঔদাসীন্যে পাশ কাটাইতে চাহিয়া অবান্তর কথা পাড়িলেন। একতরফা আলোচনায় সুখ হয় না,—অগত্যাই এমন মুখরোচক কুটুম্ব নিন্দার সুযোগ ত্যাগ করিয়া উক্ত গৃহিণীদ্বয় ক্ষুণ্ণচিত্তে নীরব হইলেন। ইহা বুঝিয়া দুর্গাসুন্দরী সখীদ্বয়কে সান্ত্বনা দিবার ইচ্ছায় আর একটা মুখরোচক আলোচনার অবতারণা করিয়া বসিলেন। তিনি চাটুয্যে-গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুরঝির তো আজ রান্নার পাঠ নেই ;—তোমার কি রান্না হ'ল দিদি ?”

“আমার ?” বলিয়া কাণের বড় বড় মাকড়ি দুটি ঠিক করিয়া দিয়া, মাথার কাপড় অপ্রয়োজনেও একটু টানিয়া, দিদি উত্তর করিলেন, “আর ভাই রান্না ! যে গরম পড়েছে—রাঁদ্‌তেও ইচ্ছে করে না, খেতেও ইচ্ছে করে না, কোনমতে দুটো গর্ত্ত বুজানো। আজ আর বেশি কিছু রাঁধিনি,— এই বেশ করে হাত বাছা করে নিয়ে, চারটি সোণামুগের ডাল রাঁধলুম, আর উচ্ছে দিয়ে আলু দিয়ে ছোলা ভিজে দিয়ে ভাজা-ভাজা করে চচ্চড়ি, কুমড়ো, ডেঙ্গো ডাঁটা আর ঝিঙ্গে দিয়ে একটা ন্যলনা—হাঁা, তাতে দুটো কাঁটাল-বীচিও দিয়েছিলুম ভাই। আর দেখ, একমালা নারকোল ছিল, তাই একটু কুরে দিলুম ; আর খানিকটা ভেঙ্গে বেশ বড় বড় করে ভাজলুম। তা খেতে বড় মন্দ হয় নি। বেশ মাথা-মাথা ঝোল-ঝোল হয়েছিল। কুমড়োটুকুও দিব্যি মিষ্টি ছিল কি না—বড্ড 'তার' হয়েছিল। হ্যাঁ, তা'পর কি বল্‌ছিলুম ? হ্যাঁ, এই তো গেল নিরিমিষ। মাছের হলো গে—চিংড়িমাছ দিয়ে আলু পটল দিয়ে একটা ডাল্‌না ; আর বড় বড় বাটা এনেছিল, তারই ঝাল। আর জানই তো,—কর্ত্তার আমাদের মাছের টুক্‌-টুকুন্ নৈলে ভাতের গরাস

মুখেই ওঠে না। কি করি, চুনোচানা মাছের মিষ্টি দিয়ে অম্বল একটু করতেই হয়। হ্যাঁ, আমাদের সরার জন্যে আমের গুড়-অম্বল একটি খোরা রেঁধেছিলুম। বউ-মা পোয়াতি-মানুষ, তাঁর আবার মাছের জিনিষ মুখে ভাল লাগে না; ঐ অম্বলটুকু দিয়েই যা দুটি ভাত খায়। সতীশ কাঁটামাছ খেতে পারে না; দুখানা পোনামাছ এ বেলার থেকে নিয়ে তার জন্যে আলাদা রেঁধে দিই। এই সব টুকুটুকু করতে করতেই বেলা হয়ে যায়। এক রকম সাপ্টা রান্না তো আমার বাড়ী হবার যো নেই।"

"পাকা-আমও তো বেশ হয়েছে, না ?"

"হ্যাঁ, পেকেছে বই কি। কালই শ'দুই হবে কলমের গাছের আম পাড়ান হলো। হলে কি হবে ভাই, আম দিয়ে দুধ দিয়ে কি কেউ ভাত খাবে? সে সব অমনি মুখে। লোকের বাড়ীর ছেলেপুলের মতন কি আমার ঘরের ছেলেপুলে।"

দুর্গাসুন্দরী তখন ঘোষ-গৃহিনীর দিকে ফিরিলেন, "তোমার বউমায়েরা কি রান্না বান্না করলেন গা নিতায়ের মা ?"

"আজ আর বড় কিছু রাঁধিনি ভাই"—এই বলিয়া নিতাইচরণের জননী-ঠাকুরাণীরও একে একে একটা বড় রকম ফিরিস্তি দাখিল করিয়া দিলেন; এবং শেষে পেষ করিলেন, "নিজেদের খাওয়া না থাকলেই কি—বউ দুটী আছে, ওদের সবখানি তো যোগাড় করে দোব,—ওরা বসে না হয় চালে-জলেই এক করবে। নৈলে নিজেদের আর ন্যাটা কি ? পোড়া বিধবাদের আবার খাওয়া! একটা শাক-চচ্চড়ি, দুখানা ভাজা, একটু ডাল, এক ফোঁটা অম্বল, নাউএর ঘণ্টই হোক, নয় তো একটু সুকতুনিই হোক্, এই হলেই ভেসে গেল।"

অপরাহ্ণে সখীদ্বয় বিদায় লইলে, কাপড় কাচিয়া আসিয়া দুর্গাসুন্দরী ভিতর বাটীর রোয়াকের একধারে একখানি কুশাসন পাতিয়া মালা জপিতে-ছিলেন। মনোরমারও কর্ম্ম কাজ সারা হইয়াছে। সে গামছা দিয়া

অজিতের গা হাত মুছাইয়া তাহাকে কাপড় পরাইয়া দিতেছিল,—অমনি মাতা পুত্রে কথোপকথন চলিতেছিল।

পুত্র প্রশ্ন করিল,—এ প্রশ্ন আজি কয়দিনে সে অনেকবারই করিয়াছে—"বাবার নিতে আস্‌তে এত দেরি কেন হচ্চ, মা? কখন বাবা আস্‌বে?"

ত্রস্তে মাতা পুত্রের মুখে হাত চাপা দিল "'আস্‌বে' কিরে পাগল! 'আস্‌বে' কি বল্‌তে আছে?—'আস্‌বেন' বল্‌তে হয়। তিনি এলে তাঁর সাম্‌নে যেন ও-রকম করে য়া'তা বলে ফেলো না।"

অজিত অপ্রতিভ লজ্জায় ভগ্নকণ্ঠে সংশোধিত করিয়া উচ্চারণ করিল,—"আস্‌বেন, আস্‌বেন।—কখন আস্‌বেন মা?"

"শীঘ্রই একদিন আসবেন। তাঁর এখন অনেক কাজ কি না; একলা মানুষ, সময় পাচ্চেন না। তিনি এলে তুমি তাঁকে কি বল্‌বে অজিত?"

"আমি!"—এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছু ভাবিয়া রাখা হয় নাই; এবং মাতৃ-উপদেশও কিছু পাওয়া গিয়াছে, এমন কথাও স্মরণে না আসায়, উৎসাহিত বালক কথঞ্চিৎ নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়া, নিস্তেজ স্বরে উত্তর করিল—"'বাবা' বল্‌বো।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া মনোরমা পুত্রের ললাট চুম্বন করিল। তারপর প্রসন্নস্মিত মুখে কহিল, "ওঁকে দেখে তুমি যেন লজ্জা করো না অজু! করবে না তো? কাছে গিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করো। যদি নাম জিজ্ঞেসা করেন তো—"

"আমার নাম বল্‌বো।"

"কি বল্‌বে বল দেখি?"

"বল্‌বো? বল্‌বো—আমার নাম শ্রীঅজিতকুমার বসু, বাবার নাম শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ বসু মহাশয়, দাদামশাইএর নাম—"

হাসিয়া ফেলিয়া মনোরমা কহিয়া উঠিল, "অত সব বল্‌তে হবে না রে, শুধু তোর নিজের নামটাই বলিস্। আর কি বল্‌বি বল্?"

"আমি বল্‌বো—মার নাম শ্রীমতী মনোরমা দাসী। আর দিদিমণির নাম শ্রীমতী দিদিমামণি—হ্যাঁ মা, দিদিমণির কি নাম?"

"যাঃ পাগলা কোথাকার! ওসব কিছু বলিস্‌নে যেন।"

"তবে বল্‌বো—'বাবা আমাদের কখন নিয়ে যাবেন?' কেমন?"

মনোরমা পুত্রের এই অতি লোভনীয় প্রশ্নে ঈষৎ চিন্তিতমুখে ক্ষণকাল কি যেন ভাবিল। তারপর জোর করিয়া প্রলোভনটাকে সে অনেক দূরে ঠেলিয়া দিয়া ধীরস্বরে বলিল, "না বাবা, ও কথা বল্‌তে নেই। যদি তিনি নিয়ে যান, আপনিই যাবেন। যদি নিয়ে যাবার উপায় না থাকে, তবে অনর্থক ওঁর মনে আমরা কষ্ট দিতে যাব কেন? কি বল অজু?"

বালক মায়ের কথায় কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়াই, সঙ্গীত মধুর-স্বরে আবৃত্তি করিয়া গেল, "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ—পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

"অজু! বাপ আমার!" মনোরমা পুত্রকে দুই হস্তে জড়াইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। তাহার প্রাণান্ত শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। সে তাহার দেবতা চিনিয়াছে! এই যে তাহার নিষ্ফল জীবনের একমাত্র সফলতা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ-
রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িণস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

তুলসী-মূলে সন্ধ্যাদীপটী জ্বালিয়া দিয়া, মনোরমা অজিতের পড়া শুনিবার উদ্দেশ্যে জপশীলা জননীর অনতিদূরে আসিয়া বসিল। গ্রীষ্ম-সায়াহ্ন, পৃথিবী বায়ুলেশহীন,—ঘরের মধ্যে তিষ্ঠান যায় না।

"মামণি! দেখুন তো, মুখস্থ হয়েছে কি না,—এই নিন্, বইটা ধরুন—

ছিল তব পুণ্যবল, ফলেছে তাহার ফল, বল রে বিহঙ্গবর
সোণাকাণি ময়না!
হেরিয়া তোমার সুখ, মনে হয় কত দুঃখ, খেদে মরি
এ যাতনা প্রাণে আর সয় না।

সোণার পিঞ্জরে—"

"ছোট খুড়িমা! চেয়ে দেখুন তো কা'কে এনেছি!—অতর্কিত পুরুষ-কণ্ঠের এই আকস্মিক সম্বোধনে জপ-পরায়ণা এবং পাঠ-পঠনশীল কয় ব্যক্তিই চমকিত বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ফিরিয়া দেখিল, দালানের খিলানের সম্মুখে তাহাদেরই প্রতিবেশী ঘোষ-গৃহিণীর জ্যেষ্ঠপুত্র নিতাই ঘোষের সহিত আর একজন কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কে সেই একজন? সন্ধ্যার স্বল্পান্ধকারে সেই প্রায়-অপরিচিত মূর্ত্তি চিনিবার পক্ষে কিছু বাধা জন্মিলেও তাহার অনন্যসাধারণ দৈর্ঘ্য, অসাধারণ গৌরবর্ণ,—এবং তদপেক্ষাও সেই নূতন আগন্তুকের শুভ্র বেশ ভূষা নিজের সকরুণ পরিচয় স্বমুখে ব্যক্ত করিয়া জানাইয়া দিতেছিল যে, ওই ব্যক্তিই—'ভাগ্যহীন অরবিন্দ বসু।' দুর্গা-সুন্দরী পাদুকাহীন নগ্ন পদ ও তদূর্দ্ধে পাড়শূন্য মলমলের শুভ্রতা অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করিয়াই, জপের মালায় অতিশয় নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ-ভাবে—তিনি যে আগন্তুকদ্বয়কে দেখিতে পাইয়াছেন, এমনও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

অজিত সহসা এই সান্ধ্য অন্ধকারে এইরূপ এক অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তি দর্শনে কেমন যেন ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। সে নিতাই মামাকেই একটু সমীহ করিত। যেহেতু, নিতাই কলিকাতার চাকুরে বলিয়া সদা সর্ব্বদা বাড়ী থাকে না। এখন এই শ্বেতবসনাবৃত দীর্ঘ মূর্ত্তি, ইহার নগ্ন পদ, রুক্ষ এবং বড়-বড় চুল, মুখখানাও দাড়ির খোঁচায় বিচিত্র—ইহার দিকে চাহিতেই শিশু-চিত্ত চমকিত হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে এই নিতাই ঘোষেদেরই

গৃহে স্থানীয় সখের থিয়েটার নরমেধ-যজ্ঞ নাটকের অভিনয় করিয়াছিল; ইহার উপর চোখের দৃষ্টি পড়িবামাত্রেই অজিতের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া স্মরণে আসিল,—'নহুষের প্রেতাত্মা কাঁদিছে।'—অমনি সেই ব্যাকুল, বদ্ধ-দৃষ্টি নির্নিমেষে তাহার উপরে নিবদ্ধ রাখিয়া সে স্তম্ভিত আচ্ছন্নবৎ হইয়া রহিল। নিতাই-মামা সেদিনকার নহুষের প্রেতাত্মাটাকে যে সঙ্গে করিয়া কেন আনিয়াছেন, এ কথা সে বেশ স্পষ্ট করিয়া কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

এদিকে যত কিছু বিপদে পড়িল—সে হতভাগিনী মনোরমা। এই মাসাবধিকাল ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে চুনিয়া চুনিয়া সে যে নিজের প্রকৃষ্ট কল্পনা পুষ্পগুলি দ্বারা সাধের মালাগাছি সুগ্রথিত করিয়াছিল, এই একটী মাত্র নিমেষেই তাহার সমুদায়টাই যেন প্রখর আগুনের শিখা লাগিয়া ঝলসিয়া শুখাইয়া গেল। দীর্ঘ যুগান্তের অবসানে একান্ত প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ আজ অতর্কিতে এমন অসময়ে ঘটিয়া গেল! যে দুখানি নগ্ন পায়ের তলায় এই মুহূর্ত্তে লুটাইয়া পড়িয়া মনোরমার অভিশপ্ত নারী-জীবন এতক্ষণে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া যাইতে পারিত; এই সুদীর্ঘকালের সঞ্চিত রাশিরাশি অকথ্য বেদনার ভার এক পলকের মধ্যে জুড়াইয়া শীতল হইয়া যাইত, সেই দুখানি নিথর অচল চরণের পানে তৃষাতুর অশ্রুনেত্রে চাহিয়া, সে গুণ্ঠনাবৃত-মুখে শুধু স্তব্ধ নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিল; উঠিতে পারিল না,—মুখের দিকে একটীবার চোখ তুলিয়া চাহিতেও সাহস করিল না। এমন কি, ভাল করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসও ফেলিতে তুলিতে সামর্থ্য রহিল না। বাহিরে তাহাকে যেমন তেমনি স্থির রাখিয়া শুধু তাহার অশান্ত বুকের মধ্যে উন্মত্ত কল-কল্লোলে ঝড়ের হাওয়া তোলপাড় করিতে লাগিল।

অরবিন্দ নিজেও বেশীক্ষণ ধরিয়া এই অন্তর্বিদ্ধ ভীষণ বাহ্য স্তব্ধতা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অদূরবর্ত্তিনী অবগুণ্ঠিতার পানে একবারও সে নিজের দৃষ্টি ফিরাইতে পারে নাই; কিন্তু দীপ-সম্মুখীন সেই যে একখানি

ক্ষুদ্র মুখের উজ্জ্বলায়ত বৃহত্তারক নক্ষত্র দীপ্ত দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত বিস্ময় কৌতূহলে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল, তাহার দিকে না চাহিয়া সে কোন মতেই যেন পারিল না। হত্যাকারী যে দৃষ্টিতে স্বহস্তবিদ্ধ আহতের পানে চাহে, ঠিক্ তেমনি করিয়া শুধু একটীবারমাত্র সেই এতটুকু ক্ষুদ্র মুখের পানে চাহিতেই, তাহার গুরু অপরাধ ভারাতুর দুই চোখের তারা আপনা হইতে ভূমিপানে নামিয়া আসিল। আরও একটা মুহূর্ত্ত নীরব নিস্পন্দ দাড়াইয়া থাকিবার পর সে ঈষৎ মাত্র অগ্রসর হইয়াই দুর্গাসুন্দরীর চরণ উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই অত্যন্ত দ্রুত-কণ্ঠে, এক নিঃশ্বাসে কহিয়া গেল, "আমার পিতৃদেবের ১৯শে বৈশাখ ৺গঙ্গালাভ হয়েছে, আপনাকে জানাতে এসেছি। যাহাতে দায় হতে উদ্ধার হই—করিবেন"—এইটুকু বলা শেষ হইয়া গেলেই, আর একবারও কোন দিকে না চাহিয়া পূর্ব্ব-পরিচিত প্রায়-অন্ধকার ঘর অতিক্রম পূর্ব্বক একেবারে সে বহির্দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাস্তায় তখন জনপ্রাণীও ছিল না। চাঁপাগাছে সেই 'কালোভূত' আখ্যাধারী কোকিলটা বোধ করি কাহার উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গস্বরেই বেশ একটু চড়া গলায় ডাকাডাকি করিয়া বলিতেছিল, 'কু কু কু'। এই কুহু রবের মধ্যে আর কোন্ কথা উহ্য ছিল, সে খবর ঠিক্ বলিতে পারি না। তবে কিছু একটা ছিল যেন!—সাম্‌নে রাস্তার ওপারে বৃহৎ উদ্যানের গাছে গাছে অন্ধকার জড়াইয়া গিয়া ইহারই মধ্যে নিবিড় হইয়াছে। সেখান হইতে একদল শৃগাল পরমোল্লাসে ঘোর কোলাহল করিয়া উঠিল। অরবিন্দ সেই-দিকে মুখ করিয়া, একটুখানি থমকিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পরক্ষণে আবার মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্বারের দিকে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই ষ্টেসনের এবং সহরের পথ ধরিয়াই একা ফিরিয়া চলিল। নিতাইয়ের জন্য অপেক্ষাও করিল না। শৃগালগুলার চীৎকারে আট বৎসর

পূর্ব্বের আর একটা রাত্রের কথা স্মরণে আসিয়াছিল। সে রাত্রেও এই দ্বারের সম্মুখে সে যখন চৌঘুড়ি হইতে অবতরণ করে, তখন ঐ বাগানের সাম্‌নে একদল রসনচৌকিওয়ালা রসনচৌকি বাজাইতেছিল। চৌকাট্ পার হইতে গিয়া পায়ে একটা হোঁচট্ লাগিল। সেদিন এই স্তব্ধ নিরালোক অর্দ্ধভগ্ন গৃহেও কত লোক, কত আলো, কত সাজ-সজ্জা! আর আজ ইহার ভিতরে বাহিরে কি অন্ধকার;—উঃ, কি অন্ধকার!

অরবিন্দের কাণ্ডে বন্ধু নিতাইচরণের বহুক্ষণাবধিই বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা ছিল না। কলিকাতা হইতে দুজনে যদিও এক ট্রেণেই আসিয়াছে, কিন্তু একশ্রেণীতে তারা চড়ে নাই। সেই হেতু বর্দ্ধমান ষ্টেসনে নামিবার পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। প্লাট্‌ফর্ম্মে নামিবার পর প্রথমশ্রেণীর দ্বারদেশে ভৃত্য-সমভিব্যাহারী অরবিন্দের সহিত নিতাইয়ের সহসা সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেলে, সে অতিশয় হৃষ্ট হইয়াই আপনা হইতে তাহার সঙ্গ লইয়াছিল। এজন্য সে-পক্ষ হইতে কোনই আবেদনও পায় নাই, এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, সে অবসরটুকুর প্রতীক্ষাও করে নাই। দু'একটি পরিচিত স্থানে নিমন্ত্রণ সারিয়া, থাজা-মাতচুর প্রভৃতির বায়নাপত্র চুকাইয়া, বিস্তর গড়িমসি করিয়াই অরবিন্দ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সহরতলীর এই পথটার পানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল।" নিতাইও কহিল, "চল। কিন্তু আজ ত আর তাহ'লে ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্চে না দেখ্‌ছি। একে বলা নেই, তায় ভর্ সন্ধ্যে হয়ে গেল। সেইজন্যই তো সেই অবধি তাগিদ্ দিচ্চি। তুমি যে 'জ্জেতোর' শেষ হয়ে গ্যাছ।"

কোন কথা না কহিয়া অরবিন্দ শুধু পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। চাকরটাকে পূর্ব্বেই ষ্টেসনে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেও অনেক দিনের লোক—এরূপ অসঙ্গত আদেশ নিঃশব্দে পালন করিতে পারে নাই। কহিয়াছিল—"খোকাবাবুকে নিয়ে এক সঙ্গেই যাব'খন। আগে থাকৃতে গিয়ে কি হবে?" নূতন মনীব ইহাতে অটলভাবে একটু মাথা নাড়িলেন।

প্রভুপুত্রের এই দৃঢ় ভাবটুকু বড়ই পরিচিত থাকায়, ঘোর অনিচ্ছা-বিরক্তি-ভরেও কার্ত্তিককে ফিরিতে হইল।

নিতাই বলিল, "আজ তাহ'লে ওদের যাওয়া হচ্চে না। তা বল তো আমিই ওদের কাল নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিতেও পারি। বরং তোমার ঐ চাকরটাকে রেখে যাও না।"

অরবিন্দ উত্তর দিয়াছিল, "দেখা যাক্।"

ইহার মধ্যে যে এতখানি ছিল, তাহা এই পল্লীবাসী সরল যুবক কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহার অর্থ কি এই নিরভিভাবক অসহায় পরিবারকে মুখ ভেঙ্গাইয়া উপহাস করা নয়? এর চেয়ে আর বেশী করিয়া কোন্ অপমান সে এই অনাথাদের করিতে পারিত? নিতান্ত সহিষ্ণু প্রকৃতির জীব হইলেও আজিকার এ ব্যবহার নিতাইও আর সহিতে রাজি হইল না। বারে বারে একটা বাহিরের লোক আসিয়া নিজেদের ধন মান ও পদ-গর্ব্বে,—অর্থাৎ সম্পূর্ণ মদগর্ব্বেই—যে তাহাদের একান্ত আশ্রিত এই নিরপরাধ নিরীহ ভদ্র নারীদিগকে নির্য্যাতন ও অবমাননা করিয়া নির্ব্বিবাদে ফিরিয়া যাইবে, ইহা সহ্য করিয়া লইয়া তাহার প্রশ্রয় বাড়ান আর উচিত হয় না। বিশেষ করিয়া নিতাইয়ের পক্ষে তো এ কার্য্য আরও অনুচিত। দরিদ্র পরিবার তাহাদের স্পর্শাতীত এই মহার্ঘ রত্নের প্রতি তো কোন দিনই লোভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। প্রতিবেশী নিতাইকে একটি চলনসই পাত্রের খোঁজ লইতেই না হয় বলিয়াছিলেন। নিতাই নিজেই মনোরমার অনন্যসাধারণ রূপটুকু স্মরণ করিয়া, তাহারই বলে সহপাঠী ধনীপুত্রের উপর কেমন করিয়া সহসা প্রলুব্ধ হইয়া উঠে; এবং অপর একটা বন্ধুর জন্য 'কনে' দেখার ছলে, এই কুমার-প্রতিম এম-এ ক্লাসের ছাত্রটিকে এক ছুটীর দিনে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, বর্দ্ধমান সহরের বহুবিধ দ্রষ্টব্য সহিত সহর-প্রান্তস্থিত দরিদ্র-গৃহের গৌরী-প্রতিমা কুমারীটিকেও দর্শন করাইয়া দেয়। সে কি ক্ষণ, কি তিথি ছিল মনে নাই; তবে ঐ মন

কোন যোগ নিশ্চয়ই ছিল, যাহার প্রারম্ভ শুভ হইলেও সমাপ্তি নিতান্তই অকল্যাণকর। কিশোরী মনোরমার চম্পক-গৌর কান্তি এবং অতুলনীয় মুখশোভা তরুণ বক্ষে আঁকিয়া লইয়া, সৌখীন ধনীগৃহের দুলাল, অরবিন্দ সেদিন ঘরে ফিরিবার পথে, নিজের নব-যৌবনের সমস্ত অর্ঘ্য-সম্ভার ইহারই ছোট ছোট দুখানি আল্‌তা-পরা, মল-বাজান পায়ের তলায় ধরিয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। তারপর নিতাইয়ের ঘটকালীতেই অনিচ্ছা-কুণ্ঠিত উভয় পক্ষ কোনমতে এ বিবাহে সম্মতিদান করিয়াছিল, এবং বিবাহও ঘটিয়াছিল। সেদিন এই নিতাইয়ের মত আনন্দ আর কাহারও হয় নাই ; তেমন করিয়া বর কনে লইয়া 'বরের ঘরের মাসি ও কনের ঘরের পিসী' সাজিয়া আমোদ করিতেও আর কেহ পারে নাই। তারপর এ কয় বৎসর নিরপরাধে অপরাধের লজ্জার কালি মুখে মাখিয়া কুণ্ঠিত নিতাই দুর্গাসুন্দরীকে মুখ দেখাইতে পারে নাই। মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুর দিনে শুধু কোঁচার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল! আর আজ আসিয়াছিল বড় আশা করিয়া,—অনেক দিনের অনেক আক্ষেপ মিটাইবার উল্লাসে।—তা মিটিল ভাল!

ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নিতাই সেই পাষণ্ডের অনুসরণোদ্দেশ্যে চরণ উঠাইয়াই, সহসা একটা ব্যথাভরা আগন্তুক কৌতূহলের বশে তাহার সম্মুখস্থিতা সদ্য অবমানিতাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য চকিত দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া যেন পার পাইল না। দেখিয়া বিস্মিত হইল, দুর্গাসুন্দরী তখনও যেমন এখনও ঠিক্ তেমনি করিয়া বসিয়াই জপের মালা ফিরাইতেছেন। বিধবার প্রশান্ত মুখের ভাবেও কোন পরিবর্ত্তনই সে লক্ষ্য করিতে পারিল না। কিন্তু মনোরমার দিকে চাহিতে সে যেন সাহস করিতে পারিতেছিল না। শুধু তাহার হাতের থরকম্পিত অঙ্গুলী হতবুদ্ধিপ্রায় বালকের বাহু পীড়ন করিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিতে চাহিতেছিল, যে ইঙ্গিতের বিশদার্থ না বুঝিয়াই অজ্ঞ শিশু তাহাকে মায়ের অর্থহীন আদরমাত্রে ভুল করিয়া

এতটুকু ঔৎসুক্য অবধি প্রদর্শন করে নাই!—এইটুকু চোখে পড়িতেই, নিতাই নিজের পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞায় অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিয়া বিনা বাক্যে ফিরিয়া চলিল। আজ আর বন্ধুত্বের কোন খাতিরই সে রাখিবে না। পত্নীত্যাগে ইহার হাত খুব বেশী ছিল না, তাহা সেও বুঝিয়াছিল; কিন্তু এমন করিয়া এই নির্য্যাতিতাগণকে অবমাননা করিয়া যাইবার তাহার কি অধিকার আছে? ইহাও যে তেমনি তাহার মত মোটাবুদ্ধি লোকের মন্দ-বুদ্ধির অগোচর।

একটা ঘর পার হইয়া দ্বিতীয় অন্ধকার ঘরটায় পা দিয়াছে, এমন সময় তাহার পিছনদিকে, অন্ধকারের মধ্যে, ঠুন্ করিয়া একগোছা চাবি বাজিয়া উঠিল। কোন স্ত্রীলোক হয় ত এই দ্বারের মধ্য দিয়া আসিবে, ইহা মনে করিয়া, তাহাকে পথ দিবার জন্যই নিতাই একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতেই কে একজন সাতিশয় ব্যস্তভাবে দ্বারের নিকট আসিয়া ব্যগ্রস্বরে ডাকিল, "নিতাই-দা ও নিতাই-দা!"

"কে রে, মনু?"

"হ্যাঁ, আমি—কোথায় তুমি নিতাই-দা?'

নিতাই দ্বারের নিকট একটু সরিয়া আসিয়া, অত্যন্ত করুণা-স্নিগ্ধ স্নেহস্বরে উত্তর করিল, "এই যে আমি, কেন বোন্, আমায় ডাক্‌চো?"

মনোরমা ক্ষণকাল কোন উত্তর দিতে পারিল না। তারপর বড় তাড়াতাড়ি করিয়া বলিয়া ফেলিল, "তুমি এখনই এ-বাড়ী থেকে বার হয়ে যেও না দাদা।"

"কেন, দিদি?"

নিতায়ের স্বরে পুঞ্জ পুঞ্জ বিস্ময় প্রকাশ পাইল।

মনোরমাও ইহা বুঝিল। বুঝিল বলিয়াই প্রশ্নের উত্তর প্রদান তাহার পক্ষে একটুখানি কঠিন বোধ হইল। কিন্তু এবার আর সে দ্বিধা না করিয়াই জবাব দিল, "তাহ'লে তুমি নিজেকে চুপ করিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না যে ভাই।"

নিতাই ঈষৎ উত্তেজিত হইয়াই উত্তর দিল ; বলিল, "না-ই বা পার্লুম। চুপ কর্বার দরকারও তো কিছু আমি দেখ্তে পাইনে।"

মনোরমা কহিল, "সেই জন্যেই তো তোমায় মানা কর্‌চি নিতাই-দা !"

তাহার কণ্ঠস্বর অতি সহজ, পরিষ্কার : অন্তরের নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতের কোন আভাসই যেন ইহার মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিতান্তই বিস্ময়ের সহিত নিতাইচরণ বিস্ফারিত নেত্রে তরল অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া শুধু এক অস্পষ্ট মূর্ত্তি মাত্র দেখিতে পাইল। আলো সেখানে বড় কম, সে আলোকে পরিচিতেরও মুখ চেনা যায় না। সে ঈষৎ নিরুদ্যম হইয়া নিস্তেজ স্বরে কহিয়া উঠিল, "তবে কি অনর্থক এমন অপমানটা আমাদের মুখ বুজেই সয়ে নিতে হবে, এই তোমার মত মনু ? কিন্তু কিসের জন্যে তা নেবো, খাতিরটা কিসের ওকে ?"

মনোরমা কুণ্ঠিত-স্বরে উত্তর করিল, "আমার জন্য তোমরা তো অনেক অপমানই সহ্য করেছ দাদা !"

"করেছি, কিন্তু তাই বলে কি চিরদিনই কর্‌তে হবে দিদি ? ও রাস্কেলটা কিছুতেই আজ আর এমন নাটক অভিনয় করে ফিরে যেতে পার্‌বে না,—না, কিছুতেই না। হয় ও তোমাদের মাথায় করে নিয়ে যাবে, না হয়—"

"নিতাই-দা !"

উত্তপ্ত-মস্তক উত্তেজিত-চিত্ত নিতাইচরণ অকস্মাৎ এই কম্পিত বেদনা-ভরা অতি ক্ষীণ আহ্বান শব্দে শরীরে যেন চমকিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল ; এবং বহুক্ষণ সেই মশকরবে শব্দিত নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্যে উভয়েই নীরবে দাঁড়াইয়া থাকার পর, এক সময়ে যেন এই বিস্ময়াহত অবস্থা হইতে সসংজ্ঞ হইয়া উঠিয়া, নিতাই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, "আয় মনো, খুড়িমার কাছে যাই; আয়।"

"এসো।" বলিয়া মনোরমা অগ্রসর হইয়া চলিল। চলিতে চলিতে

মুখ ফিরাইয়া অতি সংক্ষেপে বলিল, "মাকে এ সব কথা না বলাই ভাল।"

নিতাই বলিল, "হুঁ।"

দুজনে একসঙ্গেই দালানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দুর্গাসুন্দরীর জপ সারা হইয়াছে। তিনি ঝোলার মধ্যে মালা তুলিয়া রাখিয়া, নাতি লইয়া বসিয়াছেন। আর অজিত তাঁহার গায়ে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া, দুই হাতে তাঁহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছিল, "হ্যাঁ গা দিদিমণি! নহুষের প্রেতাত্মাটা আমাদের বাড়ী কি কর্‌তে এসেছিল গা? ওকে দেখে আমার এম্‌নি ভয় লেগেছিল।"

মনোরমা পাশের প্রাচীরটা ধরিয়া ফেলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌।

সে রাত্রে অরবিন্দ যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সহর নিস্তব্ধ নিদ্রায় নিঝুম। পথে পাহারাওয়ালা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখা যায় না। হ্যাঁ,—দু-একটা মাতাল বা ঐ শ্রেণীর লোক কচিৎ পানালয় বা ঐ প্রকার কোন স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল বটে। একটা পুলিশের হাতে পড়িল। তাহা দেখিয়া, আর একজন 'জানকীর দশা দেখে হাসে দুর্য্যোধন' ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে যথাসাধ্য ত্বরিৎপদে পলায়ন করিতে লাগিল—তাহার অবস্থা কথঞ্চিৎ উন্নত।

দ্বারবান্ ছোট্টু সিং প্রভুর প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকিয়া তখনও সুর করিয়া তুলসীদাস্ পড়িতেছিল,—দ্বার খুলিয়া দিয়া সেলাম করিল। "সব কোই আচ্ছা হ্যায়, না ছোট্টু সিং ?"

"জী, সব কোই আচ্ছা হ্যায়। লেকেন, বড়া মাইজীকো তবিয়ৎ কুছ খারাপ্ থা।"

"মার ? কি হয়েছে ?"

"হুয়া এইসা কুছ নেই। শুনাথা কি বদন তথতাথা, আউর বোখারকা এইসা মালুম হোতাথা।"

"ও—কার্ত্তিক, দেখে আয় তো, মা ঘুমিয়েছেন কি না। দেখিস্, যদি ঘুমিয়ে থাকেন, যেন জাগাস্ নে।"

কার্ত্তিক খবর আনিতে চলিয়া গেল। ছোট্টু সিংএর হ্যারিকেন লণ্ঠনের সাহায্যে ততক্ষণ অরবিন্দ বৈঠকখানার পাশে নিজের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া, দক্ষিণদিকের একটা বন্ধ জানালা খুলিয়া ফেলিয়া সেইখানে দাড়াইল। বাড়ীর এইদিকে বাগানের একটা অংশ আছে, জান্লার ধারে ধারে সারবাঁধা কতকগুলি জুঁই-ফুলের গাছ; একটা বিলাতি-ফুল—যাহার গালভরা নাম,—ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা—তাহারই একটা গাছ ছিল। বাতাসের একটা দম্কার সঙ্গে সঙ্গে খুব খানিকটা ঘন সৌরভ ছুটিয়া আসিয়া, বাতায়ন-সমীপবর্ত্তীর অবসাদ-ক্লান্ত মস্তিষ্কে স্নিগ্ধ প্রলেপমাখা শীতল হস্ত বুলাইয়া দিল। উত্তরীয়ে ললাটের ঘাম মুছিয়া, সে সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচনপূর্ব্বক, বাহিরের নক্ষত্রালোকিত অর্দ্ধস্ফুট অন্ধকারমধ্যে আপনার জ্বালাসম্পন্ন নেত্রতারকা দুইটাকে ডুবাইয়া দিল। ছোট্টু সিং ইত্যবসরে ঘরের অন্যান্য দ্বারগুলা একে একে খুলিয়া ফেলিল।

"মা'ঠান্ ঘুমুচ্চেন। দি'ঠান্ বল্লে, 'তেমন কিছু হন্ নি। ছোট্টুর বুঝি দাদার বাড়ী ঢুক্তে আর তর সয়নি।' তিনি আপনার খাবার আগ্লে বসে আছেন।"

"তুই আবার একবার যা ; গিয়ে বলে আয়,—আমি আজ আর কিছু খাবো না। ঐ জান্‌লাটার কাছে আমার ওঘর থেকে গাল্‌চেখানা এনে পেতে দিয়ে যা দেখি, আজ আমি এইখানে শুয়ে ঘুমুবো।"

কার্ত্তিক অবাক্ হইয়া গিয়া বলিল, "মশা খাবেন নি।"

"মশা তেমন নেই, বেশ বাতাস্ আস্‌ছে।"

"নীচের ঘরে পোকা মাকড় কি কোথায় আছেন, যান্, ওপরে যান্। সেথায় কি হাওয়ার আকাল পড়েচে ? দি'ঠান্ রাগ কর্‌বে, কিছু দুটো মুখে দেন্ গে।"

"না রে, তুই গাল্‌চেখানা পেতে দে'না।"

"তবে ওপর থে' মকমলের গাল্‌চেটা নিয়ে আসি। ওতে রাজ্যিশুদ্ধ ধূলো আছেন, সাতজন্ম রোদ খান্ নি, ওতে শুয়ে কি ঘুম হবে ?"

"হবে—হবে। যা বলি তাই শোন্ না। তোর শুধু কথা কাটানি।"

এই তিরস্কারে মুখখানা গোঁজের মত করিয়া কার্ত্তিক পাশের ঘর হইতে গালিচাখানা টানিয়া আনিল। গজগজ করিয়া বলিল, "কাত্তিকে যা বলেন, ভালর জন্যেই বলেন। গরমের কাল,—বিচে আচেন,—রেতের বেলা যাঁদের নাম কর্‌তে নেই, তাঁরা সব বাগানে বাগানে ঘুরচেন। মা'ঠান্ শুন্‌লে কাত্তিককে দুষ্‌বেন নি ? কাত্তিক কি আজকের চাকর।"

বিছানা বিছানো ও আবশ্যক বন্দোবস্ত হইয়া গেলে, উপরে খবর দিতে গিয়া অনেক দিনের ভৃত্য আবার সসঙ্কোচে ফিরিয়া আসিল।—"দি'ঠান্ আমার'পরে ঝেঁকরে উঠ্‌লো। বল্লো যে 'তেনাকে তুই ডেকে দে'তো। খায় না খায়, সে আমি বুঝ্‌বো'খন।"

তন্দ্রা-বিজড়িত গভীর আলস্যভরে, মুদিতনেত্রে অরবিন্দ ছাড়াছাড়া করিয়া উত্তর দিল, 'বল্‌গে যা; আমার যাবার ক্ষমতা নেই,—ভারী ঘুম লেগে গ্যাছে। আর আমায় জ্বালাতন কর্‌তে আসিস্ নি, আমি এখুনি ঘুমিয়ে পড়্‌বো।'

"দি'ঠান্ যে শোনে না বাবু, আমি কর্‌বো কি? বম্ম যে লাট্‌ফরমে যখন ফিরে এলো, তখন থেকেই দাদাবাবুর শরীলগতিক ভাল নেই, নেশা খেলে যেম্‌নি টলে পড়ে, ওঁনার পা ঠিক্ তেম্‌নি করে টল্‌ছেলো, এত শ্রেম কি ওই শরীলে সয়? কবে কি ক'রেচে? আমার তো সবই দেখা আছে বাপু। বলি, কাত্তিকে তো আর আজকের নয়।"

"আলোটা নিবিয়ে দে'তো কার্ত্তিক।"

"তা দিচ্চি। আমি এই সাম্‌নের দালানে শুয়ে থাক্‌চি। আলোও ঐখানেই রেখে দোব। ভোরের বেলা তো ঘুম ভাঙ্গবে—তা যত রাতেই শোও না কেনে। কাত্তিকে আর তোমাদের হাড়-হদ্দো না জানে কি?"

কার্ত্তিক চলিয়া গেলে উপাধানহীন মস্তক দুই বাহুমধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়া অরবিন্দ উপুড় হইয়া পড়িল। সে যে ঘুমাইল, অথবা জাগিয়া রহিল, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল না। কেবল কিছুক্ষণ ধরিয়া বড় দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি শ্রুত হইবার পর, তাহা ক্রমে থামিয়া আসিলেও, সে রাত্রির সমুদয় অবশিষ্ট কালটাতেই, মধ্যে মধ্যে এক একটা হৃদয়ভেদি সুদীর্ঘ নিশ্বাস যেন একান্ত অসুখী কোন অশরীরী প্রাণীর ন্যায় নিঃশব্দ লঘু চরণে সেই নিস্তব্ধ ঘরময় রাশি রাশি যন্ত্রণা ছড়াইয়া দিতে দিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দ্বারের বাহিরে শুইয়া অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য কার্ত্তিকচন্দ্রও ঘুম ভাঙ্গিয়া সেই ধ্বনি শুনিতে পাইয়া, মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রকে বারম্বার স্মরণ করিয়াছে। এসব ঘর অনেক দিনের অব্যবহৃত,—এই রকম কাণ্ড ইহার মধ্যে যে ঘটা সম্ভব, এ ভয় তাহার মনে মনে যথেষ্টই ছিল। তবে সে যে প্রকাশ করিয়া বলে নাই,—তা এসব কথা উহাদের কাছে বলিয়া লাভ কি যে বলিবে? যাহারা জলজ্যান্ত—সেই রাত্রে যাঁহার নাম ধরিতে নাই,—তাঁহাকেই মানিতে চাহে না, তাহারা এই সব হাওয়া বাতাস, অপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবে না ত? যা'হৌক্, লোহার ছুরিখানা বিছানার তলায় দিতে সে যে ভুল করে নাই,—এই যা পরম ভাগ্য। সে তো আর ছোট্ট-

সিংএর মত দুদিনের লোক নয় যে, মনিবকে দোরটা খুলিয়া দিয়াই, মজা করিয়া চারপাইয়ে চাপিয়া নাক ডাকাইবে। সে রাত্রে কার্ত্তিক ভাল করিয়া ঘুমাইতেই পারিল না।

সকালবেলাতেই দু'তিনখানা গাড়ী বোঝাই করিয়া দু'তিন স্থান হইতে কুটুম্ব সাক্ষাৎ আসিয়া পৌঁছিল। মেয়েরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেখান হইতে উচ্চরোলে কান্না উঠিল; এবং বাহিরের ঘরে মান্য-গণ্য আত্মীয়ের সহানুভূতিসূচক পরিতাপ, প্রবোধ এবং পরামর্শের মধ্যে পিতৃ-বিয়োগ-কাতর অরবিন্দ হেঁটমুখে বারকতক উত্তরীয়প্রান্তে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া ফেলিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনে চেষ্টিত হইল। অরু বাপের বড় আদরের সন্তান,—চিরদিনই সে পিতৃভক্ত। পিতার আদর ও শাসন সমান শ্রদ্ধা-ভরেই সে চিরদিন মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। সংসারের ঝড় ঝঞ্ঝা এইবারে যে তাহার মাথার উপর উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, উচিত অনুচিতের দ্বিধা দ্বন্দ্বে অন্তরাত্মা ঘূর্ণাবর্ত্তবেগে পাক খাইয়া খাইয়া হাঁফাইয়া উঠিতেছে,—ইহার পূর্ব্বে এমন অবস্থা ঘটিতে পারে, এ ধারণাও যে তাহার ছিল না। ভাল মন্দ নির্ব্বিচারেই সে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া গিয়াছে, নিজের লাভ ক্ষতি সেখানে সে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করে নাই। সেনাপতিত্বের দায়িত্ব বড় বেশী,—তার চেয়ে সেনাপতির অধীন থাকিয়া যুদ্ধ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ। তা, যুদ্ধের সেনাপতিত্বের অপেক্ষা সংসারের সেনাপতিত্বের দায়িত্বও নেহাৎ কম নয়।

ভাঁড়ার-ঘরে ব্রজরাণী কুটুম্ব-ছেলেদের জন্য জলখাবার দিতে বলিতে আসিয়া দেখিল, নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রীর মাঝখানে একটা বড় ঝোড়ায় করিয়া এক ঝোড়া বর্দ্ধমানের সীতাভোগ প্রভৃতি রহিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই "দি'ঠান্ বল্‌তে বল্লেন"—বলিয়া কি একটা বলিবার জন্য দ্বার-সমীপস্থ কার্ত্তিককে দেখিতে পাইয়া, 'দি'ঠান্ কি বলিতে বলিলেন, সে কথাটি শুনিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্রজরাণী সেই ঘরে উপস্থিত

একটী বালিকাকে মধ্যস্থ রাখিয়া, যাহাতে কার্ত্তিক শুনিতে পায় এমন উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "জিজ্ঞেস্ কর্ তো, কাল ওরা কত রাত্রে ফিরেছিল ?"

মেয়েটকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না—কার্ত্তিক স্বকর্ণেই শুনিতে পাইয়া উত্তর দিল, "রাত, তা সে ঢের হয়েছিলেন বৌ-মা, বারোটা-একটা হবেন বোধ করি।"

"জিজ্ঞেস্ কর্ তো টেঁপি, এ সব খাবার কোথা থেকে এলো ?"

প্রশ্ন শুনিয়াই মামা-শাশুড়ী-সম্পর্কীয়া ভাণ্ডারের অধিকারপ্রাপ্তা কর্ত্রী-ঠাকুরাণী কহিয়া উঠিলেন, "কোথা থেকে আবার আস্‌বে বউ-মা, দেখ্‌চো না এসব বর্দ্ধমানের খাজা, মতিচুর, সীতাভোগ। গেল রাত্তিরে অরবিন্দ নিজে এ সব কিনে এনেছেন যে।"

কার্ত্তিকও এ কথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়া গেল, "হ্যাঁ বউ-মা, মামী-মা ঠিকই বলচে—বর্দ্ধমান না হইলে এমন খাজা কি আর কোথাও জন্মায়! ভগল-পুরেও অবশ্য মন্দটি করে না, খেতে বরং ভালই; তবে রূপটি অমন ধারা নয়।—মনে আছে মামী-মা, বড়-বউমার বাপ ফুলশয্যার তত্ত্বে খাজা দি'ছলো, একোখানি একো বারকোসে করে—আর সে খাজার—"

"হ্যাঁ রে কার্ত্তিকে, তোকে না আমি পাঠালুম চট্ করে দু'খানা চাঙ্গারি নিয়ে যেতে,—আর তুই এখানে এসে মজা করে খাজার গল্প কর্‌ছিস্! দিন দিন তুই হচ্চিস্ কি বল্‌তো ?"

শরৎশশীর এইরূপ আকস্মিক উদয়ে কার্ত্তিক থমকিয়া গিয়া, অপ্রতিভের একশেষ হইয়া, আমতা আমতা করিয়া উত্তর করিল, "আমি তাই তো নিয়ে—তাই তো—দি'ঠান্, সেই নিতেই তো এইছিলুম। তা বউ-মা শুদুচ্ছিলেন এই খাজা, সীতাভোগের কথা। তাই বলি জবাবটা দিয়েই এক-ছুটে চলে যাই—"

"কই, চাঙ্গারি ?" বলিয়া কার্ত্তিকের বিপন্ন মুখের দিকে চাহিতেই তাহার অবস্থা বুঝিয়া, "গল্প পেলে আর কিছু হুঁস্ থাকে না—" বলিতে

বলিতে ঘরের মধ্যে পা দিয়াই, ভ্রাতৃজায়ার অপ্রসন্ন মুখখানা চোখে পড়িল। মিষ্টান্নের ঝুড়িটা যে ইঁহার দৃষ্টিকে আদৌ আনন্দ দান করিতে পারে নাই, তাহা পলকের ভিতর বুঝিয়া লইয়া, তিনিও নিজের মুখকে ইঁহার অনুকরণে বিশেষরূপে গম্ভীর করিয়া ফেলিয়া, প্রশ্ন করিলেন, "খাজা সীতাভোগের কি হয়েছে বৌ?"

বধূ উত্তর না দিয়া গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামী তাঁহার বদলে উত্তর দিলেন, "না, হয়নি এমন কিছু। বউ-মা জিজ্ঞেস্ করছিলেন, এ সব কোথা থেকে এলো।"

"বউ-মার যেমন ন্যাকাপনা। বর্দ্ধমানের খাবার কি কখন চোখে দেখেন নি, নাকি? তাই আবার জিজ্ঞেস্ করচেন!"

ননন্দার এই টিপ্পনিটুকুতে ক্রুদ্ধা বধূ ঝাঁজিয়া কহিল, "দেখবো না কেন, —লাখোবার দেখেছি। তত আদেখ্লের ঘরে ভগবান আমায় জন্ম দেন্‌নি। 'কে' আন্‌লে তাই জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিলুম।"

"সেও ত তোমার আর একরকম ন্যাকা সাজা। বেশ জানো যে দাদাই এনেছে। দাদা কাল বর্দ্ধমান গেছলো—সে ছাড়া আবার আন্‌তে যাবে কে?"

"যাবার সময় আমার সঙ্গে তো পরামর্শ করে নি। কেমন করে জান্‌বো, কে কখন কোথায় যাচ্চে। জিজ্ঞেস্ করেছি, তাতে হয়েছে কি?"

"হবে আবার কি? তবে ও রকম ন্যাকামী দেখলে যে গা জ্বালা করে। কেন, বর্দ্ধমানের খাবারও কি ঘরে আন্‌তে দোষ আছে নাকি?"

এই কথাটি বলা শেষ হওয়া মাত্রে শরৎশশী চাঙ্গারি দু'খানা টানিয়া আনিয়া তাহা কার্ত্তিকের হাতে তুলিয়া দিয়া—"নে কার্ত্তিকে, শিগ্‌গির করে আয়, পিসে-মশাই ওখানে রাগ কর্‌চেন হয় ত।" বলিতে বলিতে কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই প্রস্থান করিল।

ব্রজরাণীর গভীর কালো চোখে তখন যে বিদ্যুতের ঝলকের মত আলোর আগুন ঝলকিতেছিল, তাহা সে চাহিয়া দেখিয়াও গেল না। আর

দেখিলেই বা কি হইত? এ রকম কথায় ঠোকর মারামারি এ'তো তাহাদের মধ্যে আকস্মিক নয়,—ইহা নিত্য। এই বধূটি যেদিন ঘরে আসে, সেদিন শরৎশশী পেট-ব্যথায় অস্থির কাতর হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল।— শুভক্ষণে সে নব-বধূর মুখ দেখে নাই। মুখে কানে মধু, চোখে সোণার জল দিয়া মধুমাখা কথা শুনিবার শুনাইবার, সোণার চক্ষে দেখিবার দেখাইবার,—কোন বন্দোবস্তই সে করে নাই। কেহ সে কথা বলিতে আসিলে, কাঁদিয়া হাট বাধাইয়া বলিয়াছে, "পেটের ব্যথায় আমি মরে গেলাম,— ও-সব আমার কিছু ভাল লাগে না।"

অনেকেই সে কান্নায় গলিয়া গিয়া "আহা, বাছা রে, আজকের দিনে একবার মাথাটি তুলে উঠে বস্‌তে পারলে না ;—মরে যাই গো!" ইত্যাদি বলিয়া সহানুভূতি দেখাইয়া ফিরিয়া গেল। কেহ পেটে গরম চোকরের সেঁক, কেহ টার্পিন তেল দিয়া ফোমেণ্টেসনের ব্যবস্থা করিয়া গেল: কেহ বা বলিল, "একটুকু পিপারমেণ্ট খাইয়ে দাও দেখি, এখনি নরম প'ড়ে যাবে। আমার টেবুর সেদিন অমনি হ'য়েছিল। দেবা মাত্তর, বল্লে না পেত্যয় যাবে মা, কে যেন আগুনে জলটুকুন্ ঢেলে দিলে।"

মা আসিয়া বিস্তর সাধিলেন,—একবাটি দুধ-সাবু আনিয়া হাতে দিয়া বলিলেন, "একেবারে নিরম্বু উপোসী থাক্‌লে ব্যথা আরও বাড়বে রে,— একটুখানিও খা।"

খাটের তলায় বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া, শরৎ পাশ ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল, "আমি পার্‌বো না মা।"

মা ভয়ে এতটুকু হইয়া গেলেন। এ কেমন অপয়া বউ ঘরে আসিল? চৌকাট্ পার হইতে না হইতেই জলজ্যান্ত সহজ মেয়ে এমন হইয়া পড়িল। মামী, মাসী, প্রতিবেশিনী প্রৌঢ়াগণও একবাক্যেই এই মন্তব্যে সায় দিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া শরৎ একা পড়িয়া আছে। পায়ের শব্দ শুনা গেল না ;—খাট একটুখানি দুলিয়া উঠিল, কে যেন আসিয়া কাছে

বসিয়াছে! কিসের যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে অকস্মাৎ শরতের বুকের মধ্যে দুড়দুড় করিয়া উঠিল।—কে?—এমন করিয়া এমন সময়ে কে আসিল! উঃ! কে? ভয়ে সে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। যদি কোন অপরিচিত বালিকাকণ্ঠ এ প্রশ্নের উত্তর দেয়? সে সহিতে পারিবে না গো,—পারিবে না।—আর যার খুসী সে পারুক,—সে পারিবে না।—

বহুক্ষণ নীরবে কাটিয়া যাইবার পর, যে আসিয়া কাছে বসিয়াছিল, সে যেন বড় ভয়ে ভয়ে সঙ্কুচিত মৃদুস্বরে ডাকিল, "শরৎ!"

"কে, দাদা?"

ধড়মড়িয়া শরৎশশী বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। মুহূর্ত্তের সে মুক্তির আনন্দে দুর্জ্জয় দুঃখ অভিমানের প্রচণ্ড ব্যথাও যেন কোথায় সরিয়া গেল। অরবিন্দ আবার তেমনি স্বরেই বলিল, "শরি, এমন করে কেন কষ্ট পাচ্চিস—ওঠ্, উঠে খা' দা'।"

আবার সব কথা মনে পড়িয়া গেল। শরৎ শয্যাশ্রয়ী হইল। অনেকক্ষণ কোন কথাই সে কহিল না। তারপর ভাইয়ের পুনঃ পুনঃ অনুনয়ে, অশ্রুমথিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "খেলে আমি মরে যাব। তোমরা জানো না, আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হ'চ্চে।"

অরবিন্দ শান্ত-স্বরে কহিল, "তা' আমি জানি। কিন্তু খেলে এ রোগের কিছুই কম বেশী হবে না। শরীরে তো তোমার কিছুই হয় নি।"

শরৎ ভাইএর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া, কঠোর-স্বরে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, "তবে কি আমি শুধু শুধু ভাণ করে পড়ে আছি—এই কথা তোমরা বল্‌তে চাও?"

" 'আমরা' নয়—আমি।"

"তাতে আমার লাভ?"

"আপাততঃ একজনের মুখ দেখ্‌তে হবে না, এইটুকু।"

"তুমি কি তার হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছ নাকি?"

"না"—বলিয়া অরবিন্দ একটুখানি হাসিল। সেই হাসিটুকুর সামান্য এতটুকু শব্দে অকস্মাৎ বারুদের স্তূপের মত ফাটিয়া পড়িয়া, তর্জ্জন-শব্দে শরৎশশী কহিয়া উঠিল "হাস্‌চ তুমি?—উঃ! দাদা, তুমি কি?"

অরবিন্দ ক্ষণকাল নীরব রহিল; তারপর অত্যন্ত ম্লান-স্বরে উত্তর করিল, "আমি কি—তা'কি তুই এতক্ষণে চিন্‌তে পার্‌লি শরৎ? তবে আরও একটা কথা বলি, শুন্‌তে পার্‌বি? কাল বাসর-ঘরে—"

"কি? গান গেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

শরৎ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া সবেগে বলিল, "তুমি যাও।"

"যাই, কিন্তু তুই খেতে আয়।"

"শিগ্‌গির যাও বল্‌ছি—"

"যাচ্চি রে, তুই আগে ওঠ্‌ না।"

"কথা শুন্‌বে না? তবে আমিই যাই। তুমি বড় ভাই—এই তোমার পায়ের ধুলো নিচ্চি,—কিন্তু তোমার মুখ দেখ্‌তে নেই।"—বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত বেদনায়, অভিমানে কাঁদিয়া উঠিয়া, সেই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর জ্যেষ্ঠের কোলের ভিতর সে নিজের শতধারা ধৌত মুখখানা গুঁজিল।

এই তো ননদ-ভাজের প্রথম প্রণয়। ইহার পরিণতি আর কেমন আশা করা যায়? সেবারে বধূ যে কয়দিন শ্বশুরালয়ে রহিল, সে কয়টা দিনই তাহার বড় ননদের শরীরের অবস্থা মোটে ভাল রহিল না। পাঁচজনে নববধূকেই ননদের কাছে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে, গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বলিয়া কহিয়া পাঠাইয়া দেয়। ননদ তাহাকে গায়ে হাত দিতে তো দেয়ই না,—পাখায় বাতাস করিতে গেলে "শীত করিতেছে" বলিয়া মুখ পর্য্যন্ত চাদর টানিয়া পিছন ফিরিয়া শোয়। বধূ-বেচারা কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া নত-মুখে বসিয়া থাকে। সেও ডাগর মেয়ে—বুদ্ধি

তার বেশ তীক্ষ্ণ। এই ননদটি যে তাহার প্রতি বেশ সন্তুষ্টা নয়, এটুকু সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে। নিজের অপরাধ খুঁজিয়া পায় না। একদিন ছোট ননদকে একটুখানি আভাস দিয়া ফেলিল। কে একজন তাহাকে শরতের কাছে বসিতে বলিতেই, সে জনান্তিকে উষাকে বলিল, "আমি থাকলে ঠাকুর-ঝি বিরক্ত হন যে,—আমি যাব কি ভাই ছোট-ঠাকুরঝি?"

উষার ইচ্ছা নয় যে, তাহার এই নূতন সঙ্গীটি তেমন করিয়া একটা রোগীর ঘরে বদ্ধ হইয়া থাকে। তাই সে অতি সহজেই ইহার পক্ষাবলম্বন করিয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল. "কেন, সে তোমায় বকে না কি?"

বধূ নত-নেত্রে হাতের হীরার বালা খুঁটিতে খুঁটিতে মৃদুস্বরে কহিল, "না, ভাই, বকেন না; কিন্তু বোঝা যায় যে রাগ কর্‌চেন। কেবলি কেবলি উঠে যেতে বলেন!"

"তবে তুই যাস্‌নে।"

এই বলিয়া উষা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে নিজের খেলাঘরে লইয়া আসিল। ইহার পর হইতে কেহ বধূকে শরতের সেবার কোন ভার দিতে আসিলে, সে বধূর পক্ষে ওকালতি করিয়া জবাব দিতে আরম্ভ করিল, যে, "দিদি ওকে যা বকে—ও কি কর্‌তে যাবে? ও যাবে না।"

বধূ ভীতা হইয়া বলিল, "ও কি ভাই, ও রকম করে বল্‌চো কেন? ওঁরা হয় ত রাগ কর্‌বেন।"

"ঈস্‌, কে আবার রাগ কর্‌বে?" বলিয়া নিঃশঙ্ক উষা অপ্রতিহত অধিকারে নূতন ভাজের উপর দখল লইয়া বসিল। নববধূ সেই হইতেই দুই ননদের প্রভেদ করিতে শিখিল।

একদিন সুযোগমত অরবিন্দ কুণ্ঠিত-মুখে কাছে আসিয়া বলিল, "শরি ভাই, ও কিন্তু এ সব কথা কখন ভুল্‌বে না।"

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি সব কথা?"

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া অরবিন্দ কহিল, "এই তুই—"

"ও বুঝি তোমার কাছে এরই মধ্যে লাগিয়েছে ?"

"লাগায়নি ঠিক,—দুঃখ করে বলছিল, যে,—"

রুষ্ট হাস্যের সহিত শরৎ বাধা দিল, "থামো দাদা,—তোমার বউএর সঙ্গে তোমার কি কি কথাবার্ত্তা হয়েছে, সে শোন্‌বার আমার মোটেই কৌতূহল নেই। তবে তুমি যখন এরিই মধ্যে ওর হয়ে আমার কাছে কৈফিয়ৎ নিতে এসেছ, তখন আমারও জানান উচিত, যে, আমি কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবো, তার জন্য কারু কাছে কোন জবাবদিহি করতে বাধ্য নই। যার ভাল না লাগবে, সে যেন আমার কাছে আসে না।"

অরবিন্দ তাহার আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন মিছে এত দুঃখ ক'রে মরছিস্ শরৎ ?"

"কি করবে ?—শরতের ঐ রোগ।"

—বলিয়া খুব রাগ করিয়া উঠিয়া শরৎ চলিয়া যাইতেছিল ; অরবিন্দ ডাকিয়া বলিল, "আয়, শুনে যা।"

"কি ছাই শোনাবে তাই বলো না ?"

"অনর্থক সংসারে অশান্তি আনায় লাভ কি ?"

শরৎ তখনি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি যদি তোমাদের সংসারে অশান্তি আন্‌চি—এই হয়, তাহ'লে এখনি তোমরা আমায় বিদায় ক'রে দাও না কেন ?"

"তুই বড় একরোখা। তা আমি বলচিনে। বলি, ও বেচারার দোষ কি ? ওকে আমরাই না ঘরে এনেচি ?"

"সেই কি আপনি যেচে তোমাদের ঘরে এসেছিল ?"

"সে কথা হচ্চে না; এ তো আর তাকে তাড়ায়নি। বিয়ে ক'রে যখন এনেছি, তখন—"

"তাকে বোধ করি নিকে করেই এনেছিলে ?"

"তুই ভারি উল্টো-বোঝা মানুষ! তার কথা ছেড়েই দে' না। মনে করো না কেন, যে, সে কেউ ছিল না। সে সব একটা স্বপ্ন—"

"মা গো! তুমি মানুষ, না' কি!"—এই বলিয়া শরৎ মুখে আঁচল গুঁজিয়া দিয়াও কান্না রোধ করিতে পারিল না; এবং কান্নার চোটে তাহার মুখ দিয়া অপর কোন ভৎ´সনাও বাহির হইতে পাইল না।

তা এ সব পুরানো কথা। এখন শরৎশশী পাঁচটি ছেলেপিলের মা,—বয়সও সাত আট বৎসর বাড়িয়াছে—শরীর মনের ঝাল সেই সঙ্গে সঙ্গেই অনেকখানি মরিয়াও আসিয়াছে। কালপ্রবাহেও সেই কৈশোর শোকের কতকটা ভাসাইয়া লইয়াছিল। দ্বিতীয়ার উপর বৈরভাব আর ততদূর নাই। তবে অশুভ-দৃষ্টির ফলে দুজনের কেহ কাহাকেও বেশ যে দেখিতে পারে, তা'ও নয়। মনোরমাকে শরৎশশী আজও ভুলে নাই। তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার সাধ এ বাড়ীতে তাহার মত আর কাহারও নয়। মায়েরও যে অসাধ ছিল না, সেও প্রায় এই মেয়েরই জন্য।

নবম পরিচ্ছেদ

"তৎ কৈকেয়ী সোঢ়ুমশক্নুবানা, ববার রামস্য বনপ্রয়াণম্
—ভট্টি।"

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন ব্রজরাণীর বাপ জামায়ের বাড়ী দেখা দিলেন। বাড়ীর গাড়ীতে ছেলেমেয়েরা কে কে সঙ্গে আসিয়াছিল; আর আসিয়াছিল ব্রজর দাদা। বাড়ীর মধ্যে থাকিয়া খবর পাইয়া একটী ভাইঝিকে দিয়া ব্রজ নিজের এই দাদাটিকে আনাইয়া, নিজের ঘরের মধ্যে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সেখানে দুই ভাই বোনে কি কি কথা হইল। তাহার

খানিক পরে দাদাটি মুখখানি পরম গম্ভীর করিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। ব্রজও কাজকর্ম্ম দেখিতে ফিরিয়া আসিল।

বড়লোকের শ্রাদ্ধ,—শ্রাদ্ধে দানসাগর, দম্পতিবরণ, এমন সব অনেক কাণ্ডেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সব দেখা শুনা করিয়া, ভাল মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে, যুক্তি পরামর্শের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে বিনীত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, সেই সব বহুমূল্য সৎপরামর্শ-গ্রহণ-কার্য্যে নিযুক্ত জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া, এক সময়ে, অরবিন্দের শ্বশুর মহাশয় একটুখানি কাসিয়া, কেশবিরল-মস্তকে বারকতক হাত বুলাইয়া, একটু যেন সলজ্জভাবে কহিয়া ফেলিলেন, "কিছু মনে করো না, অরবিন্দ,—আমি তোমায় ভাল রকমেই চিনি। তবে কি না,—তবে কি না এটা সংসার, আমরা হচ্চি সংসারী। এখানকার যা কর্ত্তব্য, সেগুলো তো নিয়ম মতন ঠিক্ ঠিক্ করে যাওয়া চাই। তাই এমন অপ্রিয় প্রসঙ্গটা হঠাৎ একটীবারের জন্য তুল্‌তে হ'লো বাবা! তা তুমি সে জন্য দুঃখিত হ'য়ো না; আমি তোমায় কিছু অবিশ্বাস করে এ কথাটা বল্‌ছি না। নেহাৎ বাপের প্রাণ কি না! সেইজন্যে তার মুখটা চেয়েই, আমায়—বুঝ্‌তে পার্‌চো তো?—নেহাৎ সেইটেরই জন্যে।"

অরবিন্দ বিনীত-বচনে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কি আদেশ কর্‌চেন, বলুন?"

"না—না, আদেশ কিছু নয়, আদেশ কিছু নয়। সেই তোমাদের বিয়ের সময়কার কথাটা। সেই সময় সকলেই আমায় ছুট্‌কীর বিয়ে এখানে দিতে বারণ করেছিল কি না; আর তোমার শাশুড়ী-ঠাক্‌রুণ—সেও তো শুনেইছ, কেঁদে কেটে একেবারে শয্যাধরা হ'য়ে পড়েছিল। বলে,—সতীনে মেয়ে দেবার চেয়ে, মেয়েকে গঙ্গাজলে কলসী বেঁধে ভাসিয়ে দাও। মেয়ে-মানুষ কি না! ওদের দশহাত কাপড়ে কাচা নেই,—বুদ্ধির দৌড় ওদের ঐ পর্য্যন্ত! তা, আমি তো আর মাগী-ছাগী কারু কথা কানে তুলিনি।

সকলে একদিকে, আর আমি একদিকে। আমি বলি, মৃত্যুন্ বোস্ যখন আমায় কথা দিয়েছেন, তখন সে কথার আর নড়চড় নেই।—সে সতীন থাকা না থাকা একই কথা। ওরা কেঁদে বলে কি জান? যে, 'ওগো, তাঁর অবর্ত্তমানে ছেলে যদি সে-কথাটি না মানে?' তা, আমি তখন তার কি জবাবটি দিয়েছিলুম, সেটি শুনবে?—আমি বলেছিলুম যে, 'কেন, অত ঘাবড়াচ্চো? সে'ও তো ঐ মৃত্যুন্ বোসেরই ছেলে! কথায় বলে, বাপকা বেটা, সিপাহিকা ঘোড়া, কুছ্ নেহি তব্ হি থোড়া থোড়া। যারা বাপের বেটা হয়, তারা কি আর বাপের কথার নড়চড় হ'তে দেয়? অরবিন্দ যে স্ত্রীকে বাপের কথায় ত্যাগ করেচেন, তাঁর অবর্ত্তমানেই কি আর তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে মরা বাপের অপমান করতে পারেন?' তা বাবা, তোমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ হাজারই হোক্,—বল্লুম ঐ তো,—মেয়েমানুষ বই আর তো কিছুই নয়! তিনি এরই মধ্যে অন্নজল ছেড়ে দোর দিয়ে পড়ে আছেন। বল্‌ছেন, 'ছুট্‌কুকে যদি সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়, তা' হলে মেয়েটা কোন্ দিন না কোন্ দিন গলায় দড়ি দেবে, কি খিড়কীর পুকুরে গলায় কলসী বেঁধেই উল্‌বে।' মায়ের প্রাণ! আর ঐটি ওঁর একমাত্র কন্যা-সন্তান কি না—বড়ই আদরের—সে'ও ত তুমি সব জানোই বাবা—"

অরবিন্দ শান্ত-স্বরে, শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "আমার বাপের প্রতিজ্ঞা আমার দ্বারা ভঙ্গ হবার কোন সম্ভাবনা কি দেখা গেছে?"

মোক্ষদাচরণ (অরবিন্দের শ্বশুর মহাশয়টির উহাই নাম) কিছু যেন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না—না, তা কি বল্‌ছি, তা কি বল্‌ছি—সে ত আমি বরাবরই জানি,—আমায় আর তোমায় বুঝোতে হবে না বাবা! তবে ওরা সব মেয়েমানুষ,—মেয়েমানুষের জাত,—ওদের কথা ধরে কে? আমি একরকম বলেই এসেছি; আবার এই এখনি বাড়ী গিয়েই ওঁদের বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেব 'খন, যে, বোস্‌জাই গত হয়েছেন,—তা' বলে তাঁর ভদ্রলোকের সঙ্গে দত্ত কথার তো আর মৃত্যু হয়নি! তোমাদের এ সব

ছোট ভাবনা কেন?—ওহে চন্দর! দেখ দেখি ছেলেগুলো সব গাড়ীতে গিয়ে উঠছে কি না, সন্ধ্যাবেলা-আবার এক বেটা মক্কেলের আস্‌বার কথা আছে। শালা বেটা শালা জ্বালিয়ে মেরেচে হে,—তার ইচ্ছে যে, চব্বিশ-ঘণ্টাই আমি তার কাগজ পত্তর নিয়ে বসে থাকি।—আচ্ছা এখন চল্লুম।"

মাতা-পুত্রে কোন সময়ে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ ঘটিলে, মা ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া, সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "ওখানে গিয়েছিলি?"

পুত্র ইহার জবাব দিল, "হুঁ।"

মা বলিলেন, "সবাই ভাল আছে?"

ছেলে কহিল, "হ্যাঁ।"

"খোকাটিকে দেখ্‌লি?"

"দেখেছি।"

"কত বড়টি হয়েছে?"

"বড় হয়েছে তো।"

দেখ্‌তে কার মতটি হয়েছে রে? তোর মত, না, আমার বৌমায়ের মত?"

"তা তো জানিনে।"

"আস্‌তে চাইলে না?"

"না।"

"কিছু বল্‌লে তোকে? কোলে এলো?"

"উহুঃ।"

"ওরে, একবার তাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌লি নে, কেন রে?—একটিবার দাদার আমার চাঁদ-মুখখানি দেখ্‌তুম যে!—আমার সোণার চাঁদ রে!"

অরবিন্দকে গমনোদ্যত দেখিয়া, আকস্মিক হৃদয়োত্থিত উচ্ছ্বাস আপনি রোধ করিয়া লইলেন; কিন্তু সেই অপরিচিত পৌত্রটির কাল্পনিক সুন্দর মুখখানি স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্র, সহসা ঝরঝরিয়া চোখের জল ঝরিয়া

পড়িল; কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, উঃ! কি পাষাণই আমি পেটে ধরেছিলুম রে! কি পাষাণ!—কাল অত ক'রে ঠেলেঠুলে পাঠালাম;—মনে করলাম, ও স্বোয়াদ্ তো পাওনি,—ছেলের মুখ চোখে পড়লে, আর এমন করে থাকতে পারবে না। পৃথিবীতে মানুষ ঐ মুখখানির দিকে চেয়ে আর সবই ভুলে যেতে পারে,—কেবল ঐ খানিকেই পারে না। তা তোরা তাও পারিস্। কেমন লোকের ছেলে বাবা তুমি!—তোমার কাছে আশা কর্তে যাওয়াই যে আমার ভুল হয়েছিল।"

মা কাঁদিতে লাগিলেন; ছেলে নিরুত্তরে চলিয়া গেল।

ব্রজরাণী সে রাত্রে নিজের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে ঘরে আজ স্বামী শুইয়া আছেন। দেখিয়া সে ঈষৎ বিস্মিতা হইল। পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে অরবিন্দ মায়ের কাছেই শয়ন করিয়া থাকে।

"আজ এ ঘরে যে?"—এই প্রশ্ন করিয়া সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অরবিন্দ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া ছিল; তেমনি থাকিয়াই জবাব দিল, "চারদিকে ভারি গোলমাল।"

"ওঃ, তাই জন্যে!"

স্বরে ঈষৎ ব্যঙ্গের আভাস ছিল। পরদিন 'ঘাট',—প্রকাণ্ড বাড়ীটা আত্মীয়-কলরবে পরিপূর্ণ। অসঙ্গতত৷ ইহার মধ্যে কিছুই ছিল না। তথাপি ব্রজরাণীর মনে হইল, স্বামী নিজের শরীরের বিশ্রাম লইবার জন্য আজ তাহার মন্দির পবিত্র করিতে আসেন নাই, অপর উদ্দেশ্য আছে। অন্তরের কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রশমনার্থ তাঁহার আজ একটুখানি নির্জ্জন স্থানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল বলিয়াই, হঠাৎ এই ব্রজরাণীর ঘরখানার কথা স্মরণে আসিয়াছে। স্বভাবতঃ তীব্র অভিমানে বুক পুড়িয়া উঠিল। কিন্তু মনের মধ্যে যাই হোক্, ঝগড়াঝাঁটি করিবার তেমন ইচ্ছা ছিল না। পিতা অবশ্য বাড়ী ফিরিবার মুখে শুভ সংবাদ কন্যাকে বিজ্ঞাপিত না করিয়া যান নাই। সেই আনন্দে মনের মধ্যে আজ উদারতার হাওয়া বহিতেছিল। তাহাতেই ভাসিয়া গিয়া

একটুখানি খরচ করিয়া ফেলিল। স্বামীর কম্বল-শয্যার অদূরে, মুক্ত বাতায়নের জ্যোৎস্নাধারার মধ্যে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কাল রাত্রে ফিরে কিছু খেলে টেলে না, ওখানে বুঝি খেয়ে এসেছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"সেইজন্যেই বুঝি অত রাত হ'ল ?"

"হুঁ।"

"আমাদের কিন্তু ভাবনা হচ্ছিল যে, হয় ত শরীর ভাল নেই, না, কি। খাওয়ার কথা তো কার্ত্তিকেটা কিছুই বল্লে না।"

"সে তো তোমার মত ক্ষেপেনি।"

"আমিই বা ক্ষেপ্‌লুম কিসে ?"

"তা একটু ক্ষেপেছ বৈ কি !"

"হ'তে পারে। তবে কি, কি, লক্ষণ দেখতে পেলে, সেটা শুন্‌তে পাইনে ?"

"আমার কি এখন যেখানে সেখানে খেয়ে বেড়াবার সময় ?"

"যেখানে সেখানে নয় ; তবে ওখানে খেলে দোষ কি ?"

"ওখানেই বা আমার 'যেখানে সেখানের' সঙ্গে প্রভেদটা কি ?"

ব্রজরাণী ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তারপর হঠাৎ স্বামীর কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন শ্লেষে মনে মনে তপ্ত হইয়া উঠিয়া, তেমনি শ্লেষ প্রচ্ছাদিত সহজ স্বরেই জবাব করিল, "তা একটুখানি আছে বই কি।"

"কি, শুন্‌তে পাইনে ?"

"আর কোন্ দিন রাত একটায় বাড়ী ফিরে সারারাত নীচের ঘরে পড়ে কেঁদেচ ?"

"কেঁদেছি ?"

শব্দটা যেন অরবিন্দের কণ্ঠমধ্য হইতে নয়,—অনেক দূর হইতে অপরিচিত স্বরে ভাসিয়া আসিল।

ব্রজরাণী তখন রাগিয়াছে। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট ঝাঁজ মাথাইয়া, স্পষ্টস্বরেই উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কাঁদোনি কি? কার্ত্তিক তোমার দোরে শুয়ে কাল যে সারারাত উপদেবতার বড় বড় নিশ্বাসের শব্দ শুনলে, সে উপদেবতা কে গো? আমিও তো আর চাষা নই! মনের সমস্তটাই তোমার সে যে আজ পর্য্যন্ত জুড়ে বসে আছে। আমার কি আর এতটুকু একটু স্থান আছে কোথাও।"

অরবিন্দ তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। এ কথার কোন প্রতিবাদ সে করিল না। শুধু শান্ত সংযত-কণ্ঠে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমায় অযত্ন করেচি কখন?"

"যত্ন আর ভালবাসা দুই কি এক?"

অরবিন্দ এ কথার কোনই জবাব দিল না। তখন ব্রজরাণী উঠিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই পরম স্নিগ্ধ হৈম জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে তাহার ঈর্ষা-বিবর্ণ মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর হইয়া ফুটিয়া উঠিল; তাহার দুই চোখ নূতন ইস্পাতের ছুরির মত ঝকিয়া উঠিল। সে কহিল, "অযত্ন যে ঠিক্ কোন দিন করেছ, সে কথা বল্লে আমার জিভ খসে যাবে,—তা' আমি বল্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু তুমি যাকে যত্ন মনে করে করেছ, যত্নের ঠিক্ স্বাদও তা থেকে আমি কোন দিনই পাই নি। আমায় রাশি রাশি বই, এসেন্স, গহনা, শাড়ী কিনে এনে দিয়েছ; রাগ করে কথা,—তা, নেহাৎ আমি না রাগালে বলোও নি। কিন্তু সেই কি সব? আমি কিছু বল্‌তে চাইনে,—অনেকবার তো বলেছি,—ওসব ছাই পাঁশ,—তোমার ও শুধ্‌নো আদর যত্ন ওসব আমার চাইনে। ও-সবে আমার এতটুকুও লোভ নেই। তুমি যখন আমায় সত্যি ক'রে ভালবাস্‌তে পার্‌বে না, তখন তুমি কেন আমায় বিয়ে করেছিলে? মনের মধ্যে সমস্তক্ষণ আর একজনকে ধ্যান ক'রে, বাইরে এই যে একটা টেনে এনে ঘরকরণা করা,—এটা কি একটা মস্ত বড় ছলনা নয়? এতে কি পাপ নেই?"

অরবিন্দ আবার শয়নোদ্যোগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমি তো তোমায় নিজে কোর্টশিপ ক'রে বিয়ে করিনি রাণি ! বাবারা দুজনেই খুঁজে পেতে দুজনকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তার জন্য আর চিরকাল ধরে কেঁদে কেটে কি করবে বলো ?—সে তো আর বদল হবে না। এখন নিজের বিছানায় গিয়ে স্থির হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো দেখি,—অনেক রাত হ'য়ে গেছে।"

ব্রজরাণী এ যুক্তিতে টলিল না। সে তেমনি দাঁড়াইয়া থাকিয়াই, গভীর নৈরাশ্যের স্বরে কহিয়া উঠিল, "আমায় যে তুমি বাপের কথায় বাধ্য হ'য়ে বিয়ে করেছ, সে আমি জানি। কোর্টশিপ করে তাকে যে অনেক সাধেই বিয়ে করেছিলে, তা'ও যে না জেনেছি, তাও না ; কিন্তু আমায় বলো দেখি তুমি, এ রকম করবার তোমাদের কি অধিকার আছে ? যাকে ভালবাসতে পারবে না,—কখনও পারবে না,—কেন তাকে চিরদিন এমন করে পুড়িয়ে মারবার জন্য ঘরে নিয়ে এলে ?"

"কি ছেলেমানুষী করচো রাণি ? তোমার উপর এতটুকু অন্যায় হয় নি, তুমি নিজেই বরং ভেবে দেখ। অনর্থক নিজের মনের হিংসায় যদি জ্বলো, সে দোষ আর কারো নয়, শুধু তোমার।"

"সে দোষও আমার নয়। তুমি শুধু বাইরের কথাটাই বলচো ; কিন্তু ভিতরে যে সেই তোমার সব। সেখানে আমি যে ভিখারী—"

"রাণি, তুমি বাড়ালে ! সেই একজনকে ভিখারীর অধম করেও কি তোমরা তৃপ্ত হও নি ? এই যে মনের খোঁটা চব্বিশ ঘণ্টাই দিচ্চ, তারই বা কি তুমি প্রমাণ পেয়েছ, তাই বলো তো ? একবিন্দু মনুষ্যত্ব এ মন থেকে কোন দিন ক্ষরে পড়তে দেখেছ কি ?"

"তুমি তার কি বুঝবে ?—এই যে কথাগুলো—বললে, ওইগুলোই যে তোমার বুকের রক্তে স্নেহের রসে মাখা।"

"তবে নাচার !"

"আমি তো তোমায় কিছু বল্‌চিনে। তুমি কেন রাগ কর্‌চো? এ যে হবেই। তুমি যে তাকে ভালবেসেছিলে,—কেমন করে ভুল্‌বে; কেমন করে আবার আর একজনকে ঠিক তেমনি করে ভাল্‌বাসবে?—সে কি হয়?"

"আমি জানিনে রাণি! ঘুমে আমার শরীর পাথর হয়ে জমে আস্‌চে, যদি দয়া করে একটুখানি রেহাই দাও,—অন্ততঃ আজকের রাতটা—"

"বেশ তো, ঘুমোও না তুমি। আমি কি তোমায় বারণ করেছি? এ তো আর বর্দ্ধমান থেকে আসা নয় যে,—নাঃ! আমারই কপাল মন্দ,—কার আর আমি দোষ দেবো?"

একটা মুহূর্ত্তমধ্যে বিছানায় পড়িয়া অরবিন্দের নাসিকা গর্জ্জিয়া উঠিল। আর জানালার নিকটে বসিয়া, তাহারই গরাদে মাথা রাখিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে ব্রজরাণী মনে মনে বলিতে লাগিল, "এর চেয়ে যদি সতীন নিয়ে ঘর কর্‌তুম, সেও বোধ করি ঢের ভাল হ'তো। সে না হয় দুজনে ঝগড়া হোল,—ওঁকেও দুকথা শুনালাম। এতে বল্‌বার, দোষ দেবার কারুকে কিচ্ছুই নেই। অথচ এতে তার উপরও অন্যায়,—আর আমার উপরও— হ্যাঁ, আমার উপরও একশোবার অন্যায়। কিন্তু তাই বলেই কি আর আমি তাকে আন্‌তে দিতে পারি? ও বাবা রে! না, প্রাণ থাকৃতে সেও তো পারি নে। এর যে সবটাই মন্দ। একে শোধরাবার কোন পথই নেই। মা গো! সতীনের উপর মানুষ কেন মেয়ে দেয়? গঙ্গায় তো এখনও জলের অভাব হয় নি।"

দশম পরিচ্ছেদ

প্রভাতশাতাহতি কম্পিতাকৃতিঃ, কুমুদ্বতী রেণু পিশঙ্গ বিগ্রহম্।
নিরাশ ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী ন মানিনী সংসহতেহন্যসঙ্গমম্।

ভাগলপুরে জন্ম এবং উক্ত প্রদেশীয়া দাসী এত্‌বারিয়া কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা উষাকে ছোটবেলায় 'কবুতরি' বলিয়া ডাকা হইত। এখনও মা প্রভৃতি কেহ কেহ উপরি উক্ত সম্বোধনটিকে একেবারেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরিহাস করিয়া ননন্দার অপছন্দসই ওই নামটির যখন তখন অপব্যবহার করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইয়া তোলা ব্রজরাণীর চিরদিনের আমোদ। "আয় তিতি, আয় আয়, আয়"—ইত্যাদি জীববিশেষের প্রতি প্রযোজ্য সম্বোধন পদটি ব্যবহার করিলেই, মুখ রাঙা করিয়া হয় উষা সেখান হইতে চলিয়া যাইত, না হয় "যা—যা, ছুট্‌কি অত আর বাহাদুরি কর্‌তে হবে না।" এই বলিয়া এক দুর্ব্বল কলহের চেষ্টা উপস্থিত করিত। ব্রজরাণীর বাপের বাড়ীর যে ঝি তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই পুরাতন দাসী তাহাকে বাড়ীর কনিষ্ঠা কন্যা পদবাচ্য এই নামটিতে সম্বোধন করে। নিরুপায়া উষা আত্মরক্ষার্থ ইহাকেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু ব্রজরাণী অতি শীঘ্রই একদিন প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে, 'ছুট্‌কি' আর 'কবুতরি'তে আস্‌মান জমীন্ ফরখ্। অগত্যা রাগে গর্জ্জিয়াও উষা অজ্ঞানাবস্থায় তাহার প্রতি পাঁচজনের দেওয়া অভিশাপকে কোন রকমে হজম করিয়াই চলিত। মার কাছে নালিসে ফল ফলে নাই। বাবার কাছে নালিসে ফল ফলিয়াছিল; তবে ফলটা কিছু কটু। তিনি অতি শিশু-দিগেরও বেয়াদবি সহ্য করিতে পারিতেন না। বউমার এই অশিষ্টতা

উপলক্ষ করিয়া সেই হেতু কুশিক্ষা-প্রদাত্রী বধূ-জননীই নিন্দার ভাগিনী হওয়াতে, ব্রজরাণী যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া, ভাঁড়ার হইতে একমুঠি ধান আনিয়া উঠানে ছড়াইতে ছড়াইতে, আকাশের দিকে চাহিয়া কল্পিত পারাবতের উদ্দেশ্যে গলা ছাড়িয়া আরম্ভ করিল, "আয় তিতি, তিতি আয় আয়—"

উমা ছুটিয়া আসিয়া—"বৌদি ফেব্‌!"—বলিয়া গর্জ্জাইতেই, সগর্জ্জনে উত্তর হইল, "তুই কি পায়রা না কি? তবে আয়, ধান খাবি আয়।"

সেই অবধি 'কবুতরি'র লড়াই প্রায় মিটিয়াছিল; অর্থাৎ আর কখন এ লইয়া 'হাইকোর্ট' হয় নাই। আজ আবার সেই নামে আদরের ননদকে ডাকিয়া ব্রজরাণী কহিল, "কবুতরি ভাই! সতীনে পড়ার মত অধর্ম্ম মেয়েমানুষের আর কি আছে বল্ দেখি?"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 'খুনসুটির' ঝগড়া অনেকখানি কমিয়া গিয়া, গাঢ় প্রণয়ে এই দুইটি সমবয়স্কার চিত্ত পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মা নিজে কোন সময় ভুলিয়া গিয়া ছোটবেলার নাম ধরিয়া ফেলিলে, সে রাগ করিয়া বলিয়া উঠে—"তোমারা কি ওই ছায়ের নাম চারকাল ধরেই কবে?—উষা বলতেই বা কতক্ষণ লাগে বাবু!" কিন্তু ইহাকে প্রায় কিছু বলে না। সে মুখ খুব গম্ভীর করিয়া জবাব দিল,

"তা তো বটেই! 'বগী বিন্দীর' মত চব্বিশ ঘণ্টা সতীনের সঙ্গে লড়তে হচ্চে—অধর্ম্ম না।"

ব্রজরাণীর মনের ভাব হাসির উপযুক্ত না থাকিলেও, এ কথায় সে হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়াই বলিল, "ঠিক্ তাই রে, ঠিক্ তাই! ঐ আবাগী দুটোর মতনই দিন রাত মনের মধ্যে সতীনের সঙ্গে যে ঝগড়া চল্‌ছে, সে তোরা শুনতে না পাস্, আমার নিজের কাণ যে তাতে ঝালাপালা হয়ে গেল।—না ভাই ছোট! সত্যি বল্‌ছি তোকে;—সতীনের ওপোর যারা মেয়ে দেয়, তাদের মত মেয়ের শত্রু আর এ পৃথিবীতে কেউ নেই। তোদের ভাই বেশ, কোন জ্বালা ঝঞ্ঝাট্ পোহাতে হয় না।"

"হিংসে হচ্চে না কি ? বড্ড পছন্দ হয় তো নিয়ে নে' না ?"

"বদ্‌লে নিস্ তো রাজী আছি।"

"যাঃ !—পোড়ারমুখীর মুখে আগুন জেলে দিতে হয়।"

"তা' না হলে আর লাভটা কি হ'লো ? ইংরেজিতে যে বলে ভাজ্‌না খোলা থেকে আগুনে পড়া—তাই হবে না কি ? কেন, দাদা কি মন্দ ?"

"তুই মর্ !"

"বেশ মজা আর কি ! আমি মরি, আর আমার সতীন এসে ঘরকন্না করুক্।"

"সতীনের হিংসেয় মর্‌বি নে ? আচ্ছা, যদি সত্যি সত্যিই মরণ আসে, তাকে ঠেকাবি কেমন করে বউ-দি ? সত্যি ভাই, তা হলে কি কর্‌বি, তাই বল্ না ?"

"তা সে তখন দেখা যাবে। তুই ভাই অমন কথাগুলো থাম্‌কা বলিস্‌নে, ছোট ! শুন্‌লে যেন প্রাণ উড়ে যায়। কথায় বলে 'স্বোয়ামী যমকে দেয়ওা যায়, তবু সতীনকে দেওয়া যায় না।'—সে আমি ভাই, দিতে পার্‌বো না,—ভূত হয়েও আগ্‌লে বেড়াব।"

ঊষা ঈষৎ শিহরিয়া ভ্রাতৃজায়ার ঈর্ষা-বিকৃত মুখের দিকে চাহিল।—"মা গো ! এমন কথা তোর মুখ থেকে বেরুলো কি করে ? সত্যি কি সতীনের উপর অতই হিংসে হয় ?"

ব্রজরাণী সখীর তিরস্কারে লজ্জিত না হইয়া, সহাস্যমুখে স্কুলপাঠ্য কবিতা-পুস্তকের বাল্যপঠিত কবিতাংশ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।—

"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

উষা একটী ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, শুধু ছোট করিয়া বলিল, "কে জানে ভাই?"

ব্রজও একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, সে নিঃশ্বাসটা ননদী অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও তপ্ত। এবার না হাসিয়াই বলিল, "জান্‌বিনি কেন, জানে সব্বাই।—আচ্ছা; মনে করে দেখ দেখি,—ছোট্‌ঠাকুরজামাই আর এক জনকে নিয়ে হাস্‌ছে, কথা কইছে,—তোর ঘরের খাটের বিছানায় দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে,—ঠাকুরজামাই তাকে মধ্যে মধ্যে আদর করছে,—তোর—"

"যাঃ—" বলিয়া অপ্রিয়বাদিনীর পৃষ্ঠে উষা একটী ছোটখাট কিল বসাইয়া দিল।

"কেন গো! মারো কেন? ছবিখানা কেমন লাগ্‌ল? বড্ড সুন্দর না?"

উষা লজ্জা-কুণ্ঠিত সরল হাস্যে স্বীকার করিয়া লইল যে, ভাল লাগে নাই। তার পর ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া, কিছু বিস্ময়ের সহিত কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা, একটা আমার বড় আশ্চর্য্য লাগে,—আমরা একটী সতীন লইতে পারিনে; আর সেকালের মেয়েরা অত অত সতীন সইতেন কি করে? শুনেছি, তখন কুলীন ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরে,—বিশেষ ব্রাহ্মণের তো একশো, একশো আট পর্য্যন্ত বিয়ে হতো। তা আমাদের মায়েরই তো তিনজন শাশুড়ী ছিলেন।"

ব্রজরাণী বলিল, "কি আর সইতো? যাঁদের অতগুলি করে বিয়ে, তাদের তো ওটা বিয়ের হিসেবে ছিল না,—ব্যবসার সামিল ছিল। বউকে তো আর ঘরে আন্‌তো না,—তা ঘরই বা তাদের কোথায়? মামার ঘরেই ত মানুষ। বছরে দু'একবার পাওনা আদায় উপলক্ষে প্রত্যেক শ্বশুরবাড়ী পায়ের ধূলোর সঙ্গে স্ত্রী বেচারিকে কৃতার্থ করে আস্‌তেন। এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান,—কে কার হিংসে করে। সবার সঙ্গে হয় ত চাক্ষুষ পর্য্যন্ত কখনও হয়ে ওঠে না।"

"যারা দু'তিনজনে ঘরকন্না কর্‌তো, তেমনও তো ছিল,—সবাই ত আর 'একশতী' নয়। এই যেমন আমাদের ঠাকুরমায়েরা। তখনকার মেয়েদের সহ্য-শক্তি ভাই, বেশি ছিল।"

"তা, তাঁরাই যে খুব গলাগলি ক'রে বসে থাক্‌তেন, তারই বা প্রমাণ কি? তারাই তো ওই 'বগী বিন্দীর' আদর্শ।"

এ যুক্তি খণ্ডনের কোন বিরুদ্ধ নজীর জানা না থাকায়, ঊষা অগত্যা হারি মানিয়া চুপ করিল। কিন্তু ব্রজকে সতীনে পাইয়া রাখিয়াছে,—সে এমন মুখপ্রিয় আলোচনা এত অকস্মাৎ ত্যাগ করিতে পারে না। সপত্নীর কথায় সে যেন মাতিয়া উঠে। সামান্যক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, যেন বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়াই, সে নিজের সপত্নীদ্বেষের অনুপায়তা প্রদর্শন করিবার জন্যই বলিল, "আবহমান কাল থেকে খুঁজে দেখ, সতীন সইতে কেউ কোনদিন পারে নি। দ্রৌপদী,—যার পাঁচ পাঁচটা স্বামী, সে মেয়েও—অর্জ্জুন যখন ভদ্রাকে বিয়ে করে আন্‌লেন,—তখন বউ তুল্‌তে বরণডালা সাজাতে বসেননি। একটী দিনের জন্য দেখা হয়েছে কি, অম্‌নি হিড়িম্বার সঙ্গে ঝুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছেন। এমন কি, দুজনে চুলোচুলি হ'তে হ'তে কটকটে ছেলেগুলোর মাথা পর্য্যন্ত খেয়ে বস্‌লেন। তার পর সুনীতি সুরুচি, দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা, কতই বল্‌বো, পুঁথি বেড়ে যায়।"

ঊষা কহিল, "তা পুরাণে ও সব অনেক আছে। কৈকেয়ী সতীনটিও কারুর চেয়ে কম নন্। কিন্তু ভাই বঙ্কিমবাবুর বইতে—"

"তাই বা কি? সূর্য্যমুখী কি সতীনকে বড়ই ভালবেসেছিল? সতীনের ভয়েই তো ভদ্রলোকের মেয়ে দেশত্যাগী হ'লো!"

"কিন্তু সাগর-বৌ, নন্দা?"

"নন্দাও সতীনের প্রেমে মগ্ন হয়ে কিছুই করে নি। তবে কর্ত্তব্য বোধটা তার একটু বেশী মাত্রায় থাকায়, তারই তাড়া খেয়ে যা কিছু করেছিল। ঐ যে তারই মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন, 'সতীন মরিলেই ভাল;

কিন্তু—' ঐ কিন্তুটিতেই সে বেচারাকে সতীনকাঁটা গলা থেকে নামাতে ছায়নি।"

"ধরে নিলুম। কিন্তু সাগর-বৌ? সে যে নিজে জোগাড় করে নিজের ঘরে সতীনকে স্বামীর কোলে তুলে দিলে। তবু কতটুকু মেয়ে সে তখন? সাগর কত ভাল ভাই!"

"সংসারে ক'জন সাগর হতে পারে? ওঁর অতগুলি নায়িকার মধ্যেও তো ঐ একটী সাগর। অমনটি আর কই?"

"তা হলে তুই বুঝি সেই কালপেঁচা নয়নতারাটা?"

ব্রজরাণী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—"যাঃ! তা বই কি! কেন আমি কি তেম্‌নি কালো, না আমার তেমনি দাঁত উঁচু?"

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুত্রীতিজাতা মহতাহ চিন্তা কস্মৈ প্রদেয়েতি মহান্ বিতর্ক
ততঃ সুখং প্রাপ্স্যতি বা ন বেতি কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্।—পঞ্চতন্ত্রম্।

বিবাহের পর একটী বৎসর কাল মনোরমা পতিগৃহে স্থান লাভ করিয়াছিল। এক বৎসর সময় খুব দীর্ঘ নয়;—তিনশত পঁয়ষট্টি দিন মাত্র; কিন্তু মনোরমার নিকট সেই একটী বৎসর—কাল সমুদ্রের সেই এতটুকু একটা বিন্দু,—ঘটনা-বৈচিত্র্যময়ত্বে একটী পূর্ণ যুগেরই ন্যায় সুদীর্ঘ। সেই ক্ষুদ্র বৎসরটি তাহার স্মৃতির ভাণ্ডারে যে সব অমূল্য রত্ন সম্পদ প্রদান করিয়াছে, সে সকলের দীপ্তি এখনও তো ম্লান হয়ই নাই, কখনও যে হইবে এমনও মনে হয় না। সেই এক বৎসরের অসংখ্য ছোট বড় সুখের আলোয় এতটা কাল ধরিয়াই এই অভাগী মেয়েটার বুকের মধ্যটা অন্ধকারের কালো

কালিতে ভরিয়া উঠে নাই; বরং আজও আঁধার আকাশের গায়ে গায়ে ছিটানো নক্ষত্রবিন্দুগুলির মত ফুটিয়া ফুটিয়া আলো হইয়া আছে। মনোরমা সব ছাড়িতে পারে; কেবল সেই সুধাসিক্ত বৎসরটির স্মৃতিটুকুকে সে ইহজীবনের সার করিয়া তো রাখিবেই, যদি সম্ভব হয়, তবে হয় ত পরকালেও ইহাকেই মাথায় করিয়া লইয়া যাইবে। শাশুড়ী সোণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, ননন্দার সৌখ্য উপমার স্থল হইয়াছিল;—আর স্বামি-প্রেম?—তা বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণীরও ভাগ্যে ঠিক্ অমনটি ঘটিয়াছে কি না, এ বিষয়ে এই মুগ্ধা নারীটির মধ্যে আজও বিষম দ্বন্দ্ব রহিয়া গিয়াছে। অরবিন্দ নিজে দেখিয়া, বড় সাধ করিয়া বধূ ঘরে আনিয়াছিল। বধূর অঙ্গে তাঁহার ঘরের অনুপযুক্ত অল্প স্বল্প সোণারূপা দর্শনে মাতা ক্ষুব্ধা; বধূর সঙ্গে একখানি মাত্র কোম্পানি-কাগজের উপযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা গৃহপ্রবিষ্ট হওয়ায়, পিতা রুষ্ট; বধূর পিত্রালয় হইতে মিষ্টান্নাদির অপ্রচুরতায় আত্মীয়া কুটুম্বিনী, দাসদাসী, প্রতিবেশী সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া যাহার যেমন ইচ্ছা নববধূর পিতৃবংশে ইচ্ছা-সুখে কালির আঁচড় কাটিতে দ্বিধা করে নাই। কেবল একা অরবিন্দের চিত্তের কোন অংশেই অপ্রসন্নতার কোনও ছায়াপাত পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। সে চারি পার্শ্বের বিপ্লব বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কিশোরী বধূটির সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া ফেলিবার জন্য একান্ত উৎসাহের সহিত লাগিয়া গেল। হিন্দুর ঘর হিসাবে বধূ নিতান্ত বালিকা নয়। দরিদ্র পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করায় প্রথমাবধিই মনে মনে স্বামীর প্রতি সে কৃতজ্ঞা। তাহার উপর চিরসঙ্গিনী শরৎশশীর সহায়তা। দেখিতে দেখিতে বরবধূ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। গ্রীষ্মাবকাশ, একজামিনের পড়া বলিয়া ছেলে বউএর স্বতন্ত্র থাকিবার ব্যবস্থা কর্ত্তা স্বয়ং করিয়া দিয়াছেন। অরবিন্দ শুষ্ক-মুখে শরতের কাছে কাছে ঘুর্ ঘুর্ করিয়া বেড়ায়, পান সুপারির প্রয়োজনে ঘন ঘন বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করে, রাত্রে আহারাদির পর শরতের ঘরের বিছানায়

গিয়া বালিস জড়াইয়া শুইয়া পড়ে,—উহারা আসিলে বলে, "আজ আমার ভারি মাথা ধরেছে, তোরা ও-ঘরে শুতে যা।" শরৎ বধূর উপর মাথা-ধরার চিকিৎসাভার চাপাইয়া দিয়া, মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে সরিয়া যায়। ভোরের বেলা কোন দিন সেই আসিয়া ডাকিয়া দেয়, কোন দিন বধূ বা অরবিন্দ জাগিয়া উঠিয়া তাহার সহিত ঘর বদল করে। তা এমন প্রায় প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। বিশেষ, এই রকম ঔষধের ব্যবস্থায় রোগ কি কখনও সারিতে চাহে? বরং দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, এমন কি, সুযোগ বুঝিলে—অকস্মাৎ যখন তখন দিবা দ্বিপ্রহরেও, ইহার আক্রমণ ঘটিতে লাগিল। পিতা কোর্টে চলিয়া যান, উমা স্কুলে যায়, মাতা দিবানিদ্রায় একটা ঘরে কোথায় সুপ্ত থাকেন; আর জানিতে পারিলেও তিনি কখন এসব দিকে চোখ দেন না,—বরং স্নেহের কৌতুকে মনে মনে একটুখানি হাসিয়া নিজেদের এই বয়সের কথাগুলি স্মরণ করেন। এমন দিন সকলেরই তো এক সময় আসে,—শুধুই যে ইহাদেরই আজ আসিয়াছে, তাও তো নয়।—এই বলিয়া অপরাধীদের ক্ষমা করিয়া যান। এমন করিয়া যে দিন কাটিতেছিল, সেই স্বপ্নালসভরা সুখের দিন অকস্মাৎ কি নির্ম্মম বেদনার আঘাতেই দুঃখের কালরাত্রিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল!—

দীননাথ মিত্রের প্রতিশ্রুত অলঙ্কারের মধ্যে ভরি পনের সোল সোণা তখন পর্য্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় বসুর গৃহে পৌছিয়া উঠিতে পারে নাই। বিবাহের সময় বড়লোকের সহিত কুটুম্বিতার আনন্দে মিত্রজা খাট বিছানা, চেয়ার টেবিল, রূপার দান এবং বিবাহ-রাত্রির খাওয়া দাওয়ায় অবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়া, স্বর্ণকারটীকে এক পয়সা দিতে না পারায়, দু'তিন-খানি গহনা আদায় করিতে পারেন নাই। বিবাহ-সভায় সমস্ত দেনা পাওনা বুঝাইয়া দেওয়া হইল। বসুমহাশয় মানী লোক, তিনি এ সকল ছোট বিষয়ের মধ্যে থাকেন না। বাড়ীর প্রাচীন সরকার বিধুভূষণ নগদ টাকা গণিয়া, এবং বধূর অঙ্গের অলঙ্কার ফর্দ্দ সহিত মিলাইয়া লইতে গিয়া

দেখিল, কাণ রতনচুর এবং খোঁপায় দিবার সোণার আটটি প্রজাপতির অভাব ঘটিতেছে। কন্যাকর্ত্তা মিনতি করিয়া জানাইলেন, উহা সেক্‌রায় এখনও দিতে পারে নাই, ফুলশয্যার তত্ত্বের সঙ্গে নিশ্চিত ঐ কয়টি বস্তু পৌঁছাইয়া দিব। সে সময়ে বরকর্ত্তা তাঁহার দু-চারিটি বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত আলাপ করিতেছিলেন। বন্ধু কয়টির মধ্যে একজন বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ছিলেন; 'বরপণ' সম্বন্ধে তাঁহার মতটা বেশ কড়া রকম। বিধুভূষণের খবরটা কাণে পৌঁছিতেই, তিনি কিছু গরম হইয়া বসুজের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "সে কি হে! এই না শুন্‌লাম, তুমি বিনা পণে ছেলের বিয়ে দিচ্চো?"

মৃত্যুঞ্জয় ভাবী বৈবাহিক এবং বিধুভূষণের উপর মনে মনে মর্ম্মান্তিক চটিয়া, প্রকাশ্যে সহাস্যেই উত্তর দিলেন, "দিই নি কি? তা' না দিলে এই বাড়ীতে কি অরুকে নিয়ে আমরা পা দিই?"

বন্ধুদের মধ্যে মর্য্যাদাশালী সব কয়টিই। বসুজ মহাশয়ের খাতিরে ভিন্ন এ বাড়ীতে ইঁহারা পা ধুইতেও আসেন না, সে ঠিক্! বাধ্য হইয়া আসিতে হওয়ায় কন্যাকর্ত্তার উপরে মন কাহারও বিশেষ ভাল ছিল না। ইঁহাদের একজন বসু মহাশয়ের বাক্য সমর্থন করিয়া আগ্রহের সহিত সায় দিয়া উঠিলেন, "সে কথা আর তোমায় কষ্ট করে বল্‌তে হবে কেন জয়? যাদের কপালের মধ্যে দুটো ক'রে চক্ষু আছে, তারাই কি এটা দেখ্‌তে পাচ্চে না? ওই ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিকের মত সোণার চাঁদ ছেলে—দশটি হাজার টাকা নগদ গুণে দিয়ে, জড়াও সুট গহনায় মেয়ের গা-ঢেকে দিলেও যে ছেলে লোকে পায় না, সেই ছেলের কি না ঐ একটা হাজার টাকাকে গণপণ বল্‌তে হবে? বলি, আজকালের কাণা খোঁড়া ছোঁড়াগুলোও তো এর চেয়ে বেশী আনে হে।"

অপর একটী ভদ্রলোক—ইঁহার একটী দৌহিত্রীর সহিত এক সময় অরবিন্দের বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়; মৃত্যুঞ্জয় বসুর ফর্দ্দ মিলাইয়া আর

সমস্তই দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কেবল নগদ আট হাজারটাকে পাঁচ হাজার নামাইয়া দিতে অনুরোধ করায়, কোষ্ঠির কি অমিল বাহির হইয়া পড়িয়া বিবাহ সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যায়। ইনি এই সুযোগে সেই কথাটি একটুখানি স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিলেন,—বলিলেন, "আমরা যে এই ছাপোষা মানুষ, বেশী পারিনে,—তবু নগদে গহনায় সাত আট হাজারের কমেও তো মেয়ে সভাস্থ করতে লজ্জায় মরে যাই। তবু কি আর সকল দিক থেকে অমন পাত্রটি পেয়েচি।"

"আরে ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, এ কি আবার একটা বিয়ে! বোস্‌জা, পাশগাদায় মুক্তো ছড়ালে!"

"তা যা বলো যা কও, মনুষ্যত্ব দেখিয়েছে বটে! আজকালকার দিনে এমনটি কে' পারে বল দেখি? কায়স্থ-সমাজের পক্ষে এ একটা উদাহরণ হ'লো।"

"যথার্থ! ধন্য আপনি! দেশের দশের কাছে এ মহত্ত্বের সংবাদ পৌছান উচিত। বেঙ্গলী, হিতবাদী, বসুমতী আর সঞ্জীবনীতে এ সম্বন্ধে খবর পাঠান দরকার।"

মৃত্যুঞ্জয় শশব্যস্তে কহিয়া উঠিলেন, "আরে, রাম রাম, ও-সব করবেন না। এ তো সাধারণ একটা কর্ত্তব্য করেছি মশাই,—এতে আর 'মহত্ত্ব'টা আমার এমনই কি দেখলেন আপনারা?—"

"বলেন কি? মহত্ত্ব নেই?—দু'দশটা টাকার লোভই লোকে ছাড়তে না পেরে গরীবের ভিটে বেচে নেয়,—মনীবের টাকা ভেঙ্গে কত লোক এই কন্যাদায়ে জেল খেটেচে, অথবা অপমান এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করে মরেচে। আর আপনি, আপনার এই অগাধ টাকা,—কন্দর্পের মত সুন্দর এম-এ পাশ করা ছেলে, এই দরিদ্র-ঘরে স্বেচ্ছায় এসে বিয়ে দিচ্চেন, এর চেয়ে আর—"

এই সময় সংস্কারক বন্ধুটি আবার বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু ঐ যে গহনা-

সম্বন্ধে কি একটা কথা শুন্‌ছিলাম না? বড়লোকের কাছে দশ হাজার ছেড়ে চল্লিশ হাজার টাকা নগদ গুণে নিলেও তেমন ক্ষতি হয় না, যত এই ক্ষীণপ্রাণ গরীব গৃহস্থকে পেষণ করায় হয়।"

"গরীব গরীবের মত থাক্‌লেই পাবে, তাদের উঁচু ডালের ফল ধর্‌তে যাবার দরকার?"

"বলেন কি?—কার না সাধ যায় নিজের মেয়েটি একটু সুখে থাকে? কন্যাপুত্রের সুখাকাঙ্ক্ষী মা বাপকে কোন মতেই তো আমি অপরাধী কর্‌তে পারিনে মশায়! ধনীর মনে যদি ধনাকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল, তাঁরই দরিদ্রকে প্রথম থেকে নিবৃত্ত করা উচিত। নতুবা অভাগা লুব্ধকে আশা-স্বর্গে তুলে ক্রমে ক্রমে তার গলাটি টিপে ধরা—"

নতমুখে কন্যাকর্ত্তা গলবস্ত্রে আসিয়া কুণ্ঠিত অস্ফুট ভাবে জানাইলেন, "লগ্ন উপস্থিত, অনুমতি হইলে—"

ভাবী বৈবাহিক মহাশয় ব্যস্ত হইয়া বাধা দিলেন, "বিলক্ষণ! অনুমতিই যদি না দেবো, তাহ'লে কি আমরা তোমার এখানে বন-ভোজন কর্‌তে এসেছি হে?"

সঙ্গে সঙ্গেই বিষাক্ত তীরের মত আক্রোশে পরিপূর্ণ একটা তীক্ষ্ণদৃষ্টি—যে ব্যক্তি প্রাংশু লভ্য ফল লাভার্থ নিজের খর্ব্বতা সত্ত্বেও উদ্বাহু হইয়া উঠিয়াছে,—তাহারই প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। ইহার মধ্যে আর যে অর্থ নিহিত থাকে থাক্, প্রীতির উৎস যে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল না, সেটুকু বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহোক্ এমনি দশে-চক্রে পড়িয়া মনোরমা মেয়েটির বরণমালা তাহার নাগাল পাওয়ার অনেক ঊর্দ্ধে, বিখ্যাত ধনীপুত্র কৃতবিদ্য অরবিন্দের গলায় পৌঁছিয়াছিল।

তা পৌঁছিলে আর কি হইবে, মালা গাঁথার সূতাটার হয় ত বা তেমন জোর ছিল না; অথবা বুঝি সূতাই তাহাতে ছিল না,—বিনা সূতার মালা গলায় উঠিয়াই খসিয়া পড়িয়া গেল। লোকলজ্জায়ই বোধ করি বিরক্তিভরে

বসু মহাশয় বধূ লইয়া ঘরে ফিরিলেন; কিন্তু যাত্রাকালে এবং ইহার পর হইতে সকল সময়েই তিনি বধূ এবং তস্য দাতা পিতাকে শুনাইতে লাগিলেন যে, যে ছোট ঘর হইতে তিনি মেয়ে লইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেখানে আর তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইবেন না। ফুলশয্যার তত্ত্ব আসিলে দ্বারের বাহির হইতেই সে সকল দ্বারবান্, মেথর ও ডোমকে বাঁটিয়া দিয়া, কুটুম্বগৃহের দাসী চাকরগণকে শুধু ন ভূতো ন ভবিষ্যতি গালি বকশীয় করিয়াই বিদায় দেওয়া হইল। পাক-স্পর্শে বর্দ্ধমানের অনেক গণ্যমান্য ভদ্র ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, দীনুমিত্রের হয় নাই। কেমন করিয়া হইবে? সেই নেংটি-পরা ছোট লোকটা কি তাঁহাদের মত, মেয়ের অঙ্গ সোণা হীরায় মুড়িয়া দিতে পারিয়াছে? না ফুলশয্যার তত্ত্বে একশত জন দাসী চাকর কুটুম্ববাড়ী পাঠাইয়াছিল? তা যাই হোক্, এমন করিয়া যে গরল সেই মৃত্যুঞ্জয়ের কণ্ঠে জমিয়া রহিল, তাহা তাঁহার কোন অপকার করিতে না পারিলেও তাঁহার মুহুর্মুহুঃ উদ্গীরণে ক্ষুদ্র প্রাণ দীনুমিত্রের দল জর্জ্জরীভূত হইয়া উঠিতেছিল। পূজার তত্ত্ব অপমানিত হইয়া ফিরিয়া গেল। জামাইএর চাকর জামাইএর ধুতীচাদরটা কুটুম্ব-গৃহের দাসীদের সাক্ষাতেই বকশীষ লাভ করিল। মেয়ের সাড়িখানা শুধু মেয়ের কাছে পৌঁছিল। বাকী জিনিসপত্র গালির চোটে ফেরৎ লইয়া, ধনীগৃহে ভালরূপ পাওনার আশায় এতখানি পথ বাহিয়া আগত পাড়াপ্রতিবেশিদের এবং বাড়ীর দাসদাসীগণ বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গিয়া দুর্গাসুন্দরীর উপর মনের ঝাল মিটাইয়া ছাড়িল। সকলেই একবাক্যে শপথ করিয়া বলিল যে, তেমন ছোটলোকের বেহদ্দ ঘরে তাহারা আর এজন্মে কখন পা দিবে না। তাহারাও ঢের ঢের বড় ঘরে তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে, এমন করিয়া আর কখন অপমানিত হয় নাই। অমুক অমুক বাবুর বাড়ী দু'টাকা করিয়া নগদের উপর আবার স্বয়ং বাড়ীর কর্ত্তা নিজে হাতে পান খাইবার জন্য পাঁচ টাকা বকশীষ করিয়াছিলেন। অমুক জমিদারের গৃহিণী নিজের হাতে লুচি ভাজিয়া কাছে বসিয়া খাওয়াইয়াছিলেন,

ইত্যাদি ইত্যাদি। মনোরমার যেমন চামার শ্বশুর, গড় করি বাবা শ্বশুরের পায়ে!”

দুর্গাসুন্দরী কাঁদিয়া বলিলেন, “ওগো, ওরা মেয়েটাকে-আমার কতই না লাঞ্ছনা করচে। তুমি যেমন ক’রে হয়, আমার মেয়ে এনে দাও।”

দীননাথ ইতঃপূর্ব্বে কয়েকবার কন্যা আনিবার চেষ্টা করিয়া সফল-প্রযত্ন হইতে না পারায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পূজার পূর্ব্বে দেশে আসার খবর পাইয়া স্বয়ং হাবড়া গিয়া বেহাইএর সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিয়াছেন। গহনার দামের বাকী সাড়ে তিন শতের মধ্যে দেড় শত টাকা জমা করিয়া দিয়া মেয়েটিকে একবার বর্দ্ধমানে লইয়া যাইবার জন্য অনেক মিনতি করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। ওকালতি-কার্য্যে মক্কেলের নিকটে কষিয়া আদায় করা যাঁহার নিত্যকার্য্য, এবং সেই টাকায় তেজারতিতে সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় করায় যাঁহার একমাত্র আনন্দ, বিবাহের পর বছর ঘুরিতে যায়,—সুদ ও তস্য তস্য সুদ তো দূরের কথা,—আসলেই এখন দেড়শত টাকা বাকি রহিয়া গিয়াছে। তার পর এই এক বৎসরের বারমাসের তের পার্ব্বণের মধ্যে আঠারো আনা ফাঁকি।—মৃত্যুঞ্জয় বসুর মহাজনী কারবারে এত বড় কলঙ্ক তাহার শত্রুতেও আর কখন খুঁজিয়া পাইবে না! তথাপি বহুকষ্টে প্রচণ্ড ক্রোধোচ্ছ্বাসকে দমনে রাখিয়া অতি কষ্টে মুখে একটুখানি কঠিন হাসি টানিয়া আনিয়া, তিনি যথেষ্ট সংযত ভাবেই বেহাইকে বিদায় দিয়াছিলেন। নিজেও সেই লজ্জা-ঘৃণাপরিশূন্য ছোটলোকটাকে তাঁহার লোকজনে পরিপূর্ণ পূজাবাড়ীর বাহির হইয়া যাইতে বলেন নাই; আর মনে মনে অত্যন্ত ক্ষোভোদয় হইতে থাকিলেও, চক্‌চকে চাপ্‌রাস্-লাগান নূতন লাল নীলের পোষাকপরা দ্বারবানগুলাকে ডাকিয়াও বৈবাহিকের বিদায় অভিনন্দনের ভারার্পণ করিতেও পারেন নাই। শুধু শান্ত, উদাস স্বরে সংসার-নির্লিপ্ত ভাবেই এই জবাবটুকু তিনি দিয়াছিলেন—“কি জান বেয়াই, আমি আর ও-সবের

মধ্যে নেই। ছেলে এখন ডাগর্ হয়েছে, তার পছন্দেই বিয়ে দিয়েছি,, বউ পাঠান তার মত নয়। আর গিন্নি বলেন, ছোটঘরের মেয়ে এনেছি, মেয়েটীকে ভদ্র রীতি মোটেই শেখান হয়নি—আমাদের ঘরে সময় থাকৃতে দেখে শুনে সব শিখে নিক্। আমরা তো কবে আছি, কবে নাই। এসব ভালবকম না শিখলে কি শেষে দশের মাঝে অরুর আমার মুখ হাসাবে ?” আমাদের এই বোসেদের তো ভাই নামটা বড় কম নয়! আর ক্রিয়াকর্ম্মেরও ঘরে অন্ত নেই—তা গিন্নির তো এই মত। ছেলেও ঐ কথা বলেন, যে, রূপটাই বাহিরে থেকে দেখা যায়, শিক্ষা দীক্ষাটা তো আর বোঝা যায় না;—তা যাই হোক্, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন একটু মানুষ করে তো নিতে হবে।”

বেহাই মাথা চুল্‌কাইয়া আমতা আমতা করিয়া জবাব দিলেন, “সে তো ঠিক্ কথাই বলেছেন, তাতে আর সন্দেহ কি? তবে মেয়ের মা একটিবার,—আর তো নেই আমাদের, সেইজন্যেই—”

“ওহে তুমি কিছুই বোঝ না। বোসেদের বাড়ীর বউ কখন ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভ না করে ট্রেণে চড়েনি। পার্‌বে তেমন করে নিয়ে যেতে? আবার তেমনি করেই পৌছে দিয়েও যেতে হবে।”

দীননাথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, “তাই হবে, কবে পাঠাবেন ?”

“বলি, অনেক টাকা হয়েছে যে দেখতে পাচ্চি! তবে গরীবকে অনর্থক স্বীকৃত টাকাটার ফাঁকি দেওয়া হচ্চে কেন বল তো ? ঋণ শোধটা আগে কর্‌লেই ভাল হয় না কি ?”

হেঁটমুখে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া দীনুমিত্র অনেকক্ষণ পরে যখন বৈবাহিকের সুসজ্জিত বৈঠকখানার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কর্ম্মবাড়ীতে লোকজন ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছে; তাঁহার মত নগণ্য ব্যক্তির পানে কেহ একবার ফিরিয়াও চাহিল না। সেই-

ক্ষণে বাড়ীর মধ্য হইতে সাজিয়া গুজিয়া, চাদরে খুব দামী এসেন্স মাখিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে অরবিন্দ কোথায় বেড়াইতে বাহির হইতেছিল,—শ্বশুরকে অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই যৌবনোৎফুল্ল অসাধারণ সুন্দর মুখের দিকে চাহিতেই দীননাথের ক্ষুব্ধ চিত্ত হইতে সমুদয় ক্ষোভের জ্বালা জুড়াইয়া শীতল হইয়া আসিল। স্নেহসিক্ত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ বাবা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিয়া কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তারপর বারেক চারিদিকে চাহিয়া, ধনীপুত্র অরবিন্দ গরীব শ্বশুরের পায়ের গোড়ায় অতি সংক্ষেপে একটা প্রণাম করিয়াই, আর একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে সরিয়া পড়িল। যেন কি একটা অপরাধজনক কার্য্যই করিয়া গেল, ঠিক্ এমনই ভাবখানা প্রকাশ পাইল। দীননাথ একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া-বিদায় হইলেন। কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবার ভরসা হইল না।

এদিকে দিনের পর দিন দুর্গাসুন্দরী মেয়ে আনার জন্য কান্নাকাটি শত-গুণ বর্দ্ধিত করিয়া স্বামীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। সকল বিষয়ে বুদ্ধিমতী হইলেও, সেই একটী বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা সমস্তই যেন লোপ পাইতে বসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া কুটুম্বের ব্যবহারে ও জামাতার নিঃসম্পর্কতায় কন্যার সম্বন্ধে তাঁহার ভয় ভাবনার আর আদি অন্ত ছিল না। এই রকম কষাই যাহারা, তাহারা কি গরীবের মেয়ে বলিয়া তাহারই লাঞ্ছনা গঞ্জনার কিছু বাকী রাখিবে ? হয় ত পেট ভরিয়া তাহাকে খাইতেও দিবে না, অনেক শাশুড়ী বাপের বাড়ীর অপরাধে বধূকে শুধু মুখে গালমন্দ করিয়াই নিবৃত্তা হয় না; বউ কাঁদিলে কিংবা এতটুকু জবাব করিলে গাল টিপিয়া দেয়, গালে ঠোনা মারে, এমনি কতই 'খোয়ার' করে শুনিতে পাওয়া যায়। না জানি তাঁর মনুটার কি অবস্থা হইয়াছে ? গরীবের ঘরে জন্মিলেও দুঃখ তো কখনও তাহাকে সহিতে হয় নাই। হয় ত ভাবিয়া, কাঁদিয়া, না খাইয়া

তাঁহার সেই সোণার প্রতিমায় কালি পড়িয়া গিয়াছে। হয় ত অকস্মাৎ একদিন শুনা যাইবে, অনাদরে, অযত্নে মনোরমার কঠিন পীড়া হইয়াছে এবং তারপর হয় ত—উঃ ভগবান্! এই জন্যই কি তিনি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া বড় ঘরে মেয়ে দিয়াছিলেন? এমন কুমতি তাঁহার কেনই বা হইয়াছিল? সমাবস্থাপন্ন গরীবের ঘরের ভাল একটা পাত্র দেখিয়া মেয়ে দিলে ত আর মেয়েটি তাঁহার এমন করিয়া বড়লোকের লাথি ঝাঁটা খাইয়া মনের দুঃখে শুকাইয়া মরিয়া যাইত না।—ষাট্! ষাট্! একি করিতেছি? কি মহাপাপী মন এই অভাগী মায়েদের? মঙ্গল কামনাও এমন করিয়া কেহ করিতে জানে না, আবার অমঙ্গল-চিন্তার উদয়ও এমন আর কোথাও হয় না।

ইতঃমধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, এ পর্য্যন্ত যা কখনও ঘটে নাই।—অরবিন্দ এবার পরীক্ষায় ফেল্ করিয়া বসিল। মাতা মুখখানি ম্লান করিয়া বলিলেন, "বউমার আমার আয় পয় তো তেমন ভাল দেখিনে বাবু! সেই ইস্কুলে থেকে অরু আমার কক্‌খনো পড়ে থাকে নি।"

পিতা অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া গৃহিণীকে উল্লেখ করিয়া বধূকেই বিশেষ করিয়া শুনাইয়া বলিলেন, "দূর করে দাও হতচ্ছাড়া দীনু-মিত্তিরের ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে। ছোটলোকের ঘরের মেয়ে ঘরে আন্‌লে বড় ঘরও ছোট হয়ে যায়। ও বেটি যেদিন আমার ঘরে ঢুকেছে, সেই দিনই আমি জান্‌তে পেরেছি, যে, এ বাড়ীর আর ভদ্রস্থ নেই। সেদিন গিধোরের অমন জোরালো কেস্‌টা মাটি হয়ে গ্যাল,—না হোক্, ওটাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ত ঘরে আস্‌তোই,—আজ আবার"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ধ্যার পর ছাদের সিঁড়ির ঘরে শরতের দৌত্যে সাক্ষাৎ ঘটিলে মনোরমা স্বামীর ম্লান মুখের পানে চকিত কটাক্ষে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। অরবিন্দের নিজের মনটা জীবনের সর্ব্বপ্রথম অকৃতকার্য্যতায় প্রবল ধাক্কা খাইয়াছিল; কিন্তু মনোরমার চোখের জলে তাহার নিজের ব্যথা লজ্জা মুহূর্ত্তে সে বিস্মৃত হইয়া গেল। তখন সে সেই বিষাদ প্রতিমাখানি সযত্নে বক্ষে

টানিয়া লইয়া জলভরা চোখদুটী মুছাইবার চেষ্টা করিয়া উহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কাঁদো কেন মনো, ফেল কি কেউ হয় না? এবার না হ'লো আস্‌ছে বারে ভাল ক'রে চেষ্টা কর্‌ব; হ'য়ে যাবে কি না।"

মনোরমার কান্না ইহাতে বাধা মানিল না; বরং গ্রন্থি-ছিন্ন মুক্তা-মালার ন্যায় শুভ্র ও স্থূল অশ্রুবিন্দু তাহার পরিপুষ্ট উজ্জ্বল দুটি গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেই থাকিল। রোদনে ফুলিতে ফুলিতে ভগ্নকণ্ঠে সে বলিল, "আমার জন্যেই এই হ'লো।"

"তোমার জন্যে?"

অতি কষ্টে ঘাড় নাড়িয়া সে জানাইল যে, হ্যাঁ, তাহার জন্যই বটে। তখন অরবিন্দ ঘোর বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "বটে! তা তো জান্‌তাম না। তা, তুমিই কি তা'হলে এবারকার ওই ছাই ছাই 'কশ্চেন'গুলো 'সেট্' করেছিলে নাকি? না, পেপার একজামিন কর্‌বার সময় আমার মাথা খেয়ে অমন বিষম ভুল করে ফেলেছ? অথবা আমার স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতীরূপে ভর করে আমায় দিয়ে ভুল 'আন্‌সার' করিয়েছ? কি করেছ, সেইটেই ভেঙ্গে বল দেখি?"

কান্নার মধ্যে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া, স্বামীর বুকের মধ্যে সেই হাসিমাখা লজ্জিত মুখ লুকাইয়া ফেলিয়া, অস্ফুটে মনো কহিল, "যাও! তা কেন? আমি যে অপয়া।—যদি তুমি আমায় বিয়ে না কর্‌তে—"

"তা'হলে আর কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যে আমার এই লক্ষ্মীটি লাভ হতো,—নারে মনু! যে আমার মত ফেল করে মরেনি?"

হাসি এবং কান্না এ দুইই বিস্মৃত হইয়া গিয়া ঘোর লজ্জায় আকর্ণ ললাট আরক্ত করিয়া তুলিয়া অরবিন্দের সেই বিপন্না বধূটি তাহারই কোলের মধ্যে অসহায়ভাবে নিজেকে লুটাইয়া দিয়া, দুই হাতে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। লজ্জার তাড়নায় সবেগে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল,—"ছি, ছি ছি! কি যে তুমি যা তা সব কথা বলো!"

অরু দুষ্টামির হাসি হাসিতে হাসিতে সেই সরম-রাগ-সুন্দর প্রিয় মুখখানি দু'হাতে তুলিয়া ধরিয়া, গভীর দৃষ্টিতে সেই মুখে চাহিয়া, লজ্জিতাকে অধিকতর লজ্জা দিয়া কহিল, "তুই-ই তো বল্লি রে, যে আমি যদি তোকে বিয়ে না কর্‌তুম, তাহ'লে কি যে সব ভাল ভাল ব্যাপার ঘট্‌তো! তা আমি বিয়ে না কর্‌লেও তো আর তুই চিরদিনই আইবুড় হ'য়ে বসে থাক্‌তিস্ না। আর একজনের সঙ্গে বিয়ে তো হোতই।"

এমন অন্যায় কথা শুনিলে কাহারই বা সহ্য হয়? স্বামীর হস্তের ধৃত মুখখানা ছিনাইয়া লইয়া, সবেগে উঠিয়া বসিয়া হাঁফাইতে হাফাইতে মনু উত্তর করিল, "তা কি কক্ষন হ'তে পারে? সে বুঝি আবার হয়? তোমার যা বিদ্যে!"

"ঐ জন্যই তো আমায় ফেল করে দিয়েছে। বিদ্যে থাকলে কেউ কি কখন ফেল হয়? আচ্ছা মুনিয়া! কি হ'তে পারে না রে? আমি তোকে দেখতে গিয়ে লুটে না নিলে, এজন্মে তোর বর জুটতো না? এ সুবিস্তৃত বঙ্গদেশে আমি ছাড়া এ জহর চেনবার মত জহুরী আর কি একটাও ছিল না?—হ্যাঁ রে মনুয়া?"

স্বামীর আদরে গলিয়া পড়িয়া ক্ষুদ্র পাখীর সহিত উপমিতা সেই আদরিণীটী হাসিতে হাসিতে তখন কত কথাই কহিয়া গেল। অরবিন্দ ভিন্ন তাহার যে অপর কাহারও সহিত বিবাহ হওয়া সম্ভবই ছিল না। সেই সব দার্শনিক মহাতত্ত্ব সে অনেক যত্নে বিশ্লেষণ করিয়া একালের অর্দ্ধ-নাস্তিক, পাশ্চাত্য-বিদ্যায় সুপণ্ডিত স্বামীকে বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা করিল। স্বামীটী অবশ্য সে সব জন্মজন্মান্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট নিগূঢ় তত্ত্ব বিশ্বাস করিলেন কি না, তাহা তাঁহার কৌতুক-হাস্যমণ্ডিত আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি হইতে ঠিক্ আন্দাজ করিয়া উঠা যায় না। তবে ইঁহারা গুরু-বেদবাক্যে সুস্পষ্ট অশ্রদ্ধা দেখাইতে কুণ্ঠাবোধ না করিলেও, রূপসী এবং তরুণীদের মুখের বাণী সশ্রদ্ধচিত্তে মাথায় করিয়া লইয়া থাকেন, এটা জানা কথা।

অন্ততঃপক্ষে মনে মনে অবিশ্বাস জাগিলেও সে অপ্রিয় সত্য প্রকাশে প্রিয়-চিত্তে বেদনা দানে ব্যথিত হন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শুচিরশুচিঃ পটুরপটু শূরোভীরুশ্চিরায়ুরল্পায়ু,
কুলজঃ কুলেন হীনো ভবতি নরো নরপতেঃ ক্রোধাৎ।—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা।

মৃত্যুঞ্জয়ের এক সহপাঠী পাঞ্জাবে ওকালতী করিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জনান্তর ভবানীপুরের ভদ্রাসনে ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে করিয়া আনিলেন একটী বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা। তিনি আসিয়াই যৌবনবন্ধু মৃত্যুঞ্জয়কে পত্র লিখিলেন যে, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যা ব্রজরাণীর বিবাহ দিয়া এইবার তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করা হোক্। বিবাহের সমস্তই প্রস্তুত; কেবল কন্যা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দিন স্থির করাই যা বাকী। মেয়েকে তিনি পঁচিশ হাজার টাকা নগদ এবং হাজার দশেকের গহনা দিবেন, তা ভিন্ন আর যা কিছু। চিঠি পড়িয়া মায়ের বুক ঠেলিয়া একটা নিশ্বাস পড়িল; বলিলেন, "বরাতে নেই, কে দেবে?" পিতা উগ্রমূর্ত্তিতে প্রতারক ছোটলোক দীনু মিত্রের চতুর্দ্দশ পুরুষের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, শেষে যোগ করিলেন,—

"যেমন কাল পড়েছে। বেহায়া ছেলেগুলো একটা নোলকপরা মুখ দেখলেই তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়বে। দুটো দিন তো আর সবুর সয় না। আমি বরাবরই জানি, যে, মোক্ষদা দত্ত আমার দোরে আস্‌বেই আস্‌বে, সেইজন্যই না যেখানকার যত সম্বন্ধ সব ছেড়ে দিচ্ছিলুম। ছেলে আমার মনে করলেন, বাবা বুঝি আর বিয়ে দেবেই না, নিয়ে এলেন দুম্

করে এক ডোমের চুবড়ি ধুয়ে ঘরে! এখন কেমন হ'লো? এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ্ হাজার হাত ছাড়া হ'য়ে গেল কি না?"

কর্ত্তার রাগের সময় কথা কহিবার ভরসা কেহই রাখেন না; গৃহিণী তথাপি অনুচ্চকণ্ঠে ধীরে ধীরে যে যুক্তি দ্বারা আত্মসান্ত্বনা সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই যুক্তিটাকেই স্বামীর ক্রোধ-নিবৃত্তির জন্য প্রয়োগ করিতে চাহিলেন; কহিলেন,—"তা বউমাটি আমার রূপে গুণে লক্ষ্মী! এমন হাজারে একটী মেলে কি না সন্দেহ।"

"ওঃ! পরীর বাচ্ছা আর কি! রেখে দাও রূপ গুণ! বাপ যার অন্ত ভক্ষ ধনুর্গুণ—তার মেয়ের আবার রূপ গুণ কিসের? মোক্ষদা-দত্তর কত বড় নাম! দশের কাছে বল্‌তে কতটা মুখ উজ্জ্বল হ'তো। বল কি তুমি, এ কি কম আপ্‌শোষ!"

মনে মনে নিজের গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে প্রকাশ্যে দীনু মিত্র প্রভৃতির পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিতে করিতে গৃহস্বামী গৃহের বাহির হইলেন। সেদিন্ হইতে মনোরমার প্রতি বিদ্বেষের মাত্রাটা শতগুণেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অরবিন্দও উঠিতে বসিতে ভৎর্সিত হইলেন।

এমনি দুঃসময়ে কঠিন রোগে শয্যাশায়িনী দুর্গাসুন্দরীর অজস্র অশ্রুজলে বিগলিতচিত্ত দীনু মিত্র অনেক দুঃখে সংগৃহীত অলঙ্কারের দুই শত মুদ্রা এবং ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভের হিসাব মত টাকাগুলি বৈবাহিকের দরবারে পৌঁছাইয়া দিয়া ভিখারীর মত একটী পাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া পড়িলেন, মুখ ফুটিয়া কথা বলিবার ভরসাটুকুও হইল না। এই চেষ্টাই যে শেষ চেষ্টা, সে সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে কোনই সংশয় ছিল না। পাছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও প্রার্থনা নামঞ্জুর হইয়া যায়, সেই ভয়ে গলা দিয়া স্বর ফুটিতেছিল না। স্ত্রী যে মৃত্যুশয্যায় শুইয়া উৎকণ্ঠাদিগ্ধ ব্যাকুলতায় দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে, নিরাশার আঘাতে হয় ত সেই নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপটুকু মুহূর্ত্তে নিবিয়া যাইবে। সে যে তাহার একমাত্র জীবিত সন্তানকে মরণ-

কালে একবার শেষ দেখা দেখিতে চাহিয়াছে,—আর বুঝি বা শুধু সেই আশাটুকু অবলম্বন করিয়াই এখনও বাঁচিয়াও আছে। দীননাথের বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল।—চেষ্টা যদি সফল না হয়!

একটী দুইটি করিয়া পাঁচ সাতটি মক্কেল-মহাখাতকের আগমন ঘটিল; কাগজ পত্র দেখাইল, অগ্রিম দর্শনী দান করিল। বসু মহাশয় কাহারও প্রদত্ত দক্ষিণা হাত পাতিয়া লইলেন, কাহারও বা পা দিয়া ছড়াইয়া ফেলিলেন। আবার তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দেব-তুষ্টি সম্পাদিত হইল। কাগজপত্রে কোথাও একবার কটাক্ষক্ষেপ হইল, কেহ বা সময়ান্তরে আসিবার হুকুম লইয়া ফিরিয়া গেল,—সহস্র কাকুতি মিনতিতেও দৈব-প্রসন্নতা লাভ ভাগ্যে ঘটিল না। মৃত্যুঞ্জয় বসুর মস্ত নাম,—অপ্রতিহত প্রভাব। লাথি খাইয়াও বন্যার বেগে টাকা ঘরে আইসে,—গালি খাইয়াও মক্কেলের শ্রদ্ধা শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দরিদ্র দীননাথ বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া এই সব দেখিতেছিলেন; আর ভাবিতেছিলেন, শত শত মিষ্টভাষী শিষ্ট শান্ত নূতন পুরাতন নিরীহ উকিলের কথা।

মক্কেলগণকে বিদায় দিয়া গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত বসুজের পায়ের কাছে নোটের গোছাগুলা রাখিয়া দিয়া, সশঙ্ক সন্দেহে অস্ফুট স্বরে দীনু মিত্র কহিলেন, "আমি এই টাকাটা দিতে এসেছিলাম,—আর অমনি একটী-বারের জন্য—"

"টাকা তো ইন্‌সিওরড্ হয়েই আস্‌তে পার্‌তো, অনর্থক আবার এতদূর আসা কেন?"

দুঃখিত নম্রকণ্ঠে দীননাথ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, আপনার বেয়ান ঠাক্‌রুণের জীবনের আশা বড়ই কম,—ডাক্তার কবিরাজে একরকম জবাবই দিয়েছে। তাঁর বড় সাধ—একটীবার মেয়েটার মুখটি দেখে যান্। যদি অনুগ্রহ করে একটী হপ্তার জন্যেও একবারটী পাঠিয়ে দেন, তা'হ'লে তাঁর শেষ-মুহূর্ত্তটা হয় ত এতটুকু সুখের হয়।"

দরিদ্র বৈবাহিকের অশ্রুবাষ্প-রোধে বিজড়িত বিনীত ভিক্ষা মৃত্যুঞ্জয়ের সংসারাভিজ্ঞ চিত্ত বিন্দুমাত্র টলাইতে সমর্থ হয় নাই, তাহা তাঁহার ওষ্ঠাধরের অবজ্ঞেয় কঠিন হাস্যরেখাটুকুতেই প্রকাশ পাইল। তিনি মৃদু মৃদু হাসির সহিত মাথা দুলাইতে দুলাইতে উত্তর দিলেন, "তা এ' একটা বড় মন্দ চাল চালনি বেয়াই! তা মতলবটা করেছিলে অবশ্য ভালই। তবে কি না,— কি জান, এসব চাল একদম পুরণো হয়ে গেছে। এ'তে আর এই জোচ্চোর ঘেঁটে চুল-পাকানো মৃত্যুন্ বোসের চোখে ধূলো দেওয়া যায় না। স্বচক্ষেই ত দেখলে—সকাল থেকে অমন কত শালার বেটা শালা এসে ঐ জোচ্চুরি ঢাকবার মতলবেই না এই দুই পায়ের উপর জলের মতন টাকা ঢেলে দিচ্চে! ওসব এখানে চল্‌বে না; ভাই,—ওসব ফন্দি খাট্‌বে না।"

দীননাথের গৌর মুখ অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া তিনি রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে কেবলমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন— "জোচ্চুরি করা কখনও ত অভ্যাস ছিল না; দাদা!"

"সত্যি? আমি ত দেখছি, এ অভ্যাসটি তোমাদের চৌদ্দপুরুষে পাকাপোক্ত! এই যে ছলেকলে ছেলেটাকে—প্রতিবেশী বন্ধু লাগিয়ে, একটা ধেড়ে ধিঙ্গী মেয়ে দেখিয়ে, নিজেদের খপ্পরে ফেলে হাত করলে,— এটা কি জোচ্চোর বাটপাড়ের চেয়ে কোন অংশে কম? এই যে সিকি-পয়সার গয়নার দাম আদায় হয়ে আস্‌তে পূরো একটা বচ্ছর কাল কেটে যায়, এটাই বা কোন্ দেশী সাধুতা? তা'পর দূর্ দূর্ করে বিদায় করে দিলেও ফের এই যে ঘুরে ফিরে জ্যান্ত মানুষকে মরিয়ে দিয়ে, মেয়ে নিতে এসেছ; এর চেয়ে হারামজাদ্‌কি আর কিছু সংসারে আছে কি? তুমি জোচ্চোর নও? তোমার চোদ্দপুরুষ জোচ্চোর।"

দীননাথ বসিয়া ছিলেন, বিবর্ণ-মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"আমি আপনার ঘরে মেয়ে দিয়ে যে মহাপাতক করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমায় আপনি ছোটলোক, জোচ্চোর, বাটপাড়—সবই বল্‌তে পারেন;

যেহেতু, আমি যখন দরিদ্র, আমি যখন মেয়ে জামাইকে সোণায় মুড়তে পারিনে, আপনার প্রকাণ্ড দর-দালান তত্ত্বের আস্‌বাবে ভরিয়ে দেওয়া যখন আমার সাধ্য নয়,—তখন জোচ্চোর বাট্‌পাড় ছোটলোক ছাড়া আমি কি? কিন্তু আমার বাপ পিতামহ—হরনাথ মিত্র, সুরনাথ মিত্র নিতান্তই ছোট-লোক ছিলেন না, তাঁদের নাম কীর্ত্তি এখনও দেশ হতে একেবারে লোপ পায় নি। তাঁদের আপনি অপমান করবেন না,—তাঁরা মহাপুরুষ ছিলেন।"

"তাই নাকি? মহাপুরুষের ঔরসে মহাপাতকীর—বিশ্বাসঘাতক জোচ্চোর, বজ্জাতের জন্ম হয়—এটা একটু আশ্চর্য্য কথা না?—তবে কি ভাই, আমাদের মাঠাক্‌রুণেরই কি কোন রকম—"

দীননাথের শান্ত দুটি চোখ হইতে দগ্ধকারী অগ্নিকণা ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে চাহিল; এবং কম্পিত ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া লজ্জা ঘৃণা অপমান মিশ্রিত তীব্র ক্রোধ জ্বালার সহিত অতি তীব্রস্বরে রাজতুল্য বৈবাহিকের সমস্ত উচ্চ সম্মান দূরে ঠেলিয়া বাহির হইল—"মুখ সাম্‌লে কথা কইবেন!"

মুখের উপর এতখানি অবমানিত হইয়াও উদার-চিত্ত বৈবাহিক মহাশয় এতটুকুও বিচলিত হইলেন না। যেমন ছিলেন তেমনি স্থির থাকিয়া, ঠিক্ তেমনি একটুখানি ঠোঁট-টেপা বাঁকা হাসির সহিত দীননাথের অরুণবর্ণ মুখের দিকে সোজা চাহিয়া কহিলেন, "বলি, আপনি যাবে? না, দরোয়ান-দের ডাক্‌তে হবে?"

দীননাথ অর্দ্ধমুহূর্ত্তকাল নিরুত্তর থাকিয়াই, ক্ষণপরে ক্রোধ-সংহত সহজ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না,—আমি আপনিই যাচ্চি। মনোর গর্ভধারিণী পথ চেয়ে আছেন, তাকে তা' হ'লে বল্‌বো—তাঁর কন্যা এইখানেই মাতৃকৃত্য সমাধা করবেন। তাঁর—"

অত্যন্ত আশ্চর্য্যসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া মিত্র-কন্যার শ্বশুর মহাশয় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যস্তভাবে বাধা দিলেন, "বলো কি তুমি? তোমার মেয়ের এই বাড়ীতে আর এক তিলার্দ্ধও স্থান আছে? গাড়ী ডেকে আনো—না হয়,

প্রবৃত্তি হয়, হাঁটিয়েও তাকে নিয়ে গেলে যেতে পারো। ও মেয়ে এখন আর আমার কেউ নয়—স্রেফ্ তোমার মেয়ে। ওরে, এই চতুরিয়া—"

দীননাথের পায়ের তলায় সমস্ত মাটীটা পদতল হইতে সরিয়া চলিয়া গিয়া সেইখানে প্রকাণ্ড একটা খাদ বাহির হইয়া পড়িল। এই খাদটার শেষ দেখা যায় না,—বোধ করি ইহার তল একেবারে সেই রসাতলেরই সমতলে। তিনি উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া বৈবাহিকের দুই পা জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিলেন, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মেয়ের আমার অপরাধ কি? এ জন্মে সে আর তার বাপের বাড়ীর নাম পর্য্যন্ত কোন দিন শুন্‌তে পাবে না;—এই আমি জন্মের মত বিদায় নিয়ে চলে যাচ্চি—"

বলিতে বলিতে সত্যই উঠিয়া তিনি ঘরের বাহির হইতে গেলেন, কিন্তু গমনে বাধা পড়িল। পশ্চাৎ হইতে গৃহস্বামীর গম্ভীর অটল স্বর তাঁহার দুই জ্বলন্ত কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে গতিশক্তিহীন করিয়া দিল। নতুবা এসব কাহিনী এ বাড়ীতে প্রচার হইবার পূর্ব্বেই, ছুটিয়া গিয়া ষ্টেশনে পৌছিয়া, যে দিক্‌কার হোক্, যে কোন একটা ট্রেণে চাপিয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। লজ্জা, অপমান সমস্ত বিস্মৃত করিয়া দিয়া প্রবল একটা আতঙ্কমাত্র এক্ষণে তাঁহার অপরাধী পিতৃ-হৃদয়কে অগ্নিদগ্ধ মুদ্গরাঘাত করিতে করিতে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছিল,—"ওরে মূর্খ! ওরে পাপিষ্ঠ! এই করিতেই কি তুই আসিয়াছিলি? নির্ব্বোধ নারীর অশ্রুজলে গলিয়া মেয়েটার কি সর্ব্বনাশই না করিতে বসিয়াছিস্!—কেমন করিয়া নিজের এই মহা অপরাধের বোঝাসমেত নিজেকে তিনি অকস্মাৎ এইখান হইতে লুপ্ত করিয়া নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারেন, সেই একমাত্র অসাধ্য সাধনের মহা চিন্তায় যখন হতভাগ্যের সর্ব্বশরীরে বিদ্যুতের ঝঞ্ঝনা বাজিতেছিল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে পিছন হইতে ডাক আসিল,—"দীনু মিত্তির! মেয়ে নিয়ে গেলে ভাল কর্‌তে; নতুবা পরে আপ্‌শোষ্ কর্‌বে। বোসেদের

ঘরে তার স্থান তুমিই ঘুচিয়ে দিয়েছ। না নিয়ে যাও,—হয় সে পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করে খাবে, না হয়, মা ঠাকুরমায়ের কাছে যদি কোন শেখা-বিদ্যা থাকে, তাও কল্লে খেতে পারে,—আমার তাতেও কোন লজ্জা নাই। আমি ওকে ত্যাগ করেছি।"

দীননাথ সহসা দুই জানু ভাঙ্গিয়া সেইখানে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া হতাশার্ত্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে, ঊর্দ্ধমুখে শ্বাস টানিয়া উচ্চারণ করিলেন, "তাহলে ওকে আমি নিয়েই যাবো।"

এক বৎসরের পরে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তনে বালিকা বধূর চিত্তে যে অনির্ব্বচনীয় সুখের তরঙ্গ উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, এরূপ আকস্মিক স্তব্ধ গম্ভীর বিদায়ে মনোর সে রকমটা ঠিক্ হইতে পারিল না। বাহিরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার কোন সাক্ষী উপস্থিত না থাকায়, সব ঘটনাটার ইতিবৃত্ত ঠিক্ ঠিক্ অন্তঃপুরে আসিয়া পৌঁছায় নাই। চতুরিয়া চাকর শশব্যস্তে আসিয়া খবর দিল যে, বৌমার মায়ের কঠিন ব্যায়রাম; বাবা আসিয়াছেন, ১১টার ট্রেণে বৌমাকে লইয়া যাইবেন। বাবু বলিয়া দিলেন, খুব শীঘ্র তাঁকে তৈরি করে দিন,—বাপের বাড়ীর গহনা ভিন্ন আর কিছু যেন সঙ্গে না দেওয়া হয়, বলে দিলেন।

শরতের মুখ একটু ম্লান দেখাইল; তথাপি সখীর আনন্দে আনন্দিত হওয়ার চেষ্টা করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানের গহনা দিতে বারণ করেছেন কেন মা?"

মা সোজাসুজি যেমন বুঝিয়াছিলেন তেমনি বলিলেন, "রোগের বাড়ী; তা'ছাড়া একা একা মেয়ে গাড়ীতে যাবে। দামী গহনা, তাই বারণ করেছেন বোধ হয়। তা দেখ বৌমা, কাণের ইয়ারিংটে দু'চারটে ভাল ভাল আংটি, মুক্তোর শেলি, কণ্ঠি,—আর তোমার যা ইচ্ছে হবে, তুমি দু'চারখানা বেছে নিয়ে যাও মা,—বাপ রয়েছেন সঙ্গে, ভয় কিসের? আহা, মা মাগি কিছুই দেখ্‌বে না গা? এই তো শক্ত রোগ হয়েছে, যদি না-ই বাঁচে।"

মা যদি না বাঁচেন !—শুনিয়াই মনোরমার ছুটি চক্ষু দিয়া জলের ঝরণা ঝরিতে লাগিল। হাত দিয়া সেই জল মুছিয়া মুছিয়া শেষ করিবার অনর্থক চেষ্টা করিয়া, সে ঘাড় নাড়িয়া অনিচ্ছা জানাইল ; বলিল, "বাবা যখন বারণ করেছেন, তখন থাক্ না মা। মা ভাল হলে; এর পরে আবার যখন যাব, তখন নিয়ে যাব।"

স্নেহময়ী শ্বশ্রূ কহিলেন, "তাই হোক্ মা, তাই হোক্। আহা মা'টি তোমার সেরেই উঠুন,—বাপ মিন্‌ষের আর তো ঘরে কেউ নেই !"

গহনা বাহির করিবার সময় শরৎশশী দু'একখানা দামী গহনা, মনোরমার পিতৃদত্ত সামান্যগুলির সহিত যেন ভুল করিয়াই দিয়াছিল ; সেগুলি ফিরাইয়া দিতে গেলে সে ধমক্ দিয়া উঠিল, "ওগো থাক্ থাক্, তোমায় আর অত সরফরাজি কর্‌তে হবে না, ও টায়রাটি না পর্‌লে তোমার মুখই মানায় না। কানে কি সর্ব্বদাই দুখানা কান ঝুলিয়ে যেখানে সেখানে যাবে নাকি, যে, হীরের ইয়ারিং দুটো সঙ্গে নিচ্চো না ? রেখে দাও ওসব।"

মনোরমার মনে বারেকের জন্য এই প্রিয়বস্তুগুলির প্রতি লোভ জাগিল, কিন্তু সে তাহাকে আমল দিল না। শাশুড়ীর হস্তে সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া একটুখানি ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, "এবার এ সবই থাক্, বাবা যে বারণ করেছেন।"

শরতের মুখ ভার হইয়া রহিল। শাশুড়ী একেবারে গলিয়া পড়িয়া কহিলেন, "এমন সুবোধ মেয়ে কি আর ভূ-ভারতে দুটি আছে ? আহা, মাঁর আমার ভেতর বার দুই-ই এক সমান।"

মনোরমা আড়ালে আসিয়া হৃদয়সঙ্গিনী শরৎকে চুপি চুপি বলিল, "তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখে রেখে যাই, পাঠিয়ে দিবি ভাই ?"

শরৎ অশ্রু-স্তম্ভিত নত-চক্ষে চাহিয়াই উত্তর দিল, "দেবো না কেন ?"

"তুই রোজ একখানা করে চিঠি লিখ্‌বি তো ?"

"লিখ্‌ব না কেন ?"

"আমি ভাই হয় ত রোজ চিঠি দিতে পার্‌বো না।"

"সে আমি জানি গো জানি।"

"জানই ত ভাই, মায়ের অসুখ—তাঁকে দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে—রাঁধ্‌তে হবে হয় ত। ও কি ভাই, তুই রাগ কর্‌ছিস্ বুঝি? না ভাই, না, যেমন করে পারি, আমি রোজ চিঠি দেবো, দেখিস্।"

মনোরমা শরতের গলা জড়াইয়া ধরিল, "লক্ষ্মি দিদিটি আমার! যাবার সময় অমন করে চুপ্ করে থাকিস্ নে, ভাই, ভাল করে দুটো কথা ক'। আবার কতদিনে না কতদিনে দেখা হবে।"

এই 'দিদিটি আমার' কথাটা সে স্বামীর নিকট শিখিয়াছিল।—শরতের মেঘ-বাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু দিয়াও এইবার জলের ধারা নামিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কলত্রনিন্দাগুরুণা কিলৈব মভ্যাহতং কীর্ত্তি বিপর্য্যয়েণ।
অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে।

—রঘু।

কলিকাতা ঈডেন হিন্দু-হোষ্টেলে ত্রিতলের একটী ঘরে অরবিন্দ পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররূপে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিল; এক্ষণেও রিপণ-কলেজে আইন অধ্যয়ন উপলক্ষে তথায় বাসা বাঁধিয়া আছে। এ বৎসর ফেল করায় সে মনে মনে বড়ই লজ্জা পাইয়াছিল। পিতার মনের মধ্যে যে এ ঘটনা তাঁহার সুমহৎ পুত্র-গৌরবে একান্তই আঘাত করিয়াছে, এবং তাহারই ফলে তিনি যে এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একমাত্র অপরাধিনী বধূর প্রতিই সমধিক অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, এ সংবাদ তাহার

ভাল করিয়াই জানা। এবার একসঙ্গে পিতার সন্তোষ উৎপাদন এবং বধূর কলঙ্কবিমোচন—এই দুইটি সুমহৎ কার্য্যভার মাথায় তুলিয়া লইয়া, প্রাণপণ যত্নে সে বধূ-সায়রের তলদেশে তলাইত নিজের চিত্তটিকে টানিয়া তুলিয়া, আইন-অধ্যয়নে নিযুক্ত রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তবু সে অবাধ্য মন কি উপদেশের চোখ-রাঙানি মানিতে চায়? বিষম বিদ্রোহে সোরগোল করিয়া স্বাধ্যায়-নিরত তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গের চেষ্টাতেই সে যেন সদা সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। স্প্রিংয়ের গদি-আঁটা লৌহময় খাটের উপর চিৎপাত হইয়া পড়িয়া পড়িয়া, মুদিত দুটি চোখের সাম্‌নে খাড়া নাকের মাঝখানে দোদুল্যমান শুভ্র স্থূল নোলকটি, সরু সরু জোড়া-ভুরুর মধ্যস্থলে পাথুরে পোকার কালো টিপ্‌খানি, তাম্বুলরাগে পক্কবিম্বের মত আরক্ত, আবার গোলাপের পাপড়িখানির মতই সূক্ষ্ম হাসিমাখা অধরোষ্ঠ—এ সব যত সহজে শরৎকালের স্বচ্ছ, নির্ম্মল আকাশে বিচিত্র, সুন্দর, খণ্ড মেঘের মত অনায়াসলঘু গতিতে ভাসিয়া বেড়ায়, খোলা চোখে আইনের বইয়ের মধ্যে নিহিত আইনের ধারাগুলি ঠিক্ তেমনটি কখন হইতেই পারে না। কখন কখনও পাশের ঘরের নিষ্কর্ম্মা ছাত্রেরা একান্ত মনোযোগী ভাল ছেলেটির একটানা পঠনধ্বনি অকস্মাৎ থামিয়া যাইতে শুনিতে পায়; এবং একটুখানি খুট্‌খাট্ শব্দ হয় ত কখন শোনা যায়, নয় ত যায়ও না। তারপর যদি কেহ একটু সন্দিগ্ধ চিত্তে উঠিয়া আসিয়া উঁকি দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিত, হয় ত তাহার পক্ষে এমনও দেখিতে পাওয়া সম্ভব হইত যে, বিশাল বপুশালী ল-বুকের সেই খোলা পাতাখানারই উপরে টেবিলের উপরকার ক্যাবিনেট্ সাইজের একখানি ফটোগ্রাফ্ পড়িয়া আছে; আর রিপণ-কলেজের এই ছাত্রটির মুগ্ধ দুটি চোখের তারা কার্ডে আঁটা ছবিটুকুর ফুট্‌ফুটে মুখখানির উপরে 'অনড়' হইয়া বসিয়া গিয়াছে। তা কখন কখনও যে ঐ অন্ততঃ দুই সহস্রবার পর্য্যবেক্ষিত আলোক চিত্রখানির গৌরব-সিংহাসন একখানি এসেন্স-গন্ধি রঙ্গীন চিঠির কাগজের অধিকৃত না হইত, এমন কথা হলপ করিয়া

অস্বীকার করিবারও সাহস আমাদের নাই ;—তা সে রঙ্গীন কাগজের চিঠিখানায় যতই কেন বানান্ ভুল থাক্ না, যতই কেন তার অক্ষরগুলির ছাঁদ কুশ্রী, লাইন বাঁকা এবং কালির ছাপে অপাঠ্যই হোক্, ঐ সংস্কৃত অনারে বি-এ, ফাষ্টক্লাশ ফাষ্ট এম্-এ পাশ করা, ল-কলেজের ছাত্রটির নিকটে উহার স্থান বি-এ ক্লাসে পঠিত কালিদাসের সেই বিশ্ববিখ্যাত মহা বিরহ কাব্য মেঘদূতের চাইতে এতটুকুও নীচে নয়।—যেহেতু ইহাতেও তাহার রূপসী তরুণী প্রিয়া—সেই যক্ষ বনিতা—'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠী,—মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা·· ইত্যাদি ইত্যাদি স্বরূপা- হয় ত ঠিক্, তেম্নি করিয়াই পতিবিরহে 'শিশির-মথিতা পদ্মিনী' এবং 'মেঘাবরণ হেতু মলিন-কান্তি ইন্দুর' ন্যায় অবস্থাপন্না হইয়া এতক্ষণ—ঠিক্ তেমন—আষাঢ়ের প্রথম দিবসোদিত 'বপ্রক্রীড়াসক্ত গজের' ন্যায় কৃষ্ণ-মেঘের দর্শন-সুযোগ না পাওয়ায় শুধুই এই শীত-শেষের স্বল্প-উপভোগ্য ঝলমলে রৌদ্র-বিভাসিত নির্ম্মেঘ নীলাকাশে 'প্রবলরুদিতোচ্ছূন' নেত্র-তারকা দুইটি সুধীরে সংস্থাপন পূর্ব্বক দূরাপগত প্রিয়জনের ধ্যান করিতেছেন। সেই ধ্যানমগ্নাবস্থায় যদিচ তাঁহার উরসোচ্যুত হইয়া সুরবাঁধা বীণ্ হতাদরে ভূমি লুণ্ঠিত হয় নাই ; কিন্তু হয় ত শরতের খুকির অর্দ্ধপ্রস্তুত পশমের টুপিটা কাঁটা খুলিয়া কোন্ সময় হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে,—গভীর অন্যমনস্কতাপ্রযুক্ত সেদিকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত হয় নাই। চোখের জলে বীণাতন্ত্রী আর্দ্র না হইলেও, গোপন-রোদনে বৃত্তাকারে তাহাতে দুইটি কালির রেখা যে দেখা দিয়াছে ; ইহা একেবারে সুনিশ্চিত !—এমনি কত কি চিন্তাই সেই নবীন বিরহীর তরুণ চিত্তকে রামগিরি নির্ব্বাসিত হতভাগ্য যক্ষের মতই সময়ে অসময়ে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিত। তবে সুখের বিষয় এই যে, এই স্থানটা রমণীয় রামগিরির নির্জ্জন প্রদেশ নহে, জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরের শত শত চাঞ্চল্যপূর্ণ, তরুণ-যুবক-অধ্যুসিত হিন্দু-হোষ্টেল এবং নিরভিভাবক নিষ্কর্ম্মা যক্ষের মত এই অরবিন্দ বেচারীর নির্ভয় ও কর্ম্মহীন

অবস্থা নয়। মাথার উপর দুর্দ্দান্ত পিতার তীব্র ভর্ৎসনার আতঙ্ক-লজ্জা ও রাশিকৃত আইনের বই পড়ার দায়িত্ব—এই দুইটা বড় বড় দায় ঠেলিয়া ফেলিয়া 'চকিত হরিণী প্রেক্ষণার' চিন্তা যতটুকু করিয়া উঠিতে পারে, সেই-টুকুই ইহার বাহাদুরী। এবার যেমন করিয়া হৌক্, পাশ করিয়া, ফেলিয়া প্রিয়-বিরহরূপ অভিশাপ দূর করিতেই হইবে। পাশ হইলে ত আর এমন করিয়া এই নির্ব্বাসনে ফিরিয়া আসিতে হইত না। দীর্ঘশ্বাস মোচন-পূর্ব্বক অনুতাপী মনে মনে বলিত, পাপের প্রায়শ্চিত্ত! একটুও যদি মন দিতাম, তাকেও পাঁচটা কথা শুনিতে হইত না, আর আমাকেও ;—যাক্, যা ভাগ্যে ছিল হইয়াছে—এবার আর ঠকা হইবে না। তদ্‌ভিন্ন, কালধর্ম্মে আধুনিক বিরহীদের আরও একটা মহা সুযোগ ঘটিয়াছে,—দূতের সাহায্য ব্যতীত আধুনিক বিরহী বিরহিণীগণ অনায়াসেই নিজ নিজ বিরহ-বেদনা প্রিয়জনের গোচরীভূতকরণে অনায়াস-সমর্থ। এই বিরহলিপি ডাকযোগে প্রেরণ সামর্থ থাকিলে কি আর নির্ব্বোধ যক্ষ একখানা দু' চারি পয়সার,—কখনও বা দু' চার আনার টিকিট্-আঁটা লেফাফায় ভরিয়া খান দুচ্চার চিঠির কাগজ সরাসরি প্রিয়ার পদ্মহস্তের উদ্দেশ্যে না পাঠাইয়া মেঘের উদ্দেশ্যে বকিয়া মরিত ?

হঠাৎ একদিন সকালবেলার প্রথম ডাকেই অরবিন্দের নিজের হাতে শিরোনামা দেওয়া—একটু কালিমাখা—ঈষৎ দোমড়ানো লেফাফায়ভরা পরিচিত চিঠিখানি আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে যেমন প্রীত, তেমনি বিস্মিত করিল। লুপ-লাইনের মেল বেলায় আসে ; চিঠি বিলি বিকালে হয়, উৎপ্রেক্ষার পূর্ব্বেই আশাতীতরূপে সে ইহাকে লাভ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, হয় ত পরশুই মনুয়াটা দুখানা চিঠি লিখেছিল,—ডাকঘরের ওরা অত দেখেনি,—কাল একখানা দিয়ে গ্যাছে, আজ আবার এখানা দিলে। তা একসঙ্গে দুখানা পাওয়ার চাইতে এ এক রকম বেশ হলো কিন্তু! আহা,—খাসা ভুলটি করেছে! আর ময়নাপাখীটাও কৃত লক্ষ্মী!

কেমন মজা করে চিঠিখানি লিখে আমায় আশ্চর্য্য করে দিলে? উঃ, ঐটুকু মেয়ে কত বুদ্ধি! দেখি কি লিখেছে!—নিজের ঘরে পা দিয়াই খামখানার উপর চোখ দিতে না দিতেই বলিয়া উঠিল—"এ যে বর্দ্ধমানের ছাপ! কবে এলো? ও হরি, তাই এমন সময় চিঠি এসেছে!"

যেটি মনে করিয়াছিল, ঠিক্ সেটি নহে দেখিয়া, মন ঈষৎ ক্ষোভানুভব করিতে যাইতেই সহসা স্মরণে আসিল যে, চিঠিখানা একদিনের মধ্যে দুইখানি লেখা পত্রের একতম না হইলেও এক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হওনের কোনই কারণ নাই। এমন কি, বরং কিছু খুসী হইলেও হইতে পারা যায়। এখন মনে করিলেই একদিন—তা একদিনই বা আর কেন, আজই কলেজ-ফেরতা সেখান হইতে ঘুরিয়া আসা চলে। কাল রবিবারটাও সেখানে কাটাইয়া চাই কি সোমবার ভোরের যে কোন গাড়ীতে চাপিয়া বসিলে, যথাসময়ে সে সেদিনের কলেজ করিতে পারে। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়া, কৃতসঙ্কল্প অরবিন্দ চিঠিখানি খুলিয়া পাঠে মন দিল। পত্রে বেশী কথা কিছুই ছিল না; অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র এইটুকু অনুরোধ,—

"প্রিয়তম!

আমি আজ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কলিকাতা তো দূর নয়—একবারটি আসিবে না কি? মার বড় অসুখ,—বড় ভয় করিতেছে। কেমন আছ? আমি ভাল আছি।

কবে আসিবে লিখ।

তোমারি—মনু।"

অরবিন্দের পরিপূর্ণ চিত্ত এই ক্ষুদ্র পত্রটুকুর ক্ষুদ্রত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াই তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে,—সে-আনন্দ-স্ফীতি তাহার রুদ্ধ হইল না। ইতঃপূর্ব্বে ইহার চতুর্গুণ পত্রকেও সে ক্ষুদ্রত্ব দোষারোপে অভিমানে গুমরিয়া কলেজের পড়া মাটি করিয়াছে। লেখিকাকে এই

অপরাধের সাজা স্বরূপে নানারূপ মানে অভিমানে পরিপূর্ণ, গদ্যে পদ্যে ভরা পাঁচ সাতখানা কাগজের চারি চারি পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাণ্ড পত্র পড়াইয়া, তাহার যথাসাধ্য বড় উত্তর লেখাইয়া তবুও শান্তি পায় নাই। আজ কিন্তু কিছু না। নেহাৎ সুবোধ বালকের শান্ত মূর্ত্তিতে চিঠিখানি যথাস্থানে রাখিয়া সাবধান গামছা হাতে সকলের পূর্ব্বে স্নান করিতে গেল। পরিপাটী স্নানশেষে কেশ-বিন্যাস ও আহার সমাধার পরও যখন ঘড়িতে কলেজের বেলা ঘোষণা করিল না,—তখন অগত্যাই একটা চামড়ার হাত-ব্যাগে, জামা, কাপড়, সাবান, এসেন্স, দু'এক জোড়া বাড়তি জুতা, আরও সব কি-কি অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পত্র গুছাইয়া ফেলিয়া গোটাকয়েক টাকা পকেটে লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অরবিন্দ যখন দুই পকেট্ ভর্ত্তি করিয়া এবং রুমালে-বাঁধা কাগজে-মোড়া কতকগুলি সুদৃশ্য প্যাকেট্, বই, খাতা আরও কত কি দিয়া দুইহাত ভারি করিয়া, হাসিভরা প্রসন্নমুখে হোষ্টেলে ফিরিল, তখন বেলা তিনটা। তিনটা চল্লিশ মিনিটের যে লুপ মেলখানায় সচরাচর সে ভাগলপুরের জন্য রওনা হয়, সেইখানাতেই এবার ততদূর না গিয়া বর্দ্ধমানে নামিয়া পড়িবে, এই মতলব। জলখাবারের প্রয়োজন নাই—বলিয়া দিয়া, দুইটা করিয়া সিঁড়ি টপ্‌কাইয়া, সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক নিজের ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। পথে দু' একটা প্রশ্ন আসিলেও উত্তর দিবার আবশ্যকতা বোধ ছিল না,—তাই প্রশ্ন কয়টা ব্যর্থই হইয়া গেল। তবে ভাল কাজে বিঘ্ন অনেক। সহজে কি মুক্তি পাওয়াই যায়?—প্রশ্নকর্ত্তাদের মধ্যে দু'একজন হাতের জিনিস্, পত্রগুলার মধ্যে কি কি, এবং কাহার জন্যই বা ইঁহাদের আকস্মিক শুভাগমন, এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইতেই, অরবিন্দ স্বেচ্ছায় আততায়ীদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক বিশেষ অনুনয়ের সহিত মিনতি করিয়া কহিল, "মোটে সময় নেই, ভাই,—কাল না'তো পরশু ফিরে এসে সব তখন তোদের বল্‌বো, লক্ষ্মীটি! এখনি ছেড়ে দে'।"

"ইঃ! কাল না'তো পরশু!—খুব সকাল সকাল ফেরা হবে যে দেখছি! ছেলের এখন পলকে প্রলয় বোধ হচ্চে কিনা। তা কোথায় গমন হবে, আজ অন্ততঃ সেইটেও না হয় শুনে রাখি? ভাগলপুরে নিশ্চয়ই নয়? গৃহিণীটি তো সেই কংস-কারাগারে,—নতুন কোথাও কিছু হয়েছে না কি? নিদেনপক্ষে সেইটুকুখানি খবর রাখতে চাই। আমাদের চোখের সাম্‌নে যে দিনে ডাকাতি হবে,' সেটি হচ্চে না।"

কোন মতে ইহারও সদুত্তর প্রদান করিয়া ইহাদের হাত সে এড়াইল!

তার পরে নিজের বেশভূষা তাড়াতাড়ির মধ্যে যতদূর সম্ভব পরিপাটী-রূপে সমাধা করিয়া ফেলিয়া, হাত-ব্যাগটায় নূতন কেনা জিনিষপত্রগুলা ভরিয়া লইল। এইবার একবার এখান হইতে বাহির হইয়া পড়া!

সূর্য্যপ্রসাদ তেওয়ারি হাত ভর্ত্তি করিয়া পোষ্টকার্ড লেফাফা ও প্যাকেট্ বিলি করিতেছিল। অরবিন্দ দ্বিতলের সিঁড়ির সর্ব্বের শেষ ধাপে তাহার দর্শন পাইয়াও, নিজের কোন চিঠিপত্র আছে কি না, এ খবরটা পর্য্যন্ত লইল না; পরন্তু, পাশ কাটাইবার দিকেই মনোযোগী হইল। ঈপ্সিত পত্র আজ সকালের ডাকে অপ্রত্যাশিতরূপেই তো সে পাইয়াছে। পিতার পত্র গত-কল্য আসিয়াছিল। আর কিছু না থাকিলেও, আজ তাহার মনের কোণে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ জন্মিবে না। সূর্য্যপ্রসাদ খানদুই লেফাফা হাতে লইয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইল, "আপ্‌কা দো চিট্‌ঠি আয়া।"

"আমার দুখানা চিঠি?" এই কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অরবিন্দ পত্র লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

"কাল-দো চিট্‌ঠি দিয়া। ফিন্ আজ দো।—জরুর কুছ্ খুসী কো খবরই হোগা?—লেকেন বান্দাকো তো কুছ্ বখ্‌শিষ্ ভি মিল্‌না চাহিয়ে, মহারাজ!"

ডাকের ছাপে ভাগলপুরের নাম ও লেফাফার উপর পিতার হস্তাক্ষর দেখিতে পাইয়া, সেইখানার উপরেই প্রথম মনোযোগ প্রদান করিয়া, অরবিন্দ ঈষৎ হাস্যের সহিত জবাব দিল, "হ্যাঁ সুরয, খবর তো খুসীকোই

হ্যায়,—লেকেন আভি ফুর্‌সৎ বহুৎ কম,—লওট্‌নে পর তোম্‌কো জরুর খুসী কর দেঙ্গে।"

"জী আচ্ছা। ম্যয়তো হুজুরে কি গোলামী কর্‌তা হুঁ।"

হৃষ্টচিত্ত সূর্য্যপ্রসাদ চিঠি বিলি করিতে চলিয়া গেল। অরবিন্দ পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠ করিল।

ভাগলপুর—শুক্রবার।

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন—

অরবিন্দ! তোমার পত্নীর সহিত আমি আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। যদি তুমি আমার পুত্র হও, তুমিও আমার আদেশে অদ্যাবধি তাহার সহিত নিজ সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাইবে। যদি পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন কর, তবে একমাত্র সন্তান হইলেও অদ্যাবধি তুমিও আমার পরিত্যাজ্য।

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বসু।

অরবিন্দের হস্ত হইতে পঠিত এবং অপঠিত দুইখানি পত্রই একসঙ্গে স্খলিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। সে নিজেও এই মধ্যাহ্ন-শেষের পরিপূর্ণ আলোর মধ্যেও দুই নেত্রে গাঢ় অন্ধকার লইয়া পার্শ্বের প্রাচীরটা ধরিয়া ফেলিয়া কোন মতে নিজের পতন নিবারণ করিল।

বাহিরে তখন উৎসাহ উদ্যমে পরিপূর্ণ চিত্ত সংসার-পথের নবীন পথিক যুবার দল, দল বাঁধিয়া কলেজ হইতে ঘরে ফিরিতেছে বা ক্রীড়া-ক্ষেত্রাভিমুখে চলিয়াছে। যৌবনের দীপ্ত সূর্য্য সকলেরই মুখে পূর্ণতেজে সহস্র কিরণ-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে। অন্তর-উৎস হইতে আনন্দের সহস্র ধারা উৎসারিত হইয়া পড়িয়া ইহাদের চতুর্দ্দিককেও আনন্দময় প্রাণময় করিয়া তুলিতেছিল। ইহাদের গানের সুর, হাসির তরঙ্গ, চারিদিকের বাতাসে লহর তুলিয়া ভাসিতেছিল।

অরবিন্দের অসাড় অস্পন্দ শরীরে এ সকলের কোন কিছুই চেতনা আনিতে পারিল না, অনন্ত শব্দবহ আকাশের অসংখ্য শব্দ-লহরীর কোন ধ্বনিই কর্ণে তাহার প্রবেশ করিল না। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, এই যে পিতার হস্তাক্ষরে লেখা পত্র এইমাত্র সে পাঠ করিল, ইহাতে তাহার নিজেরই মৃত্যু-সংবাদ সে পাইয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিবাবসানেচ্ছায়েব পুরোমূলং বনস্পতেঃ॥
—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।"

সংসারে যখন যেটী দরকার, ঠিক্ তাহার বিপরীতটি, ঘটিতেই প্রায় দেখা যায়। চাষের জন্য যখন বর্ষার প্রয়োজন, তখন অনাবৃষ্টি এবং উহারই জন্য যখন বৃষ্টি না হওয়া দরকার, ঠিক্ সেই সময়টিতেই অতি বৃষ্টিতে প্লাবন দেখা দেয়। দুর্গাসুন্দরীর ব্যাপারটায় এই প্রকারই ঘটিল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকে নিজের বেশি দিন বাঁচিয়া থাকা সহজেই পছন্দ করে না। তার উপর মেয়ে আনিতে গিয়া বৈবাহিকের সহিত "কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির করা"র মত যে অঘটন ঘটিয়া গেল, ইহার পর এক তিলও বাঁচিয়া থাকা তাঁহার অনুচিত বোধ হইতে লাগিল। যত শীঘ্র তিনি মরিতে পারিবেন, মেয়ের শ্বশুর-ঘরের দ্বার ততটুকু সহজে মুক্ত হইবে, ইহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়াই, একাগ্রচিত্তে মরণেরই ধ্যান করিতে লাগিলেন। এ মরণ কিন্তু দেখা দিল না।

একদিন কবিরাজ মহাশয় নাড়ি টেপা শেষ করিয়া, নস্য টেপার প্রারম্ভে

রায় দিয়া বসিলেন যে, রোগিণীর নাড়ীর গতি অপেক্ষাকৃত ভাল দেখা গিয়াছে।

শুনিয়া মনোরমার সদা বিষণ্ণ মুখে ঈষৎ আনন্দের আভা প্রকাশ পাইল; দীননাথ একটা নিঃশ্বাস খব দীর্ঘ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ত্যাগ করিলেন।

রোগিণীর পাণ্ডু ওষ্ঠে কিন্তু ঘোর অবিশ্বাসের সহিত তীক্ষ্ণ হাস্য প্রকটিত হইয়া উঠিল এবং মাথা নাড়িয়া উহাদের আশ্বস্ত হইতে নিষেধ করিয়া যেন এই কথাই সে বলিতে লাগিল যে, এ একেবারে আ-নাড়ি!

কিন্তু বেশি দিন এমন করিয়া মনকে আঁখি ঠারা চলিল না। বৈদ্যরাজ প্রত্যহই নাড়ী টিপিতে টিপিতে পরম আশ্বাসে ঘনঘন ঘাড় নাড়েন, আর তাঁহার স্বর্ণবঙ্গ প্রভৃতির গুণ এবং উহারা কোন্ কোন্ মরণোন্মুখ নর-নারীর পক্ষে কোথায় কোথায় ধন্বন্তরীর কার্য্য করিয়াছিল, উহাদের ব্যবহার-ফলে কে কে আসন্ন মৃত্যুকে জয়পূর্ব্বক আজও সত্তর বৎসরে আখের টিকলি চিবাইয়া খাইতেছে, কোন্ এক সুকৃতিবান্ সাতষট্টি বৎসর বয়সে বর সাজিলেও তাহাকে নেহাৎ মন্দ দেখায় নাই, এবং বাসর-ঘরে তাহার বয়স পঞ্চাশের কোঠায় আন্দাজ করা হইয়াছিল, এই সব সুসমাচার চতুর্মুখে অনর্গল প্রচার করিয়া রোগিণীর আনন্দবর্দ্ধন করিতে চাহেন, দুর্গাসুন্দরীর অসহায় চিত্তের জ্বালা ততই দুঃসহ হইয়া উঠে। প্রথম প্রথম এই আত্ম-শ্লাঘাকারী প্রগল্ভ মূঢ়ের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পারই দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে মনে হাসিয়া আত্মতৃপ্তি সম্পাদন করিয়া লইতেন; কিন্তু তার পর যখন সহসা একদিন তাঁহার নিজের কাছেও এই আনাড়ি বৈদ্যের নাড়ী জ্ঞানের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইয়া পড়িল, তখন রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে তাঁহার যেন জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম করিল। কি করিলে যে এই হতভাগা নাড়ীগুলার গতি ফিরাইয়া উহাদের অ-গতিতে টানিয়া লওয়া যায়, সেই চিন্তার উদ্বেগে সেদিন জ্বর বৃদ্ধি হইলেও, পরদিন সে জ্বরও আবার কমিয়া

গেল। দুর্ব্বল শরীরে তাড়াতাড়ি জ্বর থামিতে থাকিলে, যে সকল উপদ্রবকে বৈদ্যকশাস্ত্রে চরম লক্ষণ বলা হয়, বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিয়াও সেই সকল মন্দ লক্ষণের একটিকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিন্তু তথাপি সহজে কি বিশ্বাস হয়? একটু একটু ঘাম দেখা দিতেই, পরম আশ্বাসে চরম কল্যাণের আশা মনে জাগিয়া উঠে। স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো দেখ! আমার চতুর্থটি করিয়েই তুমি মনুকে ভাগলপুরে রেখে এসো।"

দীননাথ সব কথা স্ত্রী বা কন্যার কাছে প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু সত্য বেশি দিন গোপন রহিল না। মনোরমার মনের মধ্যেই তাহার মন্দভাগ্যের কালো ছায়া একখানা ঘন কালিমাখা কালো মেঘের মত দিনে দিনে জমিয়া উঠিতেছিল। একখানা তো বটেই, কখন কখনও দুইখানা লেফাফায় ভরিয়া অরবিন্দের পত্র প্রত্যহ মনোরমার উদ্দেশ্যে আসিত। বিবাহিত জীবনের এমন একটি দিনের কথাও মনোর স্মৃতি-ফলকে লিখিত ছিল না, যে দিনটিতে এই ঈপ্সিত অথচ পাঁচজনের হাসি ইঙ্গিতের মধ্যে লজ্জা কুণ্ঠায় ভরা প্রিয় পত্রাবলী তাহার কাছে আসিয়া, তাহার দূরাপস্থত প্রিয়জনের উদ্‌ঘাটিত হৃদয়-রাজ্যের শত সমাচার শুনাইয়া, তাহারই অজস্র আদরের স্নিগ্ধ ধারায় তাহার হৃদয় প্রাণ জুড়াইয়া, তাহার ভবিষ্যৎ আশা-মন্দিরে সহস্র আলোক-শিখা জ্বালাইয়া দেয় নাই।

আজ এতগুলা দিনের উদয়াস্ত হইয়া গেল,—তেমন চিঠি তো নয়ই,— এতটুকু একটু কুশল সংবাদও সে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ীর কাহারও নিকট হইতে পায় নাই। যে শরৎ তাহাকে প্রত্যহ পত্র দিবার জন্য নিজেই প্রতিশ্রুত করাইল, সেই বা একখানি পত্র পর্য্যন্ত না দিয়া এমন করিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইল কেন? প্রথম প্রথম কয়দিন মায়ের অত অসুখের মধ্যেও, সে মনের মধ্যে কি যেন একটা প্রচণ্ড আশা করিয়া, উহারই ভিতর কেশ বেশের উপর একটুখানি নজর না রাখিয়া থাকিতে পারিত না। বিকালবেলা মায়ের জেদেই গা-ধুইবার জন্য মায়ের ঘর হইতে বাহির হইবার

পর, এই আশাটা প্রবলভাবে দেখা দিয়া বড়ই লুব্ধ করিয়া তুলিলে, প্রতি দিনের ব্যর্থতার ক্ষোভ সেই নবোন্মেষিত আশালোকে বিসর্জ্জন দিয়া নূতন বলে সে বুক বাঁধিত। তখন কেমন করিয়া সব ভয় ভাবনা আপনা হইতে দূরে সরিয়া যাইত; এবং আশ্বাসে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, তাড়াতাড়ি—চুলটা যদি বা বাঁধা নাও হয়, তো-সাম্‌নেটা একটু আঁচড়াইয়া লইয়া, বেশ ভাল বা দামী সাড়ী না পরিলেও খয়ের রংয়ের বা চাঁদের আলো খোলের একটুখানি বাহারে সাড়ী পরিয়া বসিত। মায়ের অত অসুখ,—ভালও লাগে না, ভাল দেখায়ও না,—তথাপি হঠাৎ যদি তাহাদের এই ভগ্ন-কুটীরে সেই সর্ব্ব সুখ সৌভাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তিটির উদয় হয়, ইহার সহস্র ছোট্ট বড় অসুবিধার ক্রটিতে তাঁহাকে যে কতখানি কষ্ট স্বীকার করাইবে, সে কথা সে তো ভালরূপেই জানে। তাই তাহার যথাসাধ্য ক্রটি সে পূর্ব্ব হইতেই সারিয়া রাখিতে চাহিত। ঘরদ্বার ঝাঁট দিয়া, মশারির ছিদ্র মেরামত করিয়া, ঝুল ঝাড়িয়া, নূতন কুঁজায় জল ভরাইয়া, আতরমাখা খয়েরে পান সাজিয়া, আরও যে কত কি টুকিটাকি ব্যবস্থা সে সবার অলক্ষ্যে সম্পন্ন করিয়া লইতেছিল, সে শুধু যিনি সব দেখিতে পান, তিনিই দেখিতে পাইয়া মনে মনে নিশ্চয়ই পরিহাসের হাসি হাসেন নাই—পরন্তু সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্ততঃ একবারও "আহা" বলিয়াছিলেন বই কি! সংসার শুদ্ধ নির্ব্বোধ নরনারী যে আশালতাটিকে জিয়াইয়া রাখার উদ্দেশ্যে প্রাণান্ত শ্রমে জল ঢালে, তার যে বাঁচিবার পথ রুদ্ধ করিয়া বহুপূর্ব্বেই তাহার মূল শুষ্ক হইয়াছে, ইহা বুঝিতে মানুষের যতটা সময় লাগে, ঐ একমাত্র 'সর্ব্বতশ্চক্ষু' অজ্ঞাতদ্রষ্টা তাহার অনেক পূর্ব্বেই ইহাদের সে দুর্দ্দশার খবর পাইয়া থাকিলেও, এই অন্নজদের দুর্দ্দশায় প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারেন কি? বোধ করি পারেন না। তবে যে মানুষের সকল দুঃখে তাঁহাকে একান্তই উদাসীন দেখায়, তা সে দোষ তো আর তাঁহার নয়। তিনি কি করিবেন? মানুষের ভাগ্য যে অপ্রতিবিধেয়। নিজের হাতে গড়া আইন নিজেই কি তিনি ভাঙ্গিতে সমর্থ!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"কিংবাতবাত্যস্ত বিয়োগ মোঘে, কুর্য্যামুপেক্ষাং হতজীবিতোঽস্মিন্।
স্যাত্রক্ষণীয়ং যদি মেনতেজস্তদীয় মন্তর্গত মন্তরায়ঃ।

—রঘু।"

দিনের পর রাত্রি কাটিয়া আবার অহোরাত্র অতীত হইয়া চলিয়া যায়, আর দুশ্চিন্তার জাল নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া মনোরমার সর্ব্ব দেহ মনকে যেন একগাছা লোহার শক্ত শিকল দিয়া আঁটিয়া আঁটিয়া বাঁধিতে থাকে। চিন্তা-জ্বরে তাহার অটুট স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া অম্লান সৌন্দর্য্যে কালি ঢালিয়া তাহাকে এই তরুণ-বয়সে প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌছাইয়া দিল। নিশ্চয় কিছু হইয়াছে—কিন্তু, সে 'কিছু' কি? শ্বশুর নিশ্চয় ভাল আছেন, নতুবা সংবাদ আসিত। শাশুড়ী সম্বন্ধেও ঐ একই যুক্তি খাটে। তবে আর কি হইতে পারে? শরৎও তো কই একখানা চিঠিরও জবাব দিল না? তবে কি তাহারই কিছু? না—না; তা হইলে কলিকাতা হইতে কি একখানাও পত্র আসিত না? তবে কি,—তবে কি,—হা ভগবান! এ রাক্ষসীর মাথায় বাজ পড়ে না কেন? হয় ত এক্‌জামিনের পড়ার জন্য,—কিন্তু এত অনুনয়, উদ্বেগ, ব্যাকুলতায় দুটি ছত্রের একখানি পত্রোত্তর দিলেও কি এক্‌জামিন মাটি হইয়া যাইত? নিজে না হয় নাই আসিতেন,—এতটুকু একটুখানি সময়ও কি তাঁর 'মনুর' জন্য খরচ করা চলিত না?

দুর্গাসুন্দরী এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। কিন্তু এই জীবন মরণের সংঘাত ঠেলিয়া বাঁচিয়া উঠিতে তাঁহার সময় লাগিল বিস্তর। ধীরে, অতি ধীরে, মৃদুমন্দ-গতিতে রোগ আরোগ্যের পথে রোহিণীকে অগ্রসর করিয়া দিতে দিতে, মনোরমার পিতৃ-গৃহে আগার কিঞ্চিদধিক তিনমাস কাল পরে তিনি

বিছানা হইতে কষ্টেসৃষ্টে নামিয়া বসিয়া অন্ন-পথ্য করিলেন; এবং যেদিন এই কার্য্য সম্পন্ন হইল, সেই দিনই কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। মনোরমার বিমর্ষ-মুখে হাসির আভাস দেখা দিল।

প্রতিবেশিনী বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী এবং ঘোষজায়া আসিয়া বলিলেন, "সে কি মনোর মা, তুমি কি খুকি? এ-মাসে কি ওকে শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে? এটা যে জোড়া মাস পড়্‌লো। তুমি কি রকম মা, গা? এতদিন কিছু জান্‌তেই পারনি? আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ,—ওকে কতদিন জিজ্ঞেস্‌ করেওছি,—তা মেয়ে শুধু হাসে,—বলে না তো কিছু।"

দুর্গাসুন্দরী আনন্দের মধ্যেও ঈষৎ চিন্তান্বিতা হইয়া কহিলেন, "তা হলে তো ও-মাসেও ওর যাওয়া হবে না দিদি,—জ্যেষ্ঠ বউ, জষ্টিমাসে তো যাবার যো—ই নেই!—"

ঘোষজায়া কহিলেন, "আষাঢ়ে আটমাস হবে, 'আটে কাঠে' চড়া তো এক্কেবারেই নিষেধ। তা'হলে সেই শ্রাবণ মাসে সাধ খেতে যাবে তখন।"

"আর না হয় এইখানেই সাধটাধ খেয়ে একেবারে বেটা কোলে নিয়েই শ্বশুরকে দেখাতে যাবে। সেই ভাল মনোরমা, তাই করো মা,—ক্রিপ্‌টে শ্বশুর মিন্‌সে যেমন চসম্‌খোর, তেম্‌নি একটু জব্দ হোক্‌। বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে গিয়ে অবধি এক হাঁড়ি মুড়ির মোয়া দিয়েও কখনও কুটুমের মর্য্যাদা রাখ্‌লে না,—এখন পৌত্তুর হ'লে তো আর তেল সন্দেশ বন্ধ কর্‌তে পার্‌বে না বাপু, যতই হোক্‌।"

দীননাথের কাণে এই শুভ-সংবাদটা যতখানি আশ্বাস বর্ষণ করিয়াছিল, ঠিক্‌ সেই পরিমাণে মাপিয়াই তীব্র হতাশ্বাস তাঁহার পত্রোত্তরের পরিবর্ত্তে তাঁহারই স্বহস্ত-লিখিত পত্র রূপ ধরিয়া ভাগলপুর হইয়া ফেরৎ আসিল। রাঙ্গা কালিতে লেখা শুভ-সন্দেশের বার্ত্তাবহনকারী সে পত্র কেহ খুলে নাই, শুধু খামের উপরকার ঠিকানা কাটিয়া পত্র-প্রেরকের নিজের ঠিকানাটি

সেইখানে ছোট অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। লেখকের হস্তাক্ষর দীননাথের অচেনা নয়,—তাহা মহামান্য মৃত্যুঞ্জয় বসুরই হাতের লেখা।

পিতা বলিলেন, "হোক্ জোড়ামাস, বলো তো মনোকে আমি শ্বশুর-বাড়ী রেখে আসি।"

মাতা জিভ কাটিয়া উত্তর দিলেন, "অমন কথা ব'লো না। জোড়ামাসে গিয়ে বাছার যদি কোন অমঙ্গল হয়, তখন যে দুজনকে আপ্‌শোষে মাথা খুঁড়ে মর্‌তে হবে। সে কাজ করে কাজ নেই।"

জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠীর তিথি সেবার মাসের প্রথমেই পড়িয়াছিল। নিমন্ত্রণ পত্র এবং তাহাতেই আবার একবার সাতমাসে ভাজা সাধের কথা স্মরণ করাইয়া এবার সে পত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া পাঠান হইল, পতি-পত্নী উভয়েই কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বলাবলি করিলেন যে, এইবার যা'হোক্ খবরটা তো পৌঁছিবে। এ খবর পেলে যতবড় পাষণ্ডই হোক্, রাগ করে কিছু থাক্‌তে পার্‌বে না। অবশ্যই একটা জবাব দেবে। আর তা না করে, নাই কর্‌লে। আমাদের কাজ তো করা হলো, জামাইও সব জান্‌লেন। সেও তো আর খোকাটি নয়।

যথাকালে রেজেষ্ট্রী-করা চিঠিখানি ফেরৎ আসিল। তাহাতে লেখা (Refused) "লইতে অনিচ্ছুক।"

শ্রাবণ মাসের ৩রা তারিখ শুভদিন। সেইদিন কন্যা লইয়া পিতা বৈবাহিক-গৃহে যাত্রা করিবেন। ঠিক্ ইহার পূর্ব্বরাত্রে কম্প দিয়া জ্বর আসিয়া মনোরমাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিল,—যাওয়া হইল না। দিন-পনের রোগ ভোগের পর যখন জ্বর ছাড়িল, তখনও নিমোনিয়ার জের এবং গভীর অবসন্নতা তাহার ক্ষীণ, দুর্ব্বল শরীরকে একেবারে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। রাজ-কবিরাজ কুলদারঞ্জন রোগিণীর জীবন-সম্বন্ধে এক প্রকার ভরসা দিলেও, গর্ভস্থ শিশু-সম্বন্ধে তখনও ঘোর সন্দেহের আভাসই ব্যক্ত করিলেন। অত্যন্ত সাবধানে ও সন্তর্পণে রাখিয়া সযত্ন শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে

জীয়াইয়া তুলিতে হইবে, উঠা বসা নড়া চড়া না হয় এ সম্বন্ধে বারম্বারই সতর্ক করিয়া যাইতে ভুলিলেন না। দীননাথ কতকটা আত্মগতই কহিলেন, "তা'হলে আর এখন হ'লো না; যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে, ছেলে কোলে নিয়েই যাবে।"

মা জবাব দিলেন, "আগে ও আমার বেঁচেই উঠুক্। মেয়েই যদি না বাঁচে, তা'হলে ওরা রাগ করলো, কি খুসী রৈলো, তাতে আমার কি আসে যায়।"

মনোরমার অসুখের সময় তাহার স্বামী ও শ্বশুরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রেজেষ্ট্রী পত্রে খবর দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের দশাও যে সেই পূর্ব্ব-বারের চাইতে বেশী ভাল হয় নাই, ইহা বোধ করি না বলিলেও চলে।

ভাদ্র মাসের শেষ-সপ্তাহে, অনেক দুঃখ কষ্ট পাইয়া, সেই সমস্ত দুঃখেরই সান্ত্বনা স্বরূপ মনো একটি চাঁদের মত সুন্দরকান্তি সন্তান লাভ করিল। শরীরের এবং ততোঽধিক মনের অবস্থায় নিয়তই তাহাকে যে মরণের দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, জীবনের সমস্তটাই যে ইতোমধ্যে তাহার কাছে বিষ-তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই রিক্ত প্রাণটা তাহার এই এতটুকু একটুখানি সম্বল লাভ করিয়াই যেন একমুহূর্ত্তে হুহু করিয়া ভরিয়া উঠিল। যেন কি ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারই তাহার করায়ত্ত হইয়াছে, এমন করিয়াই সে অনিমেষ-চক্ষে ছেলেটির মুখের দিকে সারাক্ষণ চাহিয়া থাকে,—সবার অলক্ষিতে কোনোমতে দুর্ব্বল মস্তক উঠাইয়া তাহার ঘুমন্ত-মুখে চুমা খায়,—চক্ষের অসম্বরণীয় অশ্রুজলে কখন কখন আপনি ভাসিয়া তাহাকেও ভাসাইয়া দেয়, আবার কখনও বা উহার আড়ামোড়া দিয়া গা ভাঙ্গিয়া ঠোঁট্ ফুল্যইয়া হাত পা মেলিয়া নিদ্রা যাওয়ার ভঙ্গি দেখিয়া, ইহার রক্তহীন বিশীর্ণ অধরে একটুকু হাস্যাভাস জাগিয়া উঠে।

খোকা হওয়ার সংবাদ পত্রে লেখা ব্যর্থ জানিয়া, চির-প্রথামত লোক পাঠাইয়াই খবর দেওয়া হইয়াছিল। বেহারি নাপিত মনোরমাকে জন্মিতে

দেখিয়াছে,—মনোর বিবাহেও সে উপস্থিত ছিল ; কিন্তু তাই বলিয়া মনোর শ্বশুরের এত বড় ছোটলোকমী সেও মুখ বুজিয়া সহিতে পারিল না।

পরলোকনিবাসী নিরপরাধ বসু-গোষ্ঠীয়গণের প্রতি যথোচিত সুব্যবস্থা করিয়া, সমস্ত গ্রাম তোল্‌পাড় করিয়া তুলিয়া. সে ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিল, যে, মনোরমার পিতা ধনলোভে তাহার যেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহাঁরা, কায়স্থসন্তান তো নহেই, পরন্তু হাড়ি মুচিও, উহাদের অপেক্ষা ভদ্র। জাতে ইহারা চামার, ব্যবসায়ে কসাই, ব্যবহারে ডোমেরও অধম। এ হেন কুটুম্বিতার ফল যাহা হয়, এক্ষেত্রে তাহার একটুও ব্যতিক্রম হয় নাই। ভদ্রকন্যা মনোকে লইয়া ইহারা কি করিবে ? সে তো আর তাহাদের সঙ্গে জুটিয়া জবাই-এর কার্য্য করিতে পারিবে না, তাই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

মনোর শ্বশুর বেহারিকে যে কি কি কথা বলিয়াছেন, সে সব সবিস্তারে জানিবার কৌতূহল না থাকা সত্ত্বেও, দীননাথকে হেঁট্‌মুণ্ডে বসিয়া একটী একটী করিয়াই শুনিতে হইল। আরও অজস্র কটু কাটব্যের মধ্যে তিনি বলিয়াছেন, যাহার জন্ম-সংবাদ এত ঘটা করিয়া দিতে আসা হইয়াছে, তাহার সহিত তাঁহার বা এই বসু-বংশের কোনই সম্বন্ধ নাই ! তাঁহার গৃহে পুত্র ও বধূর পৃথক্ থাকাই তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এ সংসারে তাঁহার ব্যবস্থা কখনই অমান্য হয় না। বিশেষতঃ, তাঁহার পৌত্র জন্মিলে, তাহার জন্ম সম্ভাবনা যখন দীন মিত্র কন্যা লইয়া গিয়াছিল, তাহার সাত-দিনের মধ্যেই আসিয়া পৌছান উচিত ছিল,—তা যখন হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ শিশু···এবং উহার মাতা পবিত্রা নয় ; অতএব অতঃপর উহারা সম্পূর্ণরূপেই তাঁহাদের পরিত্যক্ত।

পূজার ষষ্ঠী। আঁতুড় হইতে উঠিয়া মনোরমা সে দিন অনেক চেষ্টার পর কোনমতে মুখ ফুটিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, আমাদের আজ কি কাল একবার হাবড়ায় দিয়ে এলে হোত না ?"

উহার মাতা পিতায় মিলিয়া কয়দিন ধরিয়া এই আলোচনাই চলিতেছিল ; পিতার মত মেয়ে পাঠান, মায়ের মন ইহার বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, "ঐ সব কথার পর,—বিশেষ জামাই শুদ্ধ যখন ঐদিকে,—তখন ওকে কি ঐ শরীরে মেরে ফেলতে পাঠাব ? ছেলেটাকেই কি ওরা রত্নের চোখে দেখ্‌বে ? অথচ ঐ গুঁড়োটুকু নিয়েই যে ওর বেঁচে থাকা।" দীননাথের মনেও স্ত্রীর যুক্তিটাকে একেবারে ঠেলিয়া ফেলার মত তুচ্ছ ঠেকিতেছিল না বলিয়াই, তিনিও ইহার পর আর বেশি জিদ্ করিতে পারেন নাই।

মেয়ের কথায় মা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঐ দেহ নিয়ে তুই কেমন ক'রে যাবি রে ?"

"না গেলে এর কি হবে মা ?" বলিতে বলিতে টপ্‌টপ্ করিয়া চোখের জল ছেলের গায়ে ঝরিয়া পড়িল। ছেলে চম্‌কাইয়া দুই হাত নাড়া দিয়া কাঁদিয়া জাগিল। মাতা অশ্রু-অন্ধ-নেত্রে মুখ ফিরাইলেন।

বৈবাহিকের পূজাবাড়ী হইতে লাঞ্ছনা কশাহত চিত্তে ফিরিয়া আসিবার পর দীননাথ শেষ আশা বিসর্জ্জনে, একেবারেই ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন। রাগ অভিমানের ব্যাপার নয়,—যথার্থ ই ইহারা অতি সামান্য কারণকে ছুতা ধরিয়া, তাঁহার নিরপরাধিনী কন্যাকে জন্মের মতই পরিত্যাগ করিয়াছে ! শুধু তাই নয়,—সব জানিয়া শুনিয়াই,—শুদ্ধ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে, সতীর পবিত্র নামে কলঙ্ককালিমা লেপন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ভগবান্ ! ভগবান্ ! তোমার হস্ত কি ইহাদের সৃষ্টি করে নাই ? তবে এতটুকু এক-বিন্দু মনুষ্যত্ব দানে কেন ইহাদের তুমি বঞ্চিত করিয়া সৃজন করিলে ? পিতা, পুত্র, জননী—এতগুলার মধ্যে বিবেকের এতটুকু লেশও কি কোথাও ছিল না ?—ওগো, তবে এমন করিয়া দরিদ্রের সর্ব্বনাশ তোমরা কেন করিয়াছিলে ? আর তুমি ?—শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, ধনী-সন্তান ! ধনী-গৃহে তোমার উপযুক্তা পাত্রীর তো অভাব ছিল না। তবে কিসের মোহে, ক্ষণিকের কোন্

লঘু খেয়ালবশে এই অন্ধের নাড়িটুকু লইয়া খেলিবার সাধ হইল? দু'দিনেই তোমার সে খেলার সখ ফুরাইয়া গেল—পুরাতন খেলানার মত উহাকে তুমি দূরে ফেলিয়া দিলে।—তোমার ইহাতে ক্ষতি কি? লক্ষপতি পিতা বিদ্যাধরী কন্যা আনিয়া তোমার হাতে এখনই তো আবার সঁপিয়া দিবে,—যেহেতু তুমি বিদ্বান, সচ্চরিত্র ধনী পুত্র!—কিন্তু তোমার ঐ তুচ্ছ খেয়াল দরিদ্রের আজ যে সর্ব্বনাশ সাধন করিল, তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার কি জগতে কোথাও কিছু আছে? না—না,—না, এ প্রায়শ্চিত্ত! লোভাতুরের,—অতি লোভের—মহাপাতকের মহাপ্রায়শ্চিত্ত! এর জন্য কাঁদিতে বসিলে চলিবে কেন? 'গরীব কেন গরীবের মত থাকে না?' সংসারে তো দরিদ্রের সংখ্যা অল্প নয়! উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দেওয়া কি জগতে সব চেয়েই কঠিন? তা যদি হয়, তবে এ দুর্দ্দশা না ঘটিবে কেন?

অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীমান্ অরবিন্দ বসুর সহিত ভবানীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ দত্তের কন্যা শ্রীমতী ব্রজরাণীর শুভ পরিণয়বার্ত্তা যখন লোক-পরম্পরায় দীন মিত্রের গৃহে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দীননাথ রোগশয্যায় শয়ানই ছিলেন। এই সুসংবাদটুকু কর্ণগোচর হওয়ার পর তাঁহার পরলোক গমনের কাল আর বহুবিলম্বিত হয় নাই। মরণের পূর্ব্বে নিজের দুইবারেরই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তিনি কন্যার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। বুকফাটা হাহাকারে মনোরমা ইহার জবাব দিয়াছিল, "বাবা, তুমি আমার জন্যে যা ক'রেছ, ক'জন বাপে তা পারে? আমার কপাল মন্দ, তুমি কি করবে?"

এই সান্ত্বনাটুকুকে সম্বল করিয়া লইয়াই বোধ করি পিতা তাহার অতঃপর শান্ত হইয়া চোক মুদিলেন।

এ সব অতীত কাহিনী,—এখন বর্ত্তমানের খবর লওয়া যাক্।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রামস্য মধুরং বৃত্তং গায়ন্তৌ মাতুরগ্রতঃ।
তদ্বিয়োগব্যথাং কিঞ্চিৎ শিথিলীচক্রতুঃ সুতৌ॥

—রঘু।

বর্দ্ধমান রাজের বিবাহোৎসব উপলক্ষে রাজধানী সে সময় প্রমোদ-সাগরে ভাসিতেছিল। আজকাল এই বিবাহ সম্বন্ধীয় আলোচনা ব্যতীত বর্দ্ধমান সহরে অপর কোন কিছুই আলোচিত হয় না। দেশ ব্যাপিয়া ঐ একই কথা। বরের পোষাকের কি রকম বিশেষত্ব দেখা গিয়াছে,—ভোজের আয়োজনের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যবস্থাটা ভাল এবং কোন্টাই বা নয়,—নাচ তামাসার বন্দোবস্তে কি কি ত্রুটি থাকিল, কি-ই বা নাই,—এমনি সব মন্তব্য কোলাহল—তা, কি নিষ্কর্ম্মার চণ্ডীমণ্ডপ, কি সরকারী কাছারী বাড়ী,—কোনখানেই বাদ পড়িতেছিল না। স্কুল কলেজ, এমন কি, পাঠশালার ছেলেরা শুদ্ধ এই সকল এবং ইহা ব্যতীত আরও নূতনতর আন্দোলনে যোগদান পূর্ব্বক নিজেদের পাঠ্য সম্বন্ধে অমনোযোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল।

চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। স্কুলের ছুটীর পর ছেলের দল বাড়ী ফিরিতেছিল। আজিকার পর অনেকগুলি দিনই তাহাদের স্কুলের ছুটী। দলবদ্ধ হইয়া প্রবৃত্তি অনুসারে, কতক রাজবাটীর দিকে, কতক ষ্টেসনের পথে, কতক নাচ গানের মজ্‌লিস্ অভিমুখে,—এমনই যেদিকে যাহার খুসী, সেই দিকেই ভিড়িয়া পড়িল। যে সব ছেলেরা চুরি করিয়া এক আধটুকু সাহিত্যালোচনা করিয়া থাকে,—তা' সে যতটুকুই হোক্,—এই সব ভবিষ্যতের উদীয়মান কাব্য-সুধাকরগণ অপর এক যুক্তি আঁটিতে বসিল।

সাহিত্যিক রাজার বিবাহে জনকতক রাজ-পরিচিত সাহিত্যিকের নিমন্ত্রণ ছিল। ৬টা কত মিনিটের ট্রেণে তাঁহাদের ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিবার কথা। ধ্বজা পতাকা হাতে লইয়া তাহাদের একটু সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া আনা ইহাদের ইচ্ছা। একটি হৃষ্টপুষ্ট, সুদর্শন বালক,—বয়সে তাহাকে শিশু বলিলেও বলা যায়,—সে ছেলেটি এক ধারে দাঁড়াইয়া, নিজের পাঠ্য-পুস্তকের ছবিগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। তাহার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাহারই একটি সহপাঠী পিছন হইতে বলিয়া উঠিল, "দুত্তোর! এ ছোঁড়াটা দেখি একেবারেই বয়ে গ্যাছে! ওরে ও গাধা! তোর ও হিষ্ট্রী অফ্ ইংল্যাণ্ড হাউই হ'য়ে উড়ে যাবে না রে, যাবে না। আজকের দিনে ওটা হাত থেকে নামা।"

'গাধা' সম্বোধিত ছেলেটির আকারে প্রকারে উক্ত জানোয়ারের সহিত কোনই সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। সে তৃতীয়-শ্রেণীর 'ফার্ষ্ট বয়'। তদ্ভিন্ন পর্য্যন্ত যে কয়টা শ্রেণী সে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সব কয়টাতেই প্রথম হইয়া উঠিয়াছে। একবার বুঝি ডবল প্রমোসনও পাইয়াছিল। নিজের পাঠ্য ব্যতীত অপর কোন কিছুরই ঝোঁক তাহার নাই। সহসা এইরূপে অভ্যর্থিত হইয়া, ছেলেটি ঈষৎ চম্‌কাইয়া গিয়াছিল; বই মুড়িয়া এবং মুখ তুলিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হাস্যের সহিত উত্তর দিল, "না, এই যে বাড়ী যাই—"

পৃষ্ঠ-আক্রমণকারী তখন স্কন্ধ ত্যাগ করিয়া ঘাড় ধরিয়াছে। গলার কলারটা চাপিয়া ধরিয়া, তর্জ্জনের স্বরে সে বলিল, বটে রে রাস্কেল! আবার বাড়ী যাবার বায়না উঠ্‌চে! যাঃ, আজকের দিনে আর এক্ষুণি কেউ বাড়ী যায় না।"

আর একটি ছেলে আসিয়া হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "আমরা সবাই বওয়াটে, আর একমাত্র উনিই যা 'গুড্‌বয়।' যাঃ, যাঃ! বাড়ী যেতে হবে না। চল্, পাঞ্জাবীদের ও-দিক্‌টায় কি রকম কি হচ্চে টচ্চে, দেখে আসা যাক্।"

ছেলেটী হাত টানিয়া লইয়া পতনোন্মুখ বইগুলি সাম্‌লাইল; পরে বিনীতভাবে কহিল, "বাড়ী না গেলে মা বড্ড ভাব্‌বেন যে ভাই! এখন আর আমি কোথাও যেতে পার্‌বো না। কাল সকালে বরং দেখা যাবে।"

"তাই তো রে,—ভুলে গেছলুম যে!—তোর যে মা আছে,—আমাদের তো মা নেই! আর থাক্‌লেও, তারা আমাদের জন্যে ত আর ভাবে না—"

"আমরা যে ভাই মায়েদের ত্যজ্য পুত্তুর,—ও যে ভাল ছেলে। 'গোপাল অতি সুবোধ বালক; সে যা পায় তাই পরে, যা পায় তাই খায়'।"—

"যা—যা, মায়ের দুধ খে' গে' যা। দেখি,—গলা শুকিয়ে যায় নি তো? আহা বাছা রে!"

ছেলেটী কাঁদো-কাঁদো অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল,—অভিমন্যুর মত সে বালকটিও এই বিপক্ষ-প্লাবন মধ্যে অসহায় এবং একা।

ইহাদের অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মধ্য হইতে কয়েকটি ছেলে মিলিয়া একটি দল গঠন করিয়া, পাশ দিয়া যাইতেছিল,—কে একজন কাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চলেছ হে?" উত্তরটাও শোনা গেল, "ষ্টেসনে যাচ্চি, যাবে না কি?"

"কেন বলো দেখি? কে কে আস্‌ছে?"

"অনেকেই তো আস্‌বেন শুন্‌চি,—রাজ-বন্ধু সাহাত্মকের দল প্রায় সব্বাই-ই নাকি আস্‌ছেন।"

"তা হলে অরবিন্দবাবুও আস্‌চেন বোধ হয়?"

সেই পাঠে মনোযোগী মুখচোরা ছেলেটি হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল!

"কোন্ অরবিন্দ হে? সিবিল সার্ব্বিসের অরবিন্দ ঘোষ * না কি?"

"উঁহুঃ, তিনি কেন? অরবিন্দ বোস,—অমৃতবাজারে, বেঙ্গলীতে

---

* ইহা ১৩০৪ সালের কথা।

ইংরেজি প্রবন্ধ পদ্য প্রায়ই বেরোয় দেখ না? প্রদীপ, ভারতী আরও কিসে কিসে মধ্যে মধ্যে বাংলা কবিতাও লেখেন যে;—রাজার খুব আলাপী।"

"সেই অরু বোস্‌টা? হেঃ, সে আবার একটা লেখক! ঠান্‌দি একটি কি যে ছড়া বলে—'আরসোলা হলো পাখী, কুমীর হলো ঢেঁকি' তেমনি অরু বোস্ হলেন কবি? গিয়েছি যে!"

"কেন ভাই, বোসজা তো বড় মন্দ লেখে না। ওর পদ্যগুলোর বেশ একটা 'ফ্লো' আছে! আমার তো বেশ লাগে।"

"শালুক চিনেছেন মাকাল ঠাকুর! যাও,—কাঁধে করে, গাড়ি বয়ে, ভক্তি-প্রস্রবণ ছুটিয়ে দাও গে। আমি তা' বলে ওসব 'হম্‌বগ্‌দে'র জন্যে কাঁধ পাত্‌তে যাচ্চিনি। হ্যাঁ, আস্‌তেন্ মিষ্টার টেগোর, অবিশ্যি কাঁধ ছেড়ে মাথা পেতে দিতাম।"

পাঠ্য-পুস্তকগুলা বগলে চাপিয়া, তৃতীয়-শ্রেণীর সেই বালক ছাত্রটি এক লাফে প্রথম-শ্রেণীর বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছাত্র-দলে মিশিয়া গেল। যে ছেলেটি অরবিন্দের কবিতার সুখ্যাতি করিয়াছিল,—উজ্জ্বল, আয়ত নেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া, উৎসাহ-দীপ্ত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আপনি তাঁকে চেনেন?" ছেলেটি ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া, সবিস্ময়ে ইহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে চিনি, বল তো?"

বালকটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া জবাব দিল, "এই শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ বসু মহাশয়কে?"

"অরবিন্দ বাবুকে?—না কখন দেখি নি,—লেখাটা পড়েছি। কেন? তুমি বুঝি ওঁর কবিতা খুব পছন্দ করো?"

"আমি,—আমি তো ওঁর কবিতা কখন দেখি নি। আপনার কাছে আছে?"

"আমার কাছে? না, আমার কাছে বোধ হয় নেই। আমি তো মাসিক পত্রটত্র জমিয়ে রাখিনে, সে সব দাদা—, এঁরাই করেন টরেন।"

বালকটি একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। মুখ দেখিয়া বোধ হয় যেন বিশেষ আশা ভঙ্গে সে কিছু ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এই সময় অপর একটী ছেলে সেখানে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "কিবে অজু, তুই আবার সাহিত্যিক হলি কবে থেকে রে? মা গো মা, আজকালকার দিনে ছেলেগুলো যেন কি হচ্ছে! গাল টিপ্‌লে যার আজও দুধ বার হয়, তিনিও হচ্চেন সাহিত্যিক! দেখে আর বাঁচনে। কি যে একটা মা বলে—'যত ছিল নেড়াবুনে,—সবাই হলো কীর্ত্তনে,—কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে খত্তাল।"

অজিতের দল তখন যাত্রা সুরু করিয়া দিয়াছে। এ সব টিট্‌কারীতে তাহার গতি রোধ করিতে পারিল না।

ট্রেণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে যে কয়েকটি ভদ্রলোক অবতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজকর্ম্মচারিগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া উপযুক্ত স্থানে প্রেরিত হইলেন। সাহিত্য-সেবীর দল,—রাজ-সম্মানের উপর,—যে সম্মানের দাবী তুলিয়া কবি কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের বিরাগভাজন হন, অর্থাৎ 'বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে'—এই নীতির বলে, এক দফা উপরি আদর আপ্যায়ন লাভ করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসাবাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সব ছেলেরা চলিয়া আসিল; অগত্যা অজিতকেও বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে তাহার একেবারেই মন সরিতে ছিল না। কে অরবিন্দ? ত্রয়োদশজন সাহিত্যিকের মধ্যে অরবিন্দ বসু যে কে, তাহা এই সাহিত্য-সেবক-বৃন্দের সেবক দলের কেহই অবগত নহে। ইহাদের মধ্যে অরবিন্দ-ভক্ত ছেলেটি এমনই সহসা নিজের কৌতূহল-বৃত্তিকে আশ্চর্য্যরূপে সংযত করিয়া ফেলিয়াছিল, যে, আগ্রহের উগ্র তাড়নায় জরাতুর-বৎ শুষ্ককণ্ঠ, রুদ্ধশ্বাস এই ব্যাকুল বালকটি নিরুপায় ক্ষোভে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া, নিজেকে অনেক সময় অভিসম্পাতও করিয়া ফেলিতেছিল। এতগুলি লোকের মধ্য হইতে সে নিজের ঈপ্সিতকে চিনিয়া লইতে পারিতেছিল না, যাহাকে জানিবার, চিনিবার, জানাইবার, চিনাইবার জন্য ক্ষুদ্র বুকখানির

মধ্যে অশান্ত হৃদ্‌পিণ্ড উদগ্র উত্তেজনার কলকল্লোল সৃজন করিতেছিল, সুষুপ্ত রাক্ষসী ক্ষুধা যেন কেমন করিয়া হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া, উগ্র বাসনা-রূপে তাহার শিশু-চিত্তকে পীড়িত, পিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে কিছুতেই কিন্তু আজ তাহার মুখ ফুটিতেছিল না। অজিত চিরদিনই সপ্রতিভ। বিশেষ করিয়া পড়াশোনার বিষয়ে কাহারও সহিত আলোচনা করিতে অপরিচয়ের লজ্জাও তাহাকে কখন বাধা দিতে পারে নাই। এ বয়সে নিজের স্কুলপাঠ্য বিষয় ছাড়িয়া দিলেও অনেক বিষয়ের আলোচনা সে করিয়াছে। পাঠ্য অপাঠ্য যেখানে যা পায়, সবই সে নির্ব্বিচারে পড়িয়া থাকে; এইজন্য সহপাঠীর চেয়ে মাষ্টারদের সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠতা অধিক। কিন্তু আজ আর কিছুতেই তাহার মুখ খুলিল না।

সন্ধ্যার পর সবাই যখন চলিয়া আসিল, উত্তেজনায় ও ব্যথায় পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া সেও সেই সঙ্গে ঘরে ফিরিল। যেমন অনেকবারই ঘটিয়াছে— মনোরমা ছেলের প্রতীক্ষায় দ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতেছিল। ঈষৎ রুক্ষ-কণ্ঠে "এত রাত যে অজু"?—বলিতে বলিতেই নিঃশব্দে অজিত আসিয়া একেবারে মায়ের কোল ঠেসিয়া বুকে মুখ গুঁজিল। এ ঘটনা নূতন। মায়ের কণ্ঠস্বরের অতটুকু উচ্চ গ্রামও আর কখনও অজিতকে এমন করিয়া মায়ের বুকের মধ্যে টানিয়া আনে নাই। ভয়ে এবং তদপেক্ষা শতগুণ অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া, অপরাধী বালক পাথরের মূর্ত্তির মত কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। শেষকালে সেই মাকেই আবার কঠোরতার খোলসখানা খুলিয়া ফেলিয়া, অজস্র আদরের ধারা ঢালিয়া দিয়া, তবে অভিমানীর অভিমান বেদনা ঘুচাইয়া অহাকে কোলে পাইয়াছে। আজ এই চিরন্তন রীতির ব্যতিক্রমে মনোরমা ঈষৎ বিস্মিত হইয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আশ্চর্য্যাভিভূত চিত্ত অনুভব করিল যে, অজিতের নিঃশব্দ রোদন তাহার বুকের বসন ভিজাইয়া, বক্ষঃস্থলে অশ্রুজলের উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়াছে।

এ কান্নায় যে অনুতপ্ত লজ্জা ব্যতীত আরও অনেকখানি কিছু মিশ্রিত রহিয়াছিল, মায়ের প্রাণ তৎক্ষণাৎই ইহা অনুভব করিতে পারিল। বড় দুঃখ না হইলে সে তো কখনও মার বুকে আসিয়া পড়িয়া এমন করিয়া কাঁদে না! কিসের এ কষ্ট? এ প্রশ্ন মনের ভিতরে শতসহস্রবার জাগিয়া উঠিতে থাকিলেও, মা ইহাকে মুখে ফুটিতে দিল না। সুগভীর স্নেহভরে শুধু ব্যথিতের ব্যথাভরা বুকখানি নিজের সর্ব্বসন্তাপহরা মাতৃ-হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বনের পর চুম্বন করিল।

হঠাৎ এক সময়ে মনোরমা লক্ষ্য করিল, অজিতের মুখখানা বড় বিষণ্ণ। সেই পূর্ব্ব সন্ধ্যা হইতেই তাহার মুখের কথা কদাচিৎ শুনা গিয়াছে। সে যেন কি একটা বাল-স্বভাব-বহির্ভূত নিগূঢ় চিন্তায় ডুবিয়া রহিয়াছিল, এবং সেই দুশ্চিন্তার ফলে, থাকিয়া থাকিয়া, তাহার আয়ত দুটী চক্ষু বেদনাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কিসের এ চিন্তা? এ পৃথিবীতে দুঃখ এবং চিন্তার বিষয় এই বালকটির জন্য একটুখানি অধিক পরিমাণেই সঞ্চিত করা আছে, তা সত্য, কিন্তু সেগুলাকে উপভোগ করিবার কাল তো এখনও উপস্থিত হয় নাই! অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের মধ্যে সে অবসর তো অদূর-ভবিষ্যতে সুপ্রচুর সঞ্চিতই আছে,—থাক্ না। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা ত একদিন দেখা দিবেই, ঠেকাইবে কে? তাহাকে পাওয়ার জন্য এ অকাল-বোধন কেন? যে ক'টা দিন ইহার বাহিরে বাহিরে কাটিয়া যায়, সেই কয়টা দিনই না তাহার পক্ষে শুভ-দিন।

স্কুলের সেদিন ছুটী। ভাত খাইয়া উঠিয়াই, যেন সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া, হঠাৎ অজিত মায়ের চাবিশুদ্ধ আঁচলখানা ধরিয়া ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল, "মা, আমি তোমার চাবিটা একবার নিয়ে যাচ্ছি।"

"চাবি কি করবি রে?"

"আমার দরকার আছে।" বলিয়া অজিত রিংয়ের ফাঁসে টান দিল।

"না—না, চাবি খুলে এখন সৃষ্টি ছড়াতে হবে না।" বলিয়া মনোরমা

বাঁ হাত দিয়া আঁচলটা টানিয়া লইতে গেল। ছেলেকে খাওয়ান শেষ হইবার পর তখনও তাহার হাত ধোওয়া হয় নাই।

"একবারটি দাও মা, আমি তোমার কিচ্ছু ছড়াব না—" বলিতে বলিতেই অজিত মায়ের আঁচল জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়াই, সহসা অশ্রুস্পন্দিত চোখে মুখ ফিরাইল। অন্য দিন হইলে এতটুকুতেই অভিমানে ভরিয়া গিয়া মাকে ছাড়িয়া দিত, আজ তাহা করিল না; বরং সেইরূপ মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া, ধরা গলায় আবার বলিল, "আমার যে বড্ড দরকার।"

ছেলের সেই বর্ষণোন্মুখ শারদ মেঘের মত রোদন-ভারাতুর মুখের দিকে আবার কিছুক্ষণ বিস্ময়-স্তম্ভিত-নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, মনোরমা নিজের হাতে চাবির গোছাটা খুলিয়া লইয়া তাহাকে দিতে, সে তৎক্ষণাৎ, যেন কি নিধি পাইয়াছে, এমনি করিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল। তখন তাহার মুখের মেঘে বিদ্যুতের আলো খেলা করিতেছিল।

মনোরমার ব্যাক্সের মধ্যে তাহার স্বামী অরবিন্দের একখানি ফটোগ্রাফ ছিল। বর-বেশে নয়,—বিবাহের পূর্ব্বে বি-এ. ডিগ্রি লইবার জন্য কন্‌ভোকেশনের প্রত্যাবর্ত্তন-পথে সময়োচিত-বেশে এই ফটোখানা লওয়া হয়। অন্য কোন ভাল ছবি হাতে না থাকায়, 'মধু অভাবে গুড় দেওয়া'র বিধির মত অরবিন্দ তাহাকে সেইখানাই দিয়াছিল। অবশ্য আর একখানা ভাল ছবি শীঘ্র দিবার প্রতিশ্রুতি থাকিলেও, সেখানা যখন আর দেওয়া ঘটিয়াই উঠে নাই, তখন এ জন্মের জন্য এই মন্দ ছবিখানাই মনোরমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন না হইয়া আর গত্যন্তর কি? কাজে কাজেই সে ইহাকে খুবই যত্ন সন্তর্পণে মুড়িয়া-গুড়িয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিল; এবং অবসরমত ফিরিয়া ফিরিয়া সেখানাকে সে মধ্যে মধ্যে দেখিতেও ছাড়িত না। শুধু নিজে দেখিয়াও তৃপ্তি নাই। ছেলে তার অত্যন্ত শৈশব হইতেই নিজ পিতার এই প্রতিকৃতিটুকু দেখিয়া থাকিবে—না'হোক্ তবু হাজারবারের একবারও কম নয়। আজ যখন নিজের চোখের দৃষ্টি দিয়াও সে পিতৃ-পরিচয়

লাভ করিতে পারিল না, তখন সে অক্ষমতার অকথ্য লজ্জা তাহার শিশু-চিত্তে অপরিসীম হইয়া বাজিল। ছি—ছি—ছি! এ ঘৃণার কথা যদি অপরে জানিতে পারে? ছেলে হইয়া নিজের বাপকে চিনিতে পারে না! মায়ের 'পরে অভিমান হইল, মা কেন তাহাকে ভাল করিয়া বলিয়া দেন নাই। নিজের পরে রাগ ধরিল, পিতাকে না দেখুক,—সে তো তাঁহার ছবি দেখিয়াছে, তবে তাঁর চেহারাটা মনে থাকে না কেন? এই এতগুলি লোকের মধ্যে অরবিন্দ বসু কোন্ জন,—কেহ না বলিয়া দিলে আপনা হইতে তাহার যদি চিনিবার উপায় থাকিত, যদি উনিও তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিতেন, তাহা হইলে কেমন সুখ হইত? ট্রেণ হইতে নামিলেই সে ছুটিয়া গিয়া উঁহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিত। তিনিও তা' হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া চুমা খাইতেন। আচ্ছা, কোথায় চুমা খাইতেন? অন্য সবারই মত মাথার চুলের উপর? না, মার মত গালে, ঠোঁটে, কপালে? না, মাথায় নয়,—হয় ত দু'গালেই চুমা লইয়া মায়েরই মত আদর করিতেন। পিতার সেই বেগবান্ স্নেহাতুর অন্তরের আবেগ মধুর আদর-কল্পনায় শিশু অজিত একান্ত লোভাকুল হইয়া উঠিতে থাকিলেও, নিরুপায়ের ব্যথায় বুক তাহার ভারি হইয়া রহিল। সে তো চেনে না,—এই সম্মানিত রাজ-অতিথি-বর্গের মধ্যে কে অরবিন্দ বসু,—কে তাহার পিতা!

মায়ের বাক্সের চাবি পাওয়াতে সকল সংশয় ঘুচিয়াছে মনে করিয়া, আনন্দ-ব্যগ্রতায় আত্ম-বিস্মৃত বালক উচ্চ আনন্দধ্বনি করিয়া তীব্রবেগে ছুটিল। মায়ের সেই ছবিখানা একবার দেখিয়া লইতে পারিলেই তাহার সকল সন্দেহের অবসান হইয়া যায়;—তখন তো আর পিতা পুত্রের মাঝখানে অ-পরিচয়ের ব্যবধান থাকিবে না। কিন্তু এ আবার কি বিড়ম্বনা! ওই নবোদ্গত গুম্ফযুক্ত সরস-মধুর হাস্যবিমণ্ডিত তরুণ মুখের প্রতিকৃতির সহিত সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতাহত সেই সব তারুণ্য-বিহীন বাস্তব মূর্ত্তির এক-তমেরও যে এতটুকু সাদৃশ্য পাওয়া যায় না! এই আয়ত-গভীর আনন্দ-

গৌরবোজ্জল দৃষ্টিই বা তাদের চক্ষে কোথায়? অজিত ছবি হাতে করিয়া হতভম্ব হইয়া রহিল। কাল হইতে বড় হতাশ্বাসের মধ্যেও যে এই একটি-মাত্র আশাকেই সে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া রাখিয়াছিল!

মনোরমা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেও, ছেলেকে ধ্যানী বুদ্ধের ন্যায় দুই হাত কোলে রাখিয়া, চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, সশব্দে হাসিয়া ফেলিল। সেই শব্দে সচকিত হইয়া, হাতের ছবিখানা কাপড়ের মধ্যে গোপন করিয়া ফেলিতে গিয়া, অজিত যখন মায়ের দিকে মুখ তুলিল, তখন আর একবার সে মুখের বিষণ্ণ ছবি মনোরমাকে অবাক্ করিয়া দিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই গোপনীয় পদার্থটা চোখে পড়িয়া গিয়া, তাহার নিকট হইতে সকল রহস্যেরই যবনিকা খসিয়া পড়িল। যাহা স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক,—এ তাহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। হয় ত কাহারও নিকট কোন কথা শুনিয়া,—অথবা না শুনিয়াও হইতে পারে,—বাপের জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা আবেগ উঠিয়াছে। ইহা আর এমন বিচিত্র কি? অজু তো আর বোকা ছেলে নয়,—বয়সের চেয়ে বুদ্ধি তার ঢের বেশী। তাহাদের পিতা পুত্র সম্বন্ধের মাঝখানে যে কোথাও একটা গলদ্ আছে, এই সত্যটুকু আবিষ্কার করিয়া মার মনে কষ্ট দিবার ভয়ে সঙ্গোপনেই নিজের মানসিক তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। কিন্তু এরই মধ্যে সে মাকে লুকাইতে শিখিল কেমন করিয়া? এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তড়িৎ স্রোতের মত এই কথাগুলা মনোরমার মনের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া, কাল হইতে ক্লিষ্ট পুত্রের অন্তরের সমুদয় ক্লেশদাহ যেন তাহাকে বিছার মত কামড়াইয়া ধরিল। আহা, সে কেন মার কাছে গোপন করিয়া এতক্ষণ ধরিয়া দুঃখ পাইল? মনো কেন আপনা হইতে আন্দাজ করিয়া, নিজের ছেলের দুঃখ নিজের মন দিয়া বুঝিতে পারিল না। এই রকম সে মা? বসিয়া পড়িয়া, ছেলেকে কোলের উপর প্রায় টানিয়া লইয়া, তাহার মুখে মাথায় হাত দিয়া আদরের সহিত বলিল, "আমায় তুই লুকুলি কেন অজু?"

অজিত তখন বড় লজ্জা পাইয়াছে। কিন্তু মার কাছে কথা গোপন করা যে তাহার জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম। এতক্ষণে সে লুকোচুরি কাটিয়া যাওয়াতে, তাহার ক্ষুদ্র চিত্তের বিষম ভারও সেই সঙ্গে লঘু হইয়া গিয়াছিল। মায়ের স্পর্শমধ্যে নিজেকে এতটুকু ছোট শিশুটির মতই নিঃসহায়ে নিক্ষেপ করিয়া, লজ্জায় একটুখানি চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিবার পর, হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া বসিল এবং কাপড়ের মধ্য হইতে ছবিখানা বাহির করিয়া মায়ের চোখের সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া কহিয়া উঠিল, "এই ছবির মুখ থেকে সত্যিকারের বাবার মুখ কেমন করে চিন্‌তে পারা যাবে বল দেখিন্? তুমিই দেখ না—একটুকুও তো কোথাও মিল নেই।"

প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া, শেষে ঈষৎমাত্র বিমর্ষ হাস্যের সহিত মাতা জিজ্ঞাসা করিল, "মিল নেই তুই কি করে জান্‌লি রে?"

অজিত কুঞ্চিতালকযুক্ত ক্ষুদ্র মাথাটি নাড়া দিয়া জবাব করিল, "সে আমি জানি গো জানি। কাল বুঝি আমি সাহিত্যিকদের অভ্যর্থনা করে আন্‌তে ষ্টেসনে যাইনি? তা'হলে শুধু শুধুই বুঝি আমার বাড়ী ফির্‌তে অত দেরি হলো? কেন হ'লো বলো তো?"

"কাদের আন্‌তে কোথায় গেছ্‌লি?"

"সাহিত্যিকদের আন্‌তে ষ্টেসনে গেছলুম যে আমি।"

"তার সঙ্গে এ ছবির সঙ্গে কি?"

"বাঃ, ছবি না দেখ্‌লে আমি বাবাকে কেমন করে চিন্‌তে পার্‌বো? আমি বুঝি তাঁকে কক্ষনো দেখেছি? তোমার কিছুই মনে থাকে না মা! সেই সেবারে ঠাকুরদাদা মশাই স্বর্গলাভ কর্‌বার পর, বাবা এসে আমাদের নিয়ে যেতেন,—তা তাঁর খুব অনেক কাজ ছিল ব'লে তো আর আস্‌তে পারেননি। সেই জন্যেই তো তাঁকে আমি কাল ষ্টেসনে চিন্‌তে পার্‌লুম না। আর তিনিও—"

আপনার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বলা যায় না,—অজিতের কপালের

উপর মনোরমার অঙ্গুলিগুলা নিজেদের মৃদুক্রীড়াশীল গতি সহসাই হারাইয়া ফেলিল, তাহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া বাহির হইল, "কা'কে ষ্টেসনে দেখে তুই চিন্‌তে পার্‌লি নে অজু? কে এসেছে?"

"কেন, বাবা বুঝি রাজার বাড়ী আসেন নি? তিনি বুঝি একজন সাহিত্যিক ন'ন্? রাজার সঙ্গে যে তাঁর ভাব আছে। তুমি কিচ্ছু জানো না মা?"

যেখানকার হাত সেইখানেই স্থির রাখিয়া মনোরমা জড়বৎ বসিয়া রহিল। ছেলের এই ছেলেমানুষী কথায় হাসিবে কাঁদিবে কি,—সে কথা কয়টা তাহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে পৌছাইয়া দিতেও হয় ত বা পারে নাই।

অজিত কচি ছেলে,—সে অত শত বুঝে না,—আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল, "বাবা না কি অমৃতবাজারে, বেঙ্গলীতে ইংরেজী প্রবন্ধ, আর প্রদীপ, ভারতী আরও কিসে কিসে কবিতা লিখে থাকেন, সে সব না কি খুব ভাল হয়। আমি কিন্তু কিচ্ছুই পড়িনি, তুমি পড়েছ মা?"—

মাতাকে নীরব দেখিয়া আপনিই আপনার জিজ্ঞাসার সমাধান করিয়া লইল। "কেমন করে পড়বে, ও-সব মাসিক পত্রিকা টত্রিকা কিচ্ছুই তো আর আমাদের এখানে আসে না। হ্যাঁ মা, আমাদের ওগুলো এইবার থেকে নিতে হবে মা,—বাবার লেখা পড়তে আমার বড্ড ইচ্ছে কর্‌ছে। বাবাকে যদি চিন্‌তে পারি, আমি তাঁকে তাঁর পুরনো লেখাগুলো আমায় দিতে বল্‌বো,—কেমন মা? বাবা নিশ্চয় দেবেন,—হ্যাঁ মা, দেবেন না?"

মনোরমা এতক্ষণ পরে যেন ধ্যান ভাঙ্গিয়া উঠিয়া জবাব দিল, "কি?"

অজিতের শেষ-কথাটা মাত্র তাহার কাণে ঢুকিয়াছিল।

"পুরনো লেখাগুলো।"

"কে' কা'কে দেবে রে?"

"বাঃ, তুমি বুঝি এর মধ্যে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলে? বাবার পুরনো লেখাগুলো চাইলে বাবা আমায় দেবেন না?"

"হুঁ, অজিত!"

মায়ের গলার স্বরে নিজের অনভিজ্ঞ শিশুত্ব সত্ত্বেও অজিতের বুকের মধ্যে যেন তাহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে একটা বিস্ময়ের চমক বিদ্যুতের মত বহিয়া গেল। সে মায়ের মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "উ।"

"তিনি সত্যি এখানে এসেছেন? তুই ঠিক্ জান্‌তে পেরেছিস্?"

"কে' মা? কে' মা?"

মনোরমা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া বলিল, "কি মুখ্যু ছেলে তুই! এই যে বল্‌লি তাঁকে চিন্‌তে পার্‌লি নে, আবার এরই মধ্যে সব ভুলে খেয়ে ফেলেছ!"

"বাবার কথা বল্‌ছো? হ্যাঁ—হ্যাঁ, তিনি এসেছেনই তো। আরও অনেক লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন কি না, তাই জন্যে হয় ত আমাদের বাড়ী আস্‌তে পারেন নি। তিনি যদি একলা থাক্‌তেন, আমি তাঁকে ঠিক্ চিন্‌তে পার্‌তুম। মা, তুমিও কিন্তু ওঁকে দেখলে কক্ষনো চিন্‌তে পার্‌বে না, পার্‌বে না! এই যে তোমার ছবিটি দেখ্‌ছো, এটি থেকে যে তুমি তাঁকে চিনে ফেল্‌বে, সেটি কিন্তু মনেও ক'রো না। বোধ করি এই বিশ্রী 'ক্যাপ্'টা পরার জন্যই মুখটা একেবারে অন্য রকম হ'য়ে গেছে!"

মনোরমার অসীম ধৈর্য্য আকস্মিক প্রচুর বর্ষাবারিপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রা তটিনীর মতই বিপর্য্যস্ত হইতে বসিয়াছিল। সেই আবেগে ভাসিয়া গিয়া, সহসা দুই ব্যগ্র করে সে অজিতকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া, রুদ্ধ ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমায় কি একটি বারের জন্যেও দেখাতে পারিস্ না রে, অজিত! এত কাছে রয়েছেন, একবার আমায় দেখা।"

"তুমি! তুমি কেমন ক'রে দেখ্‌তে যাবে মা? সেখানে যে অনেক সব লোকজন রয়েছে, তুমি তাদের সাম্‌নে কি ক'রে বার হবে?"

মনোরমার মুখে মুমূর্ষু রোগীর শেষ পিপাসার মত অনিবার্য্য তৃষ্ণা-কাতরতা যেন মূর্ত্তিমৎ হইয়া উঠিল। জোর করিয়া ছেলের দু'হাত নিজের দু'হাতের মুঠা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া, সে যেন প্রাণপণ শক্তি খরচ করিয়া এক নিঃশ্বাসেই বলিয়া ফেলিল, "যে ক'রে হয় নিয়ে যা, অজু! বড় হয়েছিস, বুদ্ধি বার কর। যুগযুগান্তর হয়ে গেল আমি যে দেখি নি। কাছে পেয়েও যে সেবারকার সেদিন আমার ব্যর্থ চলে গেছে!"

মাকে কোন দিন সত্যকার রাগ করিতে, বা এমন উত্তেজনার সহিত কথা কহিতে, বা এভাবে নিজের অন্তস্তলশায়ী সযত্ন-রুদ্ধ নিজের আত্মবেদনা প্রকাশ করিয়া কাহাকেও জানাইতে অজিত আজ পর্য্যন্ত দেখে নাই। তাই সবটা বেশ তলাইয়া না বুঝিলেও, মায়ের উদ্বেলিত মনের বার্ত্তা তাঁহার এই আকুল কণ্ঠস্বরে সে যেন কিছু-কিছু অনুভব করিতে পারিল। স্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক কি ভাবিয়া লইয়া আকস্মিক শিশুজনোচিত আশ্বাসভরা বুকে মুখ তুলিতেই, মায়ের দুই মিনতিভরা উদ্বিগ্ন চোখের সহিত তাহার উৎসাহিত দৃষ্টি সম্মিলিত হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ হাসিয়া ফেলিয়া, মায়ের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া, দুই হাতে মায়ের গলাটা জড়াইয়া ধরিল ও একমুখ হাসির সহিত পূর্ণোৎসাহে কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা মা, ঠিক্ আমি তাঁকে তোমায় দেখাব।"

মনোরমার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা অর্দ্ধস্ফুট আনন্দধ্বনির মত নির্গত হইল, "দেখাবি?—কেমন ক'রে দেখাবি অজিত?"

"সে আমি এখন কিন্তু তোমায় বল্‌চিনে,—তোমায় দেখালেই তো হ'লো? দিদিমণিকেও বলো না মা,—দেখা যাবে, তিনিও ওঁকে দেখে কেমন চিন্‌তে পারেন!"

অজিতের চেয়েও কম বয়সের বালিকাটির মতই এই আশ্বাসে পরম আশ্বস্তা হইয়া মনোরমা ছেলেকে বুকে বাঁধিয়া অনেকগুলা চুমা খাইল। তার পর মানসিক আনন্দে পরিপূর্ণ বিভোর হইয়া কোন্ সময়টায় যে সে

আত্মচিন্তায় তন্ময় হইয়া রহিল, যে, অজিত তাহাকে হঠাৎ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও, সে অভাব সেদিন তাহার অনুভূতির কাছে আত্মপ্রকাশ করিতেও পারিল না। শুধু তাহার সমুদয় অন্তঃকরণটা জুড়িয়া এই একটামাত্র সুর বাজিয়া চলিল যে, সে আবার দেখিবে। যাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চিত্ত তাহার জলধারা-আকাঙ্ক্ষী চাতকেরই মত পিপাসার্দীর্ণ হইয়া আছে, অথচ যাঁহার দর্শনলাভাশা বারি-প্রয়াসী চাতকের অপেক্ষাও তাঁহার পক্ষে সুদূরপরাহত, সেই তাঁহাকেই সে আবার দেখিবে। আরও আনন্দ যে, এই অপ্রত্যাশিত সম্মিলনের উত্তর-সাধক তাহাদেরই অজিত—যার দ্বারা, এত বড় ব্যবধান-সত্ত্বেও, আজও সে মনে প্রাণে এবং বাহিরেও, তাঁহা হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

স্যূতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি।

—উত্তরচরিত।

অজিত কিন্তু এই কাজটাকে যত সহজ মনে ভাবিয়া মাকে আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে গিয়া বুঝিতে পারিল, তাহা তেমন নয়। সাহিত্যরথীদিগের মধ্যে সবচেয়ে যাহাকে দেখিতে ভাল, বয়সটা আবার তাহারই সবার চাইতে কম;—আনুমানিক বোধ করি বাইশ তেইশের বেশি উর্দ্ধে উঠিবে না। অজিতের বয়স যদি দশ এগারো না হইয়া অন্ততঃ পনেরও হইত, তাহা হইলে যে সন্দেহটা তাহার মনের একটা কোণকেও স্পর্শ করিত না,—এই কয়েকটা বছর পিছাইয়া থাকায়, সেই বিষয়েরই অসঙ্গতি তাহার শিশু-চিত্তকে অন্ধ করিয়া রাখিল। মায়ের মুখের

বর্ণনায় এবং নিজের মনের ভক্তিকল্পনায় মিশাইয়া পিতার যে আদর্শটা মানস-ফলকে চিহ্নিত ছিল, কবিজনোচিত এই শুভ-দর্শন তরুণ ব্যক্তিটির সহিত ইহার সঙ্গতি বোধ হইতেই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল। আর তো কোন একজনকেও অরবিন্দ বসু মহাশয়ের যোগ্য বিবেচিত হইল না; অতএব ইঁহার সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি।

অজিত ইহার কাছে ঘুরিয়াও, যখন কোন রকমে এই চশমাধারী নরটির চোখ দু'টিকে তাহার নিজের দিকে ফিরাইতে সমর্থ না হইয়া, যৎপরোনাস্তি হতাশ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, ঠিক্ এম্‌নি সময় সাহিত্যিক-বৃন্দের একতম. সেই সাহিত্য-রত্নটির দৃষ্টি কল্পনা জগৎ ভেদ করিয়া,—বোধ করি অজিতেরই তপস্যার ফলে, হঠাৎ তাহার 'পরেই পতিত হইল। লোকটি হয় ত বা মনে প্রাণে পুরা সাহিত্যিক ন'ন্। সংসারের ছোট খাট দৃশ্যগুলাকে এখনও বাস্তব হিসাবে না দেখিয়া, কবিত্বমণ্ডিত করিয়া দেখিতে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হন নাই। অজিতের ত্রস্ত হরিণের মত ব্যস্ত ব্যাকুল দৃষ্টিটুকু কে জানে কেমন করিয়া ইঁহার মনকে আকৃষ্ট করিল। "কি তোমরা বার্ণ্‌সের কবিতা নিয়ে মাথা ঘোরাচ্চো! তার চেয়ে এসো না কেন, এই ফুট্‌ফুটে ছেলেটীর সঙ্গে একটু আলাপ করে ফেলা যাক্। ওহে! কি তোমার নাম বলো তো? কাছে এসো না? তোমায় আজ সারাদিনই যেন মধ্যে মধ্যে দেখেছি, মনে পড়ছে যে! কাছেই তোমার বাড়ী বুঝি? কোন্ ক্লাসে পড়ো তুমি?"

অজিতের কপালে, চিবুকে মুক্তা-পংক্তির মত ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিল। স্পন্দিতবক্ষে ঘরে ঢুকিয়া, প্রশ্নকারীর নিকটে সঙ্কুচিত-পদে আসিয়া দাঁড়াইতেই, তাহার এতটুকু ছোট বুকখানির ভিতরে আশা আশ্বাস ভরা পুলকের বিপুলতর স্পন্দন উদ্দাম হইয়া উঠিল। একেবারেই "বাবা!" বলিয়া ডাকিয়া ছুটিয়া গিয়া প্রশ্নকারীর কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিয়াও, সে এত লোকের সম্মুখে এ রকম

ছেলেমানুষীর প্রশ্রয় নিজেকে কোনমতেই দিতে পারিল না। হর্ষোচ্ছ্বাস-কম্পিত মৃদুমন্দ স্বরে প্রশ্ন কয়টার উত্তর প্রদান করিয়া, সবশেষে নিজের নামটা বলিল—"শ্রীঅজিতকুমার বসু।"

কিন্তু বলা-শেষে সুগভীর বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, এ নাম শুনার পরও শ্রোতার মুখে চোখে কোনই ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না এবং তিনি নিজেও যথাপূর্ব্ব আরাম-কেদারার সুখশয্যায় অর্দ্ধশয়ান রহিয়া, অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে শূন্যে চাহিয়া সিগারের ধূম নিষ্কাসনেই নিরত রহিলেন। ক্ষণেকের জন্য ঘোর অভিমানে অজিতের বুক ভরিয়া উঠিয়া তাহাকে পিছন ফিরাইতে চাহিতেই, আবার একটা প্রশ্ন শুনা গেল, "এইটুকু ছেলে তুমি, এরই মধ্যে থার্ড ক্লাসে পড়চো? ক'বছর বয়স তোমার?"

অজিত ফিরিয়া দাঁড়াইল, সজল, নত-চক্ষে, গাঢ়স্বরে জবাব দিল, "দশ।"

"অ্যাঁ, বলো কি! মোটে দশ বছর! বাহাদুর ছেলে তো তুমি! তুমিই তোমাদের স্কুলের 'ফাষ্ট বয়' বোধ হয়, না?"

"হুঁ।"

"বাচ্চো কেন, এসো না, একটু গল্প করি। আচ্ছা, এখানের রাজবাড়ী, শ্যামসায়র, কৃষ্ণসায়র ছাড়া আর কি কি দেখ্‌বার মতন আছে বলো দেখি?"

অজিত এবারে ফিরিয়া আসিয়া, হাসি-মুখে একটা খালি চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া, নিজের অভিজ্ঞতা মত এই নব-পরিচিতের সহিত শুধু ওই বিষয়েরই নয়, আরও অনেক বিষয়েরই আলোচনা সুরু করিয়া দিল; এবং সে দিন যখন বাড়ী ফিরিল, তখন এই অজ্ঞাতনামা লোকটির উদ্দেশ্যে চির-সঞ্চিত সমুদয় পিতৃবৎসলতাই উজাড় করিয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। তবে ইঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া পড়িবার পর, উভয়পক্ষের একটা মস্ত ত্রুটির কথা ক্রমাগতই মনে হইয়া, তাহার চিত্তেও একটু অস্বস্তির সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিল। এই নবপরিচিত সব কথাই কহিলেন,—শুধু তাহার

পিতৃপরিচয়টুকুই জানিতে চাহিলেন না। ঐটুকু করিলেই তো এতক্ষণে সে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই বাড়ী যাইতে পারিত। আর সেই বা কেমন ছেলে? উনি না হয় ও কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াই গিয়াছেন; বোধ করি ওঁর সব কথা মনে থাকে না,—তা না হইলে, অজিতের নাম শুনিয়াই বা তাহাকে চিনিতে পারিলেন না কেন? কবিদের না কি সংসারের কথায় বেশি ভুল হয়। তা' অজিতও তো নিজে হইতেই বলিতে পারিত যে, তাহার পিতার অমুক নাম এবং পিতামহেরও—হ্যাঁ, তা, হইলে নিশ্চয়ই তিনি চিনিতে পারিয়া কত খুসী হইতেন। বুদ্ধিমান্ বলিয়া এইমাত্র তারিফ করিয়া যিনি বিদায় দিলেন,—যখন তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার এত বড় পরিচয় পাইবেন, তখন সেই তিনিই না জানি তাহাকে কত বড় বোকা মনে করিবেন।

বাড়ী আসিয়া লজ্জায় মাকে সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। কেমন করিয়া বলিবে, যে, সব ঠিক্ হইয়াও শুধু নিজের বোকামির দোষে সে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারে নাই। মার সহিত দেখা হইলে সে চোরের মত সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। কিন্তু ইহাতেও তাহার বিস্ময়ানুভব হইল যে, মাও তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। অজিত আড়-চোখে মায়ের মুখখানা দেখিয়া লইল, মুখখানার ভাব কেমন যেন মেঘ-ঢাকা আকাশের মত। ভিতরের ব্যাপার বুঝা যায় না। ছেলের কাছে ছেলেমানুষী করিয়া ফেলার লজ্জাকে, সে নিজের অক্ষমতায় মায়ের বিরক্তি মনে করিয়া, ভয়ে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল এবং বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত না হোক্ পঞ্চাশবারও মনে মনে শপথ করিয়া রাখিল যে, আগামী কল্য সকালবেলাই উঠিয়া গিয়া, সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাতেই সে তাঁহাকে জানাইয়া দিবে যে, তাহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ বসু মহাশয়; এবং ৺মৃত্যুঞ্জয় বসু মহাশয় তাহার পিতামহ।

পরদিন প্রাতে হামিদ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল, বাড়ীতে

অসুখ, ডাক্তার ডাকিয়া দিতে হইবে। ডাক্তার যদি আসিল তো প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লইয়া ডাক্তারখানায় কে যায়? এসব কাজ হাতে আসিলে আর কোন কথা অজিতের মনে থাকে না। ঔষধ লইয়া ফিরিতে বেলা প্রায় বারটা বাজিল। তখন বাড়ী না ফিরিলেই নয়।

বৈকালে গিয়া অজিত দেখিল, মোটঘাট সব বাঁধা, বিছানা ও চামড়ার ব্যাগ কয়টা গাড়ীর মাথায় চাপানো। সাহিত্যরথিবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ ইতঃমধ্যেই রথারূঢ় হইয়াছেন। দু'চারজন স্বভাব-শৈথিল্যবশতঃ তখনও আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। এ দৃশ্য দর্শনে অজিতের ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডটা সবেগে লাফাইয়া উঠিল!—ওরে নির্ব্বোধ! ওরে নির্ব্বোধ! এ কি করিয়া ফেলিলি রে! এ কি হইয়া গেল!—সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ক্ষণকাল রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পরমুহূর্ত্তে প্রায় ছুটিয়া গাড়িগুলার কাছে আসিয়া, চঞ্চল-কটাক্ষে উহাদের অভ্যন্তরভাগ দেখিয়া লইল। কই? কোথায় তাহার সেই ঈপ্সিত মুখ? তবে কি তাহার আসার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন? আর একবার কি দেখাও হইল না! সে কে, এ কথা তিনি একবার জানিয়াও যাইতে পারিলেন না। 'বুদ্ধিমান্ ছেলে' বলিয়া যে তাহাকে তিনি তারিফ করিয়াছিলেন, অথচ সেই সে এতবড় বোকা! তাঁহাকে কোন কথা একবার জানিতেও দিল না!

"ওহে! তোমরা যে মেয়েদেরও ছাড়ালে দেখ্‌চি। বেরুবার বারই যে হয় না।"

"নাঃ! এই যে এলাম বলে।" জানালা দিয়া এই কথা বলার পর জন-দুই তিন সাহিত্যিক সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহাদের এক-জনের উপর চোখের দৃষ্টি পড়িতেই, অজিতের মুখ দিয়া একটা হর্ষধ্বনি নিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। এ কার্য্য করিতে তাহার তখন কিছুমাত্র দ্বিধা বা লজ্জার কারণ বর্ত্তমান থাকা সম্ভব বলিয়াও মনে পড়ে নাই। হাত ধরিয়াই সে এক নিঃশ্বাসে

বলিয়া ফেলিল, "আমি অজিতকুমার বসু। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু মহাশয় আমার বাবার নাম।"

"বটে, অরবিন্দ বসু তোমার বাবা! কোন্ অরবিন্দ বোস্ হে? এই-খানেই তিনি থাকেন তো?"

বিস্ফারিত-নেত্রে প্রশ্নকর্ত্তার মুখে চাহিয়া, সাশ্চর্য্যে অজিত কহিল, "বাবা কল্‌কেতায় থাকেন, তিনি কবি।"

"অরু বোসের ছেলে তুমি? তা' এতদিন বলোনি কেন? অরুকে আমি বেশ জানি। মধ্যে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎও হয় তার সঙ্গে। আচ্ছা, এবার দেখা হ'লে তাকে তোমার কথা বল্‌বো'খন। তুমি—"

"ওহে সুজন! তোমার বাৎসল্যরস এখন চাপা দিয়ে ফেল, ট্রেণটা দেখ্‌ছি নেহাৎ ফেল্ করাবে।"

অজিতের বন্ধু অজিতের হাতখানায় একটুখানি নাড়া দিয়া, স্নেহস্মিত হাস্যে আকস্মিক রাহুগ্রাসে নিপতিত পূর্ণচন্দ্রের মত মুখখানার দিকে বারেক তাকাইয়া ব্যস্তভাবে গাড়ীর দরজা টানিয়া তন্মধ্যে উঠিয়া পড়িল; এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া শকট-চালক গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। নির্ব্বাক্ বালক নির্নিমেষে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া অনেকেরই সন্দেহ ঘটিতে পারে যে, ঘোড়ার পিঠের সেই কষাটা ঘোড়ার পিঠে না পড়িয়া হয় ত বা তাহারই পিঠে পড়িয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্।

মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর অরবিন্দের মা সহসা সংসারে নিস্পৃহ হইয়া একপার্শ্বে সরিয়া বসিলেন। প্রচণ্ড শোকের আঘাত তাঁহার একমাত্র পুত্রের মমতা-বন্ধনও শিথিল করিয়া দিয়াছিল, এ ছাড়া, চিরদিনের ঘর-সংসারে তাঁহার বীতস্পৃহ হওয়ার আরও একটা নিগূঢ় কারণ হয় ত বা বর্ত্তমান ছিল। তাহা এই ;—মায়েরা সব পারেন ; কিন্তু নিজ সন্তানের—বধূর চরণ-পদ্মে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করাটা আদৌ সহিতে পারেন না। তা' মুখে তিনি এ লইয়া উচ্চবাচ্য নাই করুন,—মন তাঁহার ভিতরে ভিতরে তিক্ত হইয়া উঠিবেই। ব্রজরাণীর শাশুড়ীর সহিত ব্যবহারকে দুর্ব্ব্যবহার বলা চলে না, আবার সমুচিত ব্যবহার বলিবারও কোন হেতু নাই। তাহার প্রকৃতি চিরদিনই একটু স্বাধীন ; শ্বশুরের ভয় ঘুচিতেই সে ভাবটা আর একটু প্রকট হইল। ইচ্ছা হইলে গাড়ী জুতাইয়া, সে বাপের বাড়ী চলিয়া যায় ; ঘোম্‌টা ফেলিয়া দিয়া, শাশুড়ীর সমবয়সী কুটুম্বিনী, প্রতিবেশিনী—সবার সঙ্গেই কথা কয়,—চাকর বাকরের সঙ্গে তো কহেই। সকলে বউ-মানুষের এতবড় নির্লজ্জ ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হয়। শাশুড়ী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মুখে বলেন, কি করবে বাবু, মেমের ইস্কুলে গাদাখানেক ইংরেজী বই পড়েছে, লজ্জাটজ্জা অত শেখেনি। শাশুড়ীকে সেবা-যত্ন,—তা' এমন বিশেষ করিয়া কিছুই করিবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার পুরাতন দাসী কদম ঠাকুর-সেবা করিয়া তাঁহার কাজ করিত। পান, জল, গামছা, কাপড় হাতে হাতে যোগাইত,—সন্ধ্যায় পদ-সেবা করিত,—যা কিছু প্রয়োজন, সে সবই করিত। রাঁধিয়া দিবার জন্য আশ্রিতা আত্মীয়ারও এ

বাড়ীতে অভাব ছিল না। তবে সব সত্ত্বেও, ঘরের বধূর যেটুকু অবশ্য করণীয়, সেইটুকু না পাইলেই যেন একটুখানি অভিমান দেখা দেয়। তা এ সব লইয়াও এক রকম চলিতেছিল, বিপদ বাধিয়া ছিল শরৎকে লইয়াই। ননদের গাড়ী একদিক্ দিয়া যদি বাড়ী ঢুকিল, তো ভাজের গাড়ী আর একদিক্ দিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। এম্‌নি করিয়া ইঁহারা চলিতেন। বধূ যদি বা দৈবাৎ কখন বাড়ী রহিয়া গেলেন, তো, নিজের ঘরে বই লইয়া, সেলাই লইয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়াই রহিলেন। দেখা হইলে, ছ'জনেরই মুখ একটুখানি ভারী ভারী হইল। কথার ঠোকাঠুকিও যে একটু আধটু না হইল তাও নয়।

প্রথম বছরেই পূজার কাপড় কেনা নূতন গৃহিণী নিজের হাতে লইয়া বসিল। প্রসন্ন তাঁতিনী নানারকম সাড়ী ধুতি যোগাইয়া দেয়। অন্যবারে গৃহিণীর সাক্ষাতে মেয়েদের পছন্দে সে সব কেনা হয়। এবার তাঁতিনী সেই অভ্যাসবশতঃই গৃহিণীর মহলোদ্দেশ্যে যাইতেছিল;—ব্রজরাণী তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া বলিল, "কি কাপড় এনেছ, দেখিই না তাঁতি-পিসি,—নিয়েই এসো না একবার।"

"এই যে যাই, বউমা, যাই-মা, যাই।"

বলিয়া তাঁতিকন্যা বিরাট্ মোট নামাইয়া বসিয়া গেল এবং একেবারে তাহার সব কাপড়গুলিই প্রায় নিঃশেষে ব্রজর ঘরে ঢালিয়া দিয়া ক্ষণকাল পরে যখন উঠিয়া গেল, তখন এইটুকু অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করিয়া গেল যে, এখন হইতে ইহারই সহিত তাহাকে কারবার করিতে হইবে—এই সে দিনের ঘোমটা দেওয়া মেয়েটিই এখন এই এতবড় সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী-ঠাকুরাণী। তা' ইহার জন্য ইহাদের কিছুই আসিয়া যায় না, যে কেহই হোক্ তাহাদের একজন ক্রেতা থাকা লইয়া কথা। বিশেষ, প্রবীণা এবং বিধবার অপেক্ষা, নবীনা এবং সধবা ক্রেতা হিসাবে যথেষ্ট ভাল। অরবিন্দ সেদিন ঘরে ঢুকিয়াই বিস্মিত স্মিত মুখে কহিয়া উঠিল, "এ কি!

বড়বাজারের সমস্ত দোকান যে উজাড় করে ফেলেছ! এত সাড়ী পর্‌বে ক'বছরে শুনি ?"

নূতন গৃহিণী ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিলেন, "সব বুঝি আমিই পর্‌বো !— পূজোর সময় সব্বাইকে দিতে হবে না বুঝি ?"

"সে সব মা-ই তো ফি' বছর কিনে থাকেন, এ বছর যে তুমি কিন্‌চো ?"

"মায়ের তখন ঘুমোবার সময়, তাই আমিই এগুলো কিনে নিলুম,— তা'তে কি কিছু দোষ হয়েছে ?"

অরবিন্দের স্বরে বিস্ময় ও তন্থ পত্নীর কণ্ঠে অসন্তোষ ব্যক্ত হইল।

"না, তা' আর এমন দোষ কি।" বলিয়াই অরবিন্দ প্রস্থান করিল!

দ্বিতীয় দিন তাঁতিনী আসিয়া একেবারেই "কই গো বউমা, কোথায়, বলিয়া ব্রজরাণীর ঘরেই দেখা দিল। সেদিন উষা সেখানে ছিল। ব্রজরাণী যেন তাঁতিনীকে দেখিতেই পায় নাই, এমন করিয়াই রহিল। উষা বলিল, "কাপড় দেখবে না কি ?"

"আমি! কি জন্যে ?" বলিয়া ব্রজ আলস্য ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়া, মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল, "যাক্ না ও মায়ের ঘরে।"

তাঁতিনী একটুখানি অবাক্ হইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল; এবং অল্পক্ষণ পরেই তদপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়মাখান মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বৌদি-ঠাক্‌রুণ বল্‌লেন, আমি আর ওসবে নেই,—বঙগে যাও, তিনিই দেখে শুনে নেবেন।"

"আমি বাবু ও-সব পার্‌বো না।" বলিয়া, মুখ ভার করিয়া, ব্রজরাণী আবার শুইয়া পড়িয়া,—একখানা গল্পের বই পড়িয়াছিল,—সেইখানা তুলিয়া লইতেছিল,—উষা ছোঁ মারিয়া সেখানা তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া, ধাক্কা দিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "নে'—নে, আর অত ক'রে দর বাড়াতে হবে না! মা দেখবেন না, উনি দেখবেন না—

তাহ'লে কি বাড়ীর কাজকর্ম্মগুলো সব পণ্ড হয়ে যাবে না কি? মাকেই কি আর চারকাল ধরে সবই করতে হবে? এখন যদি না-ই পারেন? ও পিসি, তুমিই বা অমন সংয়ের মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাছা! কি আছে তোমার তল্পির মধ্যে বার ক'রে দেখাও টেখাও না!"

পূজার কাপড় বরাবর যে হিসাবে কেনা হয়, এবারও ঠিক্ সেই হিসাবেই কেনা হইয়াছিল। বরং সংসারের অতবড় আয় কমিলে, সকল বিষয়েই যেমন ব্যয় সংক্ষেপ হইবার কথা এবং কিছু কিছু করাও হইয়াছে,—এটায় সে রকম না করিয়া ব্যয়-বৃদ্ধিই হইয়া গিয়াছিল। ফলে কিন্তু সকলেই বেশ খুসী হইল না। ষষ্ঠীর দিন সবাই নূতন কাপড় পরিল, শরৎ পরিল না। কেহ কেহ অনুযোগ করিলে, চোখ মুছিয়া সে জবাব দিল, "মা পরবেন না,—কি আমার সুখের বছর, যে, সাজতে বসে যাব? যাদের সুখ বেড়েছে, তাঁরাই সাজুক্।" এই কথাটা কাণে উঠিলেও, ব্রজ ঠোঁট কামড়াইয়া চুপ করিয়া রহিল। এই ননদটিকে সে মনে মনে দেখিতে না পারিলেও, যথেষ্ট ভয় করে,—সাধ্যপক্ষে ইহার দুর্ব্বাক্যে জবাব করে না।

ভাইফোঁটার উদ্যোগটা উষার চেয়ে শরতই ভালরকম করিত। ছোট-বেলা হইতেই এ বিষয়ে তাহার বিশেষ করিয়া একটা ঝোঁক ছিল। এবারেও ভাইফোঁটার আগের দিন সে ছেলেমেয়ে সব সমেত বাপের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াই দেখিল, বাড়ীর সরকার মহাশয় এক গাদা পেটা ধুতি একটা চাকরের ঘাড়ে চাপাইয়া অন্দরমহলে ঢুকিতেছেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, সে সকল বধূর ফরমায়েস্—তাঁহার ভাইদের ভাইফোঁটায় খরচ হইবে। শরৎ বলিয়া বসিল, কাপড়গুলা সে দেখিবে; এবং দেখা হইয়া গেলে, উহার মধ্য হইতে বাছা বাছা কয়েকখানা সে কিনিয়া লইল। বউয়ের সাত বছরের ভাইয়ের জন্য যে সিল্কের পাঞ্জাবী আনা হইয়াছিল, সেটাও সে সেই সঙ্গে কিনিয়া লইল। সরকার বিধুভূষণ একটু ত্রস্ত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "পাঞ্জাবীটে দিদি, ফরমাস্ দিয়ে করান যে,—আর যদি অমনটি না পাওয়া যায়?"

শরৎ একটু ঝাঁঝিয়া কহিল, "কল্‌কেতা সহরে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আবার না কি কিনতে পাওয়া যাবে না! তোমার যেমন কথা সরকার দাদা!"

বিধুভূষণ মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে জবাব দিল, "যাবে না কেন দিদি, যাবে বই কি! তবে কি না ঠিক্ ওমনটি কি আর—"

ক্রীত বস্তুগুলা একসঙ্গে জড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বিরক্তস্বরে শরৎ কহিল, "ঠিক্ ওম্‌নিটি না পাওয়া গেলেই যে মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে, তেমনও কিছু কথা তাতে লেখা নেই। অত ঘাবড়াবার দরকার নেই সরকার-দা, ফাঁসি তুমি যাবে না গো, যাবে না। যদি কিছু বলে তো ব'লো, আমি জোর করে নিয়েছি,—এবার না হয়, তাঁর ভাইয়ের অন্য রকমই হলো। পূজার সময় বোনেদের নানারকম তো হয়েছে,—ভাইরা বেটাছেলে, কিছু যদি কমই পড়ে।"

সরকার আর দ্বিরুক্তি করিতে ভরসা না করিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলেন। বড়দিদির মুখখানিকে ভয় এবং তাহার সহৃদয়তাকে ভক্তি—এ বাড়ীতে সকলেই করে।

কথাগুলা সরকার না বলিলেও, কাহার মুখ দিয়া কেমন করিয়া ব্রজ-রাণীর কাণে উঠিল। কাপড় পছন্দ নয় বলিয়া সে ফেরৎ দিল এবং অসুখ করিয়াছে বলিয়া শুইয়া থাকিয়া, সারাদিনে সে ভাইফোঁটার কোন উদ্যোগেই যোগ দিল না। অরবিন্দ বাড়ী আসিলে, রাগিয়া কাঁদিয়া, তাহার উপর ঝাল মিটাইয়া, তারপর সকালে উঠিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় বিশ্বের উপর বিরক্তিভরা চিত্তে আবার নূতন করিয়া আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ভাইয়েদের নিমন্ত্রণ করা হইয়া গিয়াছে,—ভাইফোঁটা বন্ধ করিয়া পাছে তাহাদের অকল্যাণ করিয়া ফেলে, এ ভয়টাও যে পূর্ণমাত্রায় মনে বর্ত্তমান। করেই বা কি!

সকালবেলা গাড়ী গিয়া উহাকে ফোঁটা দিবার জন্য লইয়া আসিল।

শরতের ফোঁটা দেওয়া তখন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু উষা বাকি বলিয়া অরবিন্দ তত বেলাতেও জল খাইতে পায় নাই। উষা আসিয়াই ব্রজরাণীর সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কহিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া ঢুকিল। অনেক ডাকাডাকিতে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলে, অরবিন্দ একটু রাগ করিয়াই বলিল, "ঝিরে উষি, তোর যে আর ফোঁটা দেবার ফুর্‌সৎই হয় না রে! ভাই যদি ক্ষিধের চোটে মরেই যায় তো ফোঁটা আর দিবি কা'কে?"

উষা চন্দনের বাটি হাতে লইয়া ইহার জবাব দিল, "কি কর্‌বো বাবু—এসে দেখি, এত বেলা হয়ে গেছে,—এখনও বউদি বেচারির ভাইফোঁটার খাবার দাবার কিছুই গোছান হ'য়ে ওঠেনি,—অথচ তার ভাইরাও ত এখনি এল বলে,—তাই ক্ষীরের ছাঁচগুলো তুলে দিচ্ছিলাম।"

ফোঁটা পরিতে পরিতে ভাই কহিলেন, "কেনই বা হয় নি? যাঁর ভাইরা ক্ষীরের ছাঁচ খাবেন, তিনি ও-সব করে রাখ্‌তে পারেন না বুঝি? নিজের ভাইকে শুকিয়ে মেরে তোমায় ছুট্‌তে হয় পরের ভাইয়ের ভাই-ফোঁটার তত্ত্ব সাজাতে, বড় মজা তো!"

উষা ফোঁটা দেওয়ার শেষে, ভাইয়ের চরণোদ্দেশ্যে মাটির উপর দুম্ করিয়া একটা অসন্তোষে ভরা প্রণাম ঠুকিয়া দিয়া, আশীর্ব্বাদী গিনিটা আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল, "আমাদের অত ছোট মন নয় বাবু,—ভাই আবার ওর তার কি? সব্বার ভাই-ই সমান। নিজের টুকুই সব, আর কারু কিছুই নয়—এ রকম আত্মগরজে হতে পার্‌লে বোধ করি ভালই হ'তো। তা আমি আর হ'তে পার্‌লেম না।"

"তাই না কি রে, উষি,—সব্বার ভাই না কি সমান? তা বেশ—বেশ—এই বয়সে তুই তবু ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে পড়েছিস্! আহা বোন্, বৈকুণ্ঠ তোর অক্ষয় হোক্। আমরা এই ছোট মন নিয়ে নরকেই পচে মর্‌বো। কি গো দাদা! তোমার জলখাবার ফুর্‌সৎ হবে না, না কি আজ? এদিকে

বারটা যে বাজে! তার হুঁস্ আছে?" এই বলিয়া শরৎশশী ঘরে ঢুকিয়া ভাইয়ের সাম্‌নে ফল ও মিষ্টান্ন বোঝাই খান দুই রেকাব ধরিয়া দিল। ঊষার দেওয়া থালাটার দিকে না চাহিয়াই, অরবিন্দ সদ্যপ্রাপ্ত আহার্য্যগুলা নিরুত্তরে গো-গ্রাসে উদরস্থকরণে লাগিয়া পড়িল। ঊষা ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে বারেক দিদির দিকে চাহিয়াই, সেখান হইতে সরোষ পদক্ষেপে নিজের বিরক্তি জ্ঞাপন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। কলহবিদ্যায় অপটুত্বের জন্যই যে সে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল, এমন নহে; আসিবার কালে সখী ব্রজরাণী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিল, যে, ফোঁটা দেওয়া হইয়া গেলেই সে যেন ফিরিয়া আইসে, নতুবা তাহার ভাইদের মিষ্টান্নের থালায় ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলিগুলি সাজাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

তৎ প্রতিশ্রুত্য ধর্ম্মেণ ন চেদ্দাস্যসি মে বরম্।
অদ্যৈব হি প্রহাস্যামি জীবিতং ত্বদ্বিমানিতা॥

—রামায়ণ।

অরবিন্দর তিনজন শালা ভাইফোঁটা লইয়া আহারে বসিলে, অরবিন্দের খোঁজ হইল। নিমন্ত্রিতগণ হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে—নিমন্ত্রকের অপেক্ষায় তাহারা খাইতে পারিতেছে না। অরবিন্দ উঠিতেছিল,—শরৎ আসিয়া ডাকিল, "দাদা, খেতে চল।"

"তাই তো যাচ্চি রে।" বলিয়া অরবিন্দ চটির মধ্যে পা গলাইয়া দিয়া, সেটাকে টানিয়া লইয়াই, ঘর হইতে বাহির হইতেছিল,—শরৎ হাঁ—হাঁ করিয়া উঠিয়া বলিল, "ওদিকে কেন,—মার দালানে তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে যে!"

অরবিন্দ আসিয়া দেখিল; মাত্র তাহার একার আসন সেখানে দেওয়া রহিয়াছে,—একজনেরই খাবার সাজান। সে বলিল, "এ কি রে শরতা, ওদের ঠাঁই কোথা?"

"ওদের, ওদের বোনের ঘরে,—তুমি খেতে বসো না গো—বেলা কি এখনও হয়নি নাকি?"

অরবিন্দ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, "ওরা একলা খাবে, আমারও না হয়—"

"ও গো ওদের ভাবনায় মাথা ঘোরাবার আজকের দিনে তোমার একটুও দরকার নেই। ওদের নিয়ে বারমাসে তের পার্ব্বণ সব ক'টাই করো, না,—কেউ তো আর তাতে বারণ করতে যাচ্চে না। বচ্ছরের মধ্যে এই একটা মাত্র দিন বইতো না,—এটায় না হয় বড়কুটুমদের বাদই দিলে। নাও, এখন চোক কাণ বুজে কোন গতিকে বসে পড়ো দেখি।"

আর দ্বিরুক্তি পর্য্যন্ত না করিয়াই, দিদির শাসনে সন্ত্রস্ত সুবোধ ছোট ভাইটির মতই, অরু ঈষৎ হাসিয়া নিঃশব্দে খাইতে বসিয়া গেল। পাশের ঘরেই ব্রজরাণী শাশুড়ীর ভাঁড়ারে ভাইয়েদের জন্য পাতিলেবু লইতে আসিয়াছিল,—ভাই-বোনের কথাবার্ত্তাগুলা সবই সেখান হইতে শুনিল, এবং শুনিয়া রাগে আগুন হইয়া চলিয়া গেল।

সবার যখন খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়াছে,—উষা, ব্রজরাণী ও ব্রজর অল্পবয়সী দুটি ভাই ব্রজর ঘরে তাস খেলিতে বসিয়াছে। অরবিন্দ কিসের একটা দরকারে সে ঘরে ঢুকিয়া ইতস্ততঃ চাবি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে,—তখন একটা কাপড়ের পার্শেল হাতে করিয়া শরৎ সেখানে দেখা দিল। "দাদা! কই, দাদা এখানে এসেছিল না?"

"কিরে শরৎ!"

"তোমার শিলমোহরটা দাও দেখি। পাঠাতে দিলুম, তা, সরকারবাবু ব'লে পাঠালেন যে, মোহরের ছাপ ভাল পড়েনি—পোষ্টাফিসেও নেবে না।

বাড়ী ফিরে গিয়ে পাঠাতে গেলে আবার একদিন মিথ্যে দেরী হ'য়ে যাবে,—দাও দেখি তোমারটা, ভাল ক'রে, ক'রে দিই।"

ইতোমধ্যে এই নারীটির অতর্কিত ও অনাহূত আগমনে এ ঘরের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যে ব্রজরাণী ঘোম্‌টা দেওয়াটাকে অসভ্যতা-বোধে সেটাকে সম্পূর্ণরূপেই বর্জ্জন করিয়াছিল—পুরাতন সরকার মহাশয় প্রভৃতি বাহিরের পুরুষদের খাতিরেও যাহা কপালের উপর নামিত না,—তাহা অপেক্ষা বছর চারেকের মাত্র বড় ননদকে দেখিয়া স্বামীর সান্নিধ্য স্মরণে সে নিজের অপ্রসন্ন মুখের উপর খানিকটা খুব কাপড়ের আবরণ টানিয়া দিল। অর্দ্ধশয়ানা ঊষা অসন্তোষপূর্ণ-চিত্তে উঠিয়া বসিল; এবং এমন কি, তাহাদের খেলার সাথী বালকদ্বয়ও সকলকে ত্রস্ত-ব্যস্ত দেখিয়া, নিজেরাও কারণ ব্যতিরেকে হাসি খুসী বন্ধ করিয়া গাম্ভীর্য্যাবলম্বন করিল।

অরবিন্দ বলিল, "দে,—আমি সব ঠিক্‌ঠাক্ করে পাঠিয়ে দিচ্চি—"

কিন্তু পার্শেলের উপরকার লেখাগুলার উপরে নজর পড়িবামাত্র তাহার প্রসারিত হাতখানা ঠিক্ তেমনিতরোই রহিয়া গেল। যেন ঐখান হইতে কালো কালির কয়টা অক্ষর কৃষ্ণকায় কাল সর্পের মূর্ত্তি ধরিয়া, তাহার সেই হাতখানায় একটা ছোবল্ দিয়াছিল—কি—কি,—ঠিক্ তেমনিতর বিষ-জর্জ্জর, কালিমাড়া-মুখে সে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অথচ কিসের যেন একটা প্রচণ্ড আগুনের শিখা তাহার বুকের মধ্যে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়া, তাহার ধ্বক্‌ধ্বকে চোখ দুটাকে সেই কালো রংয়ের সাপটার দিকেই পলকহীন করিয়া রাখিল। কালো সাপের গায়ের আঁকগুলায় এম্‌নিধারা একটা কথা লেখা ছিল,—"পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অজিতকুমার বসু

ঘরের লোকেরাও পার্শেলের সে বাংলা অক্ষরের লেখা কয়টা পড়িয়াছিল। উহা পাঠাস্তে ব্রজরাণী ঘোম্‌টার ফাঁকে ননদের দিকে যে দৃষ্টিতে চাহিল, তাহাতে কেনই যে শরৎ ভস্ম হইয়া গেল না, সে কথা বলা বড়ই কঠিন।

উষা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া হাতের তাস ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। অকালে খেলা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ক্ষুব্ধ, ব্রজরাণীর ছোট ভাই ডাকিয়া বলিল, "উষাদি, এক্ষুণি চলে যাচ্চ যে? আর খেল্‌বে না?"

"নাঃ—থাক্‌গে, বড্ড মাথা ধরেছে।" বলিয়াই উষা দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া, অন্ধকার-মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

"কি গো দাদা! এইটুকু উপকার আর তোমাদের বাড়ী থেকে পাওয়া যাবে না? তা' না হয় গাড়ীটাই জুতিয়ে দাও—আমি তালতলায় চলে যাচ্চি; সেখান থেকেই না হয় শীলটিল করিয়ে নিয়ে পাঠাব। এই কর্‌তে কর্‌তে, দেখ না, কতো দেরিই হয়ে গেল! আজকের দিনে বাছা আমার নতুন কাপড়খানা পর্‌তেও পেলে না।"

এই বলিয়া শরৎ চলিয়া গেল। ঘরের লোক কয়জন তাহার পিছনেও অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটাইয়া দিল। কতক্ষণ পরে চঞ্চল বালক দুটি তাস লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে, অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া সেগুলা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। বড়টি ছোট ভাইকে বলিল, "চল্, তাহ'লে ডোমিনো খেলিগে। দিদি, তুমি ডোমিনো খেল্‌বে?"

ব্রজরাণীর মুখে যে ঘোমটা টানা ছিল, সে কথা এখন পর্য্যন্ত তাহার স্মরণেই ছিল না। এখন সচকিতে জাগিয়া উঠিয়া জবাব দিল, "না, আমি খেল্‌বো না—তোরা দু'জনে খেল্‌গে যা।"—এই বলিয়া স্বামীর দিকে বারেক অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিয়াই, একটা তাকিয়া বালিস্ টানিয়া লইয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

"তবে আপনি খেল্‌বেন আসুন জামাই-বাবু?"

অরবিন্দ মুখ ফিরাইল, "কি হিতু?"

"ডোমিনো খেল্‌বেন?"

"ডোমিনো? না।"

"আচ্ছা, ডোমিনো না হয়, যা আপনার ইচ্ছে—রিভার্সি হোক্, ড্রাফ্‌ট

হোক্, বিন্তি, গোলাম-চোর কিংবা যা হোক্। দিদিমণি, তুমিও খেল্‌বে এসো না ভাই লক্ষ্মিটি!"

অরবিন্দ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তোমরা খেল ভাই। আমি কি অত রকম সব খেলতেই জানি? আমি না,—তোমার দিদিমণিকে ধরো,—ও খুব খেল্‌তে ভালবাসে।"

স্বামীকে গমনোন্মুখ দেখিয়া, ব্রজরাণী কি মনে করিয়া, হঠাৎ যেন স্প্রীংয়ের মত ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া পড়িল, এবং ঈষত্তীক্ষ্ণ-তিক্তস্বরে কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা, তোমার বোন্‌টি যখন তখন আমায় অপমান কর্‌তে আসেন কেন বলো তো?"

অরবিন্দ চলিতে চলিতে দ্বার-সমীপস্থ হইয়া ইহার জবাব দিল, "সে তো আমায় বলে করে না, তার জবাবদিহি কর্‌বার কথা আমার নয়,—তাকেই জিজ্ঞেস্ করো।"

"আমি কারু সঙ্গে সেধে পড়ে ঝগড়া বাধাতে যাইনে। আমি এই কথা তোমাকেই জিজ্ঞাসা কর্‌চি,—নিজেদের প্রতিজ্ঞা ভুলে তাঁদের সঙ্গে এই যে সব আত্মীয়তা কুটুম্বিতা তোমরা চালাচ্চো, তা' এ সব আমার বা আমার ভাইদের মুখের উপর অপমান না করেও তো অনায়াসে চল্‌তে পারে।—অতটুকু ভদ্রতাও কি আর তোমাদের কাছে থেকে আমরা প্রত্যাশা কর্‌তে পারিনে? আমায় তুমি এই কথাটার জবাব দাও দেখি!"

দ্বারের কপাটে দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করিয়াই অরবিন্দ কহিল, "আবার, আমায় নিয়ে পড়লে কেন?"

"তোমার এতে প্রশ্রয় নেই, তুমি বল্‌তে পার?"

অরবিন্দ এ কথার জবাব না দিয়া দ্বার খুলিল।

"কই, জবাব দিতে পার্‌লে কি? ওগো! আমিও চাষার ঘর থেকে আসিনি,—আমারও বাপ মাথা খাটিয়ে দু'চার লাখ টাকা ঘরে এনেছেন। পূজার সময় সেই কাপড় পাঠান,—আবার আজকের এই; এ-সবের মধ্যে

তোমার সহানুভূতি,—শুধু সহানুভূতি কেন, তোমার সম্পূর্ণ প্রশ্রয় নেই, তুমি বল্‌তে চাও ?"

খোলা দ্বারের মধ্যে একটা পা বাড়াইয়া অরু জবাব করিল, "আমি তোমার মত পাগলকে কিছুই বল্‌তে চাইনে।"

"শোন, শোন; চলে যেও না—সত্যি বল্‌ছি তোমায়—তোমাদের আমি যদি এমন গলগ্রহই হ'য়ে থাকি,—এই আজই আমি হিতু নিতুর সঙ্গে ভবানীপুরে চলে যাচ্ছি,—আমারও রোজ রোজ ত অপমান সহ্য হয় না।"

বলিতে বলিতেই অভিমানে ফুলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

অরবিন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"রাণি, তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ! আর শরতের কথা,—তা' যেদিন তুমি এ বাড়ীতে প্রথম এসেছ,—সেই দিনই কি ওকে চিন্‌তে পারো নি ?"

"চিনিনি আবার!—খুব চিনেছি তাঁকে। সে-সব কথা মনে হ'লে, আমি যাই মেয়ে—তাই আবার বড়্‌ঠাকুরঝির মুখ দেখি। আর কেউ হ'লে—"

ব্রজরাণীর পরিবর্ত্তে এরূপ স্থলে অপর কেহ হইলে আর যে কি করিয়া ফেলিত, সেই কথাটাই ছিল ইহার মধ্যে সব চেয়ে দরকারী; কিন্তু সেই মূল্যবান্‌ বাক্যটিই শোনা ঘটিয়া উঠিল না। ঠিক্‌ সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণেই, যাহার উদ্দেশ্যে অবমানিতা বধূ এই একটুখানি গায়ের জ্বালা মিটাইতেছিল, সেই লোকটিরই আকস্মিক অভ্যুদয়ে মুখের অর্দ্ধব্যক্ত বাণী তদবস্থাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া গেল।

"দাদা, তোমাকে মা ডাক্‌চেন"—বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই, ভ্রাতৃজায়ার শেষের কথাগুলা কাণে যাইতে, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সাবজ্ঞ হাস্যে শরতের মুখখানা শরৎ-মেঘের মতই রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

"আর কেউ হ'লে বোধ করি কুলোর বাতাস দিয়ে, ঝাঁটা মার্‌তে মার্‌তে বড়্‌ঠাকুরঝিকে বাড়ী থেকে বিদেয় কর্‌তো, না? তা' সে খেদটা তুমিই বা

রাখো কেন ভাই? হ্যাঁ গো দাদা! বেশ তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, খাসা চাঁদপানা মুখ ক'রে, বউএর লাগানিগুলি কান পেতে শুন্‌চো,—বলি, মনের কথাটা স্পষ্ট ক'রে কেন বলেই ফেল না?—কাল থেকে না হয় আর তোমার বাড়ী আস্‌বোই না,—এই তো? ঢের ঢের লোক দেখিছি বাপু, তোমার মতন কিন্তু এমনটি আর কখন দেখ্‌লাম না! এই মিষ্টি কথাগুলি যখন কাণে ঢোকে, মনে হয়, যেন তন্ময় হয়ে বেদ কোরাণই বা শুন্‌চো।"

অরবিন্দ একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তা' আর হবে না রে, শরৎ? জগদিন্দ্রের কথাবার্ত্তাগুলো তোরই বা কি রকম লাগে, তাই একটু ভেবে দেখ্‌তো!"

"ও তো হলো না দাদা! গোড়ায় গলদ্ করে ফেল্‌লে যে! আমার কথাই না ওঁর কাণে চাণক্যের নীতি-শাস্ত্র বলে ঠেকা উচিত ছিল।"

এই কথা বলিতে বলিতে, নিজের কথার ভঙ্গিতে নিজেরই হাসি পাইয়া গেল। তখন শত্রুপক্ষের সাক্ষাতে হাসিয়া ফেলার ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া, "আমার এখন ঝগড়া ঝাঁটির সময় নেই। মা তোমায় একটা দরকারী কথার জন্য ডাক্‌চেন,—খুসী হয় ত এসো বাপু; আর না হয়, বউএর সঙ্গে বসে বসে, কেমন করে এই শরি-পোড়ারমুখীর মুণ্ডপাত করবে, তারই যুক্তি আঁট।"

এই বলিয়া সেই পোড়ারমুখী বাহির হইয়া গিয়া ধড়াস্ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, বোধ করি ভাই ভাজকে 'যুক্তি' আঁটিবার অবসরই দান করিয়া দিল! কিন্তু দিলে কি হইবে? ভাইএর মনে সেরূপ সৎ-সাহস নাই,—তিনি যুগপৎ উভয়-পক্ষের গালি খাইয়া, আবার একটা নূতন আয়োজনের উপক্রমেই, দুর্ম্মুখী বোন্‌টির পিছনে পিছনে বাহির হইয়া পড়িলেন। পুনঃ পুনঃ অপমানের বিষে জর্জ্জরিতা, রাগে দুঃখে অভিমানে বিহ্বলা-প্রায় ব্রজরাণীর কর্ণে নেপথ্য হইতে কয়টা কথা আসিয়া প্রবেশ করিল—

"পোড়ারমুখী,—না—পোড়ারমুখী! সত্যি সত্যি তোর মুণ্ডপাত কর্‌তে হবে দেখ্‌তে পাচ্চি! যাচ্চি দাঁড়া জগদিন্দ্রের কাছে—সে তোকে বড্ড বেশি আস্কারা দিয়ে দিয়ে একবারেই মাথায় তুলেচে!"

কথাগুলা যে বলিয়াছিল, শাসনই হয় ত বা তাহার মনের মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যে শ্রোত্রীটির জ্বলন্ত কর্ণ উহাদের গ্রাস করিল, তাহার বোধ হইল, তেমন সোহাগে গলা মধুর কণ্ঠ সে ঐ বক্তাটির মুখ হইতে এত কম শুনিয়াছে যে, সে যেন না শোনারই সামিল। তাহাকে যে অমন করিয়া অপমান করিয়া গেল, তাহারই এই পুরস্কার!

আবার উত্তরটাও শোনা গেল। সেও এমনই এক ক্রোধ-বিদ্বেষ-বিহীন আদরেরই সুর!

"তোমায়ই দেখে একটু একটু শিখ্‌চে দাদা! কি করে বলো,—শাস্ত্রেই যে বলে রেখেছে,—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'।"—

আষাঢ়ের সন্ধ্যাকাশের ন্যায় অন্ধকার-মুখে ব্রজরাণী বিছানায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি বধ্যতে॥
—উত্তরচরিত।

চেয়ে ব্রজরাণী বছর দুয়েকের বড় হইলেও, উষা ষোল বৎসরে পা দিতে না দিতেই উষার শাশুড়ী তাহার গলায় তারকেশ্বরের ফুল বাঁধিয়া দিয়া সন্তান হওয়ার জন্য দেব-দেবীর মানত করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন; এবং ইহাতেও যখন সেই বাঁজা-গাছে ফুল ফলিল না, তখন রাগিয়া, চেঁচাইয়া,

গালি দিয়া পুত্রবধূ এবং বাঁজা-বৌয়ের গোষ্ঠিকে গোষ্ঠিশুদ্ধ সকলকে ত্রস্তব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ছেলেকে বলিলেন, "শোন্ মণে! যদি বছরের মধ্যে বউমা বেটা কোলে ক'রে না বসে, তো, আস্‌ছে বোশেখে তোর আবার বিয়ে না দিয়ে জলগ্রহণ কর্‌বো না। বৌবাজারের মিত্তির বাড়ী নিয়ে এলো কি না একটা বাঁজা তালগাছ! ও মাঃ, এ কি ডোম ডোক্‌লার ঘর পেয়েছে গা, যে, সাহেব বিবির মতন স্বাধীন হয়ে বেড়াবে মনে করেছে? ছেলে আমার চাই-ই, চাই। সে আমি বলে দিচ্ছি।"

মণি মাকে বাঘের মত ভয় করে। নিঃশব্দে সে মায়ের সান্নিধ্য ছাড়াইয়া পলাইয়া আসে। ঊষা এই লইয়া রাগ অভিমান, কান্নাকাটি করিলে, তাহাকে আদরে সোহাগে ভুলাইয়া হাসিয়া বলে, "তুমি যেমন পাগল! মায়ের কথা শোন কেন? কে বিয়ে কর্‌তে যাচ্চে,—সবাই তো আর তোমার দাদা নয়!"

"দাদার কথা ছেড়ে দাও সে অন্য রকম। তা তুমি ওঁর কথায় চুপটি করে থাক যে? হয় ত মনে মনে তোমারও ঐ ইচ্ছে!"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ,—আমারও মনে মনে ঐ ইচ্ছে বই কি! তোমায় যেন বল্‌তে গেছলাম। মায়ের সঙ্গে শুধুশুধু বকাবকি করে লাভ! তা, তোমারও তো ছেলের মা হবার বয়স পার হয়ে যায়নি—অতই বা তোমার ভয় কেন?"

তারপর স্বামীর আদরে, সোহাগে গলিয়া, সপত্নী-ভীতি ভুলিয়া, ঊষারও চিত্ত নবীন আনন্দে আশায় উল্লসিত হইয়া উঠে। ব্রজরাণীর কাছে শুনিয়া শুনিয়া সতীনকে সেও যে ঠিক্ যমের মতই ভয় করে। মা গো, সতীন হইলে কি আর মেয়ে-মানুষকে বাঁচিতে আছে!

একদিন মুখ শুকাইয়া মাকে গিয়া বলিল, "আমার শাশুড়ী বল্‌ছিলেন মা, যারা পরের মেয়ের গলায় সতীন গেঁথে দিয়েছে, তারা নিজের মেয়ের জন্য প্রাণে যে বড় ভয় রাখে না, বুকের পাটাও তো তাদের কম নয়! মেয়ের জন্য কি কর্‌তে পারে, এইবেলা খেদ মিটিয়ে করে নিক্। বছর ঘুরলে

আর আমি দেরি করছিনে। আমি 'অমুক দত্তের' বেটা—কথার আমার নড়চড় নাই'!"

মা ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন, তোর কি ছেলের বয়েস ফুরিয়ে গেছে!"

"কি জানি মা, তাদের আর ত্বরা সইছে না। কোড়োলা না কোথায় যে গিয়ে ওষুধ খায় না পরে, সেই সব করলে হয় না মা?"

মা একটু কি ভাবিয়া, একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, হয় ত বা কোন একটা পুরাতন পাপের অবশ্যম্ভাবী ফলের কথা স্মরণ করিয়া, সচিন্তিতভাবে জবাব দিলেন, "তা করলেই হয়। যা' না একদিন খুড়ী-মাকে সঙ্গে করে।" খুড়ি-মা ৺মৃত্যুঞ্জয় বসুর খুল্লতাত-পত্নী,—গৃহিণীর খুড়শাশুড়ী।

উষা জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোন্ খানে তুমি জানো?"

মাতা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, তাহার পাকাচুল বাছিতে নিযুক্তা কদম-ঝি বলিয়া উঠিল, "সে আবার কোন্‌জনা না জানে? আমাদের বাঁশবেড়ে থেকে বেশি দূর হয় না,—হুগলী ইষ্টিসানে নেমে কোড়লাসিদ্ধেশ্বরী তলায় যাওয়া যায়। চল না দিদিমণি, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো'খন। তা' হ্যাঁগা মা, আমাদের বউদিদিকে তো অম্‌নি এইসঙ্গে নিয়ে গিয়ে ওষুধ পরিয়ে আন্‌লেই হয়? তিনি যেটের আমাদের ছোড়্‌দিমণির চাইতে বয়সে বছর, দু'বছরের বড়ই তো হবেন। আর তোমারও তো ঘরে ছিষ্টিধর বংশধর নেই। দিদির বরঞ্চ বেঁচে থাক্ একটি ছোট দেওরও তো আছে। আমাদের ঘর যে একেবারেই শূন্যি!"

এই যুক্তিটা উষার মনে ভারি সমীচীন ঠেকিল। এ কথা যে তাহার কেন এতক্ষণ মনে পড়ে নাই, এই ভাবিয়া সে অত্যন্ত বিস্ময় ও লজ্জা বোধ করিয়া, কদমের উপর বিশেষ কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে লাগিল। মনে পড়িল, ব্রজরাণীর ছেলের সাধ তার চেয়ে কত বেশি। সন্তানে তার তো নিজের কোন আবশ্যক বোধ নাই,—শুধু শাশুড়ীর লাঞ্ছনা ও সতীনের ভয়।

কদমের কথার উত্তরে এই সময়ে অরবিন্দের মা একটু অসন্তোষপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ঘরই আমার শূন্যি বাছা,—ছিষ্টিধর বংশধরের অভাব তা' ব'লে নেই। সে যে শূন্যি, সে আমার পোড়া কপাল বলে তাই।"

"তা সত্যি মা!" বলিয়া অপ্রতিভের একশেষ হইয়া কদম চুপ করিয়া থাকিল।

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, "বাড়ীতে যে আসে, সব্বাই বলে—বউকে ওষুধ খাওয়াও, মাদুলী পরাও। এই সেদিন মুখের উপরেই বউমার মা বলে গেলেন, 'তোমরা সেকেলে মানুষ—পাঁচটা জান শোন,—রাণীর আমার কোলে যাতে একটি খোকা হয়, তার জন্য কৈ কি কর্‌চো? পৌত্তুর কোলে কর্‌বার সাধ হয় না বেয়ান? আমার যে নাতি বুকে নে'বার জন্য প্রাণটা ছট্‌ফট্ কর্‌ছে'। তা বউমার পাঁচটা খোকা খুকি হয়, সে কি আর আমারই অসাধ বাছা! তবে যে কাজ আমরা করেছি,—ঠাকুরের, বংশধরের যে অপমান ঘটিয়েছি, এর পর আবার তাঁর কাছে 'দাও' ব'লে হাত পাত্‌তে আমার যে ভয়ে হাত কাঁপে। চাইবোই বা আমি আর কোন্ মুখ নিয়ে? না চাইতে না চিন্তাতে তিনি যে আপনি পাঠিয়েছিলেন,—চাইবার অপেক্ষা তো রাখেন্ নি।"

বলিতে বলিতে মুখখানা একটুখানি ফিরাইয়া, তিনি সুপ্রচুর বেদনাভরা একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ধীরে ধীরে মোচন করিলেন। তাঁহার চোখের কোণ্ হইতে অশ্রুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি বিন্দু শীর্ণ গণ্ড দুটির উপর নিঃশব্দে গড়াইয়া আসিল। অন্যমনস্কতাবশতঃ তিনি উহা মুছিয়া ফেলিতে ভুলিয়া গেলেন,—হয় ত বা জানিতেও পারিলেন না।

মায়ের কথাগুলা উষার ভাল লাগে নাই; কিন্তু মায়ের চোখের সেই ফোঁটা-দুই জল তাহার অঙ্গে যেন টগ্‌বগে ফুটন্ত জলের ঝাপ্‌টা মারিল। সে বিদ্বেষজ্বালাপূর্ণ তপ্ত-কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ ঝঙ্কার করিয়া কহিয়া উঠিল, "এ তোমাদের বড় অন্যায় মা! বউদির কোন কিছু কথা হ'লেই, তোমরা

চোখের জল ফেল্‌বে, সেই সব কথা টেনে আন্‌বে,—কেন, ও কি তোমাদের বাড়ী আপনি যেচে এসেছিল, যে, ওকে সবাই অমন করে 'হেনস্থা' করো? তাকে যদি চিরকাল ধরে ভুল্‌তেই পার্‌বে না, তাহ'লে ওকে পদে পদে অপমান কর্‌বার জন্য ঘরে আনা কেন? এ রকম পক্ষপাত আমার ভাল লাগে না বাবু।" এই বলিয়া হাঁড়ির মত মুখখানা করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

মাতা অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া নিঃশব্দে রহিলেন। তাঁহার এ সমস্যার সমাধান তো হইবার নয়। ভিতরে ভিতরে যে আগুন জ্বলিতেছে, তাহার উত্তাপ তাহার স্ফুলিঙ্গ যে সকল সময়ে চাপা থাকিবে, এও কি সম্ভব?

সিদ্ধেশ্বরীতলায় যাওয়া হইল। ব্রজরাণী যাত্রাকালেও মুখ ভার করিয়া থাকিয়া বসিয়াছিল। বেশি কিছু আপত্তি সে করে নাই,—কেবল ঐ একটি কথা, "[illegible] যাবার দরকার কি?" উষা আসিয়া মাকে বলিল, "মা, তুমি বলো নি বলে বউদি' রাগ ক'রে যাবে না। তোমার ওকে গিয়ে নিজে বলা উচিত।"

শরৎ মার কাছে বসিয়া মায়ের মাথার বালিসের ওয়াড়ে ঝালর লাগাইতেছিল। সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া, মায়ের জবাব দিবার আগেই বলিয়া বসিল, "হ্যাঁ, মা বলেন নি বলেই না কি ওর যাওয়া আট্‌কাচ্চে,—মায়ের হুকুম নিয়েই যেন সর্ব্বত্র যায়।"

"তা' যাক্ আর নাই যাক্, এটা তো আমাদেরই দরকার বেশি। আমরা যদি না যেতে বলি, ওর কি মনে কষ্ট হয় না?"

"আমাদের চাইতে যে ওর বেশি গরজ, সে তুমি না জান্‌লেও ও নিজে জানে। কিছু ভেবো না, কাউকে বল্‌তেও হবে না,—ও ঠিক্ যাবে, সে তুমি দেখে নিও।"

"দাদার ছেলে পিলে হয়, তাহ'লে এটা তোমার ইচ্ছে নয়?"

"দাদার ছেলে তো আছেই,—আরও কতকগুলো হ'লো না হ'লো তার

জন্যে এমন কিছু আসে যায় না। তবে ছোট বউএর একটি হয় হবে, ক্ষতিই বা কি এমন তাতে।"

উষা সরোষে কহিয়া উঠিল, "দিদি! সে ছেলেকে তুমি ছেলে বলো কি করে?"

শরৎ সেলায়ের ফোঁড় হইতে চোখ তুলিল, দুই বিস্মিত-দৃষ্টি বোনের মুখে স্থাপন করিয়া কহিয়া উঠিল, "অবাক্ করলি তুই উষি! ছেলেকে ছেলে না বলে, মেয়ে বল্‌বো না কি?"

রাগে চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিলেও, এ কথার কোন রূঢ় উত্তর উষা খুঁজিয়া পাইল না।

যাই হোক্, শাশুড়ী বধূকে ডাকাইয়া হুকুম দিলেন। ব্রজরাণীও ঠাকুর-তলায় গিয়া ঔষধ ধারণ করিল এবং ইহার সাত আট মাস পরে যখন ছোট ননদ উষার কাঁচা সাধের নিমন্ত্রণে পাড়াপড়সীরা বোসেদের বাড়ী ... করিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া গেল, তাহার পরদিন সে মাদুলিটি খুলিয়া ফেলিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

তত্রাহমগমং নাথ ত্রৈলোক্যললনা গৃহে।
ততো দৃষ্টা ময়া সর্ব্বা বয়স্যা মদনোৎসবে।
অপুত্রয়া পুত্রযুক্তাস্তেনাহং দুঃখিতা ভৃশং।
—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

এদিকে, দেখিতে দেখিতে নদীর স্রোতের মত কালের স্রোত প্রবাহিত হইতে হইতে ব্রজরাণীর আঠার বছর বয়সকে আরও বৎসর তিনেক অগ্রসর করিয়া দিল। বাঙ্গালীর মেয়ের শরীরের গঠনে তাহাকে 'কুড়ির পারেই

বুড়ি' করিয়া ফেলে। প্রথম মাতৃত্বের কাল তাহাদের প্রায় চব্বিশ পঁচিশেই সীমাবদ্ধ। ব্রজরাণীর মা কন্যার সহিত নিরাশার প্রচণ্ড দহনে দগ্ধ ও দিনে দিনে ব্যাকুলা হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সন্তান-বিহীনা ব্রজরাণীর স্বামীর অতুল ঐশ্বর্য্যে কতটুকু দাবী, সে খবর উকীলের ঘরের পরিবারবর্গের তো অজানা নয়। সতীনের ছেলেকে কিসের জোরে সে ঠেকাইবে? বিধি-বিড়ম্বনা বুঝি ইহাকেই বলে? তা ব্রজরাণীর সমস্ত জীবনটাই যখন এই বিড়ম্বনার কণ্টকে বিদ্ধ, তখন তাহার ভাগ্যে এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যই বা বিধাতা লিখিবেন কেন? বিবাহের প্রারম্ভ হইতেই অনাগত সুখ সৌভাগ্যের কাঁচা ভিত্তি পাকা করিবার জন্য কত না অশাস্ত্রীয় বিচিত্র মন্ত্রতন্ত্র, অদ্ভুত অনাচার-পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছে! বিবাহ হওয়া অবধি, নিরপরাধে অপরাধের বোঝা বহিয়া, নত-মস্তকেই চলিতে হইতেছে,—কোথাও তো সে মাথা উঁচু করিয়া সুপ্রতিহত অধিকারের গৌরবে স্থান লাভ করে নাই। সঙ্কুচিত পদে আসিয়া যেন চোরের মত সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ-পথ তৈরি করিতে হইয়াছে। সতীনের সহিত নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া ব্রজরাণী ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই, যে, তাহাদের দুজনার ভিতর কাহার অবস্থাটা ভাল? তাহারই স্বার্থের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট, অথবা তাহার পরে সবিশেষ প্রেম প্রীতির সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দুচারিজন ছাড়া, বিশ্বের আর সকলকার সহানুভূতিই যে, সেই পরিত্যক্তার উপরে, তা' মুখে সবাই ফুটাক্ আর নাই ফুটাক্, এ মোট কথাটা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। মনের অগোচর পাপ নাই,—রাণী নিজেও আর সকলের সহিতই যে একমত হইতে পারিত, যদি না এই করুণ-রসাত্মক নাট্যাভিনয়ের ভূমিকা গ্রহণকারিণীদ্বয়ের একতমা সে মন্দ ভাগ্যগুণে নিজেই না হইয়া বসিত। কিন্তু এ তো সে নয়! রিজার্ভ করা বক্সে বসিয়া থিয়েটারে এ দৃশ্য দেখিলে, রুমালে ঘসিয়া চখের জল মুছা যায়,—পড়সীর ঘরে ঠিক্ এমনটাই ঘটিলে, সেই নির্য্যাতিতার পক্ষে দাঁড়াইয়া, হাজারবার আহা, উহু বলা চলে। কিন্তু যেখানে নিজের সমুদয় সুখ এবং

সৌভাগ্য লইয়া টানাটানি, ঠিক্ যদি সেই জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া বিচার করিতে হয়, তা' হইলে বিবেকও কি অন্ধ হইয়া গিয়া একটুখানি বিপথের দিকে পা ফেলিয়া বসে না? ফেলে।—কিন্তু সে তো আর চিরদিনেরই অন্ধ নয়—কাজেই নিজের এ অসংযত পদক্ষেপের ভুলকে সে প্রশ্রয় দিতে ব্যথা পায়।—কিন্তু আবার না দিয়াও পার পায় না। নিজের কাজে নিজেই অস্বস্তিতে জ্বলিয়া মরে।—অথচ এ ভিন্ন উপায়ই বা তাহার কি?

বস্তুতঃ, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, এই রাণী মেয়েটিকে খুব বেশী দোষ দেওয়া চলে না। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই আত্মীয়-আত্মীয়াদের মুখে তাহাকে সতীনে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলিয়া দেওয়ার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অনেক সুযুক্তি, এবং ইহা লইয়া মা বাপের মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটি, মায়ের অনেক অশ্রুবর্ষণ সে দেখিয়াছে এবং শুনিয়াছে। শুভদৃষ্টির সময়ে বরের যে চোখ সে নিজের চোখে দেখিয়াছিল, তা' দেখিয়া সলজ্জ আনন্দে সে কেন, কোন নবোঢ়ারই হয় ত হৃদ্‌পদ্ম উন্মেষিত হইয়া উঠে না। সেই গাম্ভীর্য্যময় স্থির দৃষ্টির আঘাতে কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় বাবুনি হৃৎপিণ্ডটা নিজের চির-চাঞ্চল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত হইয়া যায়। বাসর-ঘরে প্রমোদ-কৌতুক-মত্তা নারীগণের প্রগল্‌ভ অত্যাচারে বর কথা কহিয়াছিল,—এমন কি, সুগায়ক অরবিন্দ বার-কয়েকের অনুরোধে গান পর্য্যন্ত গাহিয়াছিল।—সে গানও বিবাহ-বিভ্রাটের বরের মত শ্মশান-যাত্রার গানও নয়।—তথাপি সূক্ষ্ম বেণারসী ওড়নার মধ্য দিয়া ব্রজরাণীর বিস্মিত নেত্রে ক্ষণে ক্ষণে সেই শ্মশানেশ্বরের মত বৈরাগ্যপূর্ণ এবং শ্মশানযাত্রীর মত নির্লিপ্ত মুখখানা দর্শন করিতে করিতে ভয়ে সন্দেহে বারংবার শিহরিয়াছে। সেই যেন মানুষের হাতে গড়া পুতুলের মত ভাবশূন্য মুখ চোখ লইয়া, যে মানুষটা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহাকে আবার বিবাহ করিয়া, যেখানের যা কিছু কর্ত্তব্য নিঃশব্দে সমাধা করিতেছিল, তাহার সেই ভাবশূন্য ভাবটাতেই সে এত বেশী ভয় পাইয়াছিল যে, ইঁহার সম্বন্ধে এমনও সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে উঁকি দিয়

যাইতে ছাড়ে নাই—যে ম্যাজিক লণ্ঠনে দেখা ; 'ব্লুবেয়ার্ডের' কাহিনীর 'ব্লুবেয়ার্ডের' মত হয় ত বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়া এ ব্যক্তি তাহাকে মারিয়াই বা ফেলিবে ! এই স্ত্রী-হত্যাই হয় ত বা তাহার পেশা।'

তার পর শাশুড়ী যে বৌ-বরণ করিবার সময়, খস্‌খসে বেণারসী শাড়ীর খসা আঁচল তুলিবার ছলে, সেই আঁচলে পুনঃ পুনঃই চোখ মুছিতেছিলেন, সে দৃশ্যটা তাহার চক্ষে অদৃশ্য ছিল না। এ ভিন্ন, চারিদিক হইতেই একটা সুস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট গুঞ্জন মৃত্যুঞ্জয় বসুর কঠোর শাসনকেও ছাপাইয়া উঠিতে থাকিত। শরতের যে ব্যবহারের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, সেও কোন নববধূর—বিশেষতঃ যাহার রূপ আছে, বুদ্ধি-বিদ্যার পাঁচজনের কাছে খ্যাতি এবং নিজেরও মনে সুপ্রচুর গৌরব বোধ আছে, আর—এ সবারই চাইতেও অনেকখানি বেশি—বাপের ঘরে টাকা আছে,—বিশেষ করিয়া সেই টাকা শুধু তাহার বাপেরই সিন্দুকে কোম্পানীর কাগজে নিবদ্ধ নাই—তা হইতে রূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই মেয়েরই শ্বশুর-ঘরে অনেকগুলা আঁক গায়ে আঁকিয়া উপস্থিত হইয়াছে।—যাহার বাপের বাড়ীর দেওয়া যৌতুকে, তত্ত্বে—মৃত্যুঞ্জয় বসুর বাড়ীতে অবশ্য স্থানের অকুলান হয় নাই,—তাছাড়া এ অঞ্চলের আর সব কয়টা বাড়ীতেই স্থান-সঙ্কীর্ণতা ঘটিতে পারিত, সেই রূপগুণ এবং ধনবতীর পক্ষে কখনই সম্মানসূচক নয়। স্বামী অরবিন্দের সম্বন্ধে অবশ্য এমন স্পষ্ট করিয়া কোনই নালিস করিবার নাই। তাহার ব্যবহারের সমালোচনা করিতে বসিলে ভদ্রসমাজের নর এবং নারীমাত্রেই তাহাকে সুভদ্র ব্যবহারই বলিবে,—কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা ভগবান এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, দুর্ভাগ্যক্রমে শুধু 'সুভদ্র ব্যবহারেই' ইহা সীমাবদ্ধ নয়।

ফুলশয্যার গভীর রাত্রে আত্মীয়স্বজন-বিচ্যুতা, আত্মগৌরবে নিরতিশয় আঘাতপ্রাপ্তা অভিমানিনী ব্রজরাণী যখন বিছানায় পড়িয়া চোখের জলের বন্যা সৃজন করিতেছিল, তখন কি যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া বিনিদ্র অরবিন্দ হঠাৎ

স্ত্রীর অশ্রু-বর্ষণ জানিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ কাছে আসিয়া সান্ত্বনা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "এখনও তুমি জেগে জেগে কাঁদ্‌চো? চুপ কর।"

রাণী বোকা মেয়ে নয়; তা ভিন্ন, তাহার কপাল তাহাকে বোকা বনিতে সাহায্যও করে নাই। বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইবার পর হইতে মা, খুড়িমা, দিদিমা, ঠাকুমা—সমুদয় প্রবীণা অপ্রবীণা অভিভাবিকার দল তাহাকে তাহার সঙ্গীন অবস্থার কথা এবং এই সঙ্কট-সঙ্কুল সঙ্কীর্ণ পথে কেমন করিয়া চলিতে হইবে, ইহারই উপদেশ উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে সদাসর্ব্বদাই শুনাইয়া আসিয়াছেন। এমন করিয়া শিখাইলে একটা বনের পাখীও তুদিনে পড়িতে শেখে, আর মানবী ব্রজরাণী তাহার যথাকর্ত্তব্য শিখিয়া লইতে পারিবে না? ব্রজরাণীর কান্না স্বামীর কথায় থামিল না বটে, কিন্তু সে কোন রকম একটু দ্বিধা পর্য্যন্ত না করিয়াই তৎক্ষণাৎ স্বামীর খুব কাছে সরিয়া আসিল, এবং হাত বাড়াইয়া স্বামীকে স্পর্শ করিয়া রুদ্ধস্বরে কহিয়া ফেলিল, "আমায় এ বাড়ীতে কেউ ভাল চোখে দেখে না!" অরবিন্দের সর্ব্বদেহে এই স্পর্শ যে একটা দারুণ শিহরণ লইয়া আসিয়াছিল, ব্রজরাণী সেটুকু জানিতে পারিলেও, সে লইয়া বিশ্লেষণ করার কথা তাহার মনে জাগে নাই। নিজের তুঃখের স্মৃতিটাই তখন তাহার কাছে প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে,—আর কোথায় কার কি অন্তর্গূঢ় নিদারুণ তুঃখ-শেলে বুক ফাটিতেছে বা ফাটে নাই, সে খবর তাহার কাছে রাখিবার মতই নয়। ক্ষণকাল নীরব, নিথর পড়িয়া থাকিয়া, অবশেষে অরবিন্দ স্ত্রীর সেই হাত-খানার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে, শান্ত মৃদু কণ্ঠে তাহার নালিশের জবাব দিল, "ভাল চোখে দেখবে বই কি রাণি, দেখবে বই কি। বাবা যখন তোমায় এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন, তখন কি কেউ তোমায় অনাদর করতে পারে?"

"বড় ঠাকুরঝি তো আমার মুখই দেখেন না।"

অরবিন্দ আবার ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া, গলা সাফ করিয়া লইয়া

উত্তর করিল, "তার যে বড্ড অসুখ রাণি, দেখ্‌চোই তো,—সে মোটে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তেই পারে না।"

"অসুখ তো তাঁর শরীরে নয়, মনে,—সে ছোট্ ঠাকুরঝি আমায় সব বলেছে। সে এই বিয়ের কথা উঠ্‌তেই খুব কান্নাকাটি করেছিল,—শ্বশুরবাড়ী চলে যেতে চেয়েছিল,—শুধু বাপের ভয়ে পারে নি। এও শুনেছি যে, সে বলেছে, আর যে যা করে করুক্, এজন্মে সে কিন্তু আমার মুখও দেখবে না। তবে শুধু শুধু কেন আমায়—"

ব্রজরাণীর মুখ দিয়া শেষ কথাটা আর দুঃখাতিশয্যে বাহির হইতেই পারিল না।

"ছিঃ, ওসব কথা কি বিশ্বাস কর্‌তে আছে? আচ্ছা, আমি তাকে বুঝিয়ে বলে দেবো। যত সব ছেলেমানুষী!"

ব্রজরাণী স্বামীর আরও নিকটে, একেবারে তাহার বুকের কাছটিতে ঘেঁসিয়া আসিল এবং তাহার মুখের কাছে মুখ তুলিয়া মিনতিভরা-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আর তুমি? তুমি কি কর্‌বে আমায়—তাই বলো না?"

আর একবার অরবিন্দের আপাদমস্তক বারে বারে শিহরিয়া উঠিল। প্রবল আলোড়নে বক্ষের মধ্যস্থলে লুক্কায়িত স্তম্ভিত হৃৎপিণ্ডটা কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহারই চাপে গলা বুজিয়া স্বর নিষ্ক্রমণ কঠিন হইয়া উঠিলেও, সে সেই নীড়ভ্রষ্ট পাখীটির মত নবীন আশা সন্দেহে আন্দোলিতা, ব্যাকুলা আশ্রয় প্রার্থিনীটির উদ্বেগ-শঙ্কিত মুখের পানে বারেক চাহিয়া দেখিয়াই তাহার মাথাটি নিজের বুকের উপর টানিয়া আনিয়া, সেইখানে তাহা রক্ষা করিল। তারপর কোনমতে যথাসাধ্য সহজ ভাষাতেই সস্নেহ মৃদুস্বরে কহিল, "না, আমি তোমায় অযত্ন ক'র্‌ব না।"

—তা' অরবিন্দ তাহার কথা রাখিয়াছিল। স্ত্রীকে অযত্ন সে একদিনের জন্যও করিয়াছে, এমন কথা অপরে তো বলিবেই না, ব্রজরাণীও কোন দিন বলিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। তাহার যত্নের চোটে সবাই তো দারুণ স্ত্রৈণ

বলিয়াই তাহার বদ্‌নাম রটাইয়াছে। আর বেশি কথা কি? স্বাধীনতা সে স্ত্রীকে ষোল আনার উপর আঠারো আনাই দিয়া রাখিয়াছে,—যেদিন স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, বাড়ীর সরকার ও ঝিকে লইয়া থিয়েটার দেখিতে চলিয়া যায়,—স্বামীর বারণ নাই। স্ত্রী যেদিন আবদার করিয়া বলে, "আজ তুমি নিজে আমায় সঙ্গে নিয়ে বায়স্কোপ দেখিয়ে আন,—নৈলে আমি তো কিছুতে যাব না। কেন, আমার সাধ যায় না নাকি?"—সেদিন অরবিন্দের সদর-বাটিতে বন্ধুবান্ধবদের সতরঞ্চ খেলার যতই জিদ্‌ থাক্‌ না কেন, অরুকে সেদিন ধরিয়া রাখা কাহারও সাধ্য নাই। পিতার জীবৎকালে এ সব স্বাধীনতার সুযোগ দেওয়ার অথবা নেওয়ার উপায় ছিল না; কিন্তু অন্য যা সম্ভব ছিল, তাহাতে ক্রুটি ঘটে নাই। লাভচাঁদের নূতন ক্যাটলগ্‌ আসিলেই একখানা ভাল গহনার সাধ ব্রজরাণীর মনে জাগিত এবং উষাকে দিয়া উষার দাদার কাছে দরখাস্ত পাঠাইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা পাশ হইয়া যাইত। একবার একটা হীরার 'স্প্রে-ব্রোচ' কিনিয়া দিতে অরবিন্দ নিজের ঘড়িচেনটা বাঁধা রাখিল,—হাতে তখন তাহার টাকা ছিল না। উহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেমন করিয়া খবরটা জানিতে পারে; এবং ভৎর্সনা করিয়া বলে, "বউএর কি আর দুটো দিন সবুর সইতো না, যে, ঘড়ি বাঁধা দিতে গেলি? অত বাড়াবাড়ি পত্নী-ভক্তি তা' বলে ভাল দেখায় না অরু!"

অরবিন্দ হাসিয়া জবাব দেয়, "বাঃ, গয়না পর্‌তে তার সাধ হয়েছে, পর্‌বে না? দু'দিন পরে যদি ঠিক্‌ ও রকমটি প'র্‌বার সাধ আর না থাকে?"

"না থাকে নাই পর্‌লে,—গহনার তো অভাব নেই। আমাদের বাড়ীর বউরা বলে,—'রাজার রাণীর যা' নেই, আমাদের অরবিন্দবাবুর 'রাণী'র তা আছে'।"

শুনিতে শুনিতে অরবিন্দ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; হাসিয়াই উত্তর করিল, "বাঃ, তারই জন্য ওর বাপ ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে,—ওর থাক্‌বে না তো কার থাক্‌তে যাবে শুনি?"

বন্ধু সেই মৃদু মন্দ হাসির ছটায় অর্দ্ধাবরিত, তীব্র রোদনোচ্ছ্বাস সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া নীরব হইয়া গেল। ইহার পর অরবিন্দের বউ লইয়া বাড়াবাড়ি যতই অসহ্য হোক্, এতটুকু প্রতিবাদ কখনও তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই।

আর একবার আর একজন তাহাদের কোন্ বিসদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া বলে, "বউ বই তো আর বাইজী নয়,—অত প্রশ্রয় কেন?"

তাহাতেও হাস্যপ্রচ্ছাদিত শ্লেষে অরবিন্দ ঐ রকমই একটা জবাব করে। সে বলে, "এ রকম বিয়ের স্ত্রী বাইজীর বাড়া যে!"

"কিসে?"

"প্রথম ধরো, দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রীকে শাস্ত্রে তো সহধর্ম্মিণীর পদই দেয় নি। দ্বিতীয়তঃ, মেয়েলী আচার অনুষ্ঠানেও এদের পদচ্যুতি ঘটিয়ে রাখা হয়েছে। তার উপর এর যে অবস্থা তা'তে—"

"কি?"

"নাঃ—কিছু না।—আমাদের একজন ঠান্‌দি ছিলেন,—তিনি তাঁর স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। যখন তখন তিনি তাঁর নিজের সাফাই গেয়ে এই ছড়াটি বল্‌তেন, 'একবরে 'স্বোয়ামীর' স্ত্রী পাতে বসে খায়, দোজবরে 'স্বোয়ামীর' স্ত্রী সাথে বসে খায়, আর তেজবরে 'স্বোয়ামীর' স্ত্রী কাঁধে চড়ে যায়'।"

দুই বন্ধুতে হাসিয়া উঠিল। তার পর বন্ধুটি ভাল ব্যারিষ্টারের মত উহার কথারই ছুত বাহির করিয়া উহাকেই ফিরিয়া আক্রমণ করিল। বলিল, "তা' তোমার যখন 'তেজবরে'র স্ত্রী নয়, তখন হঠাৎ কাঁধে চাপানটা তো সঙ্গত হয় না, হেঁ,—ডবল প্রমোশন দেওয়ার তো নিয়ম নেই এখন। গণ্ডী ছাড়াও কেন?"

অরবিন্দ শুধু হাসিমুখে বলিয়াছিল, "আমার যে সাতবরের বাড়া। আমায়,—কাঁধে ছেড়ে মাথায় চাপতে চাইলেও,—মাথা পেতে দিতে হবে।"

বন্ধু বুঝিলেন, পাত্নীব্রত্য-সাগরে ডুবিয়া এ ছেলেটির পরলোক ঝর্‌ঝরে: হইয়া গিয়াছে,—ইহার উদ্ধারের আর পন্থা নাই। অবুঝে বুঝাব কত— এই সুনীতির অনুসরণে সেই হিতকামী নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

এততেও ব্রজরাণী যে তাহার পরে স্বামীর ভালবাসার অভাব দেখে, আকর্ষণহীনতা অনুভব করিয়া হিংসার বিষে জ্বলিয়া মরে, ইহার জন্য দায়ী কে ?

দায়ী—হয় ত কেহই নয়। তাহার অন্তরের সপত্নীত্বই শুধু এই ঈর্ষাদিগ্ধ চিত্তের মিথ্যা জৃম্ভিত কল্পনায় অনর্থক পুড়িয়া ছাই হয়। স্বামী হয় ত তাহাকে শুধু বাহিরেই নয়, মনের মধ্যেও সর্ব্বেশ্বরী করিয়া রাখিয়াছেন। দু'দিনের সেই পুরাতন প্রেমের স্মৃতি এতদিনে পুরাতন চিত্রের বর্ণ রেখারই ন্যায় ম্লান হইতে হইতে হয় ত বা কোন্ সময় নিঃশেষে মুছিয়াই গিয়াছে। সেখানে আজ শুধু এই নবীনা,—এই বসন্তকাননচারিণী ব্রততীর ন্যায় সুদর্শনা সুন্দরী ব্রজরাণীর ছবিটুকুইমাত্র ষোড়শকলায় পরিণত চন্দ্রমার ন্যায় আপনার শোভা গৌরবে আলোকিত হইয়া আছে! ব্রজরাণীর নাই কি—যাহাতে দুদিন পাওয়া সেই দরিদ্র-কন্যাকে তাহার এতদিনের সাহচর্য্যও ভুলাইতে পারিবে না ? এ সকল কথা বারবার করিয়াই সে ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে,—কিন্তু কিছুতেই এ বিশ্বাসকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে পারে নাই। যতই জোরের সহিত এই চিন্তাকে সে আশ্রয় করিতে গিয়াছে, ততই ইহার অসঙ্গততা স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়া বলিয়াছে, ইহা অসম্ভব! নিজের মনোনীতা,—প্রথম প্রণয় পাত্রী,—বিশেষতঃ বিনা দোষে অন্যের দ্বারায় পরিত্যক্তা—তাহাকে যে ভুলিতে পারে, সে পারে না কি ? তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করার চাইতে না করা যে শতগুণেই ভাল। তাঁহার হৃদয়ই বা কোথায় ? তা হয় না,—এবং যাহা হয় না,—তাহা হয় নাই। অরবিন্দের প্রেমের পশরাখানি ইতঃপূর্ব্বেই মনোরমা ঠাকুরাণীর চরণপদ্মে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। এখন এই শূন্য বাজরাখানায় ব্রজরাণীর যদি কিছু কাজ চলে তো

চলুক, মোদ্দাৎ সঞ্চয় ইহার মধ্যে আর কিছুই নাই। যা' নাই,—অভিমানে অনাহারে কাঁদিয়া রাগিয়া তা আদায় হয় না।—হয় কি না, বুঝিবারও তো কোন মাপকাঠি নাই। কাজেই অন্তরে এবং বাহিরেও শুধুই গুমরিয়া মরা ভিন্ন আর সবই নিষ্ফল!

সমবয়সীদের কাহার স্বামীর সহিত কি কি কথা হয়, ঝগড়া ঝাঁটির মাত্রা কতখানি, আদর সোহাদের পরিমাণ কতটা,—এই সব কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া শুনিতে তাহার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। তারপর শোনা হইয়া গেলে, নিজের সহিত তুলনায় আনিয়া বিচার করিতে করিতে, নিজের মানসিক সন্দেহকে অসংশয়িত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইত। তা' লইয়া স্বামীর সহিত কলহ করিতে এবং কাঁদিয়া কাটিয়া হাট বসাইতেও তাহার বাধিত না।

একদিন পিসির বাড়ী হইতে পিসিমার নাতনীর বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিয়া সেই এক গা গহনা ও বেণারসী শাড়ীপরা-শুদ্ধ ব্রজরাণী নিজের বসিবার ঘরের জাজিম-বিছান পালংএর উপর শুইয়া পড়িল। কি যে তাহার সেখানে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, সে-ই জানে, গাড়ি হইতে যাহারা তাহাকে নামিতে দেখিয়াছে, তাহারাই তাহার মুখ দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছিল যে, সে কালিঘাট হইতে হাবড়া এই সারা পথখানি গাড়ি চড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই আসিয়াছে। তা কাঁদিতে কাঁদিতেই আসুক, আর না কাঁদিয়াই কান্নার এই বিপুল মেঘ চক্ষে ভরিয়াই লইয়া আসুক,—সে খবর জানিবার প্রয়োজন দেখি না। এখন সেই মেঘের বর্ষণে যে ঘরের মধ্যে নদীর সৃষ্টি হইতে বসিয়াছে কেন, এইটুকুই জানা চাই।

অরবিন্দ বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিবার পর, একটা তুচ্ছ প্রয়োজনে এই ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। স্ত্রীর অসময়ে বাড়ী ফেরার কথা সে জানিত না। খোলা জানালার মধ্য দিয়া গোধূলির রক্তালোকধারা বিছানাটার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর ফিকা নীল শাড়ী—অঙ্গে তাহার ছোট ছোট জরিবুটি ঝলমল করিতেছে—সেইটা সেই লালরংয়ে

মাথামাথি হইয়া পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল,—উঁহু, শুধু শাড়ীখানাই তো নয়! উহারই ভিতর হইতে পাতলা শাড়ীর সূক্ষ্মতা ভেদ করিয়া একখানা স্থূল শুভ্র হাতের আকার, সেই হাতে পরা মণিমুক্তা-খচিত তাবিজ বাজু জশমের, মতির চুড়ির, হীরার বালার, চুনিপান্না, নীলার আংটির বিচিত্র বিচিত্র আকারও যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল না? আর ঐ—ঐখানে—ওই যে জলে ভিজা এক ভাঁজ কাপড়ের নীচে ঐ রকমই সাদা ফরসা রংয়ের গালের পাশে একগোছা কালো কুচ্‌কুচে চুলের আভাসও যে ভাসিয়া রহিয়াছে। ন, এই বস্ত্রাবাসটি শুধুই রাণী-ঠাকুরাণীর সাধের শাড়ীখানাই নয়,—মহামহিমান্বিতা তিনি নিজেও ইহারই মধ্যে আশ্রিতা। কিছু সংশয়োদ্বেগে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অরবিন্দ প্রশ্ন করিল, "এ কি! এমন করে শুয়ে কেন? তেমন কিছু হয় নি তো?"

আর রক্ষা আছে! কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রাণী তাহার স্বামী বেচারার ডাক ধরাইয়া দিয়া তারপর কথঞ্চিৎ কান্না থামাইয়া উঠিয়া বসিল; এবং তারও পর অনেক কষ্টে সে জানাইল যে, তাহার 'তেমন কিছু হইতে' আর শুধু এইটুকুই বাকি আছে যে, এইবার একদিন—তা' সে ছিদাম হাড়ির বউই হোক্, আর জগা মেছুনীর নাতনীই হোক্—তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরায় ও সেই ফিরানো মুখে তাহার মুখের উপরই বলে যে, 'ওগো, সকালে উঠে আঁটকুড়ির মুখ দেখতে নেই—এই সহজ কথাটুকুও কি তোমার জানা নাই, তাই সব্বাইকে ঐ পোড়ার মুখখানা দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াচ্চো?' তা এই কথাটা শোনা হইয়া গেলেই, সে এবারকার মত এই নারী-জন্মটাকে সফল করিয়া লইয়া গলায় দড়ি দেয়।

অরবিন্দ সেই অশ্রুধৌত 'পোড়ার মুখখানা' দু'হাতে তুলিয়া ধরিয়া, মৃদু হাসিমাখা অধর পরিপাটী পাতা নামানো ললাটে ঈষৎ স্পর্শ করাইয়া সকৌতুকে কহিল, "গলায় দড়ি দিলে ভূত হবে যে রাণি! ভূতকে যে তোমার বড় ভয়!"

"জ্যান্তেই আমি ভূতের চাইতে কি এমন ভাল আছি যে, মরে গিয়ে ভূত না হয়ে দেবতা হতে যাব? ভূত ছাড়া আমি আর হবো কি?"

এই কথা বলিতে বলিতেই ব্রজরাণীর সন্তপ্ত অভিমান দশগুণ উথলিয়া উঠিল এবং আবার তাহার কান্না আসিয়া গেল।

অরবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল; তার পর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "তা' বিয়ে-বাড়ী থেকে হঠাৎ চলে এলে কেন?"

"আমার মাথা ধরেছে যে!"

"ওঃ, সেই জন্য মাথা ছাড়াবার এই ব্যবস্থা ক'রেছ বুঝি? তা বেশ করেছ।"

"নাঃ, করবে না বই কি। নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে শুধু শুধু আমায় দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া! আমি তো আর মানুষ নই,—আমার তো আর মনে কিছুই লাগে না।"

কে' কি 'দু'কথা শোনাইল' এ প্রশ্ন করিবার কৌতূহল অরবিন্দর মনে জাগে নাই। এমন সব অনেক অনেক দুঃখ কল্পনা এই কল্পনাময়ী নারীটির মনের মধ্যে বহুল পরিমাণে সঞ্চিত আছে, যে,সেখানে হাওয়ার ভরেও আঘাত লাগে, এ খবর সে রাখিত। কিন্তু তাহাকে বাক্য বিমুখ দেখিয়া রাণীর বলিবার স্পৃহাটা হঠাৎ বাড়িয়া গেল। সে তখন চোখ মুছিতে মুছিতে আপনা হইতেই বলিতে বসিল। যাহা বলিল, তাহার মোটামুটি অর্থ এই রকমই—

ছোটবেলা স্কুলে পড়ার সময় তাহার কিছু অঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা ঘটিয়াছিল। সেই বিদ্যার সহায়তায় আলিপনা প্রভৃতিতে সে বেশ একটু নাম কিনিয়াছিল। বিদ্যা থাকিলেই তাহা ফলাইতে সাধ হয়,—আজও মনের সেই গোপন গর্ব্বটুকু লইয়া সে বিয়ে-বাড়ীর পিঁড়ি আলপনার ভার লইয়া তুলি-হাতে বসিয়া গিয়াছিল; এবং বদ্ধ-দ্বারে একা বসিয়া অনেক যত্নে দু'খানি পিঁড়ি আলিপনা দেওয়া শেষ করিয়া, বড় মুখ করিয়া পিসিমাকে দেখাইতে যাওয়া মাত্রে, তিনি অবাক্ হইয়া গালে হাত দিলেন। ব্রজরাণী প্রথমটা ইহা

প্রশংসাসূচক বিস্ময়চিহ্ন বোধে পুলক লজ্জায় নাচিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া পিসিমার রুষ্ট কণ্ঠ অষ্টমে চড়িয়া উঠিল, "তা' ও না হয় ছেলেমানুষ, অত শত মনে নেই; তুইও কি খুকির সঙ্গে খুকি হয়েছিস্ চপলা,—তুই কি বলে বর ক'নের পিঁড়ি ওকে দিয়ে আলপনা দেওয়ালি বল্ দেখি? এ সব শুভকর্ম্মে কি ওর দ্বারা কিছু হবার যো আছে? নাও, এখন আবার অবেলায় ঐ পিঁড়ি ছ'খানা ধোও, ধুয়ে—যাহোক্ ক'রে দুটো চাল ঘসে আলপনা টেনে রাখ।"—পিসিমার বড় মেয়ে—ক'নের মা চপলা'দি মায়ের কাছে ভৎর্সিতা হইয়া যে জবাবদিহি করিল, তাহাতে জানাইল যে, সে এ তথ্য জানিত বৈ কি। কিন্তু রাণী বেচারি জিদ্ করিয়া যখন আলপনা দিতে বসিয়া গেল, তখন সে আর কি করিবে অগত্যাই—! তাহার যে কি অপরাধ, সে কথা বুঝিতে ব্রজরাণীর বাকি ছিল না। বিবাহ-মণ্ডপে যেখানে এয়ো মেয়েদেরই অখণ্ড প্রতাপ, সে সমাজে তাহার স্থান যে কতখানি নিম্নে, সে কথা তাহার না জানা নয়। কিন্তু যাঁহারা তাহার এই অবজ্ঞেয় অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই কৃত এ অবহেলা তাহার সহিল না। ঘরের গাড়ি, দাসী ও দ্বারবান্ হাজির ছিল—মাথাধরার ছুতায় কিছুক্ষণ শুইয়া থা কয়া সে এই চলিয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় আবার পিসিমা আসিয়া কতকগুলা বকিয়া গিয়াছেন। কিছুতেই তাহাকে রাখিতে না পারিয়া, তাহার মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, 'তাহ'লে আর কি করা যাবে বউ। রাণী যখন বুদ্ধিমতী হ'য়ে অবুঝের কাজ করবে, তখন যা ভাল হয় তাই করুক্। তা ব'লে যা কর্‌তে নেই, সেটা করি কি ক'রে? সতীনে-পড়া মেয়ে তুমি;—মঙ্গলকর্ম্মে তোমার হাত দেওয়াই বা কেন বাছা? নিজের মান বাঁচিয়ে রাখলেই তো থাকে। তুই পড়েছিস্ বলে সবারই যে সতীন হয়, সেই কি তুই চাস্? তোর মতন সবাই যদি না জামাইকে আঁচলে বাঁধতে পারে, তখন দশা কি হবে?' ইত্যাদি।

ব্রজরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এই তো আমার পদ, এই তো আমার মান। এর উপর আবার আমি হয় ত আঁটকুড়ো নাম কিন্‌বো,—আমার মরণই ভাল।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সহঅরি দুক্‌খালিদ্ধঅং সরবর অসিস্ সিনিদ্ধঅং।
মহোবগি গ্‌ অণঅলেং তর্প্পই হংসীজুঅলঅং॥

—বিক্রমোর্ব্বশী।

শরতের বড়মেয়ে অসীমার বিবাহের কয়েকটা দিন পূর্ব্বে, একদিন শরৎদের তালতলার বাটীকে, স্তূপীকৃত নববস্ত্র রঙাইবার বন্দোবস্ত করিতে করিতে একটা পরামর্শ আঁটিয়া উঠিতেছিল। জগদিন্দ্র লোকটি ভারি সাদাসিধা। সে নিজের আফিস ও নিয়মিত কাজ কর্ম্মটী ছাড়া সংসারের ভালমন্দের কোন ধারই ধারিত না; সকল ব্যবস্থা স্ত্রীর হাতে ফেলিয়া দিয়া, তাহারই আশ্রয়ে দুইটি খাইয়া, ঘুমাইয়া, আলবোলার নলটি মুখে দিয়া, তাহার দিনটি নিরাপদেই কাটিয়া যায়। মা বাঁচিয়া আছেন; কিন্তু তিনিও সংসারে অনেকখানি নির্লিপ্ত,—বৌমা অন্ত প্রাণ। শরৎই এক কথায়, তাহার শ্বশুরঘরের সর্ব্বময়ী গৃহিণী। এখন শরতের অনুরোধে মুখ হইতে গুড়গুড়ির নলটা বাহিরে আনিয়া, একরাশ ধোঁয়া অল্পে অল্পে মুখপ্রান্ত হইতে বহির্জগতে প্রেরণ করিতে করিতে জগদিন্দ্র উত্তর করিল, তা বেশ তো,—যদি ভাল বিবেচনা করো, নিজেই একটিবার যাও না।"

এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই দীননাথ মিত্রের সংস্কারাভাবে একান্ত জীর্ণ অর্দ্ধভগ্ন গৃহমধ্যে মনোরমা একরাশি ছেঁড়া জামা কাপড়ে, রিপু সেলাই

তালি লাগাইয়া, উঠি উঠি করিতেছে ;—সখী রাবেয়া ম্যাজেণ্টা পশমের একটা দু'কাঁটার গলাবন্ধ বুনিতে বুনিতে আসিয়া এক পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অজিতের জন্য এইটে বুনেছি,—দেখদেখি ভাই মনো, আর কতটা লম্বা কর্‌বো ?" এই বলিয়া সেফটিপিন-আঁটা, বোনা অংশটুকু খুলিয়া হাতে মাপিয়া দেখাইল যে, উহা তাহার হাতের প্রায় তিন হাত লম্বা হইয়াছে।

মনোরমা সলজ্জ কৃতজ্ঞতায়, সখী-দত্ত উপহারটির পানে চাহিয়া, প্রশংসা সূচক স্বরে কহিয়া উঠিল, "ঐ তো অনেক বড় হয়েছে,—আর বড় করে দরকার কি ? তুই কত শীঘ্র বুন্‌তে পারিস্ ভাই ! এই তো মোটে সেদিন ধরেছিস্—এরই মধ্যে এতটা হয়ে গেছে, তবু ঘরকর্‌নার কাজ টাজ সবই তো আছে।"

"ভারি তো শক্ত বোনা ! এ বুন্‌তে আর কত সময় লাগে ? আজ ভাই আর বস্‌বো না—হামিদ ক্লাসে উঠেছে,—তাই তার দু'টি বন্ধুকে আজ একটু জল টল খাওয়াবে,"—বলিয়া, গলাবন্ধটা জড়াইয়া পিন আঁটিয়া, উঠিয়া পড়িল।

মনোরমা, রাবেয়া আসায়, আবার নূতন করিয়া ছুঁচে রঙ্গিন সূতা পরাইয়া, অজিতের একখানা নূতন ধুতির কোণে চিহ্ন করিতে বসিয়া গিয়াছিল। এখনি বন্ধু-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিয়া, কোপ-কুটিল-নেত্রে বন্ধুর মুখপানে চাহিল ; কহিল, "তুই কবে না ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে আসিস্ বল্‌তো ?"

"কি করি ভাই,—জানিস্ তো, মা মারা গিয়ে অবধি আমার যা সুখ হয়েছে। ছোটমা কিছু দেখে না। দেখবেই বা কি—বেচারির তো বার মাস অসুখ লেগেই আছে ! রোগে রোগে নিজেই সে আধমরা। বাপের সেবা, ভাইয়েদের দেখা, সংসারের কাজ—সবই তো আমার।"

মনোরমা লজ্জিত-মুখে "তা সত্যি" বলিয়াই মুখ নত করিল।—"চির-

জীবনটা এমন করেই কেটে গেল! আচ্ছা, এতটা যে রূপ ঈশ্বর সৃষ্টি কর্‌লেন, সে কি শুধু এমন করেই ব্যর্থ হবার জন্যে?"

"আল্লার যা মর্‌জি!"

"কি রকমই মর্‌জি কে জানে তাঁর! আচ্ছা রাবি, তোকে একটা কথা কতদিনই বলি বলি ক'রে বল্‌তে পারিনে। তোদের ঘরে আছে বলেই বল্‌ছি ভাই, কিছু মনে করিস্‌নে—তুই কেন হিন্দুর ঘরের বাল বিধবার মত চিরদিন সন্ন্যাসী হয়ে থাক্‌বি? তোর চাচেরা-ভাই তসির তোকে বিয়ে কর্‌বার জন্য অস্থির,—বাপ মাও তো মত করেছিলেন; তবে কেন—

রাবেয়ার পদ্মের মত সুন্দর ও তেমনি হাস্য বিকশিত মুখখানার সমুদয় প্রফুল্লতা কে যেন নিংড়াইয়া লইল। তথাপি, হাতের বোনার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, এক কাঠি হইতে অন্যটায় ঘর তুলিয়া লইতে লইতে, হাসিয়াই উত্তর করিল, "তা, তুইও কেন সেই সঙ্গে একটা নিকে কর্‌ না মনো?"

"দূর! আমার আর তোর বুঝি এক হলো? তা ছাড়া, তোদের সমাজে যে আছে ভাই!"

"তা'হলে, তোদের সমাজে চলিত থাক্‌লেই, তোরাও কর্‌তিস্?"

মনোরমার মুখ লজ্জায় ঠিক রক্তজবার বর্ণ ধারণ করিল। সে আঁচলের একটা প্রান্ত তুলিয়া লইয়া, মুখ ঢাকিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "ছি—ছি, না ভাই, তুই আমায় মাপ কর্‌,—রাগ করিস্‌নে।"

রাবেয়া হাসিয়া কাছে আসিয়া, লজ্জা-নিপীড়িতার মুখ হইতে কাপড় টানিয়া সরাইয়া দিয়া, তাহার গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। আদর করিয়া বলিল, "মনো রে, তোর ওপোর কি আর রাগ হয়, যে কর্‌বো?" তার পর একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ্‌ মনো, সব সমাজেই কতকগুলো জিনিস আছে;—তা ব'লে, সেগুলো যে সবাইকার জন্য, তা না। সব সমাজের মধ্যেই নীচু-উঁচু দু'টো স্তর আছে। ডোম বাগ্‌দির তফাৎ না কর্‌লেই যে ডোম বাগ্‌দি তাদের স্বভাব ত্যাগ কর্‌বে,—তা নয়। আর,

তোমার আমার জন্য,—তা সে সব সমাজেই, এক বিধান। সেখানে হিন্দু মুসলমানের বিধি ভিন্ন নয়। তোমার মুখে এমন কথা শোভা পায় না মনো! কোন্ বংশে আমার জন্ম,—সে কি আমি নিজের তুচ্ছ মোহের স্বপ্নে ভুলে যাব? না, তুমিই তা বিস্মৃত হ'য়ে, আমায় ইতরের কার্য্যে উৎসাহিত করবে?"

"দিদি, তুমি বয়সে ছোট হলেও, জ্ঞানে আমার গুরুর যোগ্য।"

"না রে মনু! আমরা দু'জনেই দু'টি ভাগ্যহীনা মেয়ে। কিন্তু কপাল মন্দ হ'লেও, আদর্শ আমাদের খর্ব্ব হবে না। কি বলিস্ ভাই?"

যেন একটা মুক্তির নিঃশ্বাসকে দীর্ঘ করিয়া নিজের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মনু কহিল, "হ্যাঁ ভাই।"

সখীকে বিদায় দিয়াও মনোরমার মনটা কেমন যেন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। রাবেয়ার সেই হাসি মুখের তিরস্কারটুকু একফোঁটা ছোট একটি ভীমরুলের হুলের মত, তাহার মনের মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ হইয়া ফুটিয়া রহিল। "সত্যই ওই সর্ব্বত্যাগিনী, বংশমর্য্যাদাভিমানিনী, অভিজাত বংশীয়ার নিকট এমন ছোট কথাটা তাহার বলা ভাল হয় নাই। ভগবান যে সংসারের সর্ব্বত্রই ছোট বড়র ভেদ রাখিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—সব কাজ কি সবাইকে করিতে আছে?"

"দেখুন মা-মণি, আমার এই চিঠিটা, সকালে আপনি রাঁধছিলেন ব'লে, দেখান হয়নি,—এই নিন্ পড়ে দেখুন।"

"চিঠি! তোকে কে লিখেছে রে অজু?"

"পিসিমা লিখেছেন মা-মণি,—আমায় তিনি নেমন্তন্ন করেছেন যে! আচ্ছা, আমায় খাবার দিন,—আমি ততক্ষণ চিঠিটা পড়ে আপনাকে শোনাই—'চিরঞ্জীবেষু, বাবা অজিত মণিধন!' মা-মণি! পিসিমা কি রকম করে লেখে,—আমার ভারি লজ্জা করে কিন্তু—"

"লজ্জা কি অজু! সে যে তোমার পিসিমা,—তোমায় সে যে ভালবাসে।"

"আচ্ছা, পিসিমা আমায় কেমন ক'রে এত ভালবাসলে মা-মণি ? পিসিমা তো আমায় কখন দেখেনি।"

"না, দেখেনি ;—তবু আমি জানি, সে তোমায় বড় ভালবাসে। কি লিখেছে বে ?"

" 'বাবা, তোমার চিঠি পত্র অনেক দিন না পেয়ে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে,—কেন খবর দিলে না বাবা ? গোপাল আমাব ! তোমার দিদির যে বিয়ে হবে,—তুমি দিদিব বর দেখতে পিসিমার বাড়ী মাকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে তো ?'—ও কি মা-মণি ! তুমি অমন ক'রে বসে পড়লে কেন ? পায়ে লাগ্‌লো বুঝি ?" খাবারগুলো ছড়িয়ে পড়ে গেছে,—তা যাক্‌গে, আমার আজ একটুও ক্ষিধে পায় নি, গেছে ভালই হ'য়েছে।"

মনোরমা হেঁটমুখে হস্তচ্যুত রেকাবখানার দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বুভুক্ষিত ছেলের খাবার তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া, তাহার ক্ষণিকের সেই আত্ম বিস্মৃতিব যে প্রায়শ্চিত্ত ঘটাইতেছিল, সে ছাড়া সে কথা কে বুঝিবে ? ঘরে আর তো কিছু নাই,—কি সে এই সারাদিনের শ্রান্ত, ক্ষুধিত বালককে খাইতে দিবে ? সে হাসি-মুখে যত জোর করিয়াই নিজের অক্ষুধা জ্ঞাপন করুক না কেন, মায়ের প্রাণের আত্মগ্লানি কি তাহাতে চাপা পড়ে ?

বাহিরের দিক্ হইতে জুতা পরিয়া চলার শব্দ পাওয়া গেল। কে, কি বৃত্তান্ত—এই সব কথা ভাবা চিন্তার পূর্ব্বেই, একটি দশ এগার বছরের ছেলের হাত ধরিয়া বছরখানেকের একটি কচি মেয়ে, ও একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি উড়ে-চাকরের হাতে ও কোলে দিয়া, মনোরমারই সমবয়সী একটী মেয়ে দ্বারের মধ্য দিয়া ভিতরে আসিল। ইহারা এ বাড়ীর পরিচিত নয় ; মা ও ছেলে বিস্মিত-চোখে ইহাদের দিকে চাহিয়া থাকিল দেখিয়া, যে আসিয়াছিল, সে নিজের পরিহিত শাড়ীর আঁচল তুলিয়া, নিজের চোখ দু'টা ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিল এবং যেন অনেক চেষ্টায় বাঁধা ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হইতে

হইতে বলিয়া উঠিল, "অজু মণিধন! আমি তোমার কে হই বল দেখি?"

অজিতের কালো চোখে বিস্ময়ের অতি নিগূঢ় ছায়া সহসা এই প্রশ্নে তরল হইয়া উঠিল। সে সুন্দর মুখখানা হাসির আলোয় উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়া, অপরিচিতার মুগ্ধ চোখের উপর নিজের প্রফুল্ল দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিয়া উঠিল, "আপনি আমার পিসিমা হন।"

এই বলিয়াই নতজানু হইয়া মাথাটা তাহার চরণপ্রান্তে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

"কি করিস্ বাপ্, কি করিস্ রে—পায়ে যে মাথাটা ঠেকিয়ে ফেল্লি,—" বলিতে বলিতে শশব্যস্তে পিসিমা ভাইপোকে টানিয়া তুলিয়া, বুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মাথায় মুখে, যেখানে সেখানে হাজারটা চুমো খাইল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিধারার মত চোখের জলের উৎস ছুটিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। সে অশ্রুর অনাহূত আগমনে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে,—সে বেগবান্ অশ্রুধারার বহির্গমন রোধ করা শরতের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

দীর্ঘ একাদশ বৎসর পরে দুই সখীতে মিলন হইল। অনেকখানি ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে, উভয়ে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতে সাহসী না হইয়া, অজিতকেই মধ্যস্থ রাখিয়া, তাহাকে লইয়া গল্প করিতে বসিল। পিসিমা ভাইপোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমি যে পিসিমা,—কেমন ক'রে তুমি জান্‌লে অজিত?"

অজিত পিসিমার কোলে বসিয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মত থার্ড ক্লাশের ছাত্র—এগারো বছরের ছেলে আবার কাহারও কোলে বসিতে পারে, সে কথা মনে হইলে যত লজ্জা করে, তত হাসি পায়। ভাগ্যে সমবয়সীরা কেহ উপস্থিত নাই, তাই রক্ষা! নইলে কি আর সে স্কুলে গিয়া তিষ্ঠিতে পারিত। একেই তো 'মায়ের খোকা' তার নামই

হইয়া গিয়াছে। 'গোপালের' পরিবর্ত্তে 'অজিত বড় সুবোধ বালক' ইত্যাদি আওড়াইয়া, তাহাকে তো বিব্রতই রাখিয়াছে। সে এখন আস্তে আস্তে কোল হইতে নামিয়া বসিয়া, হাসিহাসি মুখে মুখ তুলিয়া কহিল, "তা আমি কিন্তু বুঝ্‌তে পেরেছিলুম পিসিমা !"

"কি করে পার্‌লি বল্‌ না বাবা ?"

অজিত হাসিয়া ফেলিল, "আপনার চিঠি আর কথা ঠিক্ যে এক রকম,—তাই থেকে বুঝ্‌তে পার্‌লুম।"

পিসিমা ভাইপোর বুদ্ধিমত্তায় একান্ত প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, বিস্ফারিত-নেত্রে, তাহার আগমন-সংবাদে গৃহাগতা দুর্গাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিল, "কি বুদ্ধি ছেলেটার ! এ যে বুড়ো মানুষেরও মাথায় আসে না মা !"

দুর্গাসুন্দরী একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব হইয়াই রহিলেন। তারপর শরতের প্রণামের পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া, জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়াই, একটা প্রশ্ন করিলেন, "সব ভাল তো ?"

এই স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটার মধ্যে যে প্রশ্নকর্ত্রীর এতটুকু একটি ফোঁটাও আগ্রহ ছিল না, তাহা তাঁহার গলার স্বরই বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেও এবং সে নিস্পৃহ আতিথেয়তা অতিথিরও কাছে অজ্ঞাত না থাকিলেও, তথাপি, নিজেদের লজ্জাভারে অবনতমুখী থাকিয়া, শরৎ কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে জবাব দিল, "হঁ্যা।"

তারপর দু'জনকার মধ্যে একজনও অপরকে বলিবার জন্য একটি মাত্র কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া, কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিবার পর, দুর্গা-সুন্দরীই প্রথমে সে সঙ্কুচিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, "মনো, এদের একটু জলটল খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিস্ ? ও মা ! এ কি কাণ্ড ! রুটি তরকারির এত ছড়াছড়ি কেন ? ছেলেটা বুঝি কিছু খেতেও পারেনি ? সাবাস্ মা তুমি বাছা ! এখন ঘরে কোথাও কিছু আছে, না,—উপোস্ করে থাক্‌বে ছেলেটা ?"—এই বলিয়াই তিনি খিড়কীর দিকে চলিয়া গেলেন।

মনোরমার চিত্ত এই আকস্মিক ঘটনার অভিঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, যাহারা আসিয়াছিল, তাহারাও নিজেদের নানা ব্যস্ততার মধ্যে, খাবার ছড়ান ও তাহার প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে মাথা খাটাইতে পারে নাই। এখন এক-সঙ্গে সবারই চক্ষু এবং মন ঐ জিনিসটার দিকেই ছুটিয়া আসিল। অজিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "দিদিমণি! আমার তো আজ মোটে ক্ষিধে নেই,—খাবার আর কিছু চাইনে,—ভাত হলেই একেবারে খাব। পিসিমা আর মোহিত-দা তোমরা আমার বাগান দেখবে এসো না? আমার সূর্য্যিমুখী গাছে আজ সাতটা বড় বড় ফুল ফুটেচে।

সারা দিন তারা মাথা উঁচু করে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, সন্ধ্যে হলেই একসঙ্গে সব্বাইকার ঘাড়গুলো নুয়ে পড়ে,—ভারি মজার ফুল, না? আর একটা লজ্জাবতী লতাও এনেছি। সেটাকে তো ছোঁবার যোটী নেই! এমন কি, জোরে হাওয়া বইলেই অমনি সে মাথা গুঁজ্‌ড়ে পড়েছে। আজকে আমাদের স্যার বল্‌ছিলেন,—মোহিত-দা তুমি তো ফোর্থ ক্লাশে উঠেছ, তোমাদের বটানির কি কিছু বই দিয়েছে? আমাদের কোন বই অবশ্য পড়ান হয় না, কিন্তু স্যার বটানি নিজে খুব ভাল জানেন কি না, আর খুব ভালবাসেন,—মুখে মুখে অনেক জিনিস তিনি শিখিয়ে দেন।"

শরৎ ইতঃমধ্যে উঠিয়া গিয়া, জগুয়ার দ্বারা বাহিত একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি টানিয়া আনিয়া, তাহার মুখের ঢাক্‌না খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার মধ্য হইতে কয়েকটা ভীমনাগের তালশাঁস সন্দেশ বাহির করিয়াছিল। ইতস্ততঃ অনু-সন্ধান-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অভীপ্সিত বস্তুর দর্শন না পাওয়ায়, সেগুলা হাতে লইয়াই অজিতকে ডাকিয়া বলিল, "এসো বাবা, আমি তোমায় খাইয়ে দিই এসো।" অজিতের এদিকে মা না খাওয়াইয়া দিলে কোন দিনই খাওয়া হয় না। যে দিন কোন কারণে সেটা না ঘটিয়া উঠে, সেদিন সে আধপেটা খাইয়া শুষ্কমুখে উঠিয়া যায়। কিন্তু আজিকার এ প্রস্তাবে তাহার কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। পিসিমাকে তাহার মন যতই আপনার বলিয়া

জড়াইয়া ধরিতে যাক্, তথাপি সে পিসিমা যে তাহার এই ঘণ্টাখানেকেরই পরিচিতা—এই একটা মস্ত সঙ্কোচকে যে একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া মুস্কিল!

"না—না, এখন একটুও ক্ষিধে পায়নি পিসিমা,—" বলিয়া সে নিজের লজ্জা সম্বরণ করিতে চাহিয়া, মোহিতের হাতটা ধরিল, "এসো মোহিত-দা! আমার পড়বার ঘরটা তোমায় দেখিয়ে আনি।"

শরৎ আসিয়া আধখানা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া মুখে গুঁজিয়া দিল; বিষণ্ণ হাসিতে অন্তরের গভীরতম দুঃখের এতটুকু একটু প্রকটিত করিয়া কহিল, "আমি যে পিসিমা—আমায় কি লজ্জা করে অজিত?"

অজিত পিসিমার বাহুমধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া, লজ্জিত হাস্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে মোহিত-দাকেও খেতে দিন্,—ও-ও তো অনেকক্ষণ কিছু খায় নি!"

"তা থাক্ না। দাও তো বউ,—ওকেও কিছু ঐ থেকে বার ক'রে দাও তো। ওরে জগুয়া, তুই সংয়ের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা না, কোথায় পুকুরঘাট দেখে শুনে হাত পা ধুয়ে এসে, আমাদের ব্যাগট্যাগগুলো তুলে রাখ,—খুকিকে বসিয়ে দে' না এইখানে।"

মনোরমা এতক্ষণে নিজের হাত পা গুলাকে কোন রকমে টানিয়া আনিয়া,—যেন ছড়ান জিনিষকে একসঙ্গে জড় করিয়া গুছাইয়া লইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সন্দেশের হাঁড়িতে হাত দিলে দেখা গেল, তাহার হাত দু'টাও, ঠিক্ দু'খানা পায়ের মতই,—সমান বেগে কাঁপিতেছে। যেখানটা দেখা যায় না, সেই মনের ভিতরটায় না জানি তখন কি ঘাত-প্রতিঘাতই চলিতেছিল। সুদীর্ঘ একাদশ বৎসরেরও অধিক! এত দিনে যখন সমস্ত স্মৃতির আলোগুলিই একেবারে নিরেট্ অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া নিবিয়া যাইবার কথা,—তখন হঠাৎ সেই বিস্মৃতির তলদেশ আলোড়িত করিয়া এ কি এক অপ্রার্থিত স্মৃতির আলোক জ্বলিয়া উঠিল? এই আলোটুকুই কি শেষ? না, ইহার পশ্চাতে আরও কোন শিখা আছে?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো লক্ষান্তরেঽর্কঃ সলিলে চ পদ্মম্।
দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য নাথো যো যস্য হৃদ্যো নহি তস্য দূরং।

—দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা।

সারাপথখানি চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিয়া শরৎ শাশুড়ীর কাছে সকল কথা বলিয়া, একবার কাঁদিতে বসিয়া গেল। তারপর জগদিন্দ্রের নিকট আরও একবার খুব খানিকটা কান্নাকাটি করিয়া, শেষে চোখ মুছিবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিরক্ত হইয়া, সে আশা ত্যাগ করিয়াই চোখের জলে ভাসিয়া ভাসিয়া বলিল, "বর্দ্ধমানে গিয়ে আজ দেবী দেখে এলুম গো,—আমার তীর্থ করা হ'য়ে গেল! কালীঘাটের দেবীর শুনেছি, কোথায় না কি একটি সিন্দুকে বন্ধ করা কড়ে আঙ্গুল আছে, আর এ দেবী যে আমার রক্তে মাংসে গড়া জ্যান্ত দেহ নিয়ে সহস্র অভাবের মাঝখানে অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তবু সেই তেম্‌নিতরই পতিগতপ্রাণা, সত্যিকারের সতী।" এই বলিয়া আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "পোড়া কপাল আমাদের, অভাগ্য আমার দাদার,—তাই এমন লক্ষ্মীও সাগরজলে ডুবে রইলো। মা গো! কেন মর্‌তে আমি দেখতে গেছলুম!"

জগদিন্দ্র আস্তে আস্তে গুড়গুড়ির নলটিতে টান দিতে দিতে, মাথা নাড়িতে নাড়িতে সায় দিয়া বলিল, "তার আর সন্দেহ কি! তা' তিনি কোথায়, দেখছি নে' যে? ডাক না, আমরাও একটু দেবী দর্শন করে পুণ্যি করে নিই।"

"কোথায় সে, যে, ডাক্‌বো তাকে? সে কি এসেছে?"

"ওঃ, আসেন নি বুঝি? তা' কেন, এলেন না কেন?"

"তবে আর বল্‌ছি কি ? পাছে দাদার মনে কষ্ট হয়, কি পাঁচজনে তাকে দোষে,—এই সব নানা ভাবনায় এলো না সে। তার মার অবশ্য মত ছিল না ; তা' সে মতের জন্য কিছু আট্‌কাতোও না। সে আমি তাঁকে রাজী করাতুম। কিন্তু সে নিজেই যে আস্‌তে চাইলে না।" কাপড় ঘসিয়া ঘসিয়া শরতের চোখের চারি পাশে তাহার শ্যামলা রংয়ের উজ্জ্বলতা বিবর্ণ করিয়া কালির ছাপে পড়িয়া গিয়াছিল।

জগদিন্দ্র কহিল, "তা এলে একবার দু'জনে দেখাটাও তো হ'তো।"

শরৎ চোখ মোছা বজায় রাখিয়া মাথা নাড়িয়া ধরা-গলায় কহিল, "সেই জন্যেই তো সে আরও আস্‌বে না গো,—সেই জন্যেই সে আস্‌বে না। তিন বছর আগে, বাবার কাজের সময় দ্বারস্থ হ'তে গিয়ে, সেই যে একটুক্ষণের জন্য যে দেখা হয়েছিল, তাইতেই না কি সে বুঝতে পেরেছিল, যে, সে দেখায় দাদার কত কষ্ট !—সে কি বল্‌লে জানো ? বল্‌লে, 'বাবা যখন আমায় ত্যাগ করেছেন, আর তাঁকে দিয়েও করিয়েছেন,—তখন এই একটা জন্ম আমার এই রকম করেই কাটিয়ে দিতে হবে। তা'হোক্, এ আমার কর্ম্মফল। দোষ আমি কারুকে দিইনে। জন্মান্তরে নিশ্চয় আমি রাণীকে মর্ম্মান্তিক করে থাক্‌বো,—তাই তার এ জন্মের পাওনাটা আমায় শোধ করে দিতেই হবে। তা'হোক্ তাতেও আমার দুঃখ নাই। আমিই বা কি কম পেয়েছি ? সেই তোমার ভালবাসায় দু'দশদিন যেটুকু আমি পেয়েছিলুম, সেটুকু যে আমার খাঁটি সোণার চাইতেও খাঁটি। সে তো কখন ময়লা হ'তে জানে না। তার ওপোর, এই যে সাত রাজার ধন আমি বুকে পেয়েছি,—এইটুকুর যে কতখানি দাম, সে কি আমি জানিনে ? এর জন্য ঈশ্বরের আর তোমাদের কাছে আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তা মুখ ফুটে বল্‌তে পারিনে। তবে হ্যাঁ,—ওকে যদি না পেতুম, তা' হ'লে আজ আমার জন্য তোমার কাঁদ্‌বার কথা ছিল বই কি'।—হ্যাঁগা, এমন মেয়ে তুমি কখন কোথাও দেখেছ ?"

জগদিন্দ্র বিবর্জ্জিতার একান্ত করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার মুখের সট্‌কার নলটা কখন্ যে মুখ-বিচ্যুত হইয়া তাহার হাতে, এবং তারপর তথা হইতে স্খলিত হইয়া গৃহতলকে চুম্বন করিয়া, নিজের অধোগতিজনিত শোকে লুণ্ঠিত হইতেছিল, এতক্ষণ জানিতেও পারে নাই। সহানুভূতিসূচক সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস টানিয়া আনিয়া, সেটার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়া, সে কহিয়া উঠিল, "নাঃ, এ চমৎকার! একেবারে সত্যি সত্যি সীতাদেবী!"

"ওগো, না—না,—সীতাদেবীরও মনে এতটুকু একটু অভিমান ছিল;—এর যে তাও নেই গো! ব'ল্‌লে, 'কেন দিদি, শুধু শুধু তাঁকে দুঃখ দিতে যাবো? চোখে আমি একবার দেখতে পেতুম বটে, কিন্তু তার জন্য হয় ত তাঁর জীবনের একটা বছর ক্ষয় ক'রে দিয়ে আসতে হ'তো। তাঁর মনের শান্তির কতখানি যে ফুরিয়ে যেত, তাই বা কে বল্‌তে পারে? এ হতভাগীকে তিনি যে আজও ভুল্‌তে পারেন নি, সে ত আমার জানা আছে। যখন চোক বুজ্‌লেই তাঁর সেই হাসিভরা মুখখানি আমি চোখের উপর দেখতে পাই, তখন তাঁর দুঃখমাখা মলিন মুখে চোক বুলিয়ে, বুক ফাটিয়ে দিয়ে নাই বা এলুম?"

"বাঃ, বাঃ,—দেখ, দেখ,—শেখ একটু!"

এসব কথা বলিতে বলিতে—শরতের চোখ দিয়া ঝরঝরিয়া অশ্রুজলের যে ধারা উপ্‌চিয়া পড়িতেছিল,—বৃষ্টিভরা শরৎকালের মেঘ সরান সূর্য্যকরের মত চকিত করুণ হাস্যে সেই মুখখানা বারেকমাত্র রঞ্জিত করিয়া, সে স্বামীর প্রতি কোপকটাক্ষ হানিয়া তাড়া দিয়া উঠিল, "কি শিখ্‌ব গা? আমার কি সতীন আছে? না, তুমি আমায় ত্যাগ করেছ?"

স্ত্রীর এই পরিচিত মূর্ত্তি ও কণ্ঠে প্রকৃতিস্থ হইয়া, জগদিন্দ্র সট্‌কাটা টানিয়া তুলিয়া, জিহ্বা-তালুসংযোগে একটা দুঃখসূচক শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক, মস্তকান্দোলন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "হ্যাঁ, এটা তুমি ঠিক্ বলেছ,—এটা তুমি ঠিক্ বলেছ। সতীন না থাক্‌লে, আর ত্যাজ্যা না হ'লে পাতি-

ব্রত্যটা বেশ খোলে না, না? পুরাণে, উপপুরাণে, উপকথায় সর্ব্বত্রই যখন ঐ এক নীতি, তখন সংসারেই বা বদল হইবে কেন। কি বলো, এঁ্যা?”

“থামো বাবু, তুমি আর জ্বালার উপর জ্বালিও না। হাসি তামাসার সময় অসময় তো নেই তোমার। বুড়ো হ’য়ে মাথার চুল পেকে গেল, তবু স্বভাব বদ্‌লালো না।”

শরৎ এইটুকু ঝঙ্কার ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মেয়ের কাল গায়ে হলুদ। মনের মধ্যে যাই থাক্, আজ তাহার বসিবার অবসর কোথা?

অজিত এ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের বাহির হয় নাই। ট্রেণে চাপা তাহার এই প্রথম। ষ্টেশনের পর নূতন নূতন ষ্টেশন আসিতেছিল,—মাল, মেল ও প্যাসেঞ্জার সবই বিচিত্র! হাওড়া ষ্টেশনের অভিনবত্বে সে অভিভূতই হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর এই কলিকাতা সহর। ইহার বৈচিত্র্য এই পল্লীবাসী বালকের পক্ষে কেন, এই সহরেরই অধিবাসী চিরাভ্যস্ত বৃদ্ধের পক্ষেও কখন না বিচিত্র? প্রদীপের আলোর পাশে তাড়িতালোকের ন্যায় তাহাদের রাজধানীর সহিত এই বঙ্গীয় রাজধানীর প্রভেদ যে। অজিত নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বড় বড় দু’টি চোখ মেলিয়া জনপ্রবাহ, আলোকলহরী প্রভৃতি দেখিল। তাহার থাকার মিয়াদ বেশি দিন নয়। সেদিন তো আসিতেই সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি আসিয়াছিল। সেদিন শনিবার। সোমবার অসীমার গায়ে হলুদ, মঙ্গলবার বিবাহ;—বুধবার ভোরের গাড়ীতেই সে ফিরিয়া যাইবে। স্কুল কামাই হওয়া ছাড়া, এর চেয়ে বেশী দিন সে মা-ছাড়া থাকিতে পারিবে না, কিম্বা মাই ছেলে-ছাড়া থাকিতে পারিবে না,—ঠিক্ বলা যায় না। হয় ত এ দুইটাই এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার মুখ্য কারণ। দিদিমা এক প্রকার অসম্মতিতেই সম্মতি দিয়াছেন। শরৎ যখন মনোরমাকে কোন প্রকারেই আসিতে সম্মত করিতে পারিল না, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,“তবে আর কি বল্‌বো; বল্‌বার আমার আছেই বা কি? তুমি না যাও, অজিতকে তো আমি নিয়ে যেতে পারি? ওকে তো আট্‌কাতে পারো না?”

মনোর অশ্রুপ্লাবিত চোখেমুখে বড় আগ্রহের একটি ফোঁটা মৃদু হাস্য চকিত হইল। আবার তখনি তাহা সেই শান্ত মুখের গভীর মেঘস্তরে বিজলী চমকের মতই মিলাইয়া গিয়া, তাহাকে যেন দ্বিগুণ নিবিড় করিয়া তুলিল। নত-চক্ষে, অতি ধীরে সে উত্তর করিল, "ওকে তোমরা নিয়ে যাবে, তা'তে আমার কি আপত্তি থাকিতে পারে ভাই? তবে আমি এই ভাবচি যে, ওর সঙ্গে সংস্রব রাখলে, তোমরা পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের পাপে পাপী হবে না তো?"

"সে আদেশ যাদের উপরে আছে, তারা পাপপুণ্যের হিসাব রাখুক,—আমার উপর তো নেই। বিশেষ, আর যে যা করতে হয় করুক,—আমি যদি ওকে আমার ভাইপো বলে স্বীকার না করি, তা'হলে আমায় যে জাহান্নমে যেতে হবে।"

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, মনোরমা মুখ তুলিয়া, একটু যেন জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই বলিল, "তা'হলে ওর বাপের বাড়ীর মধ্যে তবু ঐ একটুখানি সরু সুতোর বাঁধন থাক্। ওর তো সংসারের পাওনা খুবই বেশী নয়। যেটুকু পেতে পারে, তার থেকে আমি একটুও বাদ দিতে পারিনে। কিন্তু—"

মনোরমা দ্বিধাগ্রস্তভাবে, নিজের আঁচলের যে প্রান্তটা এতক্ষণ পাকাইতে পাকাইতে সূক্ষ্ম করিয়া তুলিয়াছিল, সেইটেকেই আরও একটু দ্রুত-হস্তে পাকাইতে লাগিল। শরৎ তাহার গা ঘেঁসিয়া সেই ছোটবেলারই মত একেবারে এক হইয়া বসিয়াছিল। সে এই এতটুকু একটু "কিন্তু"র মধ্যে জমা করা অনেকখানি সঙ্কোচ দেখিতে পাইয়া, তখনি সুগভীর আগ্রহ ভরে তাহার গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু ব'লে থাম্‌লি কেন? কি বল্ না বউ,—বল্ না ভাই, কি বল্‌ছিলি?" মনোকে তথাপি নীরব দেখিয়া, জোর করিয়া টানিয়া তাহার মাথাটা নিজের বুকের উপর আনিয়া ফেলিয়া, তাহার সেই মাথায়, মুখে অসীম প্রীতিভরে হাত

বুলাইয়া দিতে দিতে নিজের মুখখানা নত করিয়া, তাহার মুখের কাছে কাণ আনিয়া, ছেলেমানুষের মত আবার প্রশ্ন করিল, "কি ভাই? দাদার কথা কিছু বল্‌বি কি?"

এত আদর—এত আদর আর যেন মনোর দেহে মনে সহিতেছিল না। তাহার বুকের মধ্যে সমুদ্র মন্থন আজ অপরাহ্ণ হইতে সারাক্ষণই চলিতেছে, উদ্বেলিত সিন্ধুর ন্যায় তাহাতে ঢেউ বড় জোরে জোরে উঠা পড়া করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার বুকের রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হইয়া, দম আট্‌কাইয়া যাইবার উপক্রম করিল; এবং তাহার ফলে মুখখানা পাঙ্গাশ হইয়া উঠিল। তখন সে অকস্মাৎ সখীর কোলের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়া, অবিচ্ছিন্ন অশ্রুজলের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া দিল। তখন আর কোন কথাই স্মরণে থাকিল না; শুধু এই কথাই দু'জনের মনে থাকিল যে, তাহারা সেই দুইটি কিশোরী বাল্যসখী। অনেক দিনের, অনেক দুঃখের পর পুনর্মিলিত হইয়াছে। কিন্তু এই মিলনের সেই আসল কেন্দ্রটুকু আর তাহারা ফিরিয়া পায় নাই। তাই এ মিলনে সুখের চেয়ে অসুখই বেশি। যেখানে বলার কথা সে দিনে অফুরন্ত ছিল, সেখানে আজ আসন পাতিয়া বসিয়াছে,—সঙ্কোচে শীর্ণ, দ্বিধাগ্রস্ত একটা 'কিন্তু'—

অনেকক্ষণ এমন করিয়া কাটিল। শরৎ আপনি শান্ত হইয়া, সখীর চোখ্ মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে তুলিয়া বসাইয়া, আবার ঐ প্রশ্ন করিলে, মনো জবাব করিয়াছিল। প্রথমটা বড় লজ্জা বোধ হইলেও, জোর করিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিল, "অজিতকে নিয়ে যাচ্চো, তাকে একবার সুবিধে করে তাঁকে দেখিও। তিনি যেন না দেখতে পান,—আর ও তাঁকে ভাল করে দেখে,—এমন করে দেখিও। বাপ চেনে না ছেলে; এর চেয়ে যে ছেলের পক্ষে কোন লজ্জা নাই।"

ইহারই মধ্যে শরৎ তাহার মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া, চুলের গাদা লইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। সে কহিল, "সে আমায় তোর বল্‌তে হবে না।

সুজনবাবু এঁর আর দাদার দুজনারই বন্ধু কি না,—রাজার বিয়েয় এসেছিল। গিয়ে যখন অজুর কথা এঁদের কাছে গল্প কর্‌লে, বল্লে, 'অরবিন্দের ছেলে ওখানে থাকে তা'তো জান্‌তাম না। ছেলেটা বাপের বুঝি বড় ন্যাওটো? বাপের কথা যেন মুখ দিয়ে বল্‌তে পারে না,—ভারি ভক্তি দেখ্‌লাম। চমৎকার ছেলে।' তখনি থেকে আমার ইচ্ছে হয়েছিল,—"

ঈষৎ ভীতা হইয়া মনোরমা চমকিয়া মুখ ফিরাইল, "কিন্তু ওকে নিয়ে তাঁর সাংসারিক সুখে যেন এতটুকুও ব্যাঘাত না হয়,—ওর জন্যে ওঁদের বাড়ীতে কোন অশান্তি না আসে। লক্ষ্মী দিদিমণিটি আমার! দেখো ভাই, আমাদের এই দুর্ব্বলতাটুকুতে তাঁর এত দিনের এতখানি সংযম যেন ব্যর্থ না করে ফেলি।"

শরৎ তখন আবার একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া উত্তর দিয়াছিল, "দিদি রে, ওদের জন্যে তুই অত করে ভাবিস্‌নে। তোর জন্য এ সংসারে কারুর কোন অশান্তিই যে আস্‌তে পারে না। আর পার্‌লেও তা আস্‌তো না, তোর কি কেউ মূল্য বোঝে।"—ইহার পর ইহাদের মধ্যে আর কোন কথা হয় নাই। শুধু বিদায়কালে যখন শরৎ বলিল, "আর তোমায় তবে কি বল্‌ব বলো? চল্লাম তা'হলে—"

তখন মনো তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উত্তর করিয়াছিল, "না,—আর কিছু ব'লো না। শুধু এই ব'লো, আর-জন্মে যেন আবার পাই। আর সেবার যেন এমন ক'রে পেয়ে হারাতে না হয়।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কর্ণেষু যোগ্যং নবকর্ণিকারং চলেষু নীলেষ্বলকেষ্বশোকঃ।
পুষ্পং চ ফুল্লং নবমল্লিকায়াঃ প্রযাতি কান্তিং প্রমদাজনস্য।

—বসন্তবর্ণনম্।

অসীমার ভাবী শ্বশুর হুগলী জজ-আদালতের একজন নামজাদা উকিল। তাঁর এই তৃতীয় পুত্রটী থার্ড ইয়ারের ছাত্র। বড় দুইটির একটিও বেশ রোজগারে। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব লইয়া প্রায় জন-পঁচিশেক লোক ক'নের বাড়ী বেলা তিনটের সময় আসিয়া পৌঁছিল এবং কৈফিয়ৎ দিল যে, তাহাদের ট্রেণ ফেল হইয়াছিল বলিয়া এরূপ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। নাপিত অনায়াসেই হলুদটুকু ও হলুদমাখার শাড়ীখানা হাতে করিয়া সেই সদ্যঃছাড়া চলন্ত গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িতে পারিত; তা সেই 'অজবুক অথর্ব্ব মিন্‌ষে ভ্যাবা গঙ্গারাম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—তা উহারা আর কি করিবে? তবু সকাল হইতে তাহাকে 'পই পই' করিয়া বলা হইয়াছিল যে, সে সব্বার আগে যেন বাহির হইয়া ষ্টেশনে চলিয়া যায়,—তা আজকালের বাজারে কথা কি কেহ কাহারও শোনে?

কনে একাদশবর্ষীয়া অসীমা ক্ষুধার তাড়নায় ন্যাতাইয়া তখন শুইয়া পড়িয়াছে। ক'নের বাপ জগদিন্দ্র,—'এ কিরূপ আত্মগর্ব্বী অবিবেচক বৈবাহিক খুঁজিয়া জুটান হইল?' এই রূঢ় প্রশ্নের উত্তর প্রদানে নিজেকে একান্ত অসমর্থ বোধে, নিরুত্তরে মাথা চুলকাইয়া গড়গড়ায় 'তাওয়া' সাজার লোকাভাবে বিয়ে বাড়ীর একটা ডাবা হুঁকায় কোনমতে বিষণ্ণ-চিত্তে তামাকু টানিতেছিলেন। কনে'র মা তিক্ত বিরক্ত-চিত্তে সবারই ত্রুটি ধরিয়া

ফিরিতেছিল। নিমন্ত্রিতাগণ বাড়ীর ভাবগতিক দেখিয়া, এখানে আসিয়া পড়ায় যেন অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া চুপচাপ করিয়া বসিয়া, কোথাও বা আপোষের মধ্যেই মৃদু মৃদু স্বরে উপস্থিত সমস্যার বিষয়েই আলোচনা করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এই রকম বিভ্রাট আর কোথায় কোথায় ঘটিয়াছিল, তাহার শতকরা হিসাবে নজীর জমা হইতেছিল। এমন সময়ে শাঁখের শব্দে চকিত হইয়া, যে যেখানে ছিল ব্যস্তসমস্ত হইয়া, সদর অন্দরের সন্ধিস্থলে যেখানে ভিতর-বাটীর প্রবেশদ্বার, সেইদিকেই ছুটিল, এবং আশ্বস্ত হইয়া দেখিল, অসীমার গায়ে হলুদের হলুদ ও আইবড় ভাতের তত্ত্ব আসিয়াছে। যাহারা কুটুম্ব, তাহারা তত্ত্ব দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, সেই খানেই দাঁড়াইয়া বা বসিয়া পড়িল; আর যাহারা আত্মীয়া, তাঁহারা মেয়ের কপালে হলুদ ছোঁয়াইবার জন্য নিজেরা ব্যস্ত হইয়া এবং অপরকে তাগিদ দিয়া সোরগোল বাধাইয়া তুলিল। এমনই হুলস্থূলের মধ্যে বাপের বাড়ীতে মেজ ভাইএর সেজ ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ সারিয়া ব্রজরাণী ননদের মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিল।

অজিত তখন কোথায়?—ছেলের দলে ভিড়িয়া গেলেও অজিতের এই সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজ্যে বড় বেশি বাধো বাধো ঠেকিতেছিল। মনে মনে অনেক যুক্তিতর্ক খাটাইয়াও সে তাহার পিসিমার ঘরকে ঠিক্ আপন করিয়া লইতে পারিতেছিল না। কুণ্ঠায় ও লজ্জায় থাকিয়া থাকিয়া সে কেমন যেন মুষড়িয়া যাইতেছিল। তার উপরে, মায়ের সহিত বিচ্ছেদটাও মন বেশিক্ষণ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। এই উৎসবমুখরিত, কোলাহলপূর্ণ, অপরিচিত রাজ্য ছাড়িয়া নিজেদের শান্ত, নিস্তব্ধ গৃহপ্রান্তে মায়ের কোলের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য অজিতের প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। কিন্তু সুবোধ বালক সে কথা প্রকাশ করিয়া পিসিমার মনে ব্যথা দিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল। সে জানিত, সে বিবাহ না দেখিয়া ফিরিয়া গেলে, এই স্নেহময়ী পিসিমাটি অত্যন্ত দুঃখিতা হইবেন। তা ভিন্ন অজিত তো এখনও তাহার

পিতাকে দেখে নাই। সেই লোভেই যে, সে এতদূরে মা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

এক সময় পিসিমাকে একা দেখিয়া সে তাহার কাছে আসিল। পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজু! তোর ভাই বোন্‌রা সব কোথা গেল রে? তুই একা একা বেড়াচ্ছিস্ যে!"

"না ওদের কাছেই তো ছিলুম।—পিসিমা

"বাবা?"

অজিত ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। শরৎ আলমারি খুলিয়া তথা হইতে কি একটা আবশ্যক বস্তু খুঁজিতেছিল, হঠাৎ সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শিশুর দিকে চাহিল। অজিতের মুখ ঈষৎ ফিরানো,—ভাল দেখা যায় না; কিন্তু মানসোদ্বেগের ছায়া সে মুখে যে কতখানি বিদ্যমান, তাহার আভাস পাওয়া যায়। শরৎ স্নেহে বিগলিত হইয়া কাছে আসিয়া বলিল: "কি রে অজুমণি! কি বল্‌বি বল্ না? কিছু দেখতে যাবি? জু? আর মিউজিয়মে তো কাল সারাদিন ঘুরে এসেছিস্? আর কি? থিয়েটার?

বালক—পিসিমা যে হাতটা তাহার মাথার উপর রাখিয়াছিল, সেই স্থূল বাহুখানা দুই হাতে টানিয়া আনিয়া, তাহারই আশ্রয়ে মুখ লুকাইয়া ফেলিয়া, সবেগে ঘাড় নাড়িল। শরৎ হাসিয়া তাহার অর্দ্ধপ্রকাশিত ললাটে চুমা খাইল-"তা'হলে কোথায় যেতে চাস্ বল্ দেখি?"

তথাপি সে জবাব না দিয়া, আরও একটু কাছ ঘেঁসিয়া আসিল, শরতের নজরে পড়িল—তাহার হাতের আঙ্গুলগুলি কাঁপিতেছে, তখন ঘোর বিস্ময়ের সহিত সে শিশুকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিল,—"বাবা অজিত! কি হ'য়েছে বাবা? মায়ের জন্য মন কেমন কর্‌চে? বাড়ী যাবে?"

এবারও লুকান মুখ না তুলিয়াই অজিত আবার তেমনি করিয়া ঘাড় নাড়িল। তারপর অস্ফুট-কণ্ঠে কহিয়া ফেলিল, "এখনও তো বাবাকে দেখা হয় নি, যাব কি করে?"

শরতের মুখ গম্ভীর হইয়া চোখ ছলছলিয়া উঠিল। চেষ্টারুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস যথাসম্ভব সন্তর্পণে মোচন করিয়া, সে শিশুকে নিজের সমস্ত অন্তরের স্নেহ প্রীতির নির্ঝর ঢালিয়া দিয়া যেন ভরাইয়া দিতে চাহিয়া কহিল, "দেখবে বই কি ধন, দেখবে বই কি। বিকেলে তোমার পিসেমশাই গিয়ে ধরে আন্‌বেন বলেছেন।" তার পর কতকটা আত্মগতই বলিল, "কালই তো রাত্রে নেমন্তন্ন করেছিলুম। তা' বাবুর আসা হ'লো কই? বলে পাঠালেন, জ্যেঠশ্বশুরের ছেলে বিলেত যাচ্চে, তার বিদায়-ভোজের নেমন্তন্নে না গেলে দুঃখ কর্‌বে। ঢের ঢের ছেলে সংসারে আছে—এমন শ্বশুরবাড়ী-ভক্ত কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে দুটি নেই।"

"আমিই তো সেখানে পিসেমশাইএর সঙ্গে যেতে পারি। পারিনে পিসিমা? যদি না,—যদি না বাবার আস্‌বার সুবিধে হয়। যদি না আজও আস্‌তে পারেন। আর হাবড়া, সেই ষ্টেশনের কাছেই তো? কি এমন দূর? কারুকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটেও তো সেখানে—"

"ওরে বাবা! সে কি তুই হেঁটে যেতে পারিস্ রে পাগল! আচ্ছা, আমি এক্ষুনি এই চট্ ক'রে পৈতে ক'টা দিয়ে আস্‌ছি, দাঁড়া।" এই বলিয়া, সত্য মিথ্যার স্তোকে শিশুকে অর্দ্ধ আশ্বস্ত করিয়াই, তাহার বিপন্না পিসিমা এক প্রকার ছুটিয়া পলাইল।

উঃ, কেমন করিয়া সংসারের মসীরেখাহীন, সরল এই শিশুকে সে তাহার প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দিয়া বলিবে, সেখানে, সেই তোমার পরম-পূজ্য পিতৃদেবের গৃহে তোমার স্থান নাই! এততেও যে আজও নিজে এত বড় দুর্দ্দশায় অজ্ঞ রহিয়া মনের শান্তিটুকু এখনও হারাইয়া ফেলে নাই, দু'দিন মাত্র কাছে পাইয়া কাজ কি সাত তাড়াতাড়ি—ভবিষ্যতে অবশ্য-ম্ভাবী— সেই মহাদুঃখের মধ্যে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলায়? যে কটা দিন এমন করিয়া কাটে কাটুক্ না। কিন্তু সেই পিতৃনামের অযোগ্য অকৃতজ্ঞের পায়ে ঢালা এ অকৃত্রিম পূজার অঞ্জলি—এ যে আর সহ্য হয় না রে! সে কি এ জিনিষ পাইবার উপযুক্ত? সবটাই যে এর চুরি।

অজিত যখন ঠাকুমার চোখের জলে ভিজা কোলের-মধ্যে স্থান পাইল,—তখন শরতের মনের পাথর একটুকু যেন হাল্কা হইয়া গেল। তবু একটা কর্ত্তব্য সে সম্পন্ন করিয়াছে। মা আর ক'দিন? তাঁহার বংশধরের এই চাঁদ-মুখখানি একবারও চোখে দেখা তাঁহার দরকার ছিল যে।

এদিকে ব্রজরাণী বাড়ীতে পা দিয়াই দেখিল, যে ভয়ে সে ননদের রাগ মাথায় লইয়াও পূর্ব্বাহ্নে আসা কাটাইবার জন্যই ভাইপোর অন্নপ্রাশনটাকে একটা অছিলার মত দাঁড় করাইয়াছিল, সেই গায়ে হলুদের ব্যাপারটাই বাকি। মনে মনে হাসিয়া সে ভাবিল, সেই যে কথায় বলে, 'যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি',—আমার ভাগ্যে দেখ্‌ছি ঠিক্ ঐটিই ঘটে। মনে করলুম, আমি থেকে যদি এদের মেয়ের আবার কোন অমঙ্গল ঘটাই,—কাজ কি বাপু, আমি না হয় পরেই আস্‌বো। তা' আমার জন্যই সব বাকি পড়ে রইল!

এবাড়ীর ছোটবৌ বীণার সঙ্গে ব্রজরাণীর একটু হৃদ্যতা ছিল। তাহাকে আজ ঘরে পাইবার আশা না থাকিলেও, সেই দিকেই যাইতে যাইতে রাণী দেখিল, আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে কনে'র খুড়ি ও মাসি এক হাত করিয়া হলুদ মাখিয়া হাসিতে হাসিতে আসিতেছে।

"ওগো কনে'র মামি! কুটুমের বেহদ্দ হয়েছ যে দেখ্‌ছি। বলি, আর একটু পরে, কর্ত্তাটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে, একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এলেই হ'তো না।"

"তুই তো বল্‌লি ভালো! বরকে ঘুম পাড়ালেই বুঝি খুব নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? শূন্য-ঘরে ঘুম ভেঙ্গে যদি বর ডরিয়ে ওঠে,—তখন?"

"য্যাঃ, এটা একেবারেই বেহায়া রে! এর সঙ্গে এঁটে ওঠ্‌বার যো নেই!"

"আচ্ছা নাও, তা'হলে একটু হলুদ মাখো! তুমি সাঁজ জ্বেলে এসেছ ব'লেই তো আর আমাদের গায়েহলুদ ফুরোয়নি।" এই বলিয়া কনে'র কাকীমা নিজের হরিদ্রারঞ্জিত ছোট হাতখানি প্রদর্শন করিলেন।

ব্রজরাণী সভয়ে নিজের বেগুনফুলের রংয়ের উপর জরির আখপাতা ডুরে-টানা পাতলা বেনারসীখানার দিকে চাহিয়া তিন পা পিছাইয়া গেল। যোড়হাত করিয়া বলিল, "দোহাই তোর! দিস্‌নে ভাই, মাটী হ'য়ে যাবে, শাড়ীখানা একেবারে নতুন।"

"তবে প'রে এলে কেন? জানই তো, আজ কনে'র মামী মাসীদের ভাল করে হলুদ মেখে নতুন করে নিজেদের বিয়ে ঝালাতে হয়, তা নৈলে কনেকে বর ভালবাসে না।"

উষা বলিয়া উঠিল, "বাঃ! আবার আমায় জড়ান হচ্চে কেন? আমি তো দিদির কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে রেহাই পেয়ে গেছি,—খোকার অসুখ, গা'টা ধোবার যো নেই,—রং মেখে কি সং হ'য়ে থাক্‌বো?"

"না হয় তাই থাক্‌লেই,—মেয়ের বর যদি তাতে মেয়েকে ভালই বাসে—"

"তবে দাও ভাই, সাড়ীখানাই না হয় আমার গেল। একে তো ঠাকুরঝি আমায় কতই ভালবাসেন,—তার উপর যদি শোনেন যে, আমি তাঁর মেয়ের কল্যাণ করি নি, তা'হলে তিনি আমায় ঝাঁটাপেটা কর্‌বেন।"

বীণা খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, নিজের হাতের মাখান হলুদের ছোপটা আর কাহাকেও না দিয়া, নিজেরই আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "মাভৈঃ,—কনে'র কাকীমা আজকের দিনে ভাল ক'রে হলুদ মাখলেই সর্ব্বসিদ্ধি।"

তখন এই অতি চমৎকার সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায়, সন্ত্রস্ত কনে'র মাসী এবং মামী নিজেদের বস্ত্র-সমস্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শান্ত হইল। উষাও তখন নিজের হাতটা তাহারি পিঠের কাপড়ে মুছিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঠিক্ বলেছ ছোট-বৌ! মামী মাসীরা মেয়েকে শুধু ভালবাসাতেই পারে, কিন্তু কাকী-মা ভিন্ন আর কেউ তো জামাইকে মেয়ের ভেড়া বানাতে পারে না বাপু।"

বীণা দুষ্টামির হাসি হাসিতে লাগিল, "দেখ্‌ছিস্‌নে, তোর আমার কাকী নেই ব'লে, আমাদের বর আমাদের যে ভালবাসে না, তা নয়; কিন্তু বৌ-দিদি আমাদের দাদামশাইকে যেমন "ভ্যা" করাচ্ছেন, তেমন কি আর আমরা পেরেছি?"

ব্রজরাণী সাদা মুখ রাঙা করিয়া বীণার বাহুমূলে একটা শক্ত চিম্‌টি কাটিল।

এমন সময় শশব্যস্ত কনে'র মা কি একটা দরকারী কাজে সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে, এই তিনটি সমবয়সী যুবতীকে বিয়ে-বাড়ীর কাজ কর্ম্মের সমস্ত দায়িত্ব বিসর্জ্জন দিয়া হাসিরঙ্গে মাতিয়া থাকিতে দেখিয়া, জ্বলিয়া উঠিয়া বলিয়া গেল, "ছোট-বৌ, ঊষী! তোদের কাণ্ডখানা কি বল্‌ তো শুনি? মেয়েটাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে চন্দন টন্দন পরিয়ে দিবি, তত্ত্বর থালাটালা গুলো আজাড় করবি, কুটুমবাড়ীর লোকেদের খেতে বসান হয়েছে, দেখে শুনে তাদের বিদায় টিদায় করতে হবে, নেমন্তন্নর মেয়েদের পাতা টাতা করে বসাবি,—তা' না, নেমন্তন্নির মত নিজেরাই সেজেগুজে আয়া আয়া ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লি!"

সবার মুখেই হাসি মিলাইয়াছিল। অতঃপর ঊষাকে কনে সাজাইতে পাঠাইয়া, ব্রজরাণীকে লইয়া ছোট-বৌ তত্ত্বর জিনিসপত্র তুলিতে গেল। ঊষার চেয়ে ব্রজর চুল-বাঁধা ও প্রসাধনকার্য্য অনেক পরিপাটিই হয়,—তাহাকেই এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সে কোন মতেই ইহাতে স্বীকৃতা হইল না। "আমায় কি করতে আছে?" বলিয়া সে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

"সে কি ভাই! কেন থাকবে না? তুমি কি?—ওঃ—তা আপনার লোক,—কিছু দোষ হয় না ওতে।"

ব্রজ সদৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, আমি দোব না, তোমরা কেউ দাও গে যাও।"

বলিয়া সে পিছন ফিরিল। চলিয়া যায় দেখিয়া, ছোট-বৌ অগত্যা ছুটিয়া

আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "তা'হলে ছোড়দিই না হয় কনে সাজাক্,—তুমি ভাই তত্ত্ব শাজাড় কর্‌বে এসো।"

ব্রজ কহিল, "সে যদি আমায় ছুঁতে না থাকে ?"

ছোট-বৌ রাগ করিয়া, তাহার গালে একটা ঠোনা মারিয়া ঠোঁট্ ফুলাইয়া বলিল, "নাঃ! তোমায় কিছুই ছুঁতে নেই! কেন, আমার দাদা কি হাড়ি, আর তুমি হাড়ি-বৌ ?"

ব্রজরাণী হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর করিল, "তা কেন, দাদা তোমার উত্তম কুলীন কায়স্থ সন্তান; তাঁর তো কোন অপরাধ লাগে না,—তাঁরা যে পুরুষ। শাস্ত্রে বলে, বলীয়সাং ন দোষায়। আমিই বাগ্দিনী।"

"দাদা যদি কায়স্থ আর তুমি যদি বাগ্দিনী হও, তা'হলে তোমার বুঝি আর একটি—"

"দূর! তোর যা মুখ হচ্চে দিন দিন—যেন আঁস্তাকুড়!"

"আহা! উনি নিজেই বল্লেন,—এখন আমার মুখের হ'লো যত দোষ!"

"ধ্যেৎ! আমি যেন তাই বল্লুম ?"

"তবে কি বল্‌লি ভাই, তাই না হয় আমায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দে'না। দাদা এক জাত, আর তুই অন্য জাত হ'লে—"

"তোরা তো বেহায়া কম নোস্! আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছ্যাব্‌লামী কর্‌তে লাগ্‌লি! ঐ দেখ, আবার দিদি এদিকে আস্‌চে! আমার অত বুকের পাটা নেই বাবু, আমি এই বেলা পালাই, তোরা বকুনি খেয়ে মর্।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া।

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

ঠাকুরমার অনেক দিনের জমান, অনেক দুঃখ-গলান চোখের জলে স্নান করিয়া বিস্মিত, ঈষৎ মাত্রায় ভীত ও অনেকখানি পুলকিতচিত্তে অজিত-কুমার পিসিমার বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে যখন বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, তখন সে স্বপ্নেও যে সব দৃশ্য কল্পনা করে নাই, সেই সব দৃশ্যই সে চোখে দেখিয়া আসিল। ইডেন গার্ডেন নামটা শুনিয়া তাহার মনে অবশ্য ইহার আদর্শটা খুব বড় হইয়াই উঠিয়াছিল। স্বর্গোদ্যান,—সে না জানি কেমন! আদম আর ইব, তারা ঐখানেই তো ছিল? আহা বেচারারা! শুধু শুধু সয়তানের হিংসায় পড়িয়া তাহাদের অতখানি দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইল।

গঙ্গাতীরের যে মূর্ত্তি সে হাবড়া পোলের উপর হইতে দেখিয়া আসিয়া-ছিল, এখানে আসিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য চোখে দেখিয়া, এই বহুরূপিণীর রূপ-বৈচিত্র্যে তাহার শিশু-চিত্ত বিস্ময় কৌতূহলে যেন মগ্ন হইয়া পড়িল। সাহেবদের ছোট ছেলেমেয়ে কদাচিৎ একটা দুইটা ইতঃপূর্ব্বে চোখে দেখিয়াছিল;—এখানে বিচিত্র-পোষাকে সুসজ্জিত প্রজাপতির ঝাঁকের মত ঐ জাতীয় শিশুর প্রচুরতায় সে যেন দিশাহারা হইয়া উঠিল। কোথাও দলে দলে ইউরোপীয়ান্ প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল রূপ; কোথাও স্বদেশীয় অথচ ইহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্বাধীন সমাজের নরনারীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ; এখানে গান, ওখানে বাজনা, সেখানে চক্ষুচমকিতকারী অপূর্ব্ব দৃশ্য, আলো,—এই নির্জ্জন পল্লীনিবাসী গ্রাম্যনিঃসঙ্গ বালকটীর ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন বিমোহিত করিয়া

তুলিতেছিল। তার উপর যখন আবার বায়স্কোপে যাওয়া হইল,—সেখানে নির্ব্বাক্ অভিনেতা অভিনেত্রিগণের অত্যদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ শিশুরাজ্যের মন তো স্বভাবতঃই বিস্ময়রসে পরিপ্লুত করিয়াই থাকে,—অজিত সে রসে যেন একেবারে ডুবিয়া গেল। এই কলিকাতা-নগরী কি সুন্দর! ইহার মধ্যে বাস করিতে পাওয়া কত পুণ্যেরই না ফল! আঃ, ভাগ্যে তাহার পিসিমাটী ছিলেন।

রাত্রে বাহিরের নিমন্ত্রিতা মেয়েদের মধ্যে প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু কর্ম্মবাড়ী তখনও বেশ সরগরম। একদিকে কাজকর্ম্ম, খাওয়া দাওয়া চলিতেছে; এবং আর একদিকে তাহারই ফাঁকে ফাঁকে নূতন কুটুমবাড়ীর সমালোচনা মুখে মুখে গজাইয়া ও পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল। তত্ত্বের জিনিসপত্র যাচাই করিতে করিতে স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে, উহাতে লোকের বহর যত বেশি, থালার বাহার যতখানি,—দ্রব্য-সামগ্রীর প্রাচুর্য্য তত নয়। ঐ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কেহ কেহ ঠোঁট্ উল্টাইয়া মন্তব্য করিলেন "অমন থালা সাজিয়ে তত্ত্ব করা আমরা পারি নে। একখানা করে বগি থালে ফাঁক করে করে সাজিয়েছে দেখ না,—তাই নিয়ে একটা করে লোক,—এ খালি লোক-বিদায় করিয়ে কুটুমের কাছে দাম আদায় করা! মা গো! এমন ফিন্‌ফিনে ক্ষীরের ছাঁচ তুল্লে কি করে গো! দেখ্ দেখ্, পটলীর শাশুড়ীর হাতের তারিফ্ আছে। ফুঁ দিলে ঘুড়ি হ'য়ে আকাশে উড়ে যায়!" সমালোচিকারা তখনি তখনি ঠিক্ করিয়া ফেলিলেন, অসীমার জন্য যে মুক্তার কণ্ঠি আসিয়াছে, তেমন এ বাড়ীর কাহারও জন্য আসে নাই,—আহার মুক্তাগুলি যেমন ছোট, তেমনি বাঁকা-চোরা; ফুলকাটা ...নটিতে তিন ভরিরও ওজন নাই। কোন্ সেকরায় গড়িয়াছিল, জানিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে কখনও কাজে লাগিবে! বীণা বলিল, "পার্শী সাড়ীখানা কিন্তু বেশী দাম দিয়ে কিনেছে,—যদি রংটা অত ঘোরালো না হ'তো! পাড়াগাঁয়ে পছন্দ কি না।"

ব্রজরাণী কহিল, "জামার রংটা দেখেছ, আরও ক্যাট্‌কেঁ্যটে! সেমিজ, পেটিকোট, সাদা জামা সব চাঁদনির কেনা। দিয়েছে সবই,—কিন্তু কোনটারই শ্রী নাই।"

আবার উহারই মধ্যে বিক্ষ দেখিয়া একজন আত্মীয়া সকলকে শান্ত করিতে চাহিয়া মন্তব্য করিয়া বসিলেন, "তা' বাবু, যা দিয়েছে বেশ দিয়েছে। আমাদের কুলীনের ঘরে এ-সবই বা ক'জন দিত? আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল, শুধু বরের কপালে ছোঁয়ান, হলুদটুকু আর এয়োদের হাতে-কাটা—পঞ্চামৃত খাবার গোটাদশী সাড়ী যেমন হয় না—ওম্‌নি খাটো, একটু হলুদ দিয়ে পাড় করা সাড়ী। আর তাতে একথাই রাঙা সূতো ছুঁচ দিয়ে পরানো; পাড়ও তাতে হ'তো না।"

"তোমাদের সে যে মান্ধাতার আমোল ঠান্‌দি, তখনকার কথা ছেড়ে দাও। তোমাদের তো নেবার বেলাও একছড়া পাচনলী আর দু'গাছা পৈঁচে ছাড়া একশ ভরির চুড়ি সুট্, নগদ দু'হাজার, বরের ঘড়ি চেন, রূপার-দান, এ সব বালাই ছিল না।"

"তা' সত্যি ভাই, যা বল্লি!—আমাদের সময় ওসব কোথা? গণপণের সাড়ে সাত গণ্ডা কি পুরো আট গণ্ডাই হ'লো; আর কনে'র খুব ভাল দিলে তো একখানা চিউলি-পোতের রাঙা বেণারসী,—নৈলে সচরাচর বালুচরের একখানা চেলি, পায়ে চারগাছা দম্‌দম্ কি সজ্‌না পাকের মল, কণ্ঠমালা,—কি খুব হ'লো তো, ঐ যা বলেছিস্,—পাঁচনলী আর পৈঁচে দানা মরদানা পলাকাঁঠি—এরই মধ্যে একটা কিছু। শ্বশুর দিলেন বৌভাতে—যদি বড় ঘর হলো তো একটা কড়ির ঝাঁপি সিন্দুরচুবড়ি, চেলি নথ, মাটা তাবিজ, আর 'ধয়ে নো।' আর গরীব গেরস্ত হ'লে তো ওসব পাঠাই নেই,—একগাছা নোয়া আর একটা ফাঁদি-নথ—এই পর্য্যন্তই হ'য়ে গেল।"

"তোমার কি দিয়েছিল ঠান্‌দি?"

"আমায় ভাই, তা ওরা অনেক দিয়েছিল। জগতের ঠাকুদ্দা, আমার শ্বশুর-ঠাকুর শ্রীরামপুরের সাহেবদের কুঠির দেওয়ান ছিলেন কি না,— আমাদের দুজনা'কেই তিনি গা-ভরা গয়না দিয়েছিলেন। আমাদের যা ছিল, তা রাজার বৌদের থাকে না। মাথায় সিঁতিপাটি, কানে ঢেঁড়ি-ঝুম্‌কো চৌদানি, পিঠে পিঠ-ঝাঁপা, বাজু জশম 'বাউটি সুটের সবটি,—একা পায়েই ছিল যা দেখগে, তোমার,—গুজ্‌রী পঞ্চম, বাঁক-মল, চরণপদ্ম, পাইজোড়—এই এতগুলি। তা ভাই রঙ্গ দেখ,—তখনকার কাল আমাদের এমনি ছিল, বামুন কায়েতের ঘরে অত সজ্জা তখন এম্‌নি নিন্দের বিষয় ছিল, যে, আমরা কোথাও গেলে, সবাই আমাদের দিকে চেয়ে মুখ টেপাটিপি ক'রে হাস্‌তো। বল্‌তো, এ কি গো! এরা সোনার বেণে না কি?"

সকলে যখন সেই নিস্পৃহ, নিরাড়ম্বর অতীত কালের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে করিতে ভোগ-বিলাস আড়ম্বরে পরিপূর্ণ, অসন্তোষে ভরা বর্ত্তমানকে বিস্মরণ হইয়া যাইবার জোগাড়ে ছিল, সেই সময়ে বাহিরে একসঙ্গে চটাচট্ পটাপট্ করিয়া অনেকগুলা চঞ্চল জুতাপায়ের খবর দিয়া সুড়সুড় করিয়া কতকগুলি কিশোর এবং বালক সেই মেয়ে মজলিসের মাঝখানে ঢুকিয়া পড়িয়া কলরব করিয়া বলিতে লাগিল, "আজকে যে বায়স্কোপের 'প্লে' দেখে এলাম কাকীমা, তেমনধারা তোমরা দেখ নি।" "মামি-মা, তুমি তো নিত্যি যাও,—কি কি দেখেছ বল দেখি? এটা নিশ্চয়ই দেখ নি,—এ একেবারে নতুন এসেছে।"

"কি রকম বল্ দেখি?"

"দুটো ছোট ছেলে খুব দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছিল,—তাদের মা তাদের এনে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেমন পিছন ফিরেছে, অমনি তারা উঠে দুজনে দুটো বালিস্ নিয়ে না—নিয়ে না দুজনকে—"

"যাঃ, হেসেই কুটিকুটি হলি তা বল্‌বি কি! ছেলেরা তো দুষ্টুমি কিছুই জানে না,—তাই পয়সা দিয়ে রাত জেগে তাদের দুষ্টুমি শিখ্‌তে পাঠান।"

এমন সময়ে আর একটী ছোট ছেলে অগ্রবর্ত্তী দলের চেয়ে কিছু সঙ্কুচিত্ত, অথচ নূতন দৃশ্য দর্শনের আনন্দে উৎসাহদীপ্ত উৎফুল্লমুখে গৃহে প্রবেশ করিয়াই বোধ করি চিরদিনের অভ্যাসানুযায়ীই—স্থান, কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া, একেবারে ব্রজরাণীর কোলের কাছটিতে আসিয়া পড়িল এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল, "পিসিমা! পিসিমা! বায়স্কোপ জিনিসটা ভারি মজার! আর তেম্নি হাসির! কিন্তু ভা—রি বিশ্রী। কেবল যত দুষ্টু ছেলেদের কাণ্ড!"

কোথাও কিছু দেখিয়া আসিয়া এম্নি করিয়া মায়ের কাছে সেটি নিবেদন করিয়া দেওয়া এই ছেলেটির জন্মাবচ্ছিন্ন অভ্যাস। আজ মায়ের বদলে পিসিমাই সেখানে অধিষ্ঠিতা, এইটুকু মনে আছে,—তদ্ভিন্ন আরও কোন কিছু ভাবনার দরকার আছে, এমন সন্দেহ একলা মায়ের ছেলে অজিতের মনেই উঠে নাই।

যতক্ষণ বালক আপন মনে বকিয়া চলিয়াছিল, ততক্ষণের মধ্যে বিস্মিতা ব্রজরাণী কোলের কাছে ঠিক্রাইয়া আসা, সেই অজ্ঞাতপরিচয়, প্রিয়দর্শন শিশুটির মুখের দিকে নিজের দু'চোখ স্থির করিয়া দেখিয়া লইতেছিল। বসন্তকালের নবীন পত্র-পল্লবাচ্ছন্ন কচি চারাগাছটির মত চক্চকে ঝল্মলে সেই মুখখানির দিকে চাহিবামাত্র তাহার মনে হইল, তাহার দু'চোখের তারা দুইটা যেন সুধা-সাগরে ডুব দিয়া শীতল হইয়া জুড়াইয়া গেল! কি যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব মধুর বাৎসল্য-রসে সকল দেহমনে কণ্টকিত হইয়া সে লোভাকুল গভীর দৃষ্টিতে খসিয়া-পড়া তারাটির মত উজ্জ্বল ও তেমনি সুন্দরতম শিশুটির মুখে চাহিয়াই রহিল। একবার এমনও ইচ্ছা হইল যে, আপনা হইতে তাহার এত কাছে যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার তরুণ ক্ষুদ্র দেহটি দু'হাতে জড়াইয়া, তাহাকে নিজের এই বুভুক্ষিত বুকের মধ্যে টানিয়া আনে। অন্তরের মধ্য হইতে সমুদয় নিদ্রিত বৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়া এতদিনকার সুপ্ত মায়ের প্রাণ আজ যেন এই যাদুকরের এতটুকু গায়ের গন্ধে, হাতের স্পর্শে,

ঠোঁটের হাসিতে, গলার সুরে জাগিয়া উঠিয়া শুষ্ক নদীতে বর্ষার ঢল নামার মত হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার শুষ্ক, রুক্ষ, বন্ধ্যা-জীবনের মধ্যে আজ আকস্মিক মা জাগিয়া উঠিলেন।

ছেলেটি এর ভিতরেই নিজের ভ্রম বুঝিয়া তটস্থ হইয়া পড়িয়া, একটুখানি অপ্রতিভের সলজ্জ হাসে হাসিয়া, অপরিচিতার সান্নিধ্য ছাড়াইবার চেষ্টায় দু-পা পিছু হাঁটিয়া তার পর পিছন ফিরিয়া, দৌড় দিবার মতলবে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিল, ইতঃমধ্যেই তাহার পিছনে সমবয়সীর দল কৌতুকে হাততালি দিয়া হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে, "ওরে, অজিতটা খুব ঠকেচে রে—খুব ঠকেচে,—মামীমাকে ও মা মনে করেছিল।"

"ধ্যাৎ! মামীমা ফরসা, লম্বা, অত গয়না-পরা,—বড় মামী মনে করবে কি ক'রে রে? তবে হয় ত ওর নিজের মা'ই ভেবেছিল,—না'রে অজি?"

ব্রজরাণী হঠাৎ কোন কিছু না ভাবিয়াই, শুধু সেই আকস্মিক আগন্তুক ভাবোন্মাদের আবেগে আবিষ্ট হইয়াই, ঝুঁকিয়া পড়িয়া, চলনোন্মুখ লজ্জিত বালকের ডান হাতটা নিজের হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ফেলিয়া তাহার গতি নিবারণ করিল। নিজের দিকে—হয় ত বা নিজের অজ্ঞাতেই তাহাকে ঈষৎ একটুখানি টানিয়া লইয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "নাই বা হলুম আমি তোমার পিসিমা,—বায়স্কোপের গল্প-শুনতে আমিও খুব ভালবাসি। তুমি বল, আমি শুনবো।"

অজিত সচরাচর লজ্জা সঙ্কোচ বড় একটা কাহাকেও করে না। কিন্তু এ যে একেবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাজ্য এবং ইহারা—সে রাজ্যের অধিবাসীরা তাহার অভিজ্ঞতার নিকটেও যেন অপরিচিত। ইহাদের কাছে সঙ্কোচ যে আপনিই দেখা দেয়। কিন্তু এখানে সে অনাহূত আসিয়া-পড়া অতিথি। ধৃষ্টতা তাহার নিজেরই দিকে;—ইহাকে মাপ করিয়া যে কাছে ডাকিতেছে, সেখানে না যায়ই বা কেমন করিয়া? তাহাতে যে সেই পূর্ব্বকৃত ধৃষ্টতাই অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া, যাহারা হাসিতেছে, তাহাদের সেই হাসির

মাত্রাটাকেই বৃদ্ধি করা হয়। দাঁড়াইয়া পড়িয়া, অরুণ-রাঙা লজ্জিত-মুখে সে মৃদু মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, "আপনি তো অনেক দেখেছেন্।"

"দেখেছি, তবে ওটা হয় ত দেখি নি। শুন্‌ছিলুম না কি নতুন এসেছে।"

"তেমন তো নয়,—এটা বুঝি চারের রাত্তির বল্লে বুঝি।"

"তবে হয় ত দেখে থাকবো, তুমি বুঝি আর কখন দেখ নি?"

ছেলেটী দু'টি পদ্মের কুঁড়ির মত নতচোখ সুধীরে উপরে তুলিয়া, প্রশ্ন-কর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি কুণ্ঠার হাসি হাসিল। মুগ্ধা ব্রজরাণীর মনে হইল, গুমোট্ রাত্রির জমাট্ অন্ধকার ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে যেন দিনের আলো হিরণ্ময়ী ঊষা-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া উঠিল। সেই হাসির আলোয় ছোপান, পাতলা টুক্‌টুকে রাঙ্গা ঠোঁট দু'খানির মধু নিঙড়াইয়া নিজের তৃষিত অন্তরে ভরিয়া লইবার জন্য মন তাহার মাতাল হইয়া উঠিলেও, সে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে সে কষ্টে রোধ করিল। এ বয়সের ছেলে—সচরাচর যে বয়সে হিন্দুঘরের মেয়ে, বউ হয়, মা হয়, সে বয়সে হইলে, তাহার যে না হইতে পারিত, তা নয়;—তথাপি অপত্যহীনা ব্রজ-রাণীর পক্ষে অজানা অচেনা একটি বছর-দশকের ছেলের উপর এ ধরণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাওয়া যেন কতকটা অশোভন ও অনেকটা বাড়াবাড়ির মতই দেখায়। উঃ!—ছেলে না হওয়ার এত বুভুক্ষা!

সেই একটুখানি স্মিত-মধুর হাসি হাসিয়া ছেলেটী শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, না, সে ইতঃপূর্ব্বে বায়স্কোপ আর কখন দেখে নাই। ইহা শুনিয়া যেম্‌নি ব্রজরাণী আগ্রহে, মমতায় পরিপূর্ণ হইয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় শরতের মেজ-মেয়ে ন'বছরের সরলা ঘরে ঢুকিয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "অজিত-দাদা, তোমাকে মা যে খেতে ডাক্‌চেন। আর একদিক হইতে শরতের ভাগিনেয়,—অজিতের আজিকার প্রধান বন্ধু, মোহিতলাল অমনি তাড়াতাড়ি অজিতের হইয়া ব্রজর কথায় জবাব গাহিয়া

উঠিল—"ওদের বর্দ্ধমানে বুঝি ওসব আছে, যে ও দেখবে! হুঃ, ও কিই বা দেখেছিল? 'জু', মিউজিয়াম, ঈডেন-গার্ডেন, হাওড়ার পোল, এসবেরও তো ও কিছুই আগে দেখে নি। তাই জন্যেই তো মামীমা বল্লেন—"

আরও কি কি কথা সে গড় গড় করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে সব কোন কাজেই লাগিল না। পিসিমার আহ্বান পাইয়া অজিত যে মুহূর্ত্তে মুক্তির জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক্ সেই একই মুহূর্ত্তে ব্রজরাণীর হাতের আঙ্গুল কয়টা জ্বলন্ত আগুনে ঠেকা ঝলসান হাতের মত একটা প্রবলতর শিহরণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ছোট হাতখানির উপর হইতে শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িল। সেই চমকটা এত সুস্পষ্ট যে, ঐ ছেলেটীর কাছেও ইহা অজ্ঞাত ছিল না। সে সাশ্চর্য্যে উহার মুখের দিকে চাহিয়া, অর্দ্ধ-মুহূর্ত্তকাল ভীত ও অভিভূতবৎ থাকিবার পরক্ষণেই বালস্বভাবসুলভ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

অন্তর্লীনস্য দুঃখাগ্নেরদ্যোদ্দামং জ্বলিষ্যতঃ।
উৎপীড় ইব ধূমস্য মোহঃ প্রাগাবৃণোতি মাম্।

—উত্তরচরিত।

এই যে একটা আকস্মিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল, ইহাতে ব্রজরাণীর মনের ভিতর কি যে তুফান তুলিয়া দিয়া গেল, সে আন্দাজ আর কাহারও না থাক্,—সেই প্রায় মধ্যরাত্রে যখন 'কলিকে'র ভয়ানক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ব্রজরাণী না খাইয়া, কাহারও সহিত একটা সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না করিয়া ঝিয়েব দ্বারা কর্ম্মবাড়ীর কার্য্যে নিযুক্ত নিজেদের ব্রুহামখানা দাঁড় করাইয়া গাড়ীতে গিয়া

উঠিল,—তখন শরতের আর কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিল না। তবে হঠাৎ কি হইল, কোন্ সূত্রে কাহার মুখে শুনিল—এ সব কথা সেও জানিতে না পারায়, একটু বিস্মিত হইয়াই তাড়াতাড়ি আসিয়া, প্রস্থানোদ্যতা ভ্রাতৃজায়ার পথ আগ্‌লাইয়া বলিল, "সে কি বউ, এত রাত্রে যাবে কেন? শরীর না ভাল থাকে, কি হ'য়েছে বলো, ঘরে হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে, ঠাকুরপো বই দেখে বেশ দিতে পারে, তাই দিক্। একটা বিছানা ঠিক্ ক'রে দিই, শুয়ে থাক না।"

"আমায় যেতেই হবে,—হোমিওপ্যাথিতে আমার কিছু হয় না। তা' ছাড়া, রাত্রে আমার ফের্‌বারই কথা ছিল।"

"দাদা এলো না, তুমিও চলে যাবে—"

ব্রজর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ তীক্ষ্ণ হাস্য ফুটিয়া উঠিল, "তাতেও এ বাড়ীতে লোকের অভাব হবে না, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে,—"

ব্রজরাণীর হাসি ও কথার ধরণে শরতের চট্ করিয়া রাগ আসিয়া পড়িল। একেই সে জ্যেষ্ঠের ব্যবহারে আগুন হইয়া জ্বলিয়া আছে;—ধাঁ করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "দাঁড়াতে পার্‌বে কি ক'রে? তোমার যা হ'য়েছে, তা' কি আর আমি জানি নে? যাও, যাও,—আমার ভ্যাড়াকান্ত ভাইকে সাতখানি ক'রে লাগিয়ে, তাকে ঘরের দোর্ এঁটে রেখে দাও গে। দেখো, কোন মতে যেন ছেড়ে দিও না,—তা' হ'লেই গুণ তুক্ সব ভেসে যাবে।"

"নিজের ঘরে মেনতন্ন ক'রে এনে আমায় অপমান করা তা' ব'লে তোমার উচিত হয় নি। আমি যেচে তোমার দোরে পাত পাত্‌তে আসি নি তো।"—এই বলিয়া, আর কিছু না বলিয়াই রাগে, দুঃখে, অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিয়া, পরাভবের সে লজ্জা গোপনার্থ, অত্যন্ত দ্রুতপদে ব্রজরাণী গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। আততায়ীর সহিত দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

ব্রজরাণী চলিয়া গেলে, শরৎ হতভম্ব হইয়া রহিল। উহার অনুযোগে সত্যের যে অংশ ছিল, সেটুকু তাহাকে খোঁচা দিল। তার পর এই বলিয়াই সে নিজেকে ভুলাইল, যে, 'অপমান ওকে কিছু করা হয় নাই। চাঁদের মত সতীন পোর মুখ দেখে ওঁর বুকের মধ্যে দাবানল জ্বলে উঠেছে, সেই আসল কথা। মোট কথা, ব্রজরাণী থাকুক্, যাক্—তাহার জন্য কিছুই আসে যায় না। সে গিয়া পাছে অরবিন্দকে আসিতে না দেয়, এই ভয়! আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে দাদা ঘণ্টাখানেকের জন্য এ বাড়ীতে বেড়াইয়া গিয়াছেন। তখন অজিতরা বাড়ী ছিল না। অনেক বলিয়া কহিয়াও সে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। বালিগঞ্জে নূতন বাগানবাড়ী কেনা হইয়াছিল, সেইটা লইয়া কি না কি গোলমাল চলিতেছে, কাল সময় হইবে না, আজই কাগজপত্র উকিলকে দেখাইতে হইবে। শরৎ ক্ষুণ্ণ হইলেও, আশ্বস্ত করিয়াছিল যে, কাল নিশ্চয়ই পিতা-পুত্রে মিলন করাইয়া দিতে পারিবে। ব্রজরাণীর ব্যাপারে সে ভয় পাইল। আর কি রায়বাঘিনী উঁহাকে ছাড়িয়া দিবে? একটু লজ্জাও হইল,—ব্যাপারটাকে এমন প্রকাণ্ড উলঙ্গ করিয়া না ফেলিলেই হয় ত ভাল হইত। আবার মনকে তখনই সান্ত্বনা দিল, ইহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হইত না। নহিলে, পথের শত্রু যে মুখ দেখিলে ফিরিয়া চাহে, সেই মুখ দেখিয়া কি না উহার বুকে শূল-ব্যথা ধরিয়া গেল।—হায় রে সৎমা!

গাড়ীর অন্ধকারে নরম গদির মধ্যে ডুবিয়া গিয়া, ব্রজরাণী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। মাথার মধ্যে গরম রক্ত তখনও চন্‌চন্ করিয়া উঠিতেছিল;—উহারই গতি-প্রভাবে দুই চোখ জ্বালা করিতেছিল; এবং মনের মধ্যেও উন্মত্ত উত্তেজনাটা যেন একটা বিষাক্ত নেশার মতই তাহাকে সচেতন রাখিয়াও অভিভূতবৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। তার পর অল্পে অল্পে আকস্মিক ঘোর ঈর্ষা-জ্বালাদিগ্ধ ক্রোধের মত্ততা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, পিছনের গদি-আঁটা তক্তা হইতে মাথা তুলিয়া সে শান্তভাবে

উঠিয়া বসিল। দরজা দুইটাকে টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া, পিছনের খড়খড়ি ফাঁক করিয়া দিল; তেজী ঘোড়া কদমে চলিয়াছিল। মধ্য-ফাল্গুনের মধ্য-রাত্রে গাড়ির গতিতে বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার সৃষ্টি করিতেছিল, ব্রজরাণীর মাথায়-ওঠা রক্তের স্রোত তাজা হাওয়ার স্পর্শে নিম্নাভিমুখী হইল। এতক্ষণ শুধুই একটা বিষম রাগের জ্বালায় সে জ্বলিয়াছে। এতক্ষণের পর তাহারই সুস্পষ্ট অনুভূতিটা তাহার কাছে ধরা দিল। সেই অতবড় আক্রোশের ভিতর দলিত-ফণা সর্পীর মত সে যে কাহাকেও ভাল করিয়া ছোবল না দিয়া মানে মানে ফিরিয়া আসিয়াছে কেমন করিয়া, তাই ভাবিয়াই সে বিস্ময় অনুভব করিল।

এইবার নিজের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সে ইহার উল্টা দিকটায় চাহিল,—বস্তুতঃ, তাহার এতটা করিয়া তুলিবার প্রকৃত কোন কারণ আছে কি না? অমনি হিংসার হলাহলে বুক পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়া তাহার মনে হইল,—আছে, নিশ্চয়ই আছে।—ঐ ছেলেটাকে এই যে আনা হইয়াছে, ইহার অর্থ কি? এই জন্যই বুঝি দাদার জন্য বোনের প্রাণের দরদ উছলিয়া পড়িতেছে? আর হয় ত কর্ত্তাও এই ষড়্‌যন্ত্রের ভিতর আছেন? এই যে ভাগিনীর বিবাহে একবার বোনের বাড়ী যাইবার অবসর নাই, এও হয় ত একটা চাতুরী—হয় ত বায়স্কোপ আরও কোথাও কোথাও ছেলে লইয়া আমোদ প্রমোদ চলিতেছে! কে জানে? শুধুই ছেলে, না, আর কেহ?—আছে বই কি। ছেলে যখন আসিয়াছে, তখন ছেলের মাই কি আর আসেন নাই।

আবার অদম্য ক্রোধের মত্ততায় তাহার বুকের রক্ত ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল। গরম রক্তের তোলাপাড়ায় মাথা ঘুরিয়া যেন মূর্চ্ছা আসিবার উপক্রম হইল।

নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ব্রজরাণী দেখিল ঘরটা অন্ধকার। একটা গ্যাস জ্বালিতেই দেখিতে পাইল, খাটের বিছানাটা এলোমেলো,

মশারিটা উপরে তোলা,—সে ঘরে কেহ আজ শয়ন করিতেই আইসে নাই। অমনি বিদ্যুৎরেখার ন্যায় সন্দেহের ধারাল ছুরী তাহার বুকের ভিতরে নামিয়া পড়িয়া হৃদ্‌পিণ্ডটাকে যেন কাটিয়া খান্‌খান্‌ করিয়া দিল। তাহার সংশয় তো তাহা হইলে সংশয়মাত্র নয়, পরন্তু অকাট্য সত্য! তাহার বিরুদ্ধে এই যে একটা কুৎসিত চক্রান্ত আজ চলিতেছে, ইহার নায়ক তাহার স্বামী ব্যতীত আর কেহই নন। মনে পড়িল—ঠাকুরঝি নিজে বলিতে আসে নাই, অতএব তাহার বাড়ী যাইবে না—বলিয়া ব্রজরাণী সেই যে একটা দুর্ব্বল আপত্তি তুলিতে গিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া ঠাকুরঝির দাদা ইহার অসম্ভবতা নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে সেখানে ঠেলিয়া পাঠাইলেন। মনের মধ্যে তাঁহার যে এতখানিই ছিল, তখন ইহা কে জানিত?

দাঁড়া-আর্‌সিতে সালঙ্কারা সুন্দরীর সর্ব্বাবয়বের ছবি বিম্বিত হইল। মুখের উপর দেওয়ালের অপর দিক্‌ হইতে গ্যাসের আলোটা পূর্ণতেজে আসিয়া পড়িল; মুখখানা সে আলোতে স্পষ্ট দেখা গেল। কার এ মুখ? উঃ!—হিংসা কি মূর্ত্তি ধরিয়া আজ তাহাকেই দেখা দিতে আসিয়াছে না কি? আর সে আসিয়াছে তাহারই ছদ্ম-রূপ ধরিয়া! হঠাৎ নিজের জ্বালাভরা চোখ দুটাকে অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া, সে ঘরের একটা কোণে চলিয়া গেল। সেখানে একখানা ক্লিওপেট্রা কৌচ ছিল; সেইখানার উপর ধপ্‌ করিয়া শুইয়া পড়িয়া, একটু অন্ধকার লাভের আশায় চোক মুদিল। হঠাৎ মনে হইতে লাগিল, এ সংসারে তাহার যেন আর কোনও খানে কিছুই বাকী পড়িয়া নাই। এই যে কয়টি ঘণ্টা ধরিয়া সে নিজের সমস্ত বাছা বাছা হীরা মুক্তার গহনাগুলি গায়ে পরিয়া সবচেয়ে নূতন তৈরী বহুমূল্য জ্যাকেট্‌ সাড়িতে সাজিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিল, এই সময়টুকুর মত এমন দুঃসময় তাহার জীবনে আর কখন আইসে নাই এবং এর পরেও হয় ত আর কখন আসিবার অবসরও পাইবে না। এই অনতিদীর্ঘ কালটুকুর মধ্যে তাহার জীবনের দৈন্য যেন চারিদিক দিয়া উথলাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভিখারিণীর শত-ছিন্ন বসনের মত নিজের সে দুর্দ্দশাকে লোকচক্ষে ঢাকিয়া রাখিয়া সঞ্চয় তাহারও যে আর কোথাও কিছুই নাই! অতঃপর এই লাঞ্ছিত, ধূলিলুণ্ঠিত, দুঃসহ জীবনভার লইয়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া?

আহুরি ঝি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড় ছাড়বে না বৌ-দিদি?" জবাব না পাইয়া আবার বলিল, "বলি হাঁগা, রাত যে ভোর হ'য়ে এলো, গয়না গাঁটি খুলবে কখন?"

স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় চোখ তুলিয়া ব্রজরাণী ক্লান্তস্বরে কহিয়া উঠিল, "তুই খুলে দে' না ঝি।"

ওঃে বাবা! এ সবের কলকব্জা কি আহুরীর বাপ চৌদ্দপুরুষে কখনও জানিত, যে, সে জানিবে?—মাথার চুলের সঙ্গে কাপড় আঁটা হীরার সেফটি-পিন্ খুলিতে গিয়া সে দামী সাড়ীখানাই ছিঁড়িয়া ফেলিল। গলার মুক্তার কলারের টিপ্ কল খুলিতে গিয়া এমন এক টান মারিল যে, সেই টানের চোটে সেটা ভাঙ্গিয়া হাতের মধ্যে খসিয়া আসিল এবং সূতা-ছেঁড়া কতকগুলা স্থূল-মুক্তা ঝরিয়া পড়িয়া ঘরময় ছড়াছড়ি হইয়া গেল। ব্রজরাণী বাকিগুলা খুলিয়া খুলিয়া হতশ্রদ্ধার সহিত কৌচের এক পার্শ্বে টানিয়া ফেলিতে ফেলিতে ঘোর বিতৃষ্ণাভরে কহিয়া উঠিল, "যাক্ গে!"

ভোরের ঘুম অনেকটা বেলায় ভাঙ্গিলে, অনেকক্ষণ জাগিয়াই বিছানায় পড়িয়া থাকার পর, ব্রজরাণী যখন উঠিয়া বসিল, তখন গত রাত্রের সকল কথা তাহার মনের চারিপাশে যেন একটা শ্বাসকৃচ্ছ্রকর ভৌতিক কাহিনীর মত আবছায়া আবছায়া উঁকিঝুঁকি মারিয়া বেড়াইতেছিল, যাহার সত্যতায় ঠিক বিশ্বাস করাও যায় না, আবার সংশয়ও জাগে। উঠিতে গিয়া সর্ব্বশরীরে এমন দৌর্ব্বল্য অনুভূত হইল যে, হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে খুব কঠিন একটা ব্যায়রামে অনেক দিন যাবৎ ভুগিতেছে। সেই বড় আরসিখানার উপর নিজেরও অজ্ঞাতে একটা কটাক্ষপাত হইয়া গেল।

কিন্তু বিস্ময় তখনই আর তাহাকে সেখান হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে দিল না। নিজের সেই জাগরণক্লান্ত শুষ্ক, শীর্ণ মুখের দিকে সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রান্নাঘরের ঝি সারদা আসিয়া দোর খুলিল। বলিল, "রান্নাবান্নার কি হবে বৌমা? তোমরা কি বড় দিদিমণির বাড়ী সকালেই যাবে? বাবু কি বাড়ীতেই এ বেলা খাবেন? চাকরবাকরদের মধ্যে কে কে ওখানে যাবে, বাড়ীতেই বা ক'জন থাকবে, এই সব ঠিক্ঠাক্ ক'রে ভাঁড়ার বের ক'রে দেবে এস। বামুন-ঠাকুরের তুটো আকা সেই কোন্ সকাল থেকে ধূ ধূ ক'রে জ্বলে যাচ্ছে।"

ব্রজরাণী আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া ক্লান্তভাবে আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। অলসস্বরে উত্তর করিল—"যা হয় তোমরা করগে যাও,—আমি কোথাও যাব না, খাবও না,—আমার ভারি অসুখ ক'রেছে।"

"ওমা, আজকের দিনে আবার অসুখ কেন গো! কি অসুখ করেছে? তাই বুঝি অর্দ্ধেক রাতে ফিরে এলে?"

"হুঁ।"

"তা বাবুর রান্না হবে তো?"

"আমি কিছু জানি নে।" একবার ইচ্ছা হইল 'তোমাদের বাবু কোথায়? এবং রাত্রেই বা তাঁহার কি হইয়াছিল?' জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সে কথাটা যে মুখে আসিল না। ঠোঁটের কাছাকাছি আসিবামাত্র ঢিপ্‌ঢিপ্ করিয়া বুকটা কাঁপিতে লাগিল। তাহার কপাল তো ভাঙ্গিতে আর কিছুই বাকি নাই, তবে অনর্থক সে খবর সবার আগে দাসী চাকর মহলেই বা রাষ্ট্র করিতে যায় কেন? তাহার মত দুঃখী এ জগতে ক'জন আছে? পেটে তাহার সন্তান জন্মে নাই, স্বামী তাহার নিজের নয়। মেয়েমানুষের এর বাড়া পোড়া কপাল আর কি হইতে পারে?

সারি ঝি অনুমানে অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল।

ইহাদের যে মাসের মধ্যে অন্ততঃ দশটা দিনও মন ভার কাটে—সে খবর বাড়ীর তো বাড়ীর,—পড়শী বাড়ীর দাসী চাকরের নিকটও উহ্য নাই।

ব্রজরাণী উঠি উঠি করিয়াও বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না, চোক বুজিয়াই পড়িয়া রহিল। হঠাৎ তাহার মুদিত নেত্রের সম্মুখে কল্যকার সেই ছেলেটীর—শরৎকালের জলে ধোয়া শ্যামল লতাটির মত সুন্দর নবীন ও জীবনী-শক্তিতে সতেজ সেই ছেলেটীর মুখ ভাসিয়া উঠিল। অমন রাজ-পুত্রের মত, দেবকুমারের মত, ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিকটির মত ছেলে—সে কি না তাহার সতীনের। অতবড় ভাগ্যবতী যে, তাকেই কি না দুর্ভাগিনী বলিয়া সৃষ্টি শুদ্ধ লোকের সহানুভূতি তাহারই দিকে! আর তাহাকে এতটুকু 'আহা, বলিবারও কেহ নাই!—স্বামী তাহার ?, হরি বল! কোথায় তাহার স্বামী? স্বামীর দেহটাকেই না হয় সে পাহারা দিয়া বেড়ায়। কিন্তু যাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না, অথচ যেটা আসল, সেই মনটা তাঁহার কোথায়? ওই ছেলে যার, তার মা না জানি কেমনই? সেই স্ত্রীকে না কি কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ভুলিতে পারে? আর এখন তো উহাদেরই রাজত্ব! তাহার ভরা তো সকল দিকেই ডুবিল।—

একটা পরিচিত শব্দ কাণে আসিল। চোখ মেলিতেই ব্রজরাণী দেখিল, স্বামী।

—"এ কি! তুমি কখন এলে?"

অরবিন্দ স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল,—এত বেলা হইয়া গিয়াছে না কি? ব্রজরাণী শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। অভিমান ও ক্রোধ, আবার তাহার বুকের মধ্যে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিতে লাগিল। দুঃখকে অবসাদকে সে পরাস্ত করিয়া ফেলিল।

"খুব ভোরেই এসেছ বুঝি? সকাল থেকে আমরা তো সাম্‌নেই বসেছিলাম,—তোমার গাড়ী ত কই দেখ্‌তে পাই নি?"

ব্রজরাণী গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "আমি ত রাত্রেই এসেছি।"

"রাত্রে! ক'টার সময়? কই, আমি তো কিছুই জান্‌তে পারি নি?"

"পার্‌বে কি করে,—তুমি কি বাড়ী ছিলে?"

"বাঃ! বাড়ী ছিলুম না'তো কোথায় ছিলুম?"

"তার খবর আমি কি জানি? আমায় কি তুমি জানিয়ে গিয়েছিলে?"

"তোমায় না জানিয়ে রাত্রি-যাপন কর্‌বার জায়গা আমার আর কোথাও আছে না' কি?"

স্বামীর মুখের মৃদু সপ্রতিভ ব্যঙ্গ হাস্য ও এই হীন গোপন-চেষ্টা ব্রজরাণীর ক্রোধের উপর ইন্ধন জোগাইতে থাকিলেও, আপনাকে সে প্রাণপণেই দমন করিতেছিল। যথাসাধ্য সংযতকণ্ঠেই জবাব দিল, "হ'তে কতক্ষণ যায়?"

"ওঃ—তা মন্দ না; তোমাদের হাতে পড়ে, ঐ অপবাদটাই বা আমার বাদ যায় কেন?" অরবিন্দ প্রস্থানেচ্ছুক হইয়া পিছন ফিরিতে গেল।

স্বামীর হাস্য-প্রচ্ছাদিত এই সহজ তিরস্কারটুকু ব্রজরাণীর মনটাকে কেমন যেন বিকল করিয়া দিতে চাহিতেছিল। কিন্তু তখন ধীরে সুস্থে বিচার বিতর্ক করিবার অবসর নাই। উপরন্তু, স্বামীর অঙ্গের সাজসজ্জা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, "আজ যে বড় সকাল সকাল 'চান্‌' কর্‌তে যাচ্চো?"

"শরতের ওখানে যেতে হ'বে না?" বলিয়াই অরবিন্দ ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছিল,—অকস্মাৎ শিহরিয়া পিছন হইতে দ্রাবকময় বোমার মত ফাটিয়া পড়িতে শুনিল, "ওখানে আজ যদি যাও, তো তোমার ছেলের দিব্যি রইল।"

ঠিক্ যেন বাণ বিদ্ধেরই ন্যায় ক্ষণকাল স্তম্ভিত, নিশ্চল, বজ্রাহত থাকিয়া, অতি কষ্টে একটুখানি মুখ ফিরাইয়া, আর্ত্ত ব্যক্তির যন্ত্রণার্ত্ত ক্রন্দনের স্বরে অরবিন্দ কহিয়া উঠিল, "কি কর্‌লে রাণি? শরতের যে আজ প্রথম মেয়ের বিয়ে।"

ব্রজরাণী এই যে কাজটা অকস্মাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহা যে কত বড় অন্যায়, তাহা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে তাহারও বাকি ছিল না। কিন্তু বুঝিলে কি হয়,—অবমাননার ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গের শোণিতে তখন যে ফুটন্ত নর্ত্তন চলিতেছিল, সে কি কোন হিতাহিতের ধার ধারে? রাণী এখানে হতমান, সর্ব্বহারা হইয়া মনের আগুনে পুড়িতে থাকিবে, আর উনি সেখানে—যে তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল, তাহারই বাড়ী চর্ব্বচুষ্য খাইয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া আহ্লাদে মাতিয়া রাত কাটাইবেন।—এ বড় মন্দ মজা নয়! স্বামীর সেই ব্যথাহত স্তম্ভিত মুখ ও কাতর করুণ কণ্ঠ তাই তাহার মনে দয়া আসিতে দিল না। পাষাণের মত অবিচলিত ও তেমনি নীরস স্বরে সে জবাব করিল, "সে আমি জানিনে। তুমি এর পরেও যদি যাও, নিশ্চয় আজ আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো, এ জেনে যেও।"

অরবিন্দ মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

ক্রোধের ঢেউ অভিমানের ফেনা লইয়া মিলাইয়া গেলে, ধীরে ধীরে ধীরে, তুফান উঠা, বন্যা বিদ্রোহী নদীর জল যেমন আবার শান্ত ও নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তেমনি করিয়া একটা নিদারুণ অবসাদের ভারে, ব্রজরাণীর সারা প্রাণটা বোঝার মত ভারি হইয়া রহিল। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ঝি'দের মুখেই খবর পাইল, বাবু হাতে ভাতে করিয়া বেলা দশটা'য় যে পেসেঞ্জার ছাড়ে, সেই গাড়িতে ভাগলপুর চলিয়া গিয়াছেন, সঙ্গে গিয়াছে বৈকুণ্ঠ ঠাকুর আর রামফল। কার্ত্তিককেই নিতে চেয়েছিলেন, তা কার্ত্তিকের মন নয়, যে, আজকের দিনে ও-বাড়ী না গিয়ে ওখানে যায়। তা বাবু ভারি ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন,—বল্লেন, "সেখানে না কি কোন রাজাকে টাকা ধার দেওয়া আছে বিস্তর। তার রাজ্যি দেনার দায়ে "কাটামুণ্ডু"তে না কোথায় যাচ্চে,—তাই একবার শিগ্‌গির কালিক্‌টার সাহেবের সঙ্গে দেখা না কর্‌লেই নয়।"

কথাটা সত্যই বটে। কিন্তু, এই যে এতবড় ছলনার আশ্রয় লওয়াইয়া

আজিকার এই শুভদিনেই স্বামীকে সে দেশত্যাগী করাইল, এ' কি কাজ সে করিল? মা যখন জানিতে পারিবেন, শরৎ যখন শুনিবে,—তাহার প্রাণাধিক ভাই এই প্রথম মেয়ের বিবাহ-দিনে দেশ ছাড়িয়া একটা তুচ্ছ কাজের অছিলায় চলিয়া গিয়াছেন, কিছু কি বুঝিতে তাহার আর বাকি থাকিবে? কতই অভিশাপ না তাহার উদ্দেশ্যে আজ বর্ষিত হইবে? তারপর যখন শুনিল,—এই ঝিয়েদের মুখেই শুনিল, যে—স্বামী বেচারী গত রাত্রে নিজের নীচের ঘরেই ঘুমাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ীতেই এক দঙ্গল উকিল মোক্তারের অভ্যুদয় হইয়াছিল,—তিনি আবার তাদের ফেলিয়া যাইবেন কোথায়? বাবুগুলোই তো রাত দশটার পর বাড়ীর বার হ'লো। কাল আবার বিষ্ণুঠাকুরের রান্না! খেতে বসে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "ঠাকুর! এ' কি রান্না করেছ,—দেখে যে কান্না আসে! ওবাড়ী গেলে কত ভাল ভাল জিনিষ খেতে পেতুম,—তা না হয়ে, কপালে লেখা ছিল কি না তোমাদের এই অপূর্ব্ব 'চিজ্' !"

শুনিবার পর হইতে ব্রজরাণীর মাঝখানটায় কে যেন হাতুড়ি পিটাইতে লাগিল। মনোরমা বা অজিতের আসার খবর সত্যসত্যই তাঁহার অজ্ঞাত। এ কি এক মিথ্যা সন্দেহে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সে আগুন ধরাইয়া দিতে বসিয়াছিল? এ কি ছোট মন তাহার? গভীর লজ্জায়, অনুশোচনায় পীড়িত হইয়া স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িতে, সাধ্য সাধনা করিয়া দিব্য ফিরাইয়া লইয়া তাঁহাকে বিবাহসভায় পাঠাইয়া দিতে মন তাহার অস্থির হইয়া উঠিল;—কিন্তু তখন তো আর এতটুকু উপায়ই তাহার হাতে নাই। তখন আবার উল্টা হাওয়ায় মনের মধ্যে এমনও মহত্বের বাতাস বহিয়া গেল,—ইচ্ছা করিলে উহাদের গ্রহণ করা হইতে কি আর ব্রজরাণী স্বামীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে? বাস্তবিক সে চেষ্টা তিনি তো কখনই করেন নাই। শুধু শুধু একটা গণ্ডগোল পাকান, দুঃখ দেওয়া এবং দুঃখ পাওয়া এই হতভাগিনী ব্রজরাণীরই যেন একটা মহৎ রোগ! [illegible] সত্য তথ্যটুকু

সেদিনের সেই উদারতার হাওয়া তাহাকে দিয়া—অন্ততঃ নিজেরও কাছে স্বীকার করাইয়া লইল।

'কলিকে'র ব্যথা যথার্থ না ধরিলেও, ঈর্ষার যে শূলের ফলা গত রাত্রি হইতে তাহার মনের বুকে বিঁধিতেছিল, তাহারই বেদনা, আর সারা রাত্রি-দিনের অনাহারে এমন দশা ঘটাইয়াছিল, যে, বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া একটু বসিবার সামর্থ্যও ব্রজরাণীর শরীরে ছিল না। অথচ সন্ধ্যার সময় নিজেদের ঠাকুরঘরে যখন শাঁখ বাজিল, কাছের শীতলাতলায় আরতির ঘণ্টা কাঁশর মহা সোরগোল করিয়া বাজিয়া উঠিল, তখন মনটা হঠাৎ এম্‌নি তাহার উতলা হইয়া উঠিতে লাগিল, যে, সে উদ্বেগ চাপিয়া চুপ করিয়া বিছানার মধ্যে পড়িয়া থাকাও সহ্য হইল না। কোনমতে বিছানা ছাড়িয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সামনের বৈঠকখানার একটা ধার, তাহার সাম্‌নেই খানিকটা খোলা জমিতে গোটাকয়েক গাছপালার পরই নিজেদের দেউড়ির পারে সরকারী রাস্তার সরল রেখা চোখে পড়িয়া গেল। শরৎদের বাড়ীর বাহিরে এমনি যে রাজপথটি চলিয়া গিয়াছে, না জানি ঠিক্ এমন সময় সেখানে কি হইতেছে? বর হয় ত আসিয়া পৌঁছিল, বাজি বাজনা-আলোয় অনিমন্ত্রিতা প্রতিবেশিনীরা শুদ্ধ নিজেদের বাড়ীর জানালায় জনতা করিতেছে, আর সে ক'নের মামী,—মেয়েটিকে একটু ভালও বাসে,—সে এই নির্জ্জন পুরীর মধ্যে একা নির্ব্বাসিতা! বরটি অসীমার কেমন হইল কে জানে? মনে পড়িল, আবার সেই ছেলেটিকে।—সে যেদিন বর সাজিবে, কতই না সুন্দর সে বরকে মানাইবে। কোন্ ভাগ্যবতী তাহার তপস্যা-করা মেয়ে লইয়া উহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, আজ কেই-বা তা জানে?

তার পর মনে হইল, কাল যদি অমন করিয়া চলিয়া না আসিত, তাহা হইলে 'সেই' রূপসীর রূপখানা চোখে দেখিয়া একবার চক্ষুও তো সার্থক করিয়া লইতে পারিত! সে রূপের ছটাটা একবার যে দেখিতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা, আলোকের অতগুলি মেয়ের মধ্যে কোনটি 'সে'? বাহিরের

নিমন্ত্রিতাদের ছাড়িয়া দিলে, তেমন সুন্দরী আর কে ছিল? অনেক চেষ্টাতেও এই কথাটার মীমাংসা ব্রজরাণী কোন মতেই করিয়া উঠিতে পারিল না।—একবার সাবজ্ঞ হাসি হাসিয়া মনকে আঁখি ঠারিতে গেল, যে, যতটা রটে, ততটা সত্য নয়! কথায় বলে, 'যে মাছটা পালিয়ে যায়, সেইটেই বড়।' কিন্তু এ সান্ত্বনাটা মনকে সে মানাইতে পারিল না। সেই যে খসিয়া-পড়া চাঁদের মত ছেলে, সে ছেলে যে মায়ের গর্ভকে আশ্রয় করিয়া জন্ম লইয়াছে, সে নাকি আবার সুন্দরী না হইতেও পারে? কে জানে, কোথায় বোধ করি লুকাইয়া বসিয়াছিল! রাণী তাহাকে দেখে নাই, সে কিন্তু উহার সবটাই উল্‌টাইয়া দেখিয়া, মনে মনে না জানি কত হাসিই হাসিয়া অবজ্ঞায় ঠোঁট্ উল্টাইয়াছে! শাঁখের মত খানিকটা সাদা রং গায়ে থাকিলেই যে মানুষ সুন্দর হয় না, সে কথা যে ব্রজরাণী ভাল করিয়াই জানিত।

আচ্ছা, সে এখন কি করিতেছে? তা' তার আর কাজের ভাবনা কি? এতক্ষণে ক'নে-সাজান শেষ করিয়া হয় ত বরণের যোগাড় করিয়া তুলিল। বরণও হয় ত সে-ই করিবে? তা না করিবে কেন? তাহার কপাল তো আর ব্রজরাণীর মত নয়। সে যে স্বামীর প্রথমা স্ত্রী, ধর্ম্মপত্নী—অপত্যবতী জননী তো সে-ই। ভগবান আসল মান মর্য্যাদা যা কিছু, সে সব তাহাকেই দিয়া, এই পোড়াকপালী ব্রজরাণীর উপর কতকগুলা অপ্রয়োজনীয়, অযথা ধনরত্নের ভার চাপাইয়া দিয়াছেন বৈ তো নয়। উহাকে হীরার মুকুট পরাইয়া, তাহার জন্য বাকি রাখা হইয়াছে বিশপঞ্চাশ মণ ভারি কতকগুলা গিল্‌টি-করা পিতলের গহনা।—সেগুলার কাজ তাহার সর্ব্ব-শরীরকে সর্ব্বদা পীড়ন করিয়া ধরিয়া, গায়ে কেবল কলঙ্কের কালি মাখান,—আর কিছুই নয়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

"ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা।

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।"

সকালবেলা কণ্ঠী-তিলক-সেবা করা পাড়ার সর্ব্ব-পরিচিত বৈরাগী-ঠাকুর করতাল বাজাইয়া গান গাহিতেছিল,

"ও তুই জহুরী হ'য়ে জহর চিন্‌লি না,—
ভরু দেখে নিলি পেতল, তেজ্য ক'রে চালি সোনা।"

মনোরমা মুষ্টি-ভিক্ষা আনিয়া দিতে গেলে, ভিক্ষাজীবী জিভ্ কাটিয়া বলিল, "বালগোপালের হাতের নৈলে তো নিইনে মাঠান্! আমার নিতাই দাদা কোথায় গা?"

মনো নিবেদিত ভিক্ষা-মুষ্টি ফিরাইয়া রাখিয়া, অপ্রতিভ মৃদু-কণ্ঠে উত্তর করিল, "সে কল্‌কাতায় পিসির বাড়ী গেছে,—আজ আস্‌বার কথা।"

"তা' হ'লে কাল সকালে এসে তেনাকে দেখে যাব, আর চাল ক'টা তেনার হস্ত থেকে নিয়ে যাব। গড় হই—"

ঘর-বা'র করিতে করিতে মনোরমার পা দু'খানা যখন ব্যথা হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে একখানা গাড়ি গড়গড় করিয়া আসিয়া দ্বারের সম্মুখে থামিল।

অজিত গাড়ী হইতে নামিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া মাকে দু হাতে জড়াইয়া ধরিল—"মা গো! মা-মণি! তুমি এই ক'দিন বুঝি সমস্তক্ষণ ধ'রে বাইরের ঘরটাতেই দাঁড়িয়ে আছ? তবে কেন আমার সঙ্গে গেলে না তুমি?"

মনোরমা ছেলেকে বুকে লইয়া, তাহার মাথায় মুখে প্রায় হাজারটা চুমা

খাইয়া, অশ্রুভরা হাসিমুখে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মন কেমন করতো বুঝি তোর ?"

ছেলেও মায়ের মুখ চুম্বনে ভরাইয়া দিয়া লজ্জাস্মিত-হাস্যে মুখ লুকাইয়া জবাব দিল, "হাঁ মা।"

মাতা পুত্রের বিচ্ছেদ-ব্যথা প্রশমিত হইয়া আসিল।

"অসীমার কেমন বরটি হ'লো রে ?"

"বেশ হ'য়েছে মা-মণি! অমু'র চাইতে অনেক ফরসা।"

"অসীমা তোর পিসিমার মত, না পিসেমশাইয়ের মত হ'য়েছে ?"

"মা, তুমি পিসেমশাইকে তো দেখ নি, কি ক'রে জানলে যে তিনি পিসিমার চাইতে সুন্দর ?"

মনোরমা ঈষৎ হাসিল।

"এ সব কি রে!"

"পিসিমা আমায় এই ট্রাঙ্কটা কিনে দিলেন মা; আমি বারণ ক'রেছিলুম, শুনলেন না।"

যথাস্থানে জিনিষগুলা সন্নিবেশিত করিয়া আসিয়া, মামী-মাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক জগুয়া হাত পা ধুইতে পূর্ব্বদৃষ্ট পুকুরঘাটে চলিয়া গেল। মনোরমা ও অজিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মনোর বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতেছিল; কিন্তু কোথা হইতে সঙ্কোচ আসিয়া মুখ তাহার যেন চাপিয়া ধরিল। এই তিন দিনের অদর্শনেই কি ছেলের বয়স বাড়িয়া গিয়াছে না কি? "হাতে মুখে জল দিয়ে নিয়ে, কিছু খা' না অজিত।"

"খাবো কি মা, ঠিক্ বেরুবার আগেই পিসিমা যে পেট ভরে কত কিই খাইয়ে দিলেন। পিসিমা কি সব দিয়েছেন, তোমায় সব দেখাই এসো না।"

"দেখব পরে, তুই এখন—"

"না, তুমি এক্ষণি দেখসে।" এই বলিয়া সোৎসাহে অজিত মায়ের হাত ধরিয়া তাহাকে প্রায় টানিয়া ট্রাঙ্কের কাছে লইয়া আসিল। "এই দেখ আমার চাবি।"—গোলাপী সিল্কের পাঞ্জাবির পকেট্ হইতে রেশমী রুমালে বাঁধা ঝক্‌ঝকে একটি ছোট্ট রিংয়ে পরান চক্‌চকে দুইটি চাবি সে বাহির করিয়া দেখাইল এবং তাহারি একটি দিয়া ষ্টীল ট্রাঙ্কটা খুলিয়া ফেলিয়া, হাসি হাসি মুখে মায়ের দিকে চাহিল।

"ওরে, তোর পিসিমা এ কি কাণ্ড ক'রেছে! সমস্ত কল্‌কাতা-সহরটাই যে এর মধ্যে ভ'রে দিয়েছে রে! এত কেন?"

"শুধু পিসিমাই না' মা; আমার ঠাকুমা ওখানে আছেন কি না, তিনিও ঢের জিনিষ দিয়েছেন! তাঁর কাছেই আমি রাত্রে শুতুম। ঠাকুমা, মা, এত কাঁদেন! যতক্ষণ আমি কাছে থাক্‌তুম, সমস্ত ক্ষণই তিনি কাঁদতেন, আর এত আদর আমায় কর্‌তেন, ছেলেদের সব্বাইকার সাম্‌নে,—সে আমার এমন লজ্জা কর্‌তো।"

মনোরমার দুই চোখ অকস্মাৎ জলভারে ছলছল করিয়া আসিল। তপ্ত অশ্রুর আকস্মিক আবির্ভাবে নাক চোখ জ্বালা করিতে লাগিল; পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া, অনেক কষ্টে সে পতনোন্মুখ উদ্গত অশ্রুপ্রবাহ দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ততক্ষণে প্রদর্শনী সুরু হইয়া গিয়াছে।

"এই দেখ, কতগুলি বই পেয়ে গেছি। রামায়ণ, মহাভারত, দু'বছরের সখা, সাথী, এখানা 'ফেয়ারি-টেল্‌স্'; এখানার নাম 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো'। এই দেখ, ওখানকার সরকার মশাইকে দিয়ে ঠাকুমা এই সব খেলনা আমায় আনিয়ে দিয়েছেন; সাদা আর লাল ঘোড়া, স্প্রিংএর সাইকেল, কলের ইঞ্জিন জাহাজ, ম্যাজিক্ লাট্টু,—বেরালটা কেমন দৌড়ায় দেখ্‌বে? এই সব দেখে আমার এমন হাসি পেয়েছিল মা-মণি, সে তোমায় কি বল্‌বে! ওঁরা সব্বাই ভাবেন, সরলা বেলা মস্ত নন্তর মতন আমিও বুঝি ভারি ছেলেমানুষ, না মা? তবু আমি বল্লুম যে, এগুলো ওদেরই দিয়ে দিই,

ওরা তবু খেলা করবে, আমি নিয়ে কি করবো? তা পিসিমা শুনে এক তাড়া লাগিয়ে দিলেন; বল্লেন, 'কেন, তোর না কি খেলার বয়েস চলে গেছে? দেখি, চুল পেকেছে বুঝি?' উল্টে আবার দিদি তার শ্বশুরবাড়ীর খেলনা থেকে এই বড় 'ডল'টা দিয়ে দিলে। কেমন চোক বুজিয়ে ঘুমুচ্ছে দেখ্‌ছো তো? এই দেখ, দাড় করিয়েছি, অম্‌নি চোক চেয়েচে। এটা কিন্তু মা আমি নিতাই-মামার খুকিকে দেবো।"

মনোরমা সেই দুচোখ-ভরা জল ও অধরপ্রান্তে এতটুকু একটুখানি সলিলার্দ্র হাসি লইয়া পুত্রৈশ্বর্য্য দেখিতেছিল। এ সব দেখিয়া তাহার নিজের গায়ে-হলুদের তত্ত্বে পাওয়া খেলনা পত্রের কথা স্মরণ হইল।

"এই দেখ মা, সিল্কের সার্ট। শীত মোটে নেই; তবু শুধু শুধু এই একটা পাতলা গরমের, এগুলো ছিটের, এই কটা পাঞ্জাবী, এদুটো গরদের এটা সার্জ্জের, এটা আল্‌পাকার, এই আর একটা খুব দামী সিল্কের কোট্। মা গো! জরিপাড় ধুতিই তো দেখছি চারখানা দিয়েছেন। তা'ছাড়া এ সব দু'জোড়া, তিনজোড়া। এত সব কি হবে মা? দু'জোড়া জুতো দিয়েছেন দেখ্‌চো তো? মোজাও এই এতগুলি! বাবা রে বাবা! কল্‌কেতায় এত জিনিষ, আর এত কেনা; সে দেখ্‌লে, সত্যি বল্‌চি মা-মণি! তুমি অবাক্ হ'য়ে যাবে। সুধী মস্ত ওদের, জানো মা, একোজনের তিনজোড়া, চারজোড়া করে জুতোই আছে। আমি বল্লুম আমার অত কিন্তু দরকার হয় না। তা ওঁরা শুন্‌তেই চান্ না। এই দেখ না, দিদির দেওয়া ভাইফোঁটার তিন বছরের জামা কাপড় সবই তো আমার রয়েছে। কিছুই তো ছিঁড়িনি। ওরা সব্বাই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল!"

"অজু! ওখানে গিয়ে কোথায় কোথায় গেছ্‌লি রে? ঠাকুরমার সঙ্গে কোন্‌খানে দেখা হ'লো?"

"কেন পিসিমার বাড়ীতে। তিনি ঐখানেই তো ক'দিন ছিলেন। কোথায় কোথায় শুন্‌বে? সে অনেক জায়গায়—জু, মিউজিয়ম, ইডেন

গার্ডেন, বায়স্কোপ, গোলদীঘি, গড়ের মাঠ, প্রেসিডেন্সি কলেজ—মা-র্ম'ন! বড় হ'য়ে আমি কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বো, এখানে পড়বো না। সে কিন্তু এখন থেকে বলে রাখ্‌ছি।"

মনোরমা উদ্বেগের মধ্যে হাসিয়া ফেলিল, "আগে বড়ই তো হ'।"

"সে আর কদ্দিন? তিন বচ্ছর বৈ তো না! দিদিমা! এতক্ষণে তুমি বুঝি বাড়ী ফিরলে? জানো তো আজ আমি আস্‌বো।"

"এসো, দাদু ধন আমার এসো। বাড়ী অন্ধকার করে গেছ, আমি যে টেঁক্‌তে পারিনে। বিয়ে হ'য়ে গেল? কেমন ভগ্নীপতি হ'লো?"

"বেশ, আমার ঠাকুমা এই সব দিয়েছেন, দেখ না তুমি।"

"মাকে দেখাও," বলিয়া গভীর তাচ্ছল্যভরে দুর্গাসুন্দরী মুখ ঘুরাইয়া লইয়া একদিকে চলিয়া গেলেন। মনোরমা ভয়ে ভয়ে আড়চোখে দেখিয়া লইল, মায়ের মুখখানার অবস্থা ভাল নয়। ভগ্ন আশার গভীর কালো মেঘে যেন আকাশ অন্ধকার। মা' যে, অনেক দিন পরে ছেলেকে কাছে পাইয়া যদি জামাতার মতি বদল হয়, যদি সেও উহার সঙ্গে একবার দেখা দিতেও আসে, অথবা এম্‌নি কিছু প্রত্যাশা করিয়া বসিয়াছিলেন, মায়ের মনের সে খবর মনোও পায় নাই; তাই সে কিসের এ বিরক্তি, বুঝিতে না পারিয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিল।

এত সব খবরে ও প্রাপ্তিতেও, যে সংবাদটার জন্য মনোরমা ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিয়া যাইতেছিল, তৎসম্বন্ধে কোন কিছুরই আভাস পাওয়া গেল না। ও-বাড়ীর কার্ত্তিক চাকর এবং শাশুড়ীর ঝি কদম টাকা দিয়া "খোকা-বাবুর" মুখ দেখিয়াছে।

"ওখানে লোকগুলো কি রকম যে বোকা! আমি স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছি,—আমায় বলে তারা খোকা!"—

পুরাতন সরকার মশাই গুটীকয়েক সস্তার খেলনা, একজোড়া ধোয়া মিলের ধুতী ও দুটি টাকা দিয়াছেন।—কিন্তু গৃহের যিনি স্বামী,—তিনি?

কি কিছুই করেন নাই? পিসিমার ঠাকুরপো শুদ্ধ কি বলিয়া আদর জানাইয়াছিলেন,—নিবের বাক্স, বাহারে কালির দোয়াত, কোহিনুর পেন্‌সিল ইত্যাদি কিনিয়া দিয়াছেন, সে কথাও তো জানা গেল। আর কোথাও হইতে—আরও অনেকখানি—আর সেই তো তার যথার্থ পাওয়া,—সে পাওয়া মিটাইয়া পাইলে সে খবর এতক্ষণ কি লুকান থাকিত? তবে কি তিনি,—এও কি সম্ভব? মনোরমার সে যে জাগ্রত দেবতা! মূর্ত্তি তো তাঁহার শিলাময় নয়! পরিত্যক্তা মনোরমাকেই তাঁহার চাহিয়া দেখিবার অধিকার নাই, এবং তার জন্য মনোরমা কি কোন দিন পাওনা আদায়ের নালিশ করিতেই গিয়াছে? পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তিনি যদি তাহাকে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সে নিজেই কি আর এমন দেবতার আদর্শে তাঁহাকে বুকের মাঝখানে আসন পাতিয়া বসাইয়া রাখিতে পারিত? হয় ত মানসপ্রতিমাকে মনোরাজ্য হইতে বিসর্জ্জন দিয়া, মাটির সংসারে মর্ত্ত্য মানবের মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিতে মনও তাহার খর্ব্ব হইয়া যাইত। আজ আর কিছুই তাহার না থাক্, স্বামী-গৌরব তাহার পূর্ণমাত্রায়ই তো বজায় আছে। কিন্তু ভগবান্ রামচন্দ্রও তো নিজ সন্তানের অবমাননা করিতে পারেন নাই! দুষ্মন্তও পরিত্যক্তা শকুন্তলার গর্ভজাত শত্রুদমনকে দূর হইতে দেখিয়া বাৎসল্য মোহে আত্মহারা হইয়াছিলেন। শ্বশুর রাগ করিয়া যা-ই বলুন,—তিনি পূজনীয় গুরুজন,—সবই বলিলে সাজে, কিন্তু অজিতের পিতা কি তাঁহার নিজের সন্তান চেনেন না? এতটুকু সঞ্চয়, এতটুকু একটুখানি পাথেয়, এই একটি বিন্দু শিশিরের কণা এ গরীব ভিখারীকে দান করিলেও কি তিনি নিঃস্ব হইয়া যাইতেন? অথবা কে জানে, সেটুকু দিবার অধিকারও বুঝি তাঁহার হাতে নাই? বৃথাই এ পরিবেদনা।

"এটা কি রে? পাতলা কাগজেমোড়া?"

"ওহো ভুলে গেছি,. ভুলে গেছি মা,—আচ্ছা কি বলুন তো? কুল-ঝঙ্কারী পাপিয়ার মত কলকণ্ঠে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে অজিত সেই

সূক্ষ্ম আবরণটুকু সরাইয়া কার্ডে-আঁটা ছবিখানা মায়ের হাতে তুলিয়া দিল। ইহার উপর নেত্রপাত করিয়াই মনোরমা চমকিয়া উঠিয়া, আগ্রহে শত চক্ষু হইয়া আবার ভাল করিয়া চাহিল। চাহিল তো চাহিয়াই রহিল। সে ছবি তাহার স্বামীর। খুব আধুনিক না হইলেও, সম্ভবতঃ অনেক দিন পূর্ব্বেরও নয়। তবু মনোরমা কি বয়সের পরিবর্ত্তনে সে মুখের ছবি ভুলিতে পারে?

"তাঁর চেহারার সঙ্গে খুব মেলে, না অজিত?"

"আমি তো তাঁকে দেখি নি মা!"

"দেখ নি?"

এম্‌নি বিস্ময়ের সহিত এই প্রশ্নটা মনোরমার মুখ হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল, যে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় যথেষ্ট থাকিলেও এতখানি যে ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কেন যে মনে হয় নাই, মনে করিয়া অজিতও যেন তখনই তখনই ঘোরতর বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেল। সেই জন্যই সম্ভবতঃ সে আর এ কথার জবাব দিল না।

"বিয়ের দিন, বিয়ের সভায়,—সে দিনও কি তিনি—?"

অজিত ঘাড় নাড়িল।

হঠাৎ মনোরমার মুখের কালি অধিকতর কালো হইয়া গেল। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তাহার কাঁপিয়া স্থির হইয়া গেল। "তিনি,—তিনি ভাল আছেন তো? কারু কাছে কিছুই কি শুনিস্ নি? না আমায় তুই লুকুচ্ছিস্? ওরে, তুই বল্ অজিত!"

অজিতের মনের মধ্যে পিতৃ-সম্বন্ধীয় এতদিনের পূর্ণ আশ্বাসের মধ্যে কোথায় যেন কি একটা গলদ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বিশেষতঃ, আপনা হইতে যা' না হইত, ওখানে পাঁচজনের মুখে পাঁচ রকম ইঙ্গিত শুনিয়া সেটা যেন ঈষৎ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! মাকে যখন সে বলিল, "অসুখ তো করেনি মা, ভালই তো আছেন,—কি না কি মোকদ্দমার জন্য হঠাৎ ভাগলপুর যেতে হ'লো, তাই আসেন নি।" তখন এই কথাটা সে

নিজের বিশ্বাসেরই অনুযায়ী আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বলার সময়েই মনে পড়িয়া গেল, যখন ওবাড়ী হইতে কার্ত্তিক, সরকার-মশাই, সারদা, হরির-মা, চতুরিয়া, ছট্টু সিং প্রভৃতি ঝি চাকরের দল এবাড়ীতে আসিয়া, অজিতের পিসিমার প্রশ্নের উত্তরে জানাইল, যে, তাহাদের গৃহিণী অসুস্থ এবং বাবু দেশ ছাড়িয়া গিয়াছেন, পিসিমার তখনকার সেই নির্ব্বাক্, স্তব্ধ মূর্ত্তি এবং পারিপার্শ্বিকগণের বিস্ময়পূর্ণ সমালোচনা। তার পর পিসিমার ভাগিনেয় মোহিত যে তাহাকে একসময় জনান্তিকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, তাহার পিতা তাহার সহিত সাক্ষাতের ভয়েই আজ এমন অসময়ে দেশত্যাগী হইয়াছেন, অপর কোনই কারণ নাই। তখন এ কথাটা সে আদৌ বিশ্বাস না করিয়া উপরন্তু নূতন বন্ধু মোহিতের 'পরে ক্রুদ্ধ হইয়াই উঠিয়াছিল; এবং পিতার প্রতি আরোপিত এই কলঙ্ক জোরের সঙ্গে অস্বীকার করিয়া সবেগে বলিয়া উঠিয়াছিল, "ককৃখনই তা নয়, বাবার মোকদ্দমা আছে, সেইজন্য আস্‌তে পারেন নি, নৈলে—কি আর আমায় একবারটিও তিনি দেখ্‌তে আস্‌তেন না?"

মোহিত যদিও এই অল্প কয়দিনের মধ্যেই অজিতের বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাহার সত্য সংবাদের বিরুদ্ধে অতখানি মিথ্যা প্রতিবাদ তাহার সহ্য হইল না; এবং অজ্ঞ অজিতের চোখ ফুটাইয়া দিলেও চোখ না ফুটিয়া মুখ ফোটাতে বিরক্ত হইয়া সে কহিয়াছিল, "ওঃ! তোর জন্যে তোর বাবার তো ঘুম হচ্চে না রে! দেখ্‌তেই যদি আস্‌তেন, তো ওখানেই বা দেখ্‌তে যান না কেন?" অজিত বলিল,—"কি ক'রে যাবেন? তাঁর কত কাজ।" মোহিত কহিল, "দূর্ হাবা! কাজ থাক্‌লে বুঝি আর মানুষ ছেলেপিলেকে দেখ্‌তে যেতে পারে না? আর ওঁর কাজটাই বা কি এমন শুনি? একটা চাকরি ক'র্‌তেন, তাও তো বছর-দুই হ'লো ছেড়ে দিয়ে স্রেফ্ ঘরে ব'সে আছেন। এ দেশে, সে দেশে নিত্যি বেড়াতে যাচ্চেন। তা তো নয়, তোর সৎমা—"

সুধীন্দ্র আসিয়া পড়িয়াছিল,—সে চোখ পাকাইয়া মোহিতের দিকে চাহিল। "মেজ-দা! মা সব্বাইকে কি ব'লে দিয়েচে? মাকে ব'লে দোব?"

"না—না, বলিস্ নে ভাই, বলিস্ নে। অজিতেটা এত উঁচু ক্লাশে যে কি ক'রেই পড়ে, আমি তো তার কিচ্ছুই বুঝ্‌তে পারিনে!' ভারি বোকা হ'চ্চে কিন্তু এদিকে। তুই যে আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ছিস্ বল্লি—আচ্ছা মুখে মুখে এই এক্স্‌ট্রাটা কস্ দেখিন্।—একটা ট্রায়াঙ্গেলের তিনটে মিডিয়ান্ এক পয়েণ্টে 'মিট্' করে। দেখি তো কেমন পারিস্?"

তারপর তাহাকে নীরব, বিমনা দেখিয়া, একটুখানি বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া, আপনিই মীমাংসা করিয়া লইল যে, "হ্যাঁঃ! তা' আর পার্‌তে হয় না! সেকেণ্ড ক্লাশে উঠেচে না কচু করেচে। মোটে এগার বছর তো বয়েস হচ্চে। আমি তো এমন ভাল ছেলে, ইস্কুলে বরাবরই তো ফার্ষ্ট কি সেকেণ্ড থাকি, তা আমিই তো এই চৌদ্দ বছরের।"

তখন ভাল করিয়া বিশ্বাস না করিলেও, গতকল্য হইতে এই সব কথাই অনেকবার ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে হইয়াছে। যে যখনই 'কনে'র মামার অনুপস্থিতি লইয়া আলোচনা করিয়াছে, অমনি মোহিতলালের সেই মুচ্‌কি হাসি ও সেই কয়টা কথাই তাহার কাণের তারে ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। "দেখ্‌তেই যদি আস্‌তেন, তো ওখানেই বা দেখ্‌তে যান না কেন? কাজ আছে? সবার বাবারই ত কাজ থাকে।"

মনোরমা কিন্তু এ কথা শোনার পর একেবারে নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "রক্ষে হোক্! তা নৈলে,—ভাগ্নীর বিয়ে, তিনি একজন অত বড় মামা—শুধু শুধু কি আর বিয়ের সময় সরে থাক্‌তেন। বিশেষ বড় ঠাকুরঝি আর তার ছেলেমেয়েরা যে তাঁর প্রাণ। তোর সঙ্গে দেখা হয়নি শুনে প্রাণটা আমার এম্‌নি ক'রে উঠেছিল।"

নিঃশব্দে যে ব্যথাটা পুঞ্জীভূত হইতেছিল, নিমেষে তাহা ঝরিয়া পড়িয়া শুধু নূতন দৃশ্য দর্শনের আনন্দটুকুই মনের মধ্যে প্রচুরতর হইয়া রহিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

নলিনীদলগতজলমতিতরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ॥

—শঙ্কর।

অসীমার বিবাহের পর শরৎ আর হাবড়ার বাড়ীতে আসে নাই, অরবিন্দও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় নাই। ইহাতে গৃহবাস যেন অরবিন্দের পক্ষে অরণ্যবাসের বাড়া হইয়াছিল। যে শরতের সৌহার্দ্দ, তাহার মায়া-মমতা, কলহ আব্দারই অরবিন্দের জীবনের শান্তি এবং আরামের স্থল, আজ সেই যে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। প্রথম যৌবনে, বসন্তের প্রথম উৎসব যখন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে,—নিদারুণ ঝড়ের হাওয়ায় সে দিনের সেই যৌবন-নিকুঞ্জ তাহার ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেও বুঝি এতবড় অকরুণ নয়! অরবিন্দের মনে হইল, শরতের সেই সর্ব্ব-প্রথমকার সন্তান; যার জন্ম তাহার মামীমার সাক্ষাতে, তাহারই কোলে কোলে, বুকে বুকে যে সর্ব্বপ্রথম বাড়িয়া উঠিয়াছিল, যার কথা তাহাদের প্রথম যৌবনের তপ্ত অনুরাগে ভরা লিপিগুলির কতখানি স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে,—'মামাবাবু'র একান্ত অনুগত স্নেহপুত্তলীটিকে সে যখন তার জীবনের সর্ব্ব-প্রধান শুভক্ষণে আশীর্ব্বাদ করিতে পারে নাই,—তখনই তাহাদের গৃহদ্বার তাহার সম্মুখে জন্মের মত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শরৎ এ জীবনে আর তাহাকে ক্ষমা করিবে না,—সেই বা ক্ষমা চাহিবে কোন্ মুখে? তার পর মা। মাই কি পুত্র ও বধূর এতবড় ধৃষ্ট স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষমা করিতে পারিয়াছেন? সেই যে বিবাহবাড়ী হইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই হইতে বধূ ও ছেলে কাহারও সহিত একটি কথা আজ পর্য্যন্ত তিনি

কহেন নাই। সারি ঝির মুখে ব্রজরাণী আসল খবর পাইয়াছিল। সতীন নয়, শুধু সতীনপো। এ খবরে একদিকে যেমন তাহার চিত্ত ত্রাসবিমুক্ত হইল, তেমনি একটু আত্মগ্লানিরও উদয় না হইল তাও নয়। অতটুকু একটুখানি ছেলের জন্য সে অতখানি করিয়া বসিল? অতটা না করিলেও হয় ত চলিত। একদিন মনের এই চিন্তাটাই সে স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল; বলিল, "তোমার সকলই বাড়াবাড়ি। আমি না হয় রাগের মাথায় একটা কথা বলেই ছিলুম। তা বলে তোমায় দেশত্যাগী হ'তে তো আর আমি বলি নি।"

অরবিন্দ উদাসভাবে কহিল, "ওঃ! তা'হলে সেই গরীবের ছেলের মাথা খাওয়াটাই তোমার ইচ্ছা ছিল, বুঝ্‌তে পারি নি—"

নির্ম্মম আঘাত! প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া ব্রজরাণী কহিল, "আমি যদি কারুকে খুন করতে বলি তো তুমি তাই করবে?"

মা বাড়ী ফিরিয়া অবধি মৌনী থাকিবার পর, হঠাৎ একদিন কি মনে করিয়া, ছেলেকে ডাকাইয়া আনিয়া, কোন রকম প্রস্তাবনা না করিয়াই, এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "কর্ত্তার উপার্জ্জিত ধনসম্পত্তিতে আমারও তো কিছু ভাগ আছে?"

উত্তরে ছেলে বলিল, "আছে বৈ কি। বাবার সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেকই তো তোমার।"

"এতে আমার দান-বিক্রীর অধিকার আছে? তোমাদের আইনে কি বলে?"

মাতৃ-মুখের দিকে অপলকে চাহিয়া থাকিয়া পুত্র জবাব দিল, "দান বিক্রীর অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে।"

মা বলিলেন, "না বাবা, আমি তোমাদের অনুগ্রহ চাই নে। যদি যথার্থ আমার ব'লে পৃথিবীতে কিছু থাকে, তো সেই ক্ষুদ কুঁড়োটুকুই আমায় তুমি হাতে তুলে দিও,—তার চাইতে বেশির কিছু দরকার নেই।"

মায়ের মুখে জীবনে কখনও একটা পরুষ-বাক্য অরু কোন দিন শুনে নাই, এ কি তাঁহার সেই মা? কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কণ্ঠোত্থিত একটা অত্যন্ত সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসকে সাবধানে চাপিয়া ফেলিয়া, পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "সবটাই কি তুমি নগদে নেবে, না বাড়ী বা জমিদারি রাখ্‌বে?"

"যাতে তোমার সুবিধা হয়, সেইমতই আমার নামে তুমি লেখাপড়া করিয়ে রেখো,—আমার সুবিধা-মত আমি নেব।"

দু'দিন পরেই হঠাৎ একদিন শরতের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সরকারকে দিয়া ছেলেকে বলিয়া পাঠাইলেন, জামাইএর মুখে তিনি শুনিয়াছেন, বিষয়ে তাঁহার কোনই অংশ নাই; একাধিক পুত্রের বিষয় বিভাগ কালেই মাতা এক অংশ পাইয়া থাকেন। তিনি দয়া ভিক্ষা করিতে চাহেন না,—তাঁহার গায়ের যে গহনা আছে, সেই যথেষ্ট। আর কিছুর দরকার নাই।

ষ্টীলট্রাঙ্ক, হাতব্যাগ, বিছানা ও বিষ্ণু চাকরকে সঙ্গে লইয়া অরবিন্দ দার্জ্জিলিং যাওয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনবেলা উপোসী থাকিয়া ব্রজরাণী তাহার সঙ্গ লইয়া তবে ছাড়িল।

গৃহের বাহিরে নগাধিরাজ হিমালয়ের শোভা সম্পদের মাঝখানে বাস করিয়া, এমন কে ভিখারী আছে, যাহার প্রাণের দৈন্য বিমোচিত হয় না? অরবিন্দের অশান্ত হৃদয়ের আভ্যন্তরিক বহু তাপদাহ এই তুষারপুরীর তুষার শীতল বাতাসে জুড়াইয়া আসিল। কিন্তু হায়, তবু কি—

অসীমার বিবাহোপলক্ষে ভাই-বোনের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহাতেই চিরবিচ্ছেদের যবনিকা নিক্ষেপ করিয়া, শেষ-বৈশাখের এক গ্রীষ্ম অধ্যুসিত শ্রান্ত সন্ধ্যায়, শরৎশশীর চোখের তারা দুটি পৃথিবীর শেষ আলোকরেখা হইতে চিরনিমীলিত হইয়া গেল।

রোগের প্রথম বা দ্বিতীয়াবস্থাতেও, না চিকিৎসক, না গৃহস্থ—কেহই

মৃত্যুর ছায়া দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাই অরবিন্দ দার্জ্জিলিংয়ে বসিয়া যখন খবর পাইল, তখন তাহার প্রাণপ্রিয় ভগিনীটির জীবনদীপ নির্ব্বাণের কাল বিলম্বিত নয়।

শরতের অম্লান পূর্ণশশী ততক্ষণে ত্রিপাদগ্রাসী গ্রহণে রাহুগ্রাসে পতিত হইয়াছে,—সে শরৎ বলিয়া ইহাকে চিনিতে পারা কঠিন।

"দিদিমণি আমার! এমন করে চিরকালের জন্য আমার বুকে শেল বিঁধে রেখে গেলি?"

মরিতে বসিয়াও স্বভাব যায় না! বিদ্রূপ হাস্যে শীর্ণ অধর রঞ্জিত করিয়া, দুষ্ট মেয়ে এই জবাব দিল, "কেন, ঝগড়া কর্‌বে না আমার সঙ্গে?"

রোগীর মুখের উপর যে কথা প্রকাশ করা অনুচিত, মনের বিকলতায় তেমন কথাও গোপন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। গত কল্য হইতে চিকিৎসকগণ চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নিশ্চেষ্ট বসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা আত্মজনের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া কবিরাজ ডাকা হয়। তিনি নিদানের শেষ কর্ত্তব্য মৃগনাভি মকরধ্বজ দিয়াছেন। প্রথম একবারের জন্য উপকারের আশা দিয়াই পরক্ষণে সমুদয় জাগতিক শক্তিকে উপহাস করিয়া রোগীর অবস্থা মন্দের চেয়েও মন্দ হইতেছিল।

সেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের পর সুদীর্ঘ তিন মাস অন্তে অতদূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, এতবড় নিদারুণ দৃশ্য, অতখানি সহ্যশক্তি লইয়াও অরবিন্দ যেন সহিতে পারিতেছিল না। ভগিনীর প্রায় নিশ্চল বুকের উপর সে লুটাইয়া পড়িল। অত বড় পুরুষটার সেই অদম্য শোকের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন শরতের হৃদ্‌পিণ্ডের মন্থর গতি অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার চক্ষের নির্জীবতা লক্ষ্য করিয়া, জগদিন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া অরবিন্দের হাত ধরিয়া তাহাকে বলিল, ছোট-বাবু! ছোট-বাবু! ঠাণ্ডা হও—এখন রোগীর কথা ভাবো।"

"স্বর্গ মানো, না সে সব ছেড়ে দিয়েছ? তবে আবার কান্নাকাটি কিসের?"

শরতের আকস্মিক ও অকালমৃত্যুতে সকলেই শোকে মুহ্যমান হইল। ব্রজরাণীর সহিত যদিও উহার কিছুমাত্র প্রীতি-সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু তথাপি সে আজ সে কথা স্মরণে রাখিতে পারিল না। উহাদের মধ্যে যতই অসদ্ভাব থাক, সে যে তাহার স্বামীর একান্ত প্রিয়। স্বামীর মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়া সেও তাই মর্ম্মাহতা হইল।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বধূ চতুষ্কেঽপি যথা হি শান্তা প্রিয়া তনুজাস্ত তথৈব সীতা

—উত্তরচরিত।

অরবিন্দের মা জীবনের বার-আনা অংশ সুখের কোলে কাটাইয়া, অবশিষ্ট কয়েকটা দিনের জন্য দুঃখের যে পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সামান্য নয়। একমাত্র পুত্র ও বধূ লইয়া তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার সংসারকে যে অকল্যাণে ঘেরিয়া ফেলিতেছে, পরিত্যক্তা সতীর উষ্ণশ্বাসকেই তাহার মূল মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া আছেন; অথচ, ইহার প্রতিবিধানও তাঁহার সাধ্যাতীত। তার পর যখন শরৎশশী, স্বামী, সন্তান, ঘর সংসার সমুদায় ভাসাইয়া দিয়া চির-অস্তমিত হইল, সে শেল মায়ের বুকে বড় ভীষণ হইয়াই বাজিল। মায়ের নিকটে সকল সন্তানই সমান; কিন্তু বাধ্যতা ও মাতৃবৎসলতা গুণে এই মেয়েটিই তাঁহার বিশেষ একটু প্রিয় ছিল। তদ্ভিন্ন, মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশুগুলির এবং সংসারে

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ শোকবিহ্বল জামাতার দুঃখে তাঁহাকে সমধিক কাতর করিয়াছিল। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া, কাঁদিয়া বলিলেন, "সংসারে আর আমি থাকবো না অরু! আমায় তুই কাশী পাঠিয়ে দে।"

মায়ের প্রতিজ্ঞা অটল দেখিয়া কাশীবাসের বন্দোবস্ত করা হইল। যাত্রার পূর্ব্বে ব্রজরাণীকে তল্পী বাঁধিতে দেখিয়া, অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"এ আবার কি?" ব্রজরাণী উত্তর দিয়াছিল, "আমিও যে মায়ের সঙ্গে যাব।"

অরবিন্দ এ কথার জবাব না দিয়া, শুধুই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিল। যাই হোক্, ছেলে বৌ সঙ্গে করিয়াই তাঁহাকে কাশী যাইতে হইল। আর সঙ্গে গেল শরতের মাতৃহীনা কোলের মেয়েটী। অনেক করিয়া নন্দায়ের কাছ হইতে সেটিকে মেয়ের মামী চাহিয়া লইয়াছিল। শাশুড়ী, বধূর আচরণে সব দিকেই খুসী হইলেন।

কাশী আসিয়া শোকাকুলা অরুর মা একটুখানি শান্তিলাভ করিলেন। সেখানে উঁহাদের কুলগুরুর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। ঠাকুর দেবতা দেখা, গুরুর নিকট শাস্ত্র শ্রবণ ইত্যাদিতে মাস আষ্টেক কাটাইয়া, প্রায় মাসখানেকের অসুখে অরবিন্দ-জননীর ৺ কাশীপ্রাপ্তি ঘটিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে অরু ও ব্রজরাণী দু'জনেই কাছে ছিল। মধ্যে মাসখানেকের জন্য পূজার সময় বাড়ী গেলেও, মায়ের অসুখের সংবাদে দু'জনেই আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। রোগের সময় শাশুড়ীর সেবাও যেমন করিতে হয়, সে করিয়াছে। কিন্তু কদমের মুখে একটা সংবাদ শুনিয়া, মনটা তাহার শাশুড়ীর উপর আবার একটু ভার হইয়া উঠিয়াছিল। পূজার ছুটীতে, গৃহিণীর বারম্বার অনুরোধে ও আগ্রহে, খোকা-বাবুকে সঙ্গে লইয়া দুই মায়ে ঝিয়ে কাশী আসিয়াছিলেন। বেয়ান্ ঠাকরুণ কোনমতেই বাড়ী ঢুকেন নাই;—তাঁহার কোন দেশের লোক নারদ-ঘাটে থাকেন, সেইখানেই তিনি উঠিয়াছিলেন। বউএর সঙ্গে মা একদিন দেখা করিতে যান,—কদমও তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। তা' সেই

ভরা দুপুরেও তাঁ'র তখনও পূজো পাঠ সারা হয় নাই। একঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া, উহারা যেমন মুখে গিয়াছিলেন, তেম্‌নি ফিরিলেন। 'মাগী একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখিলও না। তা' বউমা-বেচারী তা'তেও যেন অপ্রস্তুতের একশেষ! ওনার অতশত কিছুই নেই। কি যত্ন, কি আত্তি,—শাশুড়ীকে যেন ঠাকুর-ঘরে বসিয়ে রেখে সেবা করেচে। মুখে হাঁসিটুকুন্ তো লেগেই আছে। যেন একখানি দেবী-প্রতিমা। মনুষ্য নয়।'

ব্রজরাণী হিংসায় কালি হইয়া গিয়া একদিকে চাহিয়া রহিল। ইহার পর শাশুড়ীর সেবা যখনই করিতে গিয়াছে, প্রত্যেকবারই তাহার মনে হইয়াছে, 'অত করিয়া ঠাকুরসেবা খাইয়া আমার সেবা কি আর ওঁর ভাল লাগিতেছে?' মনটাও অমনি হাতের সহিত পিছাইয়াছে। সেই আনন্দময় মূর্ত্তি, উজ্জ্বল মঙ্গল গ্রহের মত অনিন্দ্য-কান্তি শিশুটির সম্বন্ধে ব্রজরাণী নিজের মনকে একটা অযথা কৌতূহল হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। এটাকে যতই সে নিজের দুর্ব্বলতা মনে করিয়া মন হইতে বিদায় দিতে চায়, ততই যেন সে জোর করিয়া চাপিয়া ধরে। মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিলেও, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়াও কিছু কিছু খবর সে জানিতে পারিল। 'মায়ের মন ছিল যে বউ আর নাতিকে নিজের কাছেই রাখেন। কিন্তু খোকাবাবুর পড়ার গোলমাল হবার ভয়ে 'তানারা'ই রাজী হ'লো না। যেদিন সব চলে গেল, মাটিতে আছড়ে প'ড়ে মাগীর কি কান্না! আহা! তা 'কান্‌বে' না গা? দেখে নি তো দেখে নি! কি সামগ্রী বলো দেখি? কথায় বলে, টাকার চাইতে টাকার সুদে মায়া বেশি হয়। তা, ঘরে আর একটা থাক্‌তো, তো, সে এক রকম হ'তো। 'সোয়ামী' শ্বশুরের বংশে আর তো নেই। আবার ছেলে ব'লে ছেলে! যাকে বলে, ছেলের মতন ছেলে!'

কদম আপনার মনে বকিয়া চলিল। বলা শেষে উঠিয়া চলিয়াও গেল। গভীর অন্যমনস্কতা-প্রযুক্ত ব্রজরাণী তাহা লক্ষ্যও করিল না। তাহার দুই

কাণের ভিতর দিয়া, সেই ভিন্ন জাতি, ভিন্ন গোত্র, নিরক্ষর মূর্খ দাসীর বংশ গৌরব-সম্ভূত সেই কথা কয়টি যেন মর্ম্মের মাঝখানে প্রবিষ্ট হইয়া, সেখানে একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল—'স্বামী শ্বশুরের বংশে আর নাই!'

মাতৃকৃত্য সমাধা করিয়া অরবিন্দ সেই অবধি এখান সেখান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া, পরে বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, অযোধ্যা—এম্নি কয়েকটা তীর্থে, কোথাও দু এক হপ্তা, কোথাও পাঁচসাত দিন—এনন করিয়াই ঘুরিয়া, ফিরিতে লাগিল। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন, শরতের মা-মরা ছোট মেয়েটাকে ব্রজরাণী মানুষ করিতেছিল, সেটিও শীতের প্রারম্ভে, নিউমোনিয়া রোগে, মারা পড়িয়াছিল। এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব স্নেহের বাধায় ব্রজরাণী শোকে, দুঃখে, অনুতাপে এমনই অধীর হইয়াছিল যে, সেই অবধি একটা জায়গায় স্থির হইয়াই সে তিষ্ঠিতে পারে নাই। খুকির রূপ, খুকির গুণ, খুকির কথা, খুকির হাসি,—সবচেয়ে খুকির মুখের সেই আধ আধ 'মা' ডাক্, তাহাকে যেন মোহের আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ব্রজরাণী মাতৃত্বের এই প্রবল বেদনার হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার এমনও মনে হইয়াছিল যে, ঐ এতটুকু খুকিটির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সব সুখই যেন জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষের যে মন, সে বড় আশা-প্রবণ এবং লোভী। নূতন কিছু পাইলেই সে পুরান শোক চাপা দিবার জন্য নিজের সহিত বুঝা-পড়া করিতে বসে। মনকে সে এই বলিয়া বুঝায় যে, তাহাকে তো কখনই ভুলিতে পারিব না; কিন্তু কাঁদিয়া কাটিয়া যখন কোনই ফল নাই, তখন বৃথা পরলোকে তাহার শান্তির ব্যাঘাত জন্মাই কেন? আর, এখনও যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাদেরই বা না দেখি কেন?—তথাপি, মনের মধ্যে যে শূন্যতাটা হায় হায় করিয়া ফিরে, তাহা কি কোন সদ্‌যুক্তিরই বশ?

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

পুত্রমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি।

—উত্তরচরিত

এবারের পূজার আনন্দ-সমারোহ কিছুই ছিল না। ঠিক্ বোধনের পূর্ব্বে কর্ত্তা ও কর্ত্রী সেই নিরানন্দ, পরিত্যক্ত গৃহে ফিরিয়া আসিল। ব্রজরাণীর এক দরিদ্রা বাল্য-সখীর সহিত এলাহাবাদে সাক্ষাৎ ঘটে। সখী মিলনের মেয়েটী বড় সুন্দরী। ব্রজর শূন্য বুক তাহাকে বক্ষে চাপিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য জুড়াইয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়া তাহার জন্য পূজার পোষাক ও একজোড়া সোণার চুড়ি পাঠাইয়া সে সেখান হইতে অনুযোগপূর্ণ পত্র পাইল। দরিদ্র-দম্পতি নিজেদের অযোগ্য-মিলনের কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ব্রজরাণী এইরূপ জবাব দিল—

"প্রিয় মিলন!

বুঝিলাম, সংসারে স্নেহ ভালবাসার কোনই মূল্য নাই। আছে শুধু ব্যবহার-শাস্ত্রের অমোঘ নীতি। আর সংসারে আজ সেইটাই এর সব জায়গাটা জুড়িয়া বসিয়া আছে। তোমায় আমায় প্রভেদ কোন্‌খানে? তুমি ভদ্র কায়স্থকন্যা, আমিও তাই। তোমার স্বামীর পদবী দত্ত, ইঁহারা বোস। ঠিক আমার বাপেদের সমান ঘর। (এ কথা তোমায় অনেকবার বলিয়াছি; এবং তা না হইলে, তোমার মেয়েটির আমার ছোট ভাইটির সহিত বিবাহ দিতাম তাও বলিয়াছি।) জাতি কুল এবং সামাজিক মর্য্যাদায় তোমরা আমাদের নীচে নও। অতএব তুমি যে আমাদের অযোগ্য মিলনের জন্য সহস্রবার কুণ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, সেটা তোমার মনঃকল্পিত। তোমার সঙ্গে আমার প্রভেদ শুধু টাকায়। এইটাই তোমরা এত বড় করিয়া

ধরিতেছ কেন? দেখিতেছি, সংসারে যার টাকা আছে, সেই মস্ত অপরাধী! কাহারও সহানুভূতির পাত্র সে নয়। যেহেতু লোকে জানে, তার টাকা আছে, অতএব, তার জীবনে আর কোন অভাব থাকিতেই পারে না। শিকল-গাছটা সোণার হইলেই যে অভাগা মানুষ ভাগ্যবান্ হইয়া উঠে না, এ কথা বুঝাই কাহাকে?

আজ যদি আমার গর্ভে ভগবান্ সন্তান দিতেন, আমি যদি তোমার মানসীকে বউ করিতাম, তুমি ঐ দু'গাছা ছাই চুড়ির খোঁটা আমায় দিতে পারিতে? যাকে নিজের গায়ের আর আমার সাধ্যের অসাধ্যের সমুদয় হীরা মাণিকে সাজালেও তৃপ্তি হয় না, তাকে ঐটুকু দেবার একটা ফোঁটা তৃপ্তি নেবার অধিকার আজ তিনি দেন্‌নি বলেই না তোমরাও দিতে সঙ্কোচ কর্‌চো! কি বল্‌বো? যা ভাল মনে হয় করো। ঈশ্বর যাকে মেরেচেন, মানুষে তাকে মার্‌বে, সে আর এমন বিচিত্র কি? আজ যদি খুকিটাও আমার থাক্‌তো? এত বড় শূন্যতা প্রাণে নিয়ে মানুষ বাঁচে কদ্দিন?"

ব্রজরাণী পূজার পঞ্চমীর দিনে বাড়ীর ও যাহাদের সহিত কিছু না কিছু বাধ্যবাধকতা আছে, সেই সব লোককে যথারীতি নূতন কাপড় বাঁটিয়া দিল। বাপের বাড়ী, শরতের বাড়ী, ও ঊষার শ্বশুরবাড়ী তত্ত্ব পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছে, এমন সময়ে ঝিয়ের কোলে ছেলে দিয়া ঊষা আসিয়া উপস্থিত হইল। "তুই এসেছিস্ ছোট, এই যে তোকে এখনি আন্‌তে

ঊষা মনটা একটু ভার ভার করিয়াই আসিয়াছিল। তত্ত্বের সামগ্রী-পত্রে নজর পড়ায় অসন্তোষ চলিয়া গেল; সোৎসাহে কহিয়া উঠিল, "দেখি দেখি, ওখানা কি কাপড়! সোণালি জরির সাড়ী, রূপার ঝাড়! ভারি চমৎকার তো? এর দাম কত বৌদি? দুশো আড়াইশোর তো কম হবেই না। 'জ্যাকেট্-পিস্‌টা, অমনি রেখেছ কেন? জ্যাকেট্‌টা তৈরি করিয়ে দিলে বিজয়ার দিন পর্‌তুম।"

"কাশীতে কিনেছিলুম কি না, সেই অবধি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে আর তৈরি করান হয়ে ওঠে নি। খোকার এই ভেল্‌ভেটের স্যুট্ কাশীতেই করিয়েছি; দেখ দেখি ছোট, বেশী বড় হবে কি?"

"তা' ও-সব দামী জিনিস একটু বড়ই ভাল। দিদির ছোট খোকারও বুঝি এই রকম? অসীমার সাড়ীখানা তো আমারই মতন। ওমা! কত টাকাই খরচ করেছিস্ বৌদি! দাদা রাগ করে না?"

ব্রজরাণী ননদের মন্তব্যে মুখ ভার করিয়া জবাব দিল, "রাগ ক'রে কি করবে? আমাদের টাকা আর কার জন্য? আমরা—আমি কিসেব জন্য পুঁজি করে রাখবো?"

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায়, কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব রহিল। নিজে মাতৃত্বের স্বাদ পাইয়া অবধি ঊষা ব্রজরাণীর মর্ম্মবেদনা আজকাল সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে এবং বেদনা পায়। বিশেষ করিয়া ব্রজরাণীর অবস্থায় সে ব্যথা যে কতখানি বেশী হওয়া স্বাভাবিক, ইহাও সে অনুমান করিত।

অল্পক্ষণ পরে নিজেরই আহৃত এই আকস্মিক গাম্ভীর্য্যে ঈষৎ লজ্জাবোধ করিয়া, জোর করিয়া নিজেকে নিজের সেই বেদনা হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়া, ব্রজরাণী একটুখানি হাসিয়া কহিল, "আর সবই তো এক রকম করে তুলেছি। গুরু, পুরুত,—পূজোর আর যার যেমন হয়, ফর্দ্দ মিলিয়ে সবই হয়েছে, তোমার, আমার আর বড় ঠাকুরঝির যেমন বরাবর এক রকম হয়,—এবার তাঁর বদলে তাঁর মেয়েকে সেইটে দিয়েছি। কিন্তু একটা কথা ভেবে কোন ঠিকানায় পৌছুতে পারিনি—" এই বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়াই ব্রজরাণী চুপ করিয়া গেল এবং ঈষৎ হাসিল।

ঊষা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বৌদি?"

ব্রজরাণী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, "বর্দ্ধমানের কাপড় পাঠানর কি রকমটা হবে?"

ঊষা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "বর্দ্ধমানের কাপড় পাঠানর কথা কি বল্‌চো? কাকে পাঠাবে কাপড়?"

"বর্দ্ধমানে তোমাদের আপনার জন কেউ নেই?"

"আমাদের! আপনার জন! কই রে! কে আছে?"

ব্রজরাণী ঈষৎ উষ্ণ হইয়া কহিল, "কেন ন্যাকামী করিস্ বল্ তো? ভাইপো আর তার মা বর্দ্ধমানে থাকে না? তুই জানিস্ নে?"

ঊষা দুই ভুরু শুদ্ধ চোখ দুইটা কপালের উপর টানিয়া তুলিয়া, ঘাড় কাত করিয়া, অবাক্ হইয়া গিয়া কহিল, "অভাগ্যি! আমার আবার ভাইপো কোথায়! তাদের কথা বল্‌চো, তা আমি বুঝ্‌বো কি ক'রে?

ব্রজরাণীর মনটা দ্বিগুণ তাতিয়া উঠিল। অকারণেই সে গরম স্বরে কহিয়া উঠিল, "কেন গো, তোমার দিদি বরাবর মেয়ে দিয়ে ভাইফোঁটা পাঠাতেন; গেল বছর তোমার মা বৌ-নাতিকে নিজের কাছে এনে আদর করে গেছেন। তুমিই বা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার কর্‌লে চল্‌বে কেন? সেও যেমন পিসি ছিল, তুমিও তো তাই।"

"সে যেমন বাবার নিষেধ না মেনে পাপ কর্‌লে, তার জন্যে তার হ'য়েও তো গেল! সব্বাই তো আর সে রকম নয়। আমি কক্ষনো তাদের দিকে হয়েছি তুমি দেখেছ, যে আমায় শোনাচ্চো আজ?"

ঊষারও মেজাজ গরম হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে করিল, দিদির ও মার কাজের খোঁটা, তাঁহাদের নাগাল না পাওয়াতেই, বৌদি তাহার উপর দিয়া ঝাড়িয়া লইতেছে। ব্রজরাণীও রাগিয়া গেল; বলিল—

"দেখ্ ঊষি! মরা-মানুষের সমালোচনা করিস্ নে বল্‌ছি! এক ফোঁটা মেয়ে, সব্বার চাইতেই তুই যেন বেশী বুঝিস্। তা, তোদের সে ভাইপো কি নয়, সে তোরা বুঝ্‌গে যা; আমার তা'তে কি এসে যায়? তোমার মা দিদি দিতেন, তোমারও যদি সখ যায়, তাই ধর্ম্ম ভেবে মনে করিয়ে দিচ্ছিলুম বই ত না। নৈলে আমার গরজ কিসের বল্ তো শুনি?"

বাস্তবিকই, ব্রজরাণীর কোন 'গরজ'ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! ঊষা উহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া নিজে একটুখানি নরম হইলেও, মনের ভিতরটা তাহার বকুনি খাইয়া, বেশ একটু গরমই রহিয়া গেল। চড়া সুরেই জবাব দিল—"অত সখ আমার নেই গো নেই।"—বলিয়া খানিকক্ষণ মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিয়া, হঠাৎ কি একটা ভাবিয়া লইয়া, ব্যাপারটাকে হাসি তামাসার বিষয়ে পরিণত করিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তোর যদি সখ হ'য়ে থাকে, তুই কেন দে'না।"

ব্রজরাণীর উত্তেজনায় ঈষদারক্ত মুখ অকস্মাৎ এই কথায় বিবর্ণ পাণ্ডুর হইয়া আসিল। সে স্বল্পকাল নীরব থাকিয়া সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমি কোন্ সুবাদে পাঠাতে যাব?"

"খুব বড় সুবাদেই। তুই বরঞ্চ মা।"

ব্রজরাণী এম্‌নি করিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়া, লোভাতুর ব্যাকুল চক্ষে ঊষার মুখের দিকে চাহিল যে, সে দৃষ্টিতে মস্ত বড় একটা কিছু আছে;—কিন্তু সেটা যে কি, তাহার কল্পনামাত্র করিতে না পারায়, ঊষা উহাকে ভুল করিয়া ফেলিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। এমন অনেক দিনের কথাই তাহার স্মরণে আছে, যেদিন সতীন ও সতীনপো সম্বন্ধীয় আলোচনার মধ্যে ব্রজরাণী এম্‌নি উন্মত্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে যে, ঊষা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়া পলাইবার পথ খুঁজিয়াছে। তাহারই বা ভ্রমে পড়ার দোষ ধরিলে আজ চলিবে কেন?

যে উৎসাহিত আশায় অকস্মাৎ চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল নদীর জলের ঢেউএর মত ব্রজরাণীর মুখ চোখ চক্‌চকে হইয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্তমধ্যে সে তরঙ্গ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়া, সে মুখ যেন মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত রহস্যময় ও আঁধারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মনের মধ্যে এই এতটুকু সময়ের ভিতর একটা যে তাড়িতের তীব্র প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, খুব অসহ্য একটা যন্ত্রণার প্রবাহের মতই সেটা ক্ষণমধ্যে তাহাকে অবসাদক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল করিয়া দিয়া গেল।

সে বলিল, "হ্যাঃ, সৎমা আবার মা! গোষ্পদ যেমন নদী, তেমনি সৎমাও মা, আর কি!"

নিজের ঐ কথাটা নিজেকে কি উষাকে, কাহাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য, তা' কে জানে—বলিয়াই সে জোর করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সেই হাসির স্বরটা এবং যেখান হইতে সেটা উৎপন্ন হইয়াছিল—তাহার সেই মুখখানা—এতদুভয়েই সে হাসিটা হাসির চাইতে কান্নার ভাবেই মানাইল বেশী। তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া, পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া, আঁচলের খুঁটে চোখ রগড়ানটা যতটা পারে অন্যের চক্ষে অদৃশ্য রাখার চেষ্টা করিতে করিতে, বলিয়া উঠিল—"মজা দেখ! কি বাজে কথায় সময় কাটাচ্চি! চারিদিকে কত কাজ বাকি পড়ে আছে। আয় দেখি, বাসন বার করিগে। শ্রী বরণডালা সবই যে এখনও তৈরি করতে বাকী।"

তা' এ প্রসঙ্গ এইখানেই মিটিল না। তখনকার মত চাপা পড়িলেও, পরদিন ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভে যখন পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিল, ঘরের ও পরের ছেলেরা নূতন নূতন পোষাকে সাজিয়া পূজাবাড়ীর শোভাবর্দ্ধন করিতে জড় হইল; প্রতিবেশীর অঙ্গনে, রাস্তায়, সর্ব্বত্র ছেলেবুড়ার অঙ্গে সাধ্যানুযায়ী নূতন কাপড়ের নিশান,—বাঙ্গালী ঘরের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসবের সমাচার ঘোষণা করিতে লাগিল, তখন আর ব্রজরাণী নিজের মনের দ্বিধার দ্বন্দ্বে নিজেকে জয়ী রাখিতে পারিল না। আপনার কাছে হার মানার দীনতা স্বীকার করিয়া, সে স্বামীর সহিত সাক্ষাতের জন্য ভিতরে বাহিরে ছট্‌ফট্ করিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীও কি ছাই সেদিন তেম্‌নি দুর্ল্লভ হইয়া পড়িলেন! তাঁহার আর সেদিন টিকিটিও দেখা গেল না।

শেষকালে খবর লইয়া লইয়া, বাহিরের ঘরে বাহিরের কোন লোক উপস্থিত নাই সংবাদ পাইয়া, নিজেই সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। অরবিন্দ একলা একটা ইজি-চেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল; সে তাহার আগমন জানিতে পারিয়া চোখ তুলিবার পূর্ব্বেই কোন রকম

ভূমিকা না করিয়াই, বারবার করিয়া মনেকরা, সঙ্কোচ সরান নিজেরই শেখান বুলিটা সে গড়গড় করিয়া আওড়াইয়া গেল, বলিল, 'দেখ, আর সব তো আমি এক রকম করেছি। কেবল বর্দ্ধমানে যদি কিছু পাঠানর দরকার থাকে, সেইটেই শুধু হয় নি। তা' তুমি সেটা না হয় সরকার মশাইকে বলে দাও—আজও তো রেজেষ্ট্রী নেবে, আজই তা'হলে দিয়ে দিক্।"

অরবিন্দ অকস্মাৎ এইভাবে সম্ভাষিত হইয়া, একটুক্ষণ চোখের সাম্‌নে বই রাখিয়া, নীরব হইয়া থাকিয়া, পরে নিজের স্বাভাবিক সংযত স্বরেই কহিল, "কই, কিছুই তো পাঠাবার দরকার নেই।" বলিয়াই আবার বই পড়িবার উপক্রম করিল দেখিয়া, ব্রজরাণী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

"দরকার নেই তো? তা'হলেই হ'লো। আমার কাজ মনে করে দেওয়া, আমি তো কর্‌লুম। তারপর তোমাদের যা কর্ত্তব্য, তোমরা তাই ক'র্‌বে। আমায় না কেউ দোষ দিলেই হ'লো।"

"তোমায় এই চৌদ্দ বৎসর যদি না কেউ দোষ দিয়ে থাকে, আজকের এ বৎসরেও দেবে না।—কিন্তু আজকের দিনে কে' কখন এসে পড়ে, তার কোন হিসেব নেই। আজ যদি তুমি এ বেশে এ ঘরে এসে দাঁড়িয়ে থাক, তা' হ'লে লোকে তোমায় যে বেহায়া ব'ল্‌বে এটা ঠিক্।"

"বয়ে গেল,—নিন্দাকে আমি ভয় তো বড্ডই করি।—তুমি যে ঐ 'চৌদ্দ বৎসরের' কথাটা বল্লে, তা সে চৌদ্দ বৎসর তো আর আমার দায়িত্বে কাটে নি। সে দিনের দায়ী ছিলেন আমার শ্বশুর শাশুড়ী। কিন্তু এই বছরটা না কি আমার হাতের, তাই আমায় এত করে এটার জন্মেই ভাবতে হচ্চে। কাপড় চোপড় সবই আছে। যদি ইচ্ছা থাকে, সরকারকে একবার বল্লেই, সে পাঠিয়ে দেবে।—"

"কোন দরকার নেই। তুমি ভিতরে যাও রাণি, অমর মিস্তিরের এখনি আস্‌বাব কথা আছে। কি রে চতুরিয়া, বাবুলোগ কই আয়া?

"জি"—বলিয়া চতুরিয়া, প্রবেশদ্বারের দু'দিকে দুই বাহু দিয়া পথ

আগুলিয়া দাঁড়াইয়া, হতভম্বের মত 'বহুজীর' মুখের দিকে চাহিল। তখন আর কাহাকেও না পাইয়া অগত্যাই চতুরিয়া এবং তাহার পশ্চাতে ব বস্থিত 'অমর মিত্রের' প্রতিই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া, মনে মনে ইহাদের প্রতি এমন একটা কটু মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে সে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিল যে, উহা মনে মনেই বলা চলে, মুখে প্রকাশ করিতে গেলে ভদ্রতা রক্ষা পায় না। তারপর উত্ত্যক্ত-চিত্তে কর্ম্মবাড়ীর কার্য্যনিরত পরিজনবর্গের কাজের খুঁৎ কাড়িয়া টিক্‌টিক্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফলে, নিজে অসচ্ছন্দ এবং সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল মাত্র; আর কোনই লাভ দেখা গেল না।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

পুনরিব শিশুভূতো বৎস স মে রঘুনন্দনো

ঝটিতি কুরুতে দৃষ্ট কোঽয়ং দৃশোরমৃতাঞ্জনম্ ॥

—উত্তরচরিত।

শরতের অকালমৃত্যু সংসারে যে কয়টি প্রাণীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল, স্বজন-পরিত্যক্ত শিশু ও তাহার জননী ইহাদের অন্যতম। এই সুকুমারমতি শিশুটি জীবনের যে প্রধান অংশটায় চিরবঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেই তাহার অপ্রত্যাশিত কুয়াসাচ্ছন্ন ভাগটায়, সহসা একদিন, কক্ষে অমৃতভাণ্ড ধারণ করিয়া সিন্ধু-সলিলোত্থিতা মা-লক্ষ্মীর মতই, তাহার এই পিতৃস্বসাটির আগমন ঘটিয়াছিল। ইঁহার পায়ের রেণুতে দীনের ভগ্ন কুটীর নবীন হইয়া উঠিয়াছে, ইঁহার হাতের স্পর্শে চিরসঞ্চিত অনেক বেদনা ঝরিয়া পড়িয়াছে, অজ্ঞতার গুহাশায়ী অন্ধকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পলায়ন করিয়াছে। অপরিচয়ের ব্যাকুল তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির আনন্দে পর্য্যবসিত করিয়া দিয়াছে।

এক কথায়, ভাল হোক্, মন্দ হোক্, সংসারে আসিয়া যা অবশ্য প্রাপ্য, তারই কিছু কিছু সে এইখানেই পাইয়াছে। তাই, যেদিন খবর আসিল যে, সেই পিসিমা ইহলোকে নাই, বালক হইলেও অজিতের দুঃখ সেদিন অসহনীয় বোধ হইয়াছিল। মনোরমা সে দারুণ শোকে একটী ফোঁটা চোখের জলের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিল না,—তাহার অজিত যে এই একটীমাত্র আত্ম-জনের বিয়োগ-ব্যথায় ঝটিকা বিপর্য্যস্ত চারা-গাছটির মতই লুটাইয়া পড়িয়াছে।

পূজার সময় অজিতের ঠাকুরমার নিকট হইতে আহ্বান আসিলে, মনোরমা সেখানে না যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। অজিতকে বলিল, "লিখে দে, একজামিনের পড়া শক্ত হ'য়ে আস্‌ছে, ছুটীতেও পড়তে হবে।"

যুক্তিটা অজিতের মনঃপূত হইল না। জীবনের যে অনাস্বাদিত সুধা-টুকুর স্বাদ সে লাভ করিতেছে, তার এতটুকুও সে ছাড়িতে প্রস্তুত নয়। মায়ের কথায় মৃদু প্রতিবাদ করিল, "পড়া তো আমার তৈরি হ'তে কিছুই বাকী নেই মা-মণি! ছুটির সময় আবার মানুষে বুঝি পড়ে।" দিদিমাকে গিয়া বলিল, "দিদিমণি! চল না, তোমায় তীর্থ করিয়ে আনিগে।"

এ লোভটুকু সংসারনির্লিপ্তা দুর্গাসুন্দরীর মনের নিভৃতে কোথায় বুঝি বাসা বাঁধিয়া ছিল,—ডাক্ পড়িতেই বেশ বড় গলায় সাড়া দিল, বলিল, "যেতে তো সাধ যায় ভাই,—তা সবই তো টাকার খেলা।"

কাশী আসিয়া সন্তপ্ত অজিত শোকাকুলা ঠাকুরমায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া পিসিমার জন্য বড় কান্নাটাই কাঁদিল। প্রথম প্রথম পিসিমার অভাবে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াই রহিল! তার পর বালস্বভাববশতঃ ক্রমশঃই আবার একটু শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল। দুর্গাসুন্দরী গ্রাম-সুবাদে এক আত্মীয়ের গৃহে উঠিয়াছিলেন,—দু'পাঁচজন সঙ্গী জুটাইয়া নিকটবর্ত্তী তীর্থ-গুলি সারিয়া লইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার সময় আহ্নিক সারিয়া আসিয়া চিরপ্রথামত অরুন্ধ মা ছাদে

কিংবা দ্বিতলের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসেন। অজিত সাম্‌নে আলো রাখিয়া ততক্ষণ অভ্যাসমত একটু বই লইয়া পড়িতে বসে, এবং বারে বারে বই হইতে চোখ তুলিয়া ঠাকুরমার পথ চায়। বারান্দার প্রান্তভাগে যেমন তাঁহার শুভ্র বসনের প্রান্তটুকু দেখা দেয়, অম্‌নি চটুপট্‌ বই তুলিয়া রাখিয়া আলো সরাইয়া এক লাফে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়ে। কখনও বা কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া, দু' হাত দিয়া তাঁহার চর্ম্মলুলিত কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ধরে। অতীতের দুঃখে, ভবিষ্যতের ব্যথায় বর্ত্তমানের এতবড় সুখকেও বেদনাময় ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়া, ঠাকুরমার মথিত বক্ষ রুদ্ধশ্বাসের ভারে ফুলিয়া উঠে। চোখের জলের দরবিগলিত-ধারায় অন্ধ হইয়া গিয়া, কখনও মৃত পতিকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে তিনি কাতর হইয়া বলেন, "কি করে গেলে গো! ওগো, এ তুমি কি করে রেখে গেলে? ওরে আমার তপস্যার ধন রে! কার শাপে তুই আজ আমার পথের কাঙ্গাল হ'য়ে রইলি?" প্রকাশ্যে শিশুর ক্ষুদ্র মস্তকটির উপর নিজের বুকের সমস্ত মঙ্গলকামনাময় আশীর্ব্বাদের পসরাখানি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া, তাহার চিরজীবনের সমুদয় বাধা বিঘ্ন, বিপদ বিপত্তি যেন নিজের সেই শীর্ণ হাত-খানিতে মুছিয়া লইয়া, ঘন ঘন তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে কম্পিত-অধরে উচ্চারিত হইতে থাকে,—বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথ! সেই বিপুল স্নেহের বেগ নিজের শরীর মনে উপলব্ধি করিয়া, ইহাকে ভাল করিয়া উপভোগ করিবার লোভে, অজিত হাসিমুখে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। উভয়েরই হৃদয়ভাবের বার্ত্তা পাইয়া শ্বশ্রূর পদসেবানিরতা মনোরমার দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠে।

এম্‌নি করিয়া দুঃখের দিনে অরবিন্দের মা সুখের যে নৈবেদ্য উপহার পাইতেছিলেন, ইহা তাঁহার স্বপ্নাতীত। এতদিনের দীর্ঘ জীবনেও এ আনন্দ তাঁহার এই নূতন পাওয়া। শরতের ছেলে মেয়ে, ঊষার সন্তান লইয়া তিনি অনেক সন্ধ্যা, অনেক মধ্যাহ্ন যাপন করিয়াছেন বটে, তা'দের

মধ্যে দু'একজন তাঁহার হৃদয়ে যথেষ্ট অধিকারও বিস্তৃত করিয়াছিল ইহাও সত্য; কিন্তু, এ সব সত্বেও, যখনই তিনি উহাদের ভিতর বাহিরের কোন পাওনা দিতে গিয়াছেন, তখনি একটা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন না করিয়া দিতে পারেন নাই। আবার সেইক্ষণেই মনে মনে সাতবার মা-ষষ্ঠীকে স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া আত্মগতই বলিয়াছেন, আহা! বেঁচে থাক্ মায়ের বাছারা! আমি কি ওদের হিংসা কর্‌চি, তা তো নয়। ওরাও তো আমারই। তবে কি না, মরে গেলে একটা গণ্ডুষ জল সেই তো আমায় দেবে? তা' যার কাছে অতবড় দাবী, দেবার বেলায় তাকেই কি না বঞ্চনা করে গেলুম। এই আপ্‌শোষ কাটাই কি ক'রে?—আজ এত দিনে সেই চিরসঞ্চিত দেনা তিনি তাই সুদশুদ্ধ মিটাইতে বসিয়াছেন।

কোন দিন দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রাম-শয্যায়, কোন দিন বা সন্ধ্যাতেই, অজিত ঠাকুরমাকে মহাভারত বা ভাগবত পড়িয়া শুনাইত। বেশীর ভাগ নিজের পাঠ্য অপাঠ্য পুস্তকের বিবিধ অভিজ্ঞতা সে তাহার এই বিমুগ্ধ শ্রোতার উদ্দেশ্যে উৎসারিত করিয়া দিয়া অনর্গল বকিতে থাকিত। ইতঃপূর্ব্বে এমন শ্রোতা সে আর একটীও খুঁজিয়া পায় নাই। দিদিমা নেহাৎ ছোটবেলায় সেই যে একটু শুনিতেন,—এখন তো তাঁহার নাগাল পাওয়াই ভার। মা খানিকক্ষণ হাসিমুখে শোনেন বটে; কিন্তু বেশীক্ষণ ধরিয়া শুনিবার ধৈর্য্য বা সময় তাঁহার দুই-ই কম। একটু পরেই, 'মিছে কতকগুলো বকিস্‌নে বাবু, ও-সব কি ছাই আমি বুঝ্‌তে পারি?' বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া যান। তা' এ ঠাকুরমার সঙ্গে জিওমেট্রী, অ্যালজেব্‌রা, জিওগ্রাফি—পৃথিবীর যত কিছু সমস্ত লইয়াই আলোচনা চলিতে পারে। আলোচ্য যাই হোক্ না কেন, উৎসাহ উভয় পক্ষেরই কোথাও বাধিত হয় না। এই সব আগড়ম্-বাগড়ম্ শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়া, পিতামহী পৌত্রের মাথায় চুম্বন দিয়া উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠেন, "এই বয়সে এত সব শিখ্‌লি কখন দাদা?" তার পর আবার উচ্ছ্বাসের বেগ একটুখানি সংযত করিয়া লইয়া

বলেন, "তা' তোর বাপও ঐ রকম ছিল। সেও ছোট্ট থেকে অনেক সব শিখেছিল।"

উহার পিতৃ-পরিচয় যে সর্ব্বদা সাবধানে এড়াইয়া চলিয়া থাকেন, উৎসাহের মুখে সে কথাটাও প্রায় এ সময় স্মৃতিপথচ্যুত হইয়া যায়। অজিতও যেন এই আলোচনাটির প্রত্যাশা করিয়াই বসিয়া থাকিত। কথায় কথায় এই প্রসঙ্গটা উঠিয়া পড়িলেই, তাহার উৎসাহ প্রায় বাঁধ ছাপাইয়া ছুটিয়া বাহির হইত। তখন দু'জনের কথাবার্ত্তা প্রায় এইরূপই হইত,—

"আমার বাবা কত বছর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করেছিলেন, ঠাকুমা?"

"কত বছর?—পনের বছরে। তুমি তার চাইতে এক বছর আগেই পাশ করবে, দাদামণি!"

"আচ্ছা ঠাকুমা! বাবা তো এণ্ট্রান্সে কুড়ি, এফ-এতে পঁচিশ, আর বি-এ পাশ ক'রে পঞ্চাশ টাকা স্কলারশিপ্ পেয়েছিলেন? বি-এতে ফার্ষ্ট হ'য়ে তিনটে সোণার মেডেল পেয়েছিলেন। এম-এতে সেকেণ্ড হয়েছিলেন। তবে ল'তেই বা তিন তিনবার ফেল হ'য়ে গেলেন কেন? আইন বুঝি তাঁর ভাল লাগতো না? আইন-পড়া বড় বিশ্রী, না? আমিও আইন পড়চি নে, আমি কি ঠিক্ করেছি জানো? এম-এ দিয়ে পি, আর, এস্ হবার চেষ্টা করবো। তার পর পি, এইচ, ডি, কেমন? সে বেশ হবে, না? অনেক টাকা পাওয়া যাবে, আর নামও হবে। আচ্ছা, ঠাকুমা, বাবা অত ভাল ছেলে ছিলেন, উনিও কেন পি, আর, এস্ হবার চেষ্টা করলেন না? করলে নিশ্চয়ই পারতেন। না ঠাকুমা! পারতেন না? আইনটাই না ভাল লাগার জন্যে—"

ঠাকুমা একটু ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিতেন, "হ্যাঁ ভাই, তা পারবে না কেন? বাবা তোমার বরাবর সেই এতটুকু বেলা থেকে ইস্কুলের 'ফাস্‌টো' থেকেচে। ঐ তেই কি আর ফেল হ'তো? একবারই না হয় হয়েছিল। দু'বারের বার ওকে ফেল্ করে কে? ভগবান্ মারলেন।"

এই 'ভগবানে'র 'মারে'র সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া, একদিন কয়েক ফোঁটা চোখের জলে মাত্র ইহার জবাব পাইয়া, এতৎসম্বন্ধে সে আর কোন দিনই পুনঃ প্রশ্ন করে নাই। ইহার পর, তাহার বাবার কোন্ মেডেলটা কত বড়? ওজন উহাদের আন্দাজীতে কতখানি? স্কুলের প্রাইজে বাবা কি কি বই পাইয়াছিলেন? প্রথমবারের স্কলারশিপের টাকা কোন্ কোন্ দাতব্য-ফণ্ডে বা দেব-অতিথি-সেবায় খরচ করা হইয়াছিল? সেরূপ কিছুই হয় নাই শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া, সে ভবিষ্যতে নিজের ঐরূপ প্রাপ্তি ঘটিলে তদ্দ্বারা কি সব মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহারই একটা তালিকা তৈরি করিতে বসিয়া যায়। কিন্তু ইহাদের এই সব অবাধ মুক্ত আলোচনারও মাঝখানে কিসের একটা কণ্টক, অতি সূক্ষ্ম কাঁটার মত বিঁধিতে থাকে,—কাহার একখানা লৌহময় হস্ত মধ্যভাগে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়,—সেটুকু সেই সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সরল শিশুও বুঝিতে পারে। আর যতই সরল হোক্, অজিত বুদ্ধিমান্ ছেলে; বুদ্ধির অভিজ্ঞতা তাহার কে ঠেকাইতে পারিবে? পিত্রালয়ের সহিত যতই পরিচয়ে আসিতেছিল, ততই সেখানকার অজ্ঞাত রহস্যটা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। অস্ফুট সন্দেহ উত্তরোত্তর নিষ্ঠুর সত্য বিশ্বাসে পরিণত হইয়া, এমন কি, অনেক সময় তাহার শিশু চিত্তের শান্তিভঙ্গ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। ভক্তিমতী জননীর সমস্ত শিক্ষা, নিজের মনেরও অপরিসীম শ্রদ্ধাজাত অপরিচিত পিতার প্রতি বিশ্বাস সে হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছে। আর বুঝি তাহাকে জীয়াইয়া রাখা যায় না।

একদিন প্রথম সন্ধ্যায় অসমবয়সী দুই বন্ধুতে ছাদে উঠিয়াছিল। সিঁড়িভাঙ্গা ক্লেশকর হইলেও অজিতের পিতামহী নিজের এ অক্ষমতা পৌত্রের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহার চিত্তে আশা-ভঙ্গের বেদনা দানে কুণ্ঠিত হইতেন। তিথি সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশী; প্রায় পরিণত পূর্ণচন্দ্র অনেকখানি দীপ্তিশূন্যভাবে আশে পাশের সোণালী রঞ্জিত খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের

একটী খণ্ডের মতই একটী মন্দিরচূড়ার স্বর্ণপতাকার পাশ দিয়া দেখা যাইতেছে। ছাদের চৌদিক্ বেড়িয়া কাশীর সৌধ-মন্দির-মালা। এদিকে চাহিলে বর্ষাবারিপরিপূরিতাঙ্গী দেবী জাহ্নবীর প্রশস্ত সলিল-রেখা চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা বিপুল আনন্দ প্রদান করিতে থাকে। তবে এক্ষণে তাঁহার সেই 'বিমল মূর্ত্তি ধবল পারা' নয়। 'বিশ্বনাথের চরণতলে' কলকল নাদে প্রবাহিতা উক্তা দেবী এক্ষণে গৈরিকবসনা তপস্বিনী। অজরামর স্বামী বিদ্যমানে তাঁহারই আলয়ে আসিয়া এমন বৈধব্যাচারপরায়ণা কেন হইয়াছেন? ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে গেলে, কাল ধর্ম্মেরই দোহাই পাড়িতে হয়। অথবা স্বামীর সহিত কলহে, সন্ন্যাসিনী সজ্জার প্রতি তৃষ্ণা জন্মিয়াছে? তাই বুঝি গেরুয়া পরিয়া, তরঙ্গে তরঙ্গে মণিকর্ণিকার ছাই ধুইয়া নিজের অঙ্গে লেপন করিতেছেন!

অজিত এ কথা সে কথার পর হঠাৎ এক সময় কি কথার মধ্যে কোন্ কথা আনিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা ঠাকুমা! আমার বাবা কি সত্য সত্যই আমাদের ত্যাগ করেছেন?" এই বলিয়াই জিজ্ঞাসু দুই নেত্র ঠাকুমার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া, সে দুই হাত দিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

এই নির্ঘাত সত্য জিজ্ঞাসার অব্যর্থ শেল বুকে বিঁধিয়া বৃদ্ধা ঠাকুমা পতনোন্মুখী হইয়াছিলেন, অল্পকালের মধ্যে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া শুনিতে পাইলেন, অজিত অত্যন্ত ভয় পাইয়া তাঁহার অবসন্ন দেহ নাড়া দিতে দিতে রুদ্ধশ্বাসে ডাকিতেছে—"ঠাকুমা! ও ঠাকুমা! ঠাকুমা!"

"দাদা আমার! মাণিক আমার! সৃষ্টিধর আমার রে!"—বলিতে বলিতে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছোট্ট একটী অবোধ মেয়ের মত, বর্ষাজল-কলঙ্কিত ছাদের মেঝের উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তার পর পাগলের মত নিজের কপালে ঘা মারিতে মারিতে দ্বিগুণ আবেগে কাঁদিয়া উঠিয়া অজিতের ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন—"ওগো, তোমার মতন আমিও

যদি যেতে পার্‌তুম গো !—হে বিশ্বনাথ ! এ কথার জবাব দেওয়ার আগে তুমিও কি আমায় একটুখানি স্থান দিতে পার্‌লে না ঠাকুর ?”

অজিত নিজের অবিমৃষ্যকারিতার এই অপ্রত্যাশিত পরিণাম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার সেই ব্যগ্রতাপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরটা যেন তাহার লজ্জা বেদনাকে আহত করিয়া ফেলিয়া প্রকাণ্ড একটা ক্ষুধিত অজগরের হাঁ-করা মুখের মত তাহার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

দেহি মে ভগবন্ পুত্রং নো চেদ্দেহমিহাগ্নয়ে।
প্রকরোম্যাহুতিং পুত্রদুঃখদাহোপশান্তয়ে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

ভাইফোঁটার পর বাড়ী-ঘরের বন্দোবস্ত সারিয়া অরবিন্দ ও ব্রজরাণী আর একচোট্ বেড়াইতে বাহির হইল। ‘বেলা’ মেয়েটীকে দেখিতে মন্দ নয়,—সেইটিকেই সে এবার চাহিয়া লইল। পরের ছেলে আর কখন লইবে না প্রতিজ্ঞা থাকিলেও, সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিল না। একটা অবলম্বন না পাইলে কি থাকিতে পারা যায় ?

কাশী আসিতেই এবার ৺বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছাকাছি একটা গলিতে বেশ একখানা ভাল বাড়ী জুটিয়া গেল। তাহার সম্মুখে আর একখানা বাড়ী। সেখানে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত লোকের ভিড় লাগিয়া থাকে। প্রথমে উকিলের, দ্বিপ্রহরেও জনসমাগম দেখিয়া ডাক্তারের মনে করিয়া, শেষকালে ব্রজরাণী জানিল যে, উহা কোন্ একজন জ্যোতিষীর।

আবার দু'চারদিন গত হইলে, একদিন খবর পাওয়া গেল, ঐ লোকটির নিজের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে খুব বেশি অধিকার নাই,—ইনি যে শাস্ত্রের চর্চা করেন, তাহার নাম ভৃগু-সংহিতা। কোন্ সে পুরাকালে,—যে যুগে মানুষ নিজের বিদ্যার পরিচয় নিজেই জাহির না করিয়া তাহা চির-রহস্য যবনিকার তলে লুক্কায়িত রাখিয়া,—যাঁহা হইতে উত্তরাধিকারিত্বে বুদ্ধি, বিদ্যা, ধারাবাহিকভাবে পাইয়া আসিয়াছেন,—সেই গোত্রপতি, বংশপতি ঋষি নামেই নিজ পরিচয় মিলাইয়া দিতেন, সেই যুগেরই কোন 'ভার্গব' এই শাস্ত্রের প্রণেতা। জ্যোতিষ এবং ত্রিকালজ্ঞের দিব্যদৃষ্টি—এই দুইয়ে মিলাইয়া ভৃগু-সংহিতার এই 'কুণ্ডল্যাধ্যায়' বিরচিত। সম্পূর্ণ শাস্ত্র পাওয়া যায় নাই। ভারতের অধিকাংশ রত্ন-সম্ভারের মতই উহাও বৈদেশিক শাসন-যন্ত্রের তলে দলিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা দিয়া জীবৎ রাখিবার লোকের দৈন্য সুদূরাতীত বৌদ্ধযুগ হইতেই যে আরম্ভ হইয়াছিল।—এই লুপ্ত রত্নোদ্ধার হইয়াছে নেপাল রাজ্য হইতে। অল্প দিনের কথা,—বিগত মিউটিনির সময় এই সকল প্রদেশেরই এক ব্রাহ্মণ উভয়পক্ষীয় অত্যাচারের ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান,—ভৃগু-সংহিতা তাঁহারই সম্পত্তি ছিল। পলায়নকালে কিছু খোয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট পুত্র ও জামাতাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইনি সেই জামাতা, ইঁহার অংশে শুনা যায় না কি,—চারি লক্ষ কুণ্ডলী আছে। নিজের গৃহে রক্ষিত জন্ম-পত্রিকা হইতে রাশিচক্রটি ছকিয়া লইয়া গিয়া উঁহাকে দিলে, প্রত্যেক লগ্নচক্রের সূচীপত্র মিলাইয়া ঠিক্ উহারই প্রতিরূপ আর একটা রাশিচক্র সেই বহু পুরাতন অতীত যুগের লক্ষ লক্ষ কুণ্ডলীর মধ্য হইতে পাওয়া যাইবে। তাহারই সহিত শ্লোকচ্ছন্দে সেই ভাগ্যচক্রের অধিকারীর ভাগ্যফললিখিত পূর্ণ কুণ্ডলীও পাওয়া যায়। অতীতের কথা ইহাতে সংক্ষিপ্ত; বিশেষ বিশেষ ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুই প্রদত্ত থাকে; নতুবা ঠিকানা হইবে কেমন করিয়া? বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎই ইহার লক্ষ্য।

মানব-জীবনের ভাল মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের প্রত্যেক সমাচারটুকু, কোন্ স্থলে কোন্ গ্রহের অবস্থান-জনিত কি ফল, কোন্ দুঃখই বা অপ্রতিবিধেয়, কিসেরই বা প্রতিবিধান সম্ভব, সে প্রতিকার কি?—এ সকল কথাই শরণাগতের জন্য ঋষিদ্বয়,—ভৃগু ও শুক্র পরস্পর কথোপকথনচ্ছলে জানাইয়া দিতেছেন। অতীত জীবনের কোন্ মহা ভ্রান্তি ইহজীবনের এই সমাগত অশান্তিকে বরণ করিয়া আনিয়াছে, কি উপায়েই বা সহজে লঘুচিত্ত, মানব-জীবের সেই ভুল ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত সমাধা হইয়া অতীত পাপের ক্ষালন ঘটিতে পারে, এইদিকেও ইঁহারা কৃপা-কটাক্ষ করিতে ভুলিয়া যান নাই। পরিশেষে এই জীবনান্তে কোন্ গতি লাভ হইবে, তাহারও আভাস দিয়াছেন। আরও একটা কথা,—ভৃগু-ঋষি জন্মান্তরের মহাপাতক বলিয়া যে পাপের উল্লেখ করিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই সে পাপের আভাষ কতকটা এজন্মেও লক্ষিত হয়।

ব্রজরাণী ভবঘুরে গণৎকারদের হাত দেখাইয়া অনেক পয়সা খরচ করিয়াছে,—কিন্তু ভাল জ্যোতিষীর খবর এ পর্য্যন্ত পায় নাই। একবার কলিকাতাতেই একজন নামজাদা ভাগ্য-ব্যবসায়ীর শুভাগমন ঘটিয়াছিল। সাহেবী-ধরণে ঘড়ী ধরিয়া তিনি 'ভিজিটার'দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। হাত দেখিয়া ব্রজরাণীকে তিনি তাহার বন্ধ্যাত্ব মোচনার্থ কবচ প্রদান করেন। পাঁচ সাত শত টাকা তাহারই যাগ যজ্ঞে খরচ হয়। কিন্তু ফল? ফলানুসন্ধানে ভগবানের নিষেধ আছে। এবার এই অভিনব ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া পরম পুলকিত হইয়া ব্রজরাণী পত্র লিখিয়া মায়ের নিকট হইতে কোষ্ঠি আনাইল; এবং অরবিন্দকেও তাহারটার জন্য ধরিয়া পড়িল। অরবিন্দ প্রথমে উপেক্ষায় কাটাইয়া, শেষে নাছোড়বান্দা দেখিয়া কহিল,—"কেন, ও-সবের মধ্যে যাচ্চো!—কি বল্‌তে কি বল্‌বে,—শেষে কেঁদে কেটে খুন হবে। না হয় তো শাস্ত্রটার উপরেই শ্রদ্ধা হারাবে;—কাজ কি।"

ব্রজরাণী কহিল, "আমি শ্রদ্ধা হারালে আমিই হারাবো,—শাস্ত্র তো আর তাতে খোঁড়া হ'য়ে যাবে না। তুমি লিখে দাও তো।"

"মুখের উপর কি লিখে দেবে, তার কি কিছু ঠিক্ আছে ?"

ব্রজরাণী অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "কিই বা আর এমন বল্‌বেন ?"

অরবিন্দ কহিল, "ভৃগু-ঋষি তো আর অরবিন্দ বোস্ ন'ন্। শ্রীমতী ব্রজরাণীকে তাঁর ভয়ই বা কিসের ? যদি কিছু ব'ল্‌বার থাকে, না বল্‌বেনই বা কেন ?"

ব্রজরাণী ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমান-ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "যদি কিছু বল্‌বার থাকে, বল্‌বেন। সে শোন্‌বার সৎসাহস আমার না থাক্‌লে আমি ওঁর দোরে যাচ্চিই বা কেন ? সংসারে যারা মন রেখে কথা কয়, সে রকম লোকের তো 'আকাল' পড়ে নি।"

অরবিন্দ একটুখানি মুচ্‌কিয়া হাসিয়া বলিয়া গেল, "তবে তুমিই উচিত কথা শুনে নাও। আমার ঢের শোনা হ'য়ে গিয়েছে।"

প্রথমে সংক্ষেপে শুনিয়া, নিজের কি না বুঝিতে হয়। তাহাই লিখিয়া আনা হইল। তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—"উচ্চকুলোদ্ভব কায়স্থ-কন্যা, পিতা ধনী, স্বামী মহাধনী। পিতা মৃত, মাতা ও তিন ভ্রাতা বর্ত্তমান। এক ভ্রাতা কৃতী। শ্বশুর শ্বশ্রূ মৃত। পুত্রহীনা। স্বামী বিদ্বান্, সচ্চরিত্র; কিন্তু তথাপি ইনি একাকী 'পতিপ্রিয়া' নহেন। স্বামীর পুত্র বিদ্যমান। জন্মান্তরের মহাপাপের ফলে ইনি নিজে পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিতা। প্রতিকার ? আছে; কিন্তু প্রায় অপ্রতিবিধেয়।"—নকলের জন্য বলা হইল।

জীবন-রহস্যের এই ইঙ্গিতটুকু ব্রজরাণী বারবার করিয়া পাঠ করিল। যতবারই পড়িল, ততবারই ভিতরটা তাহার লজ্জায়, ভয়ে চমকিত হইয়া উঠিল। অভিমান, অপমানের উষ্ণতাও মনের মধ্যে দেখা না দিল যে, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। 'একক পতিপ্রিয়া নহেন!' সে তো ব্রজরাণী সেই বিবাহের দিন হইতেই জানে। এ আর নূতন কথা কি তিনি

জানাইয়াছেন? মনোরমা-সুন্দরীই যে পতির ধ্যানের কেন্দ্র, প্রেমের উৎস, উঁহাকে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিয়াই যে স্বামী তাহার আজ হৃতসর্ব্বস্ব। সেই রিক্ত অন্তরের বিরাট্ শূন্যতার ফাঁকটা দিয়া আজ এই দীর্ঘকালেও যে হতভাগী ব্রজরাণী তাঁহার নিকটেও পৌঁছিতে পারে নাই, সে কি বুঝিতে কিছু বাকী থাকে? এই দুঃখটাই যে নারী-জীবনের চরম দুঃখ, সে না কি সেই সহৃদয় ঋষি-বুদ্ধির আগোচর? স্বামী যে বাহিরে উঁহার সম্বন্ধে অত বড় নির্লিপ্ত, ইহাতে জগৎ ভোলে ভুলুক, রাণীও কখন ভুলে নাই, আর যাঁদের চোখে ধূলা দেওয়া যায় না, তাঁরাও ভুল করেন না।

কিন্তু এ লইয়া নালিশ মোকর্দ্দমা চলে না। 'অপ্রিয়সত্য' সহ্য করিবার সৎসাহস দেখাইয়া এ অস্বস্তি নিজেই সে কিনিয়া আনিয়াছে। নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল, যে, এতদিনেও যখন উঁহার প্রিয়তমাকে উনি পূজা করিতে ছাড়িলেন না, তখন আমি কাঁদিতে বসিলেই কি আর উঁহার মন্ত্রবিস্মৃতি ঘটিবে? তারপর সহসা কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া এই কথা ভাবিতে লাগিল, 'আচ্ছা, সত্যই যদি উনি তাকে অত ভালই বাসেন, তা' হ'লে এতটা কাল কি ক'রে এমন নিঃসম্পর্ক হ'য়ে রয়েছেন? যাকে ভাল-বাসিব, দুঃখে তাকে ডুবিয়ে রাখ্‌বো,—এ আবার কেমন ভালবাসা রে বাপু? দণ্ডবৎ করি অমন ভালবাসার পায়ে। বিধাতা আমায় 'পতির প্রিয়া' না ক'রে যে অপ্রিয়া ক'রেছেন, সে রক্ষা করেছেন!"

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বন্ধ্যাভূতাপি সা বালা পূর্ব্বপক্ষপ্রভাবতঃ।

—ভৃগুসংহিতা।

এত সাধের ভৃগুসংহিতা,—এ সংহিতা পাঠ করিতে করিতে ব্রজরাণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল।—শত শত অতীত বর্ষের কীটদষ্ট, পুরাতন জীর্ণ পুঁথির পাতায় এই যে মানব-জীবনের ফলাফল,—কোন্ সে অজ্ঞাত লেখক লিখিয়া গিয়াছেন,—বহু শতাব্দী অন্তে এই বর্ত্তমান যুগের, এই বঙ্গদেশীয়া ব্রজরাণীর জীবনকথার সহিত কেমন করিয়া এ এমন সম্মিলন সাধন করিল? এ কি শুধু জ্যোতিষ-গণনা? অথবা, ত্রিকালজ্ঞের ত্রিলোকবিজ্ঞাত জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের, ইহপর সমস্ত লোকের চিরযুগ এবং যুগান্তরের গর্ভশায়ী সমুদায় মানব ও মানবীর জীবন-রহস্য আলেখ্য লেখনের ন্যায় চক্ষে দেখিয়া চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন? স্থূল প্রত্যক্ষ দর্শনেও এ শাস্ত্রের অপূর্ব্বত্ব যে অস্বীকার করিবার নহে। যদি শুদ্ধমাত্র জ্যোতিষ-বিদ্যারই এ ফল হয়, তবে যাঁদের হস্তে গণনা-শাস্ত্রে এতবড় উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁদের শক্তিকে প্রণিপাত! পূর্ব্বজন্মে ইঁহারা রাজারাণী ছিলেন। পরপুত্রের প্রতি অন্যায়াচরণের ফলে এজন্মে ইহার মহাবন্ধ্যাত্ব প্রাপ্তি! কৃচ্ছ্রসাধ্য পূজাজপাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তান লাভ ঘটিলেও, তাহার জীবিত থাকা সম্ভব নয়। এমন কি. পোষ্য-সন্তানের পর্য্যন্ত ইঁহার সংস্পর্শে আয়ুক্ষয় সম্ভাবনা।

ব্রজরাণীর শিথিল মুষ্টি হইতে বিচ্যুত হইয়া ধর্ম্মাধিকরণের মহা বিচারকের বিচারের রায় লেখা দণ্ডপত্রখানা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। নিজে সে যেন

সুদূর জন্মজন্মান্তরের পরপার হইতে ভাসিয়া আসা কোন্ সে এক অজ্ঞাত জীবনের বিস্মৃতির অতল তলে তলায়িত অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়া যেন তাহারই তলায় তলাইয়া যাইতে লাগিল।—কবেকার সে যুগ? ইতিহাসের কোন্ পৃষ্ঠায় তাহার স্থান? কোথাকার সে এক ক্ষুদ্র রাজ্য, অথবা বৃহৎ সাম্রাজ্য? গত জীবনে কোন্ প্রদেশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল? যে মহারাষ্ট্রীয় মেয়েদের নিজস্ব সুশ্রী পরিচ্ছদ সুন্দর স্বাধীন ভাব ও নির্ব্বিকার শান্ত মুখের দিকে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, হরিদ্রারঞ্জিত উৎকল নারী 'তকি ঝুম্মকওয়ালি, বেহার প্রদেশীয়া—অথবা দোষে গুণে, পরানুকরণে নিজের নিজস্ব পর্য্যন্ত বর্জ্জনোন্মুখী বঙ্গবধূই সে আগের জন্মেও ছিল?—কি ছিল? কোথায় ছিল? হিন্দু না মুসলমান, পার্শী, জৈনী, শিখ অথবা খৃষ্টীয়ান্? কোন্ জাতি, কোন্ গোত্র, কোন্ ধর্ম্মী, কোথায় বাস? তারপর আবার সে ভাবিতে লাগিল, 'আচ্ছা সে জীবনেও কি ইনিই সেই রাজা ছিলেন? আমরা কি সে দিনেও এম্নি দুই সতীন ছিলাম না কি? সে বারে নিশ্চয়ই আমি দো-রাণী ছিলাম? তা' না হইলে এজন্মেও উনি আমাকেই ভালবাসিতেন। তবে জন্মান্তরে বোধ করি সো-রাণী মনোরমা আমায় স্বামী হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেই সর্ব্বস্ব ভোগ করিয়াছিল,—তাই এ জন্মে আমাকেই তার সর্ব্বনাশের হেতু হইতে হইয়াছে! 'দো' হইলেও ঢেঁকিশালের মহলটা দখল করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু মহারাজের মনটা? সেটা আর আমি কেমন করিয়া পাইব? দেখ, এই জন্যই কথায় বলে যে, 'স্বভাব যায় না মলে!' যে যার প্রিয় থাকে, তা সে একজন্ম পরেও থাকে। আচ্ছা, তবে যে 'পরপুত্র' পীড়নের পাপটা ভৃগুমুনি আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন, তা আমি যদি দুর্দ্দশাপন্না 'দো' রাণীই ছিলুম, তো সতীনের ছেলের পীড়ন কেমন করে আমি করতে গেলুম শুনি? হিংসা—তা হয় ত মনে মনে করে থাক্‌তে পারি। এ জন্মেও তো অনেক সময়—দূর হোক্ গে, এজন্মের কথা আবার এর মধ্যে আনি কেন? এজন্মে এমন কিছু মহাপাতক

আমি করি নি, যার জন্য নিজের ছেলে দূরের কথা,—পরের ছেলেকেও আমার ছোঁয়াচে মরে যেতে হয়। আমার জন্মান্তরের পাপ রয়েছে বলেই ত আমায় এই অশান্তির মধ্যে আস্‌তে হয়েছে। নইলে, আমি তো আর স্বয়ম্বর-সভায় দাঁড়িয়ে আমার জন্মান্তরের মহারাজার গলায় স্বয়ম্বরের মালা পরিয়ে দিই নি।

"উঃ জন্ম জন্মান্তর ধরে এই সতীনের জ্বালা! আবার আস্‌ছে জন্মেও এম্‌নি তাল ঠোকাঠুকি চল্‌বে না কি? আমি তা হোলে এবার মরে আর যা হই; মানুষ আর হচ্চি নে। ভৃগু-ঋষি এত বল্‌তে পারেন, আর কি কর্‌লে মেয়েমানুষ জন্মটা ঘুচে গিয়ে আস্‌ছে জন্মে অন্ততঃ পুরুষ হ'য়ে জন্মাতে পারা যায়, এই কথাটাই কি বল্‌তে পারেন না?"

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

ইত্যুক্তবন্তং সা পুত্রং মূর্দ্ধ্নি পস্পর্শ পাণিনা।
তস্যাঃ স্পর্শেন তেনাসৌ দুঃখদৌর্ভাগ্যসঙ্কটম্।
জহৌ প্রাবৃড়্‌ঘনাসাদাদ্ গ্রীষ্মতাপমিবাচলঃ॥

—যোগবাশিষ্ট রামায়ণ।

অজিত যেদিন বাল্য-চপলতার বশে চারিদিকের কাণাঘুষা হইতে জাত সন্দেহটাকে ঠাকুরমার মুখ হইতে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া লইবার বড় আশাতেই তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া ছাদে তুলিয়াছিল, সেদিন তাহার কাঁচা-সোণার মত কচি প্রাণে এতটুকু সন্দেহের কষ থাকিলে হয় ত তেমন কাজ

করিত না। কিন্তু জ্ঞাতে হৌক্, অজ্ঞাতে হৌক্,—অজগরের ঘাড়ে পা পড়িয়াছে, আর কি রক্ষা আছে!

প্রথম সে খানিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। তারপর হঠাৎ,—ছাদের যে দিক্‌টায় দিনের আলো চলিয়া গিয়াছে,—অথচ জ্যোৎস্নার আলো তখনও নামিতে সময় পায় নাই বলিয়া অন্ধকার ছায়া করিয়া আছে,—সেই দিকে চলিয়া গেল। উঁচু আলিসার একটা কোণ ঘেঁসিয়া একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ নীচের দিক্ হইতে উঠিয়া আসিয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়াছে, তাহারই উপর সে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। তারপর অনেকক্ষণ তাহার কোন সাড়া শব্দই রহিল না। নিজের কোন কথাই অজিতের মনে তখন স্থান পাইতেছিল না। শুধু এইটুকুই মনে রহিল যে, সে যেন কেমন করিয়া আজ তাহার পাথেয় হারাইয়া ফেলিয়াছে! সমস্ত বুক জুড়িয়া অত্যন্ত কঠিন একটা বেদনা সমুদায় প্রাণটাকে মোচড় দিতে লাগিল; এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন তাহার ভিতর বাহিরের সমস্ত চেতনাটাকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অসাড়তার একটা সূক্ষ্ম আবরণ তাহার উপর চাপা পড়িয়া যেন তাহার চোখের দৃষ্টি, কাণের শোনা এবং ত্বকের স্পর্শ পর্য্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য তাহার অনুভূতির অতীত করিয়া দিল। তারপর যখন সে আচ্ছন্ন ভাবটা দূর হইল, তখনও তাহার মনে হইল, ক্লান্তি একটা ভারের মত তাঁহার সমস্ত শরীরটাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে। মাথার উপরে তখন সাদা মেঘের পুঞ্জ খণ্ড খণ্ড হইয়া দূরে দূরে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। হাপরে পোড়া সোণার মলিন পাতের মত দীপ্তিহীন চাঁদের উপরে যেন স্বর্ণকারের হাতের চক্‌চকে শাণ-পালিস পড়িয়া তাহাকে নূতন তৈয়ারী গহনার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছে। চাঁদকে বেড়িয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা চন্দ্রমণ্ডল পড়িয়াছে, রামধনুর মত সেটার বর্ণচ্ছটা চাঁদের ঔজ্জ্বল্যের আশে পাশে ঠিক্ যেন পালিস-পাতের 'ব্রেস্‌লেটের' গায়ে চুণি পান্না বসানর মত মনে হইতেছে। আকাশের গায়ে শতাবলী হারের মত স্তবকে স্তবকে নক্ষত্রমালা ঝুলিয়া আছে। ছাদের

মাটির উপরে সেইদিকে চাহিয়া অজিত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দূরের অদূরের মন্দিরের মঙ্গল-আরতির বাদ্যধ্বনি পৃথিবীর বুক চিরিয়া চিরিয়া একটা কাতর কান্নার মত যেন সেই চন্দ্রে নক্ষত্রে বিভাসিত আকাশের বুকের দিকেই ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিয়া আসিতে লাগিল।

পড়া শোনায় অজিতের অখণ্ড মনোযোগ। এই ক্ষুদ্র পণ্ডিতটি এপাড়ার ছোট বড় সকলের আদরে আদরেই আজ এত বড়টি হইয়া উঠিলেও, এখন বিদ্যার খাতিরে সে সবার কাছেই সম্ভ্রমের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণও ক্ষুদ্র শিশুর এত অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ ও অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসেন যে, এই বয়সে এত বিদ্যা হইলে, বাঁচিবে সে কোন্ অবিদ্যার জোরে? সেই অজিত এবার বাড়ী ফিরিয়া আসন্ন পরীক্ষার কথাও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কোলের উপর বই রাখিয়া সে জানালার বাহিরে কোথায় কোন্ অনির্দ্দেশ্যের অভিমুখে চাহিয়া থাকে। তাই বলিয়াই কি সে সেই শেওলা-ধরা, পাড়-ধসা, আধমজা পুকুরে কলমীদলের মধ্যে পান-কৌড়ির ডোবা ওঠা, অথবা কলমী-শাকের বুকের মাঝখানে ডাঁটা তুলিয়া একটা যে ঐ রক্ত কহ্লার সবুজ সাড়ীর আধ-ঘোমটা দেওয়া পল্লীবধূর নোলকচুম্বিত রাঙ্গা ঠোঁটের একটী ফোঁটা সরস হাসির মত দুলিয়া উঠিয়াছে, উহারই নাচন কোঁদন এ সব কিছু দেখিতে পায়? কিছু না। জানালার ফাঁকে ঐ যে শীতকালের ফ্যাকাসে আকাশের খানিকটা দেখা যাইতেছে, এই বালকটির মনের মাঝখানে যে আকাশটা আছে, সেটাও ঠিক্ এমনই শূন্য এবং বিরসতার ধূসর রংয়ে এই রকমই রঞ্জিত। তা এমন মনের ফাঁকে যেখানে আপনার গরজের উপরেই ফাঁকি চলিতেছিল, সেখানে চোখের তারা দু'টা যে ফাঁকা মাত্রই দেখিবে, সে আর বিচিত্র কি? এম্‌নি ব্যথা জড়, নিরুদ্যম চিত্ত লইয়া শুদ্ধ হইয়া বসিয়া জীবনের সব চেয়ে অমূল্য সুযোগকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল।

সেদিন জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে স্কুলের ছুটী ছিল। মনোরমা ঘরে

ঢুকিয়া দেখিল, তক্তপোষের উপর বই ছড়াইয়া এবং তাহারই মধ্যে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া অজিত বসিয়া জানুর উপর ইংলণ্ডের ইতিহাসখানা খুলিয়া রাখিয়া অন্যমনে একদিকে চাহিয়া আছে।

মনোরমা ডাকিল, "অজিত!"

অজিত একটু চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিল। তারপর যেন নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া, ইতিহাসের নোট-লেখা খাতা ও পেন্‌সিল টানিয়া লইল; এবং পরিত্যক্ত বইখানা পড়িবার উপক্রম করিয়া, মুখ তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। সেই মুখ আর সেই হাসি দেখিয়া মনোরমার বুকের ভিতরের রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল। কি বিষণ্ণ ও শুষ্ক মুখ! আর কতই করুণ সেই হাসিটুকু! যে হাসি শুকতারার মত উজ্জ্বল, আবার শিশিরের মতই নির্ম্মল,—যে হাসিতে মনোর চোখে বিশ্বের আলো ফুটিয়া উঠিত, ঝঙ্কারে পাখীর কলকাকলী, বীণার সুর, কর্ণের তারে তারে ঝঙ্কার দিত।—শুধু এই হাসির আলোটুকুতেই যে সে তাহার প্রাণের অন্ধকারকে বহুদূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। সে চাঁদ যদি রাহুগ্রাসে আজ পতিত হয়, তবে এই হতভাগিনী মা বাঁচে কি দেখিয়া?

ছেলের কাছে তক্তপোষের একধারে বসিয়া পড়িয়া মনোরমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "কাশীর চিঠিপত্র কিছু এলো রে?"

অজিত কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, আসে নাই। কিছু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া মা কহিল, "তোর ঠাকুর-মায়ের অসুখ দেখে এলাম, তারপর চিঠিতেও অসুখ বাড়ার খবর পাওয়া গেল; আর তো কোন খবরই নেই। কেমন আছেন, কে জানে!"

অজিত কিছুই না বলিয়া ইতিহাসের বইখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া পড়ায় মন দিল। কিন্তু তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখা না গেলেও, মনোরমার সন্দেহ হইল, তাহার সব মুখখানাই রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, এবং চোখ দুইটা জলে ছলছল করিতেছে।

তখন মনোরমার হঠাৎ মনে হইল, হয় ত ঠাকুরমার অসুখের খবর অজিতের এই চঞ্চলচিত্ততার হেতু। ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভালই আছেন হয় ত। তুই তো তাঁর চিঠিখানার জবাব দিয়েছিলি ?"

অজিত জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল ; তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—"না।"

নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া মনোরমা কহিল, "সে কি রে, ঠাকুরমার চিঠির জবাব দিস্ নি ! ভুলে গিয়েছিলি বুঝি ? তা' কাল মনে ক'রে একখানা লিখে দিস্।"

অজিতের নিকট হইতে বাক্যে বা ইঙ্গিতে কোনই উত্তর না পাইয়া, মনোরমা অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া, অজিতের মুখপানে চাহিয়া দেখিল, সে দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া স্থির, নিশ্চল দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া আছে। অগ্রাণের এই শীতের হাওয়ায়ও তাহার কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা জমিয়া উঠিয়াছে।

এইটুকু ছেলের পক্ষে এতবড় অসম্ভব আত্মদমনের প্রয়াস মনোরমার বিস্ময়কে যেন কতকটা বেদনায় ও কতকটা বিরক্তির দিকে টানিয়া আনিল। সে তখন কাছে আসিয়া, নিজের আঁচল দিয়া কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতে দিতে একটুখানি অপ্রসন্ন-স্বরে বলিয়া ফেলিল, "চব্বিশ ঘণ্টাই যে অমন ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকিস্, তোর হ'য়েছে কি অজিত ? পড়াশোনা পর্য্যন্ত ত ছেড়ে দিচ্ছিস্ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে এতটুকু বাতাসের দম্‌কা লাগিলেই যেমন বৃষ্টি আসে, তেমনি মায়ের কথায় অজিতের চোখ দিয়া নিঃশব্দে বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অশ্রু গোপন চেষ্টায় আবার সে 'নোট'-লেখা খাতাখানা মুখের কাছে উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহারই আড়ালে মুখ লুকাইল। কিন্তু চোখের জল যে থামাইতে পারে নাই, বইয়ের আড়াল হইতে যে বড় বড় জলের ফোঁটা বুকের উপর ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল, তাহারাই সাক্ষ্য দিতে

লাগিল। শিলাবৃষ্টির শিলার মতই তাহা মনোরমার হৃদ্‌পিণ্ডে একটা করিয়া ঘা মারিতে লাগিল।

"অজিত! অজিত! এই বয়সে তুই আমায় এমন ক'রে পর ক'রে দিতে পার্‌লি রে?

এবার বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অজিত একবার উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিয়াই, তৎক্ষণাৎ আবার প্রাণপণ বলে সে আবেগ নিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু—

মনোরমা আঁচল দিয়া নিজের অবাধ্য চোখ দুটা মুছিয়া লইল। তার পর ছেলের চোখের উপরকার করাবরণ মোচন করিয়া তাহাকে বরাবরের মতই নিজের বুকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল।

"অজিত! মাণিক আমার! গোপাল আমাব! চুপ কর। বাবা রে! আমি সইতে পার্‌চি নে! তুই থাম্।"

মায়ের বুকে কিছুক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া শেষকালে ছেলে চুপ করিল বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক কান্নার রুদ্ধ উৎস তখনও মধ্যে মধ্যে তাহার শরীরটাকে গভীররূপে কুঞ্চিত করিয়া তুলিতে ছাড়িল না।

"ঠাকুমার জন্য মন কেমন করে? হাঁরে?"

ক্ষণকাল মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া যেন আত্ম-পরীক্ষান্তে সে সবেগে মাথা নাড়িল "না।"

"কাশী যাবার ইচ্ছা হয় না? ঠাকুমা বলেছেন আবার গ্রীষ্মের ছুটীতে আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।"

ছোট ছেলে ভূতের ভয়ে যেমন করিয়া মাকে জড়াইয়া ধরে, তেমনি করিয়া মার বুকে লুকাইয়া ভয়ত্রস্ত স্বরে অজিত বলিয়া উঠিল—"না মা, না, ওঁদের কাছে আমরা আর যাবো না।"

"কেন অজিত?" মনোরমার কণ্ঠে বিস্ময়ের সহিত উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল।—"কেন আর যাবি নে?"

আবার কিয়ৎক্ষণ দ্বিধায় ইতস্ততঃ করিয়া, অকস্মাৎ সঙ্কোচ কাটাইয়া ফেলিয়া, অত্যন্ত দ্রুতকণ্ঠে অজিত বলিয়া ফেলিল, "ঠাকুমা আমাদের ভালবাসেন ;—কিন্তু ও'ও তো বাবারই বাড়ী।" স্বরে তাহার নিদারুণ অভিমান ধ্বনিত হইল। ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। কর্ণমূল অবধি সমস্ত মুখখানা সূর্য্যরশ্মি বিভাসিত অপরাহ্ণ বেলার পশ্চিম আকাশের মত সমুজ্জ্বল লালের আভায় জ্বলিতে লাগিল।

মনোরমা ক্ষণকাল মূঢ়ের ন্যায় থাকিয়া তেম্‌নি বিমূঢ়ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর বাড়ী তাতে কি হয়েছে ?"

"বাবা যখন আমাদের ত্যাগ করেছেন, তখন তাঁর বাড়ীতে আমরা কিসের জন্য যাব ? বলিতে বলিতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া অজিত সবেগে উঠিতে গেল ; কিন্তু মনোরমা তাহার হাত ধরিয়া ছিল বলিয়া পারিল না। নিজের এই আকস্মিক আঘাতের সমুদয় বিস্ময় বিহ্বলতা ও বেদনা এক নিমেষের মধ্যে কাটাইয়া ফেলিয়া সে সহজ গম্ভীর গলায় ডাকিল, "অজিত !"

এ কণ্ঠকে অজিত চিনিত—মনে মনে ইহাকে সে অত্যন্ত সঙ্কোচ করিত। যতদূর তাহার পক্ষে সম্ভব সংযত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াই মায়ের পায়ের উপর নজর রাখিয়া জবাব দিল, "মা !"

"আমি বলছি, তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নি। বাপের আদেশ পালন করবার জন্য শুধু দূরে রেখেছেন। এ কথা তোমার বিশ্বাস হয় ?"

ধীরে ধীরে ভোরের শিশিরে আর্দ্র শুভ্র শেফালির ন্যায় অশ্রু-ধৌত নির্ম্মলতায় অজিতের শোণিতার্দ্র কাতর চিত্ত একটি মুহূর্ত্তেই জুড়াইয়া স্নিগ্ধ হইয়া গেল। বিদ্রোহী অন্তঃকরণ নিজের অপরাধের গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। মায়ের দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া অজিত মাকে প্রণাম করিল। এই মায়ের কথায় যেদিন অবিশ্বাস আসিবে, সে দিনের পূর্ব্বে এ পৃথিবীর আলো বায়ু অজিতকে যেন গ্রহণ করিতে না হয়। ঠিক্ এই কথাটিই বালক-অজিতের মুখে বা মনে না

আসিলেও, ঠিক্ এই কথাটিই মানুষ-অজিতের বুকের মধ্যে ছিল, একথা জোর করিয়াই বলা যায়।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

পিতা হি দৈবতং তাত দেবতানামপি স্মৃতম্।
তস্মাদ্দৈবতমিত্যেব করিষ্যামি পিতুর্ব্বচঃ॥

—রামায়ণম্।

সেই যে মনোরমা সেদিন নিজের সমস্ত ইতিহাসটা শুনাইয়া দিয়া অবশেষে বলিয়াছিল, "এখন সবই তো তুমি জান্‌তে পার্‌লে, লোকের কথায় নিজের মনকে আর খারাপ হ'তে দিও না। অন্যের পক্ষে যাই হোক্, তুমি যার ছেলে, তাঁর ছেলের পক্ষে বাপের উপর ওটুকু বিরুদ্ধ ভাব মনের কোণে আস্‌তে দেওয়াও অপরাধ। তিনি বাপের হুকুমে নিজেকে যে কতখানি সইয়েছেন অজু! আজ তুমি ছেলেমানুষ, বুঝ্‌বে না। কিন্তু আমি তোমায় এই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি বাবা,—বাঁচিয়ে রেখে ঈশ্বর তোমায় ছেলের বাপ হ'তে দিন, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে, এ কি ভীষণ ত্যাগ।" সেই যে অজিতের মনের মধ্যে দেবনির্ম্মাল্য-ধোয়া শান্তিজল ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, মনের সমস্ত অভিমানের কালী তাহার সেই জলের ধারায় ধুইয়া গিয়া তাহা যেন শিশির-ধৌত শতদলের মতই মুহূর্ত্তে বিকশিত ও সুবাসিত হইয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে একটা মধুর আবেগে অজিতের হৃদয় মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দিনান্তের সূর্য্যালোক তাহার ভবিষ্যতের আশাটাকে যেন স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তুলিল। কি সুন্দর পৃথিবী, কি আলোকোজ্জ্বল আকাশ বাতাস; সুগন্ধি

পুষ্পবাসে দেহ মনের সকল ক্লান্তি যেন হরণ করিয়া লইয়া গেল রে! এত শোভা এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল? .

যে মুসলমান ফকিরটা প্রায় প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে আসে, নিজের বাঁধা বুলি, "আল্লাকে নামকো চাউল, মহম্মদকো নামকো পয়সা, খোদাকো নামকো রোটি—দিলা দেগা, ভালা হোগা"—বলিতে বলিতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেই অজিত কোথা হইতে তিন লাফে আসিয়া তাহাকে একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া, আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে সমান ওজনে গালভরা হাসি লইয়া ফিরিয়া গেল।

ভক্তি এতদিন শুধু উপদেশের বাণীতেই নিবদ্ধ ছিল; আজ সে বাস্তব সত্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; তাই সমুদয় জগৎ-সংসারের উপর হইতেও যেন আবরণ খসিয়া গিয়াছে। চির-পরিচিত পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা অন্তর্হিত হইয়া গিয়া, পশুপক্ষী, গাছপালা, পথের জনতা, সকলই আজ আবার পূর্ব্বের মতই—কি তদপেক্ষাও অভিনবত্বে অপরূপ হইয়া উঠিল। এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্যসাগরে সে যেন ডুবিয়া ভোর হইয়া রহিল; এবং উচ্চ আশার রাগিণীতে বাঁধা তাহার মনোযন্ত্রের সমস্ত তারগুলা খুব উঁচু সুরেই ঝঙ্কৃত হইতে থাকিল। এই ভাবাবেশে 'মুংলী' গাইকে ও তাহার বাছুর 'বুধী'কে অনেক দিনের পরে সে খুব একচোট্ আদর করিয়া তাহাদের ইংরাজী কবিতার মুখস্থটা আদ্যোপান্ত শুনাইয়া দিয়া আসিল। 'রাখুদা' মরিয়া গেলে যে পাঁচু কৃষাণ তাহার স্থলে কাজে বাহাল হইয়াছে, তাহার সঙ্গে খানিকটা হিষ্ট্রী (ইতিহাস) সম্বন্ধে আপন মনে বকিয়া, অনেক দিনের অনাদৃত চন্দনাটার ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া তাহাকে "গোপীকৃষ্ণ কহো" বলাইয়া, এমন কি, গম্ভীরপ্রকৃতি দিদিমাকে শুদ্ধ যা-তা বলিয়া হাসাইয়া যেন এতদিনকার অকাল-গাম্ভীর্য্যের শোধ তুলিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই সঙ্গে নীরবতার নৈষ্ঠুর্য্যে হানাবাড়ীর মত থমথমে সমস্ত বাড়ীখানার ঘনীভূত বিষাদ বক্ষে যেন এক মুহূর্ত্তে শরৎকালের লঘুগতি পুঞ্জ মেঘের মত কোথায়

উড়িয়া চলিয়া গিয়া, তাহারই দিকে দিকে পুলকোচ্ছ্বসিত শিশু-কণ্ঠের স্বর্ণ-বীণার আলোকশ্রুত সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে দিনের সমস্ত পড়াশোনায়, আহার নিদ্রায় কি অসীম আগ্রহ, কি মধুর শান্তিই বর্ষিত হইতে লাগিল। তার পর এই সকল আগ্রহ উদ্দীপনার ভিতরে ভিতরে বুকের মধ্যে যে একটা অনুশোচনাপূর্ণ আত্মগ্লানি প্রবাহিত হইতেছিল, সেটাকে লইয়া সে যখন ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেল, তখনি প্রবল আত্মধিক্কারে সমস্ত প্রাণটা তাহার যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া আসিল। পিতার এতখানি মহত্ত্বকে ভুল করায়, নিজের মনটা যে কতখানি কদর্য্য, কতখানি কুৎসিত, তাহারই পরিমাপ করিতে গিয়া লজ্জায়, ঘৃণায়, সে যেন মরিয়া যাইতে লাগিল; এবং যে মা তাহাকে এই অধঃপতনের পথ হইতে ফিরাইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে সে বারংবার প্রণাম করিল। রাত্রে বিছানায় শয়ন করিতে গিয়া, মাকে পূর্ব্বের মত জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার বুকের ভিতর একবার ঢুকিয়া শুইল। ছেলের মনের ভাব বুঝিয়া মনোরমা শান্ত-চিত্তে একটু হাসিল এবং তাহার বক্ষ মথিত করিয়া একটি দীর্ঘ তপ্তশ্বাস উত্থিত হইল।

ষট্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

চিতা চিন্তা সমাখ্যাতা চিন্তা বৈ বিন্দু'না'হধিকা।
চিতা দহতি নির্জ্জীবং সজীবো দহ্যতেঽনয়া॥

বাজপড়া তালগাছ যেমন বাহিরে স্থির থাকিয়া নিঃশব্দে পুড়িয়া যায়, প্রবল অভিমানের আগুন বুকের মধ্যে জ্বালাইয়া লইয়া ব্রজরাণীও ঠিক্ তেম্নি করিয়া রহিল। এ অভিমান কাহার উপর? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে

সে নিজেই বোধ করি সব চেয়ে বিপদে পড়িত। মনের এই যে নৈরাশ্য ও বেদনা, এবং ইহার ফলে প্রসূত এই যে দুর্জ্জয় অভিমান, ইহার লক্ষ্য যে কে, সে কথা হয় তো সে নিজেও ভাবিয়া দেখে নাই। তবে খুব সম্ভব, ভৃগু-ঋষিই ইহার মূল। তাঁহার ব্যবস্থা-পত্রখানা ফিরিয়া ফিরিয়া যতবারই পড়িল, ততবারই যেন সেখান হইতে হাজারটা ভীমরুল উড়িয়া আসিয়া সহস্রটা বিষাক্ত হুল ফুটাইয়া দিয়া, তীব্র বিষের যন্ত্রণায় তাহার শরীর মনকে বিষাক্ত করিয়া দিল।

নিজের নিঃসহায় অবস্থায় অস্থির হইয়া পড়িয়া ব্রজরাণী স্বামীর কাছে দিনে অমন পঁচিশ বারও নিষ্ফল নালিস করিয়া করিয়া তাঁহার মুখের বিপুল ঔদাস্যে এতটুকু মাত্র পরিবর্ত্তনের রেখা বদল করিতে না পারিয়া অভিমানে অধীর হয়। এবার কিন্তু নিজের নিঃসঙ্গাবস্থাতে কতকটা শান্তি লাভ করিয়া সে নিজের ঘরের বিছানা এমন করিয়া দখল করিল যে, যে অরবিন্দের মনটাকে দুই হাতে ধরিয়া নাড়া দিলেও তাহা নড়ে কি না বলিয়া সন্দেহ জন্মে, সেই মানুষেরও হঠাৎ একদিন এই নির্লিপ্ততা নজরে ঠেকিয়া গেল। বাহিরের ঘরে হয় বন্ধুবান্ধব লইয়া তাস পাশার আড্ডা চালান, অথবা খবরের কাগজ ও বইয়ের গাদা লইয়া তন্মধ্যে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া থাকা, ইহাই অরবিন্দের জীবন-যাত্রার চিরাভ্যস্ত পাথেয়। এখানে বন্ধুর সংখ্যা বেশী নয়।

বই কাগজই-একমাত্র সঙ্গী। এঁদের আশ্রিতবর্গের সঙ্গিহীনতা কখনই উপলব্ধি হয় না। নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে নির্ব্বাচন করিয়া লইলেই সৎ, অসৎ হাস্যরসিক, গম্ভীর প্রকৃতিক, আস্তিক নাস্তিক, সর্ব্বপ্রকারেরই সহচর পাওয়া যায়। তথাপি ইহারই ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ মানুষের মন কোন একটা সময় হয়ত জীবন্ত একটা অতি সাধারণ মানুষের বৈচিত্র্যবিহীন একটু-খানি সাহচর্য্যের লোভে এমন চঞ্চল হইয়া উঠিতে পারে, যখন স্বদেশীয় অথবা বৈদেশিক মহামহোপাধ্যায়গণের আশ্চর্য্য গুণগরিমা তাহার চিত্তকে শান্তি দিতে পারে না।

অরবিন্দ বই ফেলিয়া একা বসিয়া বসিয়া শরতের কথাই ভাবিতেছিল। তাহাকে মনে করিতে মনের মধ্যটা সুখের আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। আবার তাহার সহিত এই চির-বিচ্ছেদের স্মৃতি মনে জাগিয়া চিত্তকে পীড়িত এবং ব্যথিত করিয়াও তুলিতেছিল। একটি একটি করিয়া কতদিনের কত কথাই মনে আসিল। যেদিন নিতাইএর সঙ্গে 'কনে' দেখিতে সে বর্দ্ধমানে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া শরতের শ্বশুরবাড়ী গিয়া শরৎকে বলে, "ঐ মেয়েটা যদি তোদের বউ হয়, তোর নিশ্চয় খুব পছন্দ হবে। অমন বউ কখ্খন আর পাবি নে, তা আমি এই তোকে ব'লে দিচ্চি।"

শরৎ দুষ্টু হাসি হাসিয়া, বলিয়াছিল, "বউএর উপর যদি তোমার চাইতে আমার দাবী বেশি ক'রে করিয়ে দাও, তা'হলেই আমি এই ঘট্‌কালী করি।"

অরবিন্দ অবশ্য তখনই এই সর্ত্ত আগ্রহের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল,—বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই। কিন্তু তাহাদের জীবনে এ অঙ্গীকারকে তাহাদের অন্তর্য্যামী যে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই কথাটাই শুধু আজ বলিয়া নয়, অনেকবারই অরবিন্দের স্মরণে আসিয়াছে। আজ আবার তাহাই মনে করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হইল। আর একটা দিনের কথা,—ব্রজরাণীকে বিবাহ করার পর, দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভে, তৃতীয়বার একজামিনে ফেল্ করিয়া, সে যখন পিতার আদেশে পড়া ছাড়িয়া চাকরী আরম্ভ করিল, এবং বধূকে লইয়া হাবড়ার বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, তখনকার তাহাদের কি একটা ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, শরৎ একদিন কঠিনকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল, "তার সেই দুর্দ্দশা ক'রে একে যে এমন মাথায় তুলে নাচাচ্চো, জিজ্ঞাসা করি, অধর্ম্মেরও কি একটা ভয় হয় না?" অরু তখন হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, "তা'হলে তোর মতে, তার যখন দুর্দ্দশা করেচি, অতএব এরও তাই করা উচিত,—এই না? আরব্য উপন্যাসের বাদ্‌শার মতই দেখছি তোর মনটা! সে ভদ্রলোক তার সব ক'টা বউএরই এক দশা করেছিল;—রাত্রে বিয়ে এবং সকালে খুন! এক ক্ষুরে মাথা

মুড়ানোর চাইতেও একটুখানি বেশি।"—শরৎ বলে, "না, তা আমি বলছি নে, যে, একেও তুমি তার মতন ত্যাগ করো। কিন্তু তা ব'লে একে তুমি যদি এমন করেই মাথায় তোলো ;—তা'হলে তার প্রতি তোমার ব্যবহারটাকে ইচ্ছাকৃত,—অতএব মনুষ্যত্বের বিরোধী ব'লে—লোকের মনে সন্দেহ আসবে যে !"—অরবিন্দ সে কথার কণ্টকটুকু স্বীকার করিয়া লইয়া প্রতিপ্রশ্ন করিল, "একে আমি পায়ে ফেলে রাখলে, তার দুঃখের একচুলও কি তফাৎ হবে ?"—"তা হবে না, কিন্তু—" "তা'হলে অনর্থক আমার পুণ্যের ভরাখানা ভরিয়ে তোলায় লাভ ?"

এই পর্য্যন্ত আলোচনার পর শরৎ হঠাৎ গভীর উচ্ছ্বাসে "দাদা গো, তোমার পায়ে পড়ি, অন্ততঃ আমায় দেখিয়েও তুমি ওকে একটুখানি কম ভালবেসো ;—ওগো, আমি যে কিছুতেই সইতে পারি নে—" এই কথা বলিয়াই কাঁদিয়া উঠিয়া, মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজিতে গুঁজিতে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে কথাও অনেকবারের মত আবার ফিরিয়া মনে আসিল। আরও কত দিনের কত কথা। এমনি করিয়া শরতের স্নেহময়ী স্মৃতি বুকের মধ্যে ভরিয়া লইয়া, তাহাকেই নাড়িয়া চাড়িয়া সে অনেকখানি সময় কাটাইয়া দেয়। স্মৃতির মধ্যে তন্ময় হইয়া থাকা তাহার তো আজিকার অভ্যাস নয়। এই করিয়াই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলা—যেগুলা শুধু বাস্তবেরই প্রধান উপভোগ্য—সেইগুলাই কাটিয়া গিয়াছে। আজ তো তবু তাহার পুরাতন খাতার খালি পৃষ্ঠাগুলা সমস্তই প্রায় ভরা।

শীতের দিনের মেখলা বড় ক্লান্তিকর,—অস্বস্তিতে শরীরের সঙ্গে মনটাকেও সে যেন ঝাপ্‌সা করিয়া রাখে। ঘরের মধ্যে আলোর অভাব ক্ষণে ক্ষণেই ঘটিতেছিল, এই বয়সেই ক্ষীণদৃষ্টি, শিরঃপীড়াগ্রস্ত অরবিন্দের নজর বইএর লেখায় বাধিত হইতে লাগিল। চিন্তাও ক্রমে গুরুভারগ্রস্ত বোধ হইল। বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই, বৃষ্টি-অধ্যুষিত রাজপথ ও পথিপার্শ্বের ক্লেদাক্ত আর্দ্রতা তাহার ভারাক্রান্ত চিত্তটার উপর যেন গোযান-চক্রের মথিত

কর্দ্দমের ন্যায় ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িল। দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া, ঘরে ফিরিয়া ঢুকিতে গিয়া হঠাৎ মনে হইল, আজ ভোরবেলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসার পর হইতে ব্রজরাণীকে সে আর একবারও দেখিতে পায় নাই। ব্রজরাণীকে দেখিবার জন্য সে যে কিছু ব্যস্ত থাকে, এমন সন্দেহও তাহার মনের মধ্যে কোনদিনই ছিল না, অথবা সে সন্দেহোদয়ের অবসরও কোনদিন ঘটে নাই বলাই সঙ্গত। অপ্রাপ্য বা আয়াসলব্ধ বস্তুতেই মানুষ লুব্ধ হয়। কিন্তু অরবিন্দের এই দ্বিতীয়া বধূটি তাহার পক্ষে প্রাংশুলভ্য ফল নহেন,—নিতান্তই অনায়াস-প্রাপ্ত ঘাড়ের বোঝারূপেই সে ইহাকে ঘরে আনিয়াছিল। তার পর সেই মাথার মোটকে সে যে সহনীয় এবং বহনীয় করিয়া লইতে পারিয়াছে, সে কেবল তাহার অনন্যসাধারণ ধৈর্য্য-সহায়েই। যাই হোক্, গুণপনা ইহাতে যাহারই থাক্, মোট কথা, অরবিন্দ এই স্ত্রীটিকে যত বেশি আদুরে করিয়া তুলিয়াছিল, তত বেশি আদর করিবার প্রয়োজন তাহার কোনদিনই হয় নাই। এক একজন মানুষ যেমন কেবল মানুষ চরাইবার জন্যই জন্মায়, ব্রজরাণীও সেই রকম কর্ত্তৃত্বের একটা জন্মগত শক্তি লইয়া আসিয়াছিল। কেহ তাহাকে সে অধিকার দিক্ না দিক্, সে লোককে চালাইবার ন্যায্য অধিকার নিজের জোরে দখল করিয়া বসিবেই বসিবে,—ঠেকাইতে কেহ পারিবে না। অতএব, ইহার সহিত বিদ্রোহ না করিয়া সন্ধিতে কাটানই শ্রেয়ঃ।

অরবিন্দ স্ত্রীকে চিনিয়া এই নীতির আশ্রয়েই এতদিন কাটাইল। সে দেখিল, ব্রজরাণী তাহার আদর অনাদর কোন কিছুরই প্রত্যাশা না রাখিয়া, নিজের অপ্রতিহত-শক্তিতে, নিজের অধিকার অনধিকার-নির্ব্বিচারে যেমন সবার উপর, তেমনি তাহার উপরেও দখল লইয়া বসিল। এ লইয়া চেঁচামেচি করিতে গেলেই যে সে, তাহার হক্ সীমানা বলিয়া যেটাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেটাকে ছাড়িয়া দিবে, এমন কোন প্রমাণ তাহার কোন আচরণেই কখন সপ্রমাণ হয় নাই। সে বিনা বাধায় তাহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া

লইল। মেয়েরা অন্তঃপুরে গালে হাত দিয়া এবং পুরুষেরা সদরে গলা ছাড়িয়া, তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল,—"একেবারেই ভেড়া বনে গ্যাছে!"

অরবিন্দ শুনিয়া শুধু একটু হাসিয়াছিল।

তা, এই নতুন গৃহিণীর কর্তৃত্ব তাহার এমনি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, কোন দিন তাহার সঙ্গলিপ্সা মনে জাগাইবার প্রয়োজন হয় নাই। ব্রজরাণীই যে উদয়াস্ত তাহার পিছনে ছায়ার মত ঘুরিতেছে; এবং কত সময়ে, ইহার দৃষ্টি এড়াইয়া একটুখানি নিঃসঙ্গ হইবার জন্য নিরালার সন্ধানে সে অস্থির হইয়াছে।

আজ শীতশীর্ণ গাছপালার উপর, কর্দমাক্ত পথপানে জীর্ণকন্থা-বিশোভিত প্রতিবেশীর অলিন্দে চাহিয়া, যখন তাহার মেঘাচ্ছন্ন চিত্ত অধিকতর বিষণ্ণতায় ভরিয়া উঠিল, তখন এই বাড়ীরই আর একটা নিঃসঙ্গ জীবের কথা তাহার সহসাই স্মরণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, দিনের মধ্যে না হোক্ পাঁচ সাতবারও যে অন্দর ও বাহিরকে এক করে, সে আজ একটিবারও তো তাহার তত্ত্ব লইতে আসে নাই। তখন মনে পড়িল, আজকাল কিছুদিন হইতে সে বড় একটাই আসে না। আবার এও মনে হইল, প্রায় দিন চার পাঁচ তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তাও তো কই বড় একটা হয় নাই। মান অভিমান, কোন কিছু স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেও স্মরণে আসিল না। তবে একবার খবর লওয়া উচিত তো।

ব্রজরাণী ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, বোধ করি কড়িকাঠই গুণিতেছিল! অরবিন্দ ঘরে ঢুকিয়া তাহার দিকে চাহিতে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি অধে নামাইয়া সে ক্লান্তভাবে একটুখানি হাসিল। সেই হাসিটুকুর মাঝখান দিয়া অরবিন্দ সাশ্চর্য্যে দেখিল, উহার ভিতরটা যেন তাহার অপেক্ষাও পরিশ্রান্ত, অবসন্ন। অবসাদের চরম গহ্বরে গড়াইয়া না পড়িলে মানুষের ঠোঁট দিয়া অমন হাসি ব্যক্ত হইতে পারে না। বিশেষ যারা রূপৈশ্বর্য্যের মহামানে মণ্ডিত এবং যৌবন নিজের প্রখর জ্যোতিঃ যাহাদের শরীর মনে সহস্র ধারায়

ঢালিয়া দিয়া, দীপ্ত-শিখায় সূর্য্যের মত জ্বালাইয়া রাখিয়াছে! অরবিন্দ অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "কি রাণি, এমন সময়ে শুয়ে যে!"

ব্রজরাণী কহিল, "আমার আবার সময় অসময় কি?"

"অসুখ বিসুখ তো করে নি?"

"আমি বাঁজা-খাঁজা মানুষ, আমার আবার অসুখ কি করবে?"

"তবে অবেলায় শুয়ে কেন?"

শ্রান্ত-স্বরে রাণী জবাব দিল—"কি করি?"

অরবিন্দ একটা চৌকি টানিয়া বসিয়া বলিল, "কাজের আবার অভাব কি? সেই যে কি সব শলমার কাজ টাজ করা হচ্ছিল, সে সব শেষ হ'য়ে গেছে না কি? কি সব 'বাদলা'র কাজ শেখা হবে বল্‌ছিলে, সে শেখ্‌বার সখ কখন মিটিয়ে ফেল্লে?"

ব্রজরাণী ক্লান্তভাবে চোখের উপর একটা হাত চাপা দিয়া উত্তর করিল—"কি হবে সে সব ক'রে?"

অরবিন্দ বলিল, "কেন, কি হবে কেন? বালিগঞ্জের নতুন বাড়ী সাজাতে হবে না? তা'ছাড়া তোমার আর উষার কি যে সব সাড়ী-টাড়ী হবে বল্‌ছিলে। বলেই কি সব ভুলে গেছ এর মধ্যেই? কাশীর বৈরাগ্যের হাওয়া লাগ্‌লো কখন এসে?"

ব্রজরাণী ঈষৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিল, "মরে গেলে যার পিছনে চাইবার কেউ নেই, তার আবার—" কথাটা শেষ না করিয়াই সে বক্ষোত্থিত দীর্ঘশ্বাসটাকে চাপা দিতে গিয়া, নড়িয়া চড়িয়া কপালটা টিপিয়া ধরিয়া, একটু চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়া সেটাকে শেষ করিয়া দিল। স্বামীকে আপন ভাবিয়া আপনার এই অপ্রতিবিধেয় দুঃখের অংশ সে ভাগ করিয়া লইতে কুণ্ঠিতই হইত। স্বামী ত তাহার একার নহেন। বিশেষ ব্রজরাণীর দুঃখের সহিত সহানুভূতি তাঁহার কিসের? নিজে তিনি অপত্যবান্‌। তাহার এ দুঃখ তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন? বরং, হয় ত, তাহার এই

নিঃসঙ্গ মাতৃ-বক্ষের ব্যাকুল বেদনা অনুভব করিয়া মনে মনে বিদ্বেষের সুখানুভবে একটু বিদ্রূপের হাসিই হাসিবেন। এই মনে করিতেই তাহার মনের ইন্ধনে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নিজের প্রকাশমান দুর্ব্বলতায় সে মর্ম্মান্তিকরূপে নিজের উপরেই চটিয়া, দশনে অধর চাপিল।

অরবিন্দর মনে কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহা বিন্দুমাত্র জাগে নাই; বরঞ্চ, ইহার এই সঙ্গিহীন, নৈরাশ্য-ব্যথিত জীবনের ভারটা তাহার অন্তরে যেন কতকটা চাপিয়া ধরিয়া, ইহার প্রতি তাহাকে সহানুভূতি-সম্পন্নই করিয়াছিল। সরল-মনেই তাই সে প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তোমার ভৃগুসংহিতা আমায় দেখালে না যে!"—উত্তর না পাইয়া এবার রঙ্গ করিবার জন্যই হাসিতে হাসিতে কহিল, "না দেখাও গে যাও,—আমি সব শুনে নিয়েছি। আর জন্মে তুমি রাণী ছিলে, আর আমি ছিলুম রাজা,—এই তো? তা, আমি রাজা থাকি, আর না থাকি, তুমি যে রাণী ছিলে, তাতে ভৃগু-ঋষি কেন, আমারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাস্তি। রাণী ব'লে রাণী!—সাক্ষাৎ মহারাণী!"

তখন সেই আষাঢ়-মেঘের মত ব্যথাভারাতুর চিত্ত চিরিয়া বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় লজ্জার হাস্য স্ফুরিত হইল। সলজ্জ, সপ্রেম দৃষ্টি স্বামীর মুখে তুলিয়া ধরিয়া, কৃত্রিম কোপে ব্রজরাণী সবেগে কহিয়া উঠিল, "আঃ, কি যে তুমি বলো! তুমি রাজা ছিলে না, আর আমি ছিলুম রাণী, তাই না কি আবার হয়? তা'হলে বোধ করি চাকরাণী কি মেথরাণীই বা হবে।"

অরবিন্দের হৃদ্‌পিণ্ডটা কে যেন বিপুল বলে টানিয়া ধরিল। ঠিক্ এই কটা কথাই যে আর এক রকম ভাষায়, আর এক দিন, আর একজনের মুখে সে শুনিয়াছিল।

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

মুখং দ্রক্ষ্যাম রামস্য দুর্দ্দশং নো ভবিষ্যতি।
—রামায়ণ।

ভৃগুসংহিতার ব্যবস্থামত যাগযজ্ঞের কোন উদ্যোগ আয়োজন করিতে ব্রজরাণীর আগ্রহ দেখা গেল না। বরঞ্চ, তাহার বাপের বাড়ীর পুরোহিত কালীঘাটে কি সব হোমযাগ করিতেছিলেন,—তাঁহাকে পত্র দিয়া এই কথা লিখিল যে, "ভাবিয়া দেখিলাম, বিধিবিধানের বিরুদ্ধে লড়াই না করাই ভাল। অতএব ও-সকলে প্রয়োজন নাই। ভৃগুসংহিতাখানা কাপড়ের ট্রাঙ্কের মধ্যে রক্ষিত ছিল, খুলিতেই চোখে পড়িল। সাভিমানে চোখ ফিরাইয়া বোধ করি ভৃগু-ঋষিকেই শুনাইয়া বলিল, "কাজ নেই আমার এত সৃষ্টি করে, একটিবারের জন্য মা হ'য়ে। আমার পোড়া কপাল আমারই থাক্। আমি আর কারু দয়া চাই নে।"

একদিন কোথাও কিছু নাই,—অকস্মাৎ ঝড়ের মত বাহিরের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া ব্রজরাণী কহিয়া উঠিল, "ওগো, শীগ্‌গির করে ঠাকুরজামাইকে একখানা তার ক'রে দাও। বেলার বড্ড অসুখ ক'রেচে।"

অরবিন্দ চম্‌কাইয়া উঠিল, "কি হয়েছে তার?"

"জ্বর। ওগো, বড্ড জ্বর তার।"

"টেম্‌পারেচার নিয়েছিলে? কত উঠ্‌লো?"

ব্রজরাণী কহিল, "সে তেমন বেশি নয়;—তবে বেশি হ'তে কতক্ষণ।"

অরবিন্দ বলিল, "তবু কতটা হ'লো শুনিই না।"

ব্রজ। নিরেনব্বুই পয়েণ্ট ছয়। সর্দ্দিও খুব আছে,—একটু একটু কাস্‌চেও।"

অরবিন্দ কহিল; "এই? আমি বলি না জানি কি! তা এর জন্য জগদিন্দ্রকে তার না ক'রে, সোজাসুজি ঈশান ডাক্তারকে ডাক্‌তে পাঠালেই তো চুকে যায়।"

ব্রজরাণী নির্ব্বন্ধ-সহকারে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "ওগো, না—না, রোগকে তুমি অত সোজা মনে ক'রো না। পরের মেয়ে নিয়ে এসেছি,—একটাকে তো মেরেই ফেলেছি, শেষকালে কি হ'তে কি হ'য়ে যাবে। তুমি বাবু ওর বাপকে খবর দিয়ে দাও।"

সেদিন ঈশান ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাঁহার মুখে সামান্য সর্দ্দিজ্বরমাত্র খবর শুনিয়া, অরবিন্দ বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু নিষ্কৃতি পাইল না। মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ব্রজরাণী কাঁদো-কাঁদো-গলায় বলিল, "অত ক'রে বল্লুম—তুমি আমার কথা তখন শুন্‌লে না,—এখন জ্বর যে এই বাড়চে, কি আমি করি? কেনই যে মর্‌তে পরের মেয়ে নিয়ে এলুম। ঠেকেও শিখ্‌লুম না। আমার যেমন মরণ নেই!"

অরবিন্দ ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর কি বড্ড বেশি বেড়েচে? কি কর্‌চে সে? ছট্‌ফট্‌ কর্‌চে কি বেশি?"

ব্রজরাণী অধীর হইয়া কহিল, "ছট্‌ফট্‌ কর্‌বে কেন, একেবারে নিঝুম হ'য়ে রয়েছে। জ্বরও খুব বেশি বলে মনে হচ্চে,—তুমি একবার দেখ্‌তেই এসো না।" এই বলিয়া স্বামীকে পাশের ঘরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। সেখানে নেয়ারের খাটে বেলা অঘোরে ঘুমাইতেছিল,—তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সহজ এবং স্বাভাবিক। মেঝের বিছানায় তাহার ঝি গভীর নিদ্রামগ্না। শুধু ব্রজরাণীর শয্যাটিই খালি। সে সমানে সন্ধ্যা হইতে ইহার মুখ চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া, পৌষ-রাত্রির দুর্জ্জয় শীত ভোগ করিয়াছে। অরবিন্দ ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভাগিনেয়ীর ললাটের তাপ পরীক্ষা করিল, নাড়ীর গতি দেখিল; তার পর উঠিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল, "তুমি একটা আস্ত

পাগল! কোথায় জ্বর বাড়চে? জ্বর তো নেই বল্লেই হয়। অমন স্থির হ'য়ে ঘুমুচ্চে, কেন মিথ্যে ওকে হেঁচ্‌ড়া-হেঁচ্‌ড়ি কর্‌চো। তার চাইতে চুপ্‌টি করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো দেখি। ওরও ভাল, আর তোমারও ভাল।"

"বলো কি তুমি! আমার চক্ষে আজ না কি ঘুম আস্‌বে?"

"তবে বসে শীতে হিহি করো,—আমি শুতে যাই।" এই বলিয়া অরবিন্দ চলিয়া গেল। নিজের বিছানা হইতে আর একবার ধর্ম্মডাক্ দিয়া তাহাকে শুইতে বলিয়া, অনতিবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ব্রজরাণী কিন্তু কোন যুক্তিই কাণে তুলিল না। গায়ে একখানা শাল জড়াইয়া, সে রোগীর সুপ্তিময় মুখের দিকে স্থির-নেত্রে চাহিয়া বসিয়া, মনের মধ্যে অশেষবিধ অশান্তি উপভোগ করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, যে, সকালে উঠিয়াই সে, স্বামীকে না জানাইয়া, সকলের পূর্ব্বে টেলিগ্রাফ করিয়া জগদিন্দ্রকে আসিতে অনুরোধ করিবে এবং ঠাকুরদেবতার কাছে মনে মনে নাকে কাণে খত দিয়া কাতর অনুনয়ে বারংবার করিয়া বলিল, যে, এইবার তাঁহারা মেয়েটিকে বাঁচাইয়া দিন, নিশ্চিত সে ইহাকে ইহার বাপের কাছে ফিরাইয়া দিবে এবং আর কখনও এমন করিয়া পরের ছেলে-মেয়ের উপর লোভ করিতে যাইবে না। তাহার গায়ের বাতাসে যখন পরের ছেলের শুদ্ধ ক্ষতি লেখা আছে, তখন জানিয়া শুনিয়া কেন সে এমন কর্ম্ম করিল? কেন, যে-দিন এ খবর পাইয়াছিল, সেই দিনই ইহাকে ফিরাইয়া দিল না? এতবড় কুমতি তাহার কেমন করিয়া হইয়াছিল, এই আশ্চর্য্য কথাটা আজ সে এই নিদ্রাহীন মধ্যরাত্রে মনের অজস্র আত্মগ্লানির মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাইল না।

ফাল্গুন মাসে সরলার বিবাহোপলক্ষে সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণপত্র আসিল। অরবিন্দ কোন কথাই কহিল না দেখিয়া, ব্রজরাণী নিজে হইতেই বলিল, "বেলাকে নিয়ে তুমি যাও, আমি এখানে থাকি।"

অরবিন্দ কহিল, "আমার তো এখন যাবার সুবিধা হবে না।"

"তা'হলে বেশোকে কে নিয়ে যাবে ?"

"সে ব্যবস্থা তারা কি আর না করবে ?"

অসীমার বিবাহের কাণ্ড মনে করিয়া ব্রজরাণী ভাল মন্দ আর কোন কথাই কহিল না। কিন্তু তথাপি তাহাদের যাইতে হইল। জগদিন্দ্র যখন নিজে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, সরলার মাতৃহীনতার দোহাই পাড়িল, তখন ব্রজরাণী আর 'না' বলিতে পারিল না। যাত্রার উদ্যোগ করিতে বসিয়া গেল। ইহা দেখিয়া অরবিন্দ আসিয়া বলিল, "তুমি যে ক'দিন থাকবে না, তারি মত সব বন্দোবস্ত করে রেখে যাও। আমি ওসব পেরে উঠবো না।"

ব্রজরাণী বিস্মিত হইয়া ট্রাঙ্কের কাপড়চোপড় হইতে চোখ তুলিয়া কহিল, "সে কি! তুমি কি যাবে না ?"

অরবিন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।"

"কারণ ?"

"ইচ্ছা নেই।"

হাসিমুখ আঁধার করিয়া রাণী কহিল, "সেবারের কথা মনে করে যে তুমি আমায় দুঃখ দেবার জন্য যেতে চাইচো না, সে আমি জানি। কিন্তু সেই জন্যই এবার আমায় যেতে হবে—সরলার যে মা নেই।"

অরবিন্দ কহিল, "আমি তো তোমায় যেতে একবারও বারণ করি নি।"

স্বামীর এই শান্ত উদাসীনতার মধ্যে যে কত বড় বজ্রবল লুকান থাকে, সে খবর ব্রজরাণী যত জানিত, অরবিন্দের অপর কোন আত্মীয়, পর, এমন কি তাহার গর্ভধারিণী জননী নিজেও ততটা জানিতেন কি না সন্দেহ। সে লজ্জিত, কুণ্ঠিত, বিরক্ত এবং এমন কি, ক্রুদ্ধ হইয়াই, মনের মধ্যে আপনাকে আপনি ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিলেও, বাহিরে আর একটি কথাও ইঁহাকে বলিতে পারিল না; জানিত যে, বলিলে জবাব পর্য্যন্ত পাইবে না। এখুনি

তাহার অজস্র মান অভিমানকে ঔদাস্যের এতটুকু মৃদুমন্দ হাস্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দিয়া, হয় ত সারনাথ, না হয় চুণার—এম্‌নি কোথাও একটা চলিয়া গিয়া, দিন-দুই সেইখানেই কাটাইয়া আসিবে বৈ তো নয়।

যে ব্রজরাণী স্বামীকে ছাড়িয়া এক রাত্রির বেশী দুই রাত্রি বাপের বাড়ীতেও থাকিতে পারে না, সেই ব্রজরাণী যখন নন্দাইএর সঙ্গে তাহার বাটীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে স্বামীকে ছাড়িয়া আসিল, তখন আর দশজনের মত নিজেও সে কম বিস্মিত হয় নাই। কিন্তু যখন আসিবার দু'এক দিনের মধ্যেই সে জানিতে পারিল যে, তাহার এই আগমনের উদ্দেশ্য শুধুই মাতৃহীনা সরলার প্রতি সহানুভূতিই সবটা নয়, আরও একটা কারণ,—যদিও অত্যন্ত নিগূঢ় এবং হয় ত বা নিজেরও অজ্ঞাতেই—কখন কেমন করিয়া বলা যায় না,—মনের কোণে আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছে—তখন ভীষণ লজ্জার তাড়নে সে অবশ্য নিজের কাছে নিজের এই দুর্ব্বলতাটুকু স্বীকার পর্য্যন্ত করিতে চাহিল না। অগত্যা এ লইয়া মনের মধ্যেও কোন আন্দোলন না তুলিয়াই, নিঃশব্দ ধৈর্য্যে শুধু উৎকর্ণ হইয়া, কাণ পাতিয়া, এবং উন্মুখ হইয়া চোখ মিলিয়া, যেখানে যেখানে ছোট ছেলেপুলের ভিড় দেখে, সেইদিকেই সব ফেলিয়া ছুটিয়া যায়। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি চক্ষু, কর্ণাশ্রয়ী করিয়া, উতলা বিমনা-ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও, চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইল না। সে যাহা শুনিতে এবং দেখিতে চাহিতেছিল, সে নাম তো কই কাহাকেও লইতে শোনা গেল না?—এবং দুই বৎসর পূর্ব্বের এম্‌নি আর একটা দিনের অতর্কিতে দেখা একখানি মুখ,—এতদিন এত দেশ বিদেশে ঘুরিয়াও ব্রজরাণী যে মুখের আর একখানি যোড়া পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই,—সেখানি তো কই তাহার তৃষিত দৃষ্টিপথে আর তেমন করিয়া ভাসিয়া উঠিল না! সেই যে স্পর্শটুকু ছোট ছোট একটি পাখীর গায়ের পালকের মত;—গভীর অনিচ্ছা অবহেলার সর্ব্ব-প্রযত্ন চেষ্টাকে পরাভূত করিয়া আজও তাহার সমস্ত দেহ মনকে রোমাঞ্চিত করিয়া আছে, আজও আবার যদি ঠিক তেম্‌নি করিয়া

সেইটুকুকে সে ফিরিয়া পাইত! অথচ এই সম্ভাবনাটা তাহার উন্মুখ চিত্তকে কতবারই না বিমুখ করিতেও ছাড়ে নাই।

অবশেষে থাকিতে না পারিয়া সে অসীমাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, বর্দ্ধমানে এবারে যে বলা হয় নি?"

অসীমা বলিল, "হবে না কেন, হয়েছিল বই কি, মামীমা! বাবা যে সব আগে নিজে বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেন। তা বড় মামীমা বল্লেন, 'অজিতের এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা—কি ক'রে সে যাবে? আর নিজে তিনি তো আস্তেই ভালবাসেন না,—রাজী হ'লেন না'।"

শুনিয়া একদিক্ দিয়া ব্রজরাণীর মন যেন কি এক রকম তীব্র নৈরাশ্যে ফাঁকা হইয়া গেল। মনে হইল, তাহার আসার সমস্ত উদ্দেশ্যটাই যেন একান্ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আর একদিক্ দিয়া নন্দায়ের উপর একটা অভিমানও আসিয়া পৌঁছিল।

তাই বটে! বড়-গিন্নির কাছে আমোল পান্ নি বলে, তখনই—এই ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো—আমার কথা মনে পড়েছে।

বিবাহের পরদিন বরকন্যা বিদায় লইলে, বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়া ভাইকে বলিল, "দাদা, আমায় কাশী পৌঁছে দেবে চল।" মা বলিলেন, "সে কি রে রাণী! এই তো মোটে চার্‌টি দিন এসেছিস্। আমরা তোকে একদিন তো চোখ দিয়ে দেখ্‌লুমও না,—এরই মধ্যে তুই ফিরে চল্লি কি রে?" মিনতি করিয়া সে বলিল, "মা, আমায় যেতে দাও। আমার মন মোটে ভাল নেই। সেখানে ভারি কষ্ট হচ্চে যে।"

মা আর আপত্তি তুলিলেন না, দুঃখিত হইয়া নীরবে রহিলেন। দাদা একটু চিন্তিতভাবে একটা খট্‌কা বাহির করিলেন, "আজই যাবি, তা'হলে গাড়ী রিজার্ভের কি করা যায়!" অধৈর্য্য হইয়া সে ইহাও খণ্ডন করিয়া দিল, বলিল, "নাই বা গাড়ী রিজার্ভ হ'লো? তুমি আমায় অম্‌নিই নিয়ে চলো।"

অরবিন্দ উহাদের কাশীতে হঠাৎ দেখিয়া এতটুকুও বিস্ময় প্রকাশ করিল

না, নিজের খেয়ালী স্ত্রীটিকে সে কাহারও চাইতে কম চিনিত না। বৈশাখ মাসে বালীগঞ্জের নূতন বাড়ী সম্পূর্ণ হইয়া গেলে গৃহ-প্রবেশ করিবার জন্য অরবিন্দকে কাশীর বাসা উঠাইয়া আসিতে হইল। প্রকাণ্ড একটি জমি লইয়া অরবিন্দের নূতন বাড়ী। সাম্‌নে সবুজ তৃণমণ্ডিত সমচতুষ্কোণ ভূমি-খণ্ডের চারি পাশে বিবিধ বর্ণখচিত ফুলের বাগান, পিছনেও তাহাই এবং ইহার একদিকে সুন্দর একটী দীর্ঘিকা। এ ভিন্ন, বাটী ও পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি হইতে দূরে বৃহৎ-বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী, নানা দেশ হইতে সংগৃহীত উপাদেয় ও দুর্ল্লভতর ফল-বৃক্ষেরও অভাব ছিল না। অট্টালিকাটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে গঠিত, এবং সেইভাবেই সুচারুরূপে সজ্জিত। এই সুরম্য গৃহের গৃহকর্ত্রীরূপে, ইহার সবচেয়ে সুসজ্জিত অপূর্ব্ব চাক্‌চিক্যময়, আলোক ঐশ্বর্য্যে উদ্ভাসিত দ্বিতলের বৈঠকখানা-ঘরে দাঁড়াইয়া, ব্রজরাণীর দুই চোখ জ্বালা করিয়া, তাহার বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ যেন শূন্যতায় হা হা করিয়া উঠিল। অনেক সাধে, এবং বিস্তর সাধ্যসাধনায়, একদিন সে এই বাড়ী তৈরি করাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ এই ইন্দ্রপুরীতুল্য সাজান বাড়ীতে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল, ইহার কিছুমাত্র প্রয়োজন তাহার ছিল না। এই যে এখানে সে এই রাজৈশ্বর্য্যের সমাবেশ করিয়া তুলিয়াছে, কাহার জন্য এ আয়োজন? যেদিন ভবের হাটে পাওনা-দেনা মিটাইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে, সেদিন এই পুঁজির রাশি কোথায় ফেলিয়া সে চোখ বুজিবে? এমন একটা দিনের ছবি তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, যে দিনে সে বাঁচিয়া নাই,—সে দিনেও অবশ্য আর কাহারা তাহার এই সাধের নিকুঞ্জে নিবাস করিতেছে; কিন্তু ব্রজরাণীর নাম ইহাদের নিকট সম্পূর্ণই অপরিচিত, ব্রজরাণীর রক্ত তাহাদের শিরা ধমনীতে কাটিয়া কুচাইয়া দিলেও এক ফোঁটা বাহির করা যাইবে না।

বাড়ীখানা তাহার যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। স্বামীকে গিয়া বলিল, "এখন আমরা আমাদের হাবড়ার বাড়ীতে গিয়া থাকিগে' চলো।"

অরবিন্দ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ! এত খরচপত্র করে বাড়ী কর্‌লুম, এখানে না থেকে এখন হাবড়ার বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌তে যাব কোন্ দুঃখে? হাবড়ার বাড়ী আমি ইস্কুলকে ভাড়া দেবার বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি।"

ব্রজরাণী বলিল, "না—না, তা ক'রো না, বরং এইটেই কেউ যদি ভাড়া নেয় তো—বরং—"

অরবিন্দ কহিল, "সে আর হয় না রাণি! আমার কথা আর ফেরে না।"

ব্রজরাণীর পক্ষটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে কি? সে তো কই এলাইয়া কাঁদিতে বসিল না!

অষ্টত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

প্রবিশন্তৌ কদাযোধ্যাং দ্রক্ষ্যামি শুভকুণ্ডলৌ।

—রামায়ণ।

জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগে একদিন একটা বৃষ্টিশূন্য ঝড়ের অবসানে, আস্‌বাবপত্রের ধূলাঝাড়া লইয়া চাকরদের সহিত বকাবকি করিয়া, তিক্ত-বিরক্ত চিত্তে ব্রজরাণী নিজেই উহাদের হাত হইতে ঝাড়ন লইয়া, বিশেষ বিশেষ স্থানগুলির ঝাড়াঝুড়ি করিতে লাগিয়া গেল। চতুরিয়া, বিষণা, বেহারি প্রভৃতি চাকরের দল কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া, শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিয়াও যখন কর্ত্রীঠাকুরাণীকে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিবৃত্ত হইতে দেখিল না, তখন তাহারা একে একে, গৃহান্তরে বা কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল। যে ঘরটার সম্মার্জ্জন লইয়া চাকর মনিবে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেটা অরবিন্দের বসিবার ঘর, এবং এই ঘরটাই খাস্ করিয়া তাহার নিজের। ব্রজরাণী চিরদিন কর্ত্তৃত্ব করিয়া

আসিতেছে। চাকর দাসীর চরিত্র বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। কর্ত্তা বা কর্ত্রী—যাহার প্রকৃতি কিছু ঠাণ্ডা, ইহারা আড়ালে দশের কাছে তাহার খ্যাতি বাড়ায় বটে, কিন্তু কার্যতঃ ইঁহার ভাগেই ফাঁকি চালায়। অরবিন্দ হাজার ত্রুটী পাইলেও, কাহাকেও কখন মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলে না; সেইজন্য মনিবের মতন অমন মনিব কি আর আছে; এ কথা গর্ব্বের সহিত বলিয়া বেড়াইলেও, তাহার ঘরে যদি সাত মণ ধূলা জমিয়া থাকে, তাহার গামছায় যদি চিটা পড়ে,বা জুতাগুলায় ছাতা ধরে, সে সব কাজ করিতে উহাদের আলস্য বৃদ্ধিই পায়। কিন্তু ব্রজরাণীর বেলায় পান হইতে চুণটুকু না খসে, এজন্য সকলেই সদাসর্ব্বদা তটস্থ। ব্রজরাণী এ সমস্তই দেখিতে পায়; দেখিয়া সে যৎপরোনাস্তি রাগও করে। চাকরদের এবং তাহাদের কর্তৃত্ব-শক্তিতে খর্ব্বতাপ্রাপ্ত, অকর্ম্মা মুনিব উভয় পক্ষই ভৎর্সিত হয়। কিন্তু স্বভাব কোন পক্ষেরই সংশোধিত হয় না। নিরুপায়ে ব্রজরাণী যতটা পারে নিজেই উঁহার ঘরদ্বার বিছানা বস্ত্রের তদারক করিয়া বেড়ায়। আজও তাই এই এত বড় তিনতালা বাড়ীটার সর্ব্বত্র ছাড়িয়া ইঁহার ব্যবহৃত ঘর কয়টারই তদ্বির করিতে আসিয়া দেখিল—এই ঘরটায় সে সচরাচর আসে নাই বলিয়াই বোধ করি চাকর মনিবের সম্মিলিত চেষ্টা ফলে এটার যে অবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার জন্য আজিকার এই ঝড়কেই দায়ী করিতে গেলে, সে যে কত বড় মিথ্যা রটনা, তা যাহারা অম্লানমুখে সে কথা বলিয়া গেল, তাহারাও বুঝে। ঘরের চারিদিকের কোণে কোণে, আল্‌মারি কৌচের আশে-পাশে ধূলার জাল পড়িয়া গিয়াছে। আল্‌মারির বইগুলার মাথা দশ-খান্যর বা সোজা, আবার তিনখানার বা উল্টা দিকে। কাগজ-ফেলা ঝুড়িটা ভরিয়া গিয়া, ছেঁড়া খাম, খবরের কাগজ, মাসিকপত্রিকার মোড়ক, শীলভাঙ্গা গালা ছাপাইয়া পড়িয়াছিল,—ঝড়ে উড়িয়া এক্ষণে ঘরময় ছড়াছড়ি হইয়া গিয়াছে। লিখিবার টেবিলের উপর আঁটা সবুজ বনাতটা নিজের গাঢ় সবুজত্ব হারাইয়া ধূলায় ধূসর হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর ছড়ানী নাই, বোধ

করি সংসারে এমন কোন জিনিষই নাই। দোয়াত প্রায় পাঁচটা জড় হইয়াছে, তার মধ্যে গোটা-তিনেক কালিহীন। কলমের সংখ্যার অনুপাতে নিবের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ত্যক্ত-চিত্তে চারিদিকের গোছগাছ সমাধা করিয়া তুলিয়া, টেবিলের বিক্ষিপ্ত চিঠিপত্রগুলা বাছিয়া বাছিয়া চিঠির ফাইলে গাঁথিয়া দিতে গিয়া, একখানা খামের লেখায় হঠাৎ তাহার চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া পড়িল। চিঠিখানা হাবড়ার বাড়ী হইতে ঠিকানা কাটিয়া এখানে আসিয়াছে। ইহার খামের উপর বর্দ্ধমানের ছাপ। তা'ভিন্ন আরও কয়েকটা ;—একটা হাবড়ার, একটা এখানের। কাটা খামের মধ্য হইতে পত্রখানা টানিয়া বাহির করিয়া সে চঞ্চল-চক্ষে তাহারই উপর চাহিল ; বুকের মধ্যটা হঠাৎ তাহার এম্নি প্রচণ্ড বেগে দুলিয়া উঠিয়াছিল, যে, তাহারই আবর্ত্তে চোখের দৃষ্টিও কিছুক্ষণের জন্য যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল ! চিঠিখানা এই—

"প্রণামা শতকোটি নিবেদনমিদং—

আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না, আমি প্রবেশিকা-পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছি। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আর অধিক কি লিখিব। এখানের সমস্ত কুশল। ইতি—

সেবক

শ্রীঅজিতকুমার বসু।"

চিঠিখানা পাঠ শেষে ব্রজরাণী সেখানা হাতে করিয়া অনেকক্ষণই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বাহিরে স্তব্ধ থাকিলে কি হইবে, এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহারই ঘরকন্নার জিনিষপত্র উলোটপালোট করিয়া দিয়া যেমন করিয়া ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল, সেই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নের আগুনে-হাওয়ার অনুকল্পে তাহার মধ্যেও তখন একটা উন্মত্ত ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল।—প্রথম হইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে, সেই নবকিসলয়তুল্য সুন্দর কিশোর ! বিদ্যার গরিমায় দীপ্ত সমুজ্জল মুখে মনোরমাকেই তো সে 'মা'

বলিয়া ডাকিতেছে! আজ এতক্ষণে পুত্র-গৌরবে মনোরমার বুকটা যে কতখানিই ভরিয়া উঠিয়াছে, নিজের বুকের এক আংশিক অভাবনীয় শূন্যতা হইতেই সে ইহা কল্পনা করিয়া লইয়া যেন অসহনীয় একটা তীব্র যন্ত্রণা বুকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল। চেনা অচেনা সবাই তো আজ রত্নগর্ভা বলিয়া সেই সৌভাগ্যবতীর অভিনন্দন করিবে। দরিদ্র-কুটীরে আজ কত উৎসব। আর তাহার এই এতবড় রাজপ্রাসাদ—এ যে তার, চির-নিরানন্দে ভরা, চির-অন্ধকারময়! এইখানে রাণীর গৌরবের মাঝখানেও সে যে ভিখারিণী!

চিঠিখানা যেখানকার সেইখানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু মনটাকে ব্রজরাণী আর সেদিন সেখান হইতে নড়াইয়া আনিতে পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেই দুই বর্ষাধিক পূর্ব্বে দেখা মুখখানি মনে পড়ে, আর চিঠির কথাগুলা বুকের মধ্যে আসিয়া ঘা দেয়। একবার ইহাও তাহার মনে হইল, যে, হে ভগবান! ওই ছেলেটিকে কেন আমার পেটে একটুখানি জায়গা দিলে না? আবার নিজের কাছে নিজেই লজ্জায় রাঙিয়া এ চিন্তার সুখ প্রলোভনটুকু চাপা দিয়া ফেলিতে হইল। কে যেন হৃদয়-গুহার অন্ধকার কোণ হইতে তাড়না করিয়া কহিয়া উঠিল, তার স্বামী নিয়েও তোর মন উঠে নি? ঐটুকু শেষবাঁধনও তার, তুই রাক্ষসী খসিয়ে নিতে চাস্ না কি?

অরবিন্দ কি একটা বৈষয়িক কার্য্যে দু'দিনের জন্য ভাগলপুরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিলে, দু'একদিন ইতস্ততঃ করিয়া এক সময় দ্বিধার নিষেধ সরাইয়া ফেলিয়া ব্রজরাণী হঠাৎ এই কথাটা তুলিয়া বসিল। চোখ বুজিয়া প্রাণপণে বলিয়া ফেলিল, "অজিত ফাষ্ট হ'য়ে পাশ করেছে"—বলার ধরণে, এই কথাটা সে জিজ্ঞাসা করিল, অথবা জানাইল,—ঠিক্ করিয়া বুঝা গেল না।

অরবিন্দ ইহা শুনিয়াও যেন শুনে নাই, এম্‌নি করিয়া থাকিয়াই পূর্ব্বের

মত আহার করিতে লাগিল। ব্রজরাণী তাহার নিরুত্তর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "সে এইবার কল্‌কাতায় এসে পড়বে বোধ করি?"

অরবিন্দ তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া তখন জবাব দিল, "বর্দ্ধমানেও একটা কলেজ আছে যে।"

"সে তেমন ভাল কলেজ তো নয়। এমন ভাল করে পাশ হ'য়ে কি আর সে কলেজে সে পড়বে।"

ইহাও ঠিক্ প্রশ্ন নয়। অরবিন্দ আপন মনে খাইয়া যাইতে লাগিল, জবাব দিল না।

এ কয়দিন ব্রজরাণী রাত্রিদিন ধরিয়াই ভাবিয়াছে। ভাবিতে গিয়া নিজের মাথার মধ্যে আগুন ধরাইয়া দিয়া, কতই না সম্ভব অসম্ভব কল্পনার জালই সে বুনিতে বসিয়া গিয়াছিল। কতবার তাহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এইবার অজিতের পিতা নিশ্চয়ই তাহাকে এইখানে নিজের কাছে লইয়া আসিবেন। তা ছেলে যখন আসিল, তখন ছেলের মা-ই বা না আসিবেন কেন?—বিশেষ, যেমন তেমন মা তো নয়,—অমন ছেলের মা! তার মর্য্যাদা কি আজ পুত্রের মর্য্যাদায় মিলিয়া শতগুণেই বাড়িয়া উঠে নাই? চাহি কি, ভাগলপুরে যাওয়া একটা অছিলা,—আসলে, উনি স্ত্রী পুত্রকে আনিতেই গিয়াছেন।

আচ্ছা, ব্রজরাণী তখন কি করিবে? যেমন আধুনিক দু'একখানা উপন্যাস বা ছোট গল্পে সপত্নী প্রীতির ঢেউ উঠিয়াছে, তেম্‌নি,—না, সে-কালের সেই বগী বিন্দির মত চুলাচুলি করিতে করিতে সতীন লইয়া ঘরকন্না করিতে বসিয়া যাইবে? মনে করিতেই, দারুণ বিতৃষ্ণায়, বিরাগে মন ভরিয়া উঠিল। বিশেষতঃ, ছোট-বয়সে ঝগড়া করাও সাজে, আবার 'পিরিত্তি' করাও চলে;—এ বয়সে কাঁচিয়া ও হুটার একটাও পোষায় না। সতীন লইয়া ঘর সে করিতে পারিবে না। স্বামী যে তাহাকে মনে মনে ভালবাসেন,

ইহাতেই কত সময়ে তাহার এমনও মনে হইয়াছে যে, ঐ মনটা যদি, কোন পদার্থ হইত, তো, সেটাকে সে নির্দ্দয়-হস্তে ছিঁড়িয়া আনিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিত ; এবং এই একমাত্র উপায়েই সেই অবিস্মৃতার গুপ্ত স্মৃতি সে ইহাঁর হৃদয় হইতে লুপ্ত করিতে যদিই পারিত। স্বামীর সেই প্রিয়তমাকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া নিজে তাহার বাঁদীগিরি করিতে পারে, এতবড় উদারতা তাহার মধ্যে নাই। তা এঁর জন্য তাহাকে যে যা বলিতে হয় বলুক্‌ !

কিন্তু—কিন্তু কি ? সে নিজেও বুঝি ভাল করিয়া বুঝিতেছিল না যে, এ কিন্তুটা কি ?—এবং ইহার মূলই বা কোথায় ? তাই স্বামীকে এ বিষয়ে যথাপূর্ব্ব নীরব থাকিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে কোথায়, তা নয়,—তাহার বুকের মধ্যে অস্বস্তিতে ঢেঁকি পড়িতে লাগিল।

এখন স্বামীর নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ততায় নিজের বক্তব্যটাকে জটিলতর হইয়া উঠিতে দেখিয়া মনে মনে সে আগুন হইয়া চটিয়াছিল,—গলার সুরে খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "তার চিঠিটার জবাব দিয়েছ, না—না ?"

অরবিন্দ পাতের উপরকার তপ্‌সে মাছটা টানিতে গিয়া হাত সরাইয়া লইয়া, তাহার উত্তেজিত মুখের দিকে বারেক চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, এবং পুনশ্চ ধীরভাবে আহারে মনোনিবেশ করিল, কথা কহিল না।

তা' কথা না কহিলে কি হয়, স্বামীর সেই এক লহমার সাশ্চর্য্য দৃষ্টিটুকুই যে একশো'টা কথার চাইতে অনেকখানি বেশী, সে কথা না কি ব্রজরাণী জানিত না ? মুহূর্ত্তে সে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"বলি, পরও তো পরকে একখানা চিঠি লিখ্‌লে তার জবাব দেয়—এটুকুও কি মনে কর্‌লে পার্‌তে না ? না, আমিই তা'তে দম্‌ ফেটে মরে যেতুম্‌।"

অরবিন্দ এবার কথা কহিল ; বলিল, "তুমি মরে যেতে কি না ঠিক

জানি নে, কিন্তু আমি এটা পার্‌তুম না। আমি তাদের পরের চাইতেও যে অনেক বেশী পর, সে কি তোমারও জানা নেই?”

“তুমি না' বল্‌লেই তো আর সত্যিকারের সম্বন্ধটা ফুস্‌মন্তরের চোটে হুস্‌ ক'রে উড়ে যাবে না। জগৎশুদ্ধ সবাই তাকে তোমার ছেলে ছাড়া আর কিছু বল্‌বে কি? তুমি জোর ক'রে পর হ'তে চাইলে কি হবে?”

অরবিন্দ বেশ শান্ত-স্বরেই উত্তর করিল, “জগৎশুদ্ধ সবার সঙ্গেই তো আর আমার কারবার নয়।”

এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য যাহাই থাক্‌, ব্রজরাণীর উত্তপ্ত মন ইহাকে নিছক্‌ ব্যঙ্গ বলিয়াই ধরিয়া লইল। তাই অপমানে অভিমানে আগুন হইয়া গিয়া সে উত্তর করিল, “সৎ-মায়ে সংসারে অনেক কুকীর্ত্তিই ক'রে থাকে,—সে এমন কিছু বিচিত্র নয়; কিন্তু সৎ-বাপ যেমন আমি অজিতের দেখ্‌চি, এমন আর কোথাও কারও দেখি নি।—বেশ ত, তোমার ছেলে, তুমি যদি তার ভাল মন্দ না দেখ, নাই দেখবে। আমার তো তাতে বড় বয়েই গেল। আমি ধর্ম্ম ভেবেই বলেছিলুম।”—এই বলিয়া ব্রজরাণী কাঁদো-কাঁদো হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

অরবিন্দের খাওয়া হইয়াছিল, কোন কথা না বলিয়াই সে উঠিয়া চলিয়া গেল। এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনাই হইল না।

উনচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

অজিতের পরীক্ষার ফল যেদিন জানা গেল, দুর্গাসুন্দরীর অসুখ সেদিন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। অজিত যখন লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঢুকিয়া চেঁচামেচি করিয়া বলিয়া উঠিল, “দিদিমামণি! তোমায় একটা সুখবর দিই যদি, তো, কি আমায় দেবে বলো?” তখন সেইমাত্র একটা শ্বাসকষ্ট হইতে উদ্ধার

পাইয়া দুর্গাসুন্দরী ঘন ঘন হাঁপাইতেছিলেন,—কষ্টে দম লইয়া বলিলেন, "তোর দিদিমণির মত এত বড় গরীব কি আর এ ভূ-ভারতে আছে রে? তুই পাশ হয়েছিস্ বুঝি?"

অজিত প্রথম উচ্ছ্বাসের মুখে ঈষৎ দমিয়া গিয়া বলিল, "হাঁ, ফাষ্ট হয়েছি।"

সমপাঠী অনেকেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিল,—আবার ফেলও অনেক ছেলেতেই করিয়াছে। এই দুই দলেই অজিতকে নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিল যে, একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে। যাহারা পাশ করিয়াছিল, অজিত তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তা'হলে তোমরাও তো ভাই, খাওয়াতে পারো?"

তাহারা বলিল, "দ্যাৎ, আমরা না কি আবার পাশ করেছি! ইউনিভার্সিটি আমাদের দয়া ক'রে ফাউ দিয়েছে। তোর মতন পাশ করলে আমরা ত রোজ একটা ক'রে 'ফিষ্ট' করতুম।"

অজিত বলিতে গেল,—"আমরা তো ভাই বড় লোক নই।" কিন্তু বলিতে পারিল না।

শেষকালটায় এই রকম বন্দোবস্ত দাঁড়াইল যে, খবরের কাগজে শ্রেণী-বিভাগ হিসাবে যাহার নাম যেরূপ আগে পরে বাহির হইয়াছে, খাওয়ানর ব্যবস্থাও ঠিক্ সেই হিসাবে হইবে। তা গুণানুসারে বা বর্ণমালা অনুসারে যেদিক্ দিয়াই ধরা হোক্ না কেন,—ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রথম ভোজের আয়োজনটা অজিতেরই উপরে আসিয়া পড়ে। অজিত মাকে আসিয়া বলিল, "ছেলেদের একদিন ভাল করে খাওয়াতে হবে যে মা-মণি, কবে খাওয়াবেন বলুন তো?"

মনোরমা ছেঁড়া-কাপড়ে তালি লাগাইতে লাগাইতে কি সব চিন্তা করিতেছিল; বিষণ্ণ মুখ তুলিয়া বলিল, "সে কি করে হবে অজি, দিদি-মায়ের অত অসুখ।"

অজিত মুহূর্ত্তে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ; কিন্তু নিজের সঙ্কট অবস্থা স্মরণে আসিয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইতে দিল না,—সঙ্কোচের সহিত কহিল, "সে ওদের বলেছিলুম, কিছুতেই ওরা শুন্‌তে চায় না যে।"

মনোরমা কহিল, "তা'হলে একদিন টাকা-দুয়ের জলখাবার আনিয়ে দিই, খাইয়ে দে'।"

পুনশ্চ সঙ্কোচের সহিত অজিত জানাইল, "সে রকম খাওয়া তাহারা মানিবে না। সবাই বলে, দুটো স্কলারশিপ্ পাচ্চিস্, একলাই খাবি, আমরা না হয় দশটা টাকাই খেলুম। একটা দিন বই তো নয়। দিন্ না মা-মণি, একটু ভাল রকম ক'রে খাইয়ে।"

মনোরমা কিছু অপ্রসন্ন হইয়া উত্তর করিল, "ঘরে এত বড় একটা রোগী, অবস্থা তো এই ; যা ক'রে দিন যাচ্চে,—যাক্ এ সব যখন ওরাও বুঝ্‌বে না, তুমিও না, তখন তাই হবে। বোলো তাদের।"

ইহার পর হইল সবই, কিন্তু অজিতের মনে সুখ আর হইল না। তাহার মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া রহিল, কাজকর্ম্মের উৎসাহ অনেক দূরেই চলিয়া গেল। শিশিরে-ভেজা ফুলের কুঁড়ির মত চোখের পাতার তলায় তলায় জলের আভাস জমিয়া উঠিয়া ক্ষণে ক্ষণে পতনোন্মুখ হইতে লাগিল। দুঃখের মধ্যে জন্ম হইলেও অভাবের স্পর্শ সে ত এ পর্য্যন্ত পায় নাই। নিজের প্রাণ বাহির করিয়াও মনোরমা আজ পর্য্যন্ত ছেলের কাছে ঐ জিনিসটাকেই যে অপরিচিত রাখিয়াছে। কিন্তু আজ কাল দুর্গাসুন্দরীর ভীষণ রোগের চিকিৎসায় যখন মনোরমার সমস্ত সম্বলই শেষ হইয়া আসিল, তখন হইতেই এ জিনিসটা এ বাড়ীতে একটু বেশি রকম প্রভাব বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একে রাখু'র মৃত্যুর পর হইতেই জমিজমা দেখা শুনার অভাবে পূর্ব্বের মত উৎপন্ন হয় না ; তার উপর এ দু'তিন বৎসরের অজন্মায় খাজনা টেক্স দিয়া জনমজুরের মজুরি পোষাইয়া বাকি তো কিছুই থাকে না, উপরন্তু ঘর হইতেই বাহির করিয়া দিতে হয়। তা ঘরের সঞ্চয়ই বা কতটুকু ?

অকূল-পাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে মনোরমা দুর্গা কালী—সবার কাছেই মাথা খুঁড়িয়া প্রার্থনা করিতেছিল, অজিত যেন অন্ততঃ নিজের পড়াটা চালাইয়া লইতে পারে। নতুবা কেমন করিয়া সে উহার পড়ার খরচ যোগাইবে? অথচ, তা' না পারিলে অজিতের সমস্ত ভবিষ্যৎটাই—উঃ! কেমন করিয়া এ কথা সে মনেই আনিবে? তা' প্রার্থনা তাহার দেবদেবীরা শুনিয়াও ছিলেন। অজিত পঁচিশ এবং পনের, এই চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া মায়ের ঘোরতর দুশ্চিন্তা দূর করিল। এখন চারিদিকের দেনা কর্জ্জের মধ্যে ঐটুকুকে সম্বল করিয়াই মনোরমা আবার নবীন আশায় বুক বাঁধিতেছিল। সংসারে যে এত বড় করিয়া অভাব দেখা দিতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে এই খবরটা তাহার এমন করিয়া জানা ছিল না। রাখু নিজের বুকের রক্ত দিয়া জমিজমাগুলি দেখিত, দুর্গাসুন্দরী নিজে দাঁড়াইয়া তদারক করিতেন, তার উপর উপ্‌রি দরকারের বেলায় মনোরমার কয়েকখানা অলঙ্কারও ছিল। এখন যে আর কোন দিকেই কিছু নাই। তা হোক্, এত অভাবের দিনেও মনোরমা এই একটুখানি অবলম্বন লাভ করিয়াই অনেকখানি সুস্থ হইল। সে জানে, জীবনের মধ্যাহ্নে সূর্য্যরশ্মি একটু প্রখর হইয়াই উঠে এবং আবার তাহা অস্তের ছায়ায় শীতল হইয়া যায়।

অজিত একখানা সদ্য-লেখা চিঠি হাতে করিয়া তাহার কাঁচা-কালি শুখাইবার জন্য নাড়া দিতে দিতে আসিয়া বলিল, "বাবাকে এই চিঠিখানা লিখ্‌লুম, পাঠিয়ে দিই?"

মনোরমা প্রথম একবার চম্‌কাইয়া উঠিয়াই, সাগ্রহে হস্ত প্রসারিত করিয়া, বলিয়া উঠিল, "কি লিখেছিস্, কৈ দেখি।" পড়িয়া দেখিয়া, কিছুক্ষণ মনে মনে কি একটা তোলাপাড়া করিয়া, ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পাঠাও।"

কয়দিন নিজে সে ঠিক্ এই কথাটাই ভাবিতেছিল। কিন্তু চিন্তা করিয়া কোন মীমাংসায় পৌছিতে পারে নাই। ছেলের মনেও যখন সেই চিন্তারই

তরঙ্গ, পৌঁছিয়াছে, তখন ইহাকেই প্রত্যাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিল। অপরিহার্য্য বাধা-বশতঃ পুত্রের অবশ্য প্রাপ্য অধিকারদানে অপারগ হইলেও পিতার নিশ্চিত পাওনা কেন তিনি পাইবেন না? অজিতকে চুম্বন করিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদের উপর আরও অনেক আশীর্ব্বাদ করিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। বাহিরের ঘরের যে জানালাটা রাস্তার সবচেয়ে বেশি দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, সেইখানে অজিতের বসিবার আড্ডা হইয়াছে। প্রত্যহই প্রায় ডাক্-পিয়ন ঐ পথে যায়। তাহাকে দেখিলেই তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত একটা আহ্বানের প্রত্যাশায় কাণের মধ্যে গিয়া শব্দ করিতে থাকে, কিন্তু অধীর প্রতীক্ষা সফল হয় না। কোন দিন থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "নকড়ি! আমার চিঠি আছে ভাই?" উত্তরে যখন শুনিতে পায়, "এজ্ঞে, না দাদাঠাকুর, নেই তো।" তখন তাহার ভয় হয়, পাছে তাহার কান্না আর চাপা না থাকে!—এমন করিয়া আশার আশ্বাসের প্রতীক্ষায় দিন যখন গত হইয়া গিয়া, সমুদয় বুকখানা জুড়িয়া একটা গভীর নৈরাশ্যের বেদনা হা-হা করিয়া উঠিয়াছে,—বর্ষাসমাগত বন্যাধারার ন্যায় প্রবল ও গভীর উচ্ছ্বাস যখন আকস্মিক নিদাঘ রৌদ্রের তপ্ত কিরণ-স্পর্শে পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে,—এমনি সংশয়-সঙ্কুল দুঃসময়ে একদিন অপ্রত্যাশিত সঙ্গীতের রেশ কাণে আসিয়া ধ্বনিত হইল, "দাদাঠাকুর, চিঠি আছে গো।"

শুনিয়াই হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন পা দু'খানার আগেই লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিল। ব্যথিত বালকের কাতর মর্ম্মের করুণ ক্রন্দন তখনি থামিয়া পড়িয়া তাহারই মধ্য দিয়া মধুর মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় আশার দিব্য সঙ্গীত যেন মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিল।

কিন্তু কার লেখা এ চিঠি? শিরোনামার ইংরেজী লেখা দেখিয়াই তাহার চিত্তে সংশয় জাগিয়াছিল। খামের মধ্য হইতে লেখা চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিতে সন্দেহ দৃঢ় হইল। কেমন মনে হইল, এ লেখা তাহার

পিতার নয়। যদিও তাহার মনের মধ্যে উৎসাহের জোয়ারে ভাটা আসিয়া গিয়াছিল, তথাপি কৌতূহলের বশে সে চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে চিঠিখানা অসীমা বা তাহার পরিচিত কাহারও নয়। বিশেষতঃ, ইহার সম্বোধন পদ হইতে লেখককে তাহার 'গুরুজন' পর্য্যায়-ভুক্ত বুঝায়, এবং পরলোকনিবাসিনী পিসিমাকে মনে পড়ে। চিঠিখানা এম্‌নি—

"শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন,

অজিত! তুমি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছ জানিয়া, আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি জানিবে। ঈশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী ও কীর্ত্তিমান্ করুন। অতঃপর তুমি খুবই সম্ভব যে কলিকাতায় পড়িতে আসিবে। প্রেসিডেন্সি-কলেজে পড়াই স্থির করিয়াছ বোধ হয়? কবে আসিবে? আশা করি সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছ? আশীর্ব্বাদ লইও। আর অধিক কি লিখিব?

ইতি—তোমার ছোট-মা।"

পত্রের উত্তর দিবার অনুরোধ দুইবার দুই জায়গায় করিয়াই আবার উহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিঠিখানার পাঠ সমাপ্ত হইতেই, সেখানা যেন বিশ মণ ভারি একখানা পাথরের মত দুঃসহ হইয়া অজিতের হাত হইতে খসিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত, স্তম্ভিত অজিতের মনশ্চক্ষে বহুদিন পূর্ব্বেকার সেই একটা দৃশ্য, যেদিন অপরিচিতা নারী তাহার ভ্রমের লজ্জাকে নিজের মাতৃ-অঙ্কে তুলিয়া লইয়া, কোমল করুণায় তাহাকে বুকে টানিয়াই, সহসা আবার কোন্ অজ্ঞাত-সত্যের আকস্মিক আবিষ্কারে অসহ্য ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিয়াছিল! একটি নিমেষের মধ্যেই করুণাময়ীর মমতা-মাখান মুখের ছবি, অকরুণার নৈষ্ঠুর্য্যে যে কেমন করিয়াই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, সে দিনের সে দৃশ্য চোখে দেখা না থাকিলে, সে কল্পনায়ও উহা আনিতে পারিত না। তখন তাহার নিকট যত বড় আশ্চর্য্য রহস্যই এ থাক্, আজ অনেক জিনিষের মত এ বিষয়টাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুটা যে বিমাতার বিদ্বেষ, এই সত্যটুকু আজ কিশোর অজিতের

অজ্ঞাত নয়। তাহার অন্তরকেন্দ্রে অঙ্কিত সেই ঘৃণাপূর্ণ মুখের ছবি সে তাহার মাতৃমূর্ত্তির, পাশাপাশি স্থাপন করিতেই, দু'জনের মধ্যকার সুস্পষ্ট বৈষম্য তাহার অনভিজ্ঞ কিশোর চক্ষুকেও প্রতারণা করিতে পারিল না। মা তাহার যথার্থই মাতৃ-প্রতিমা—তাঁহার ভুবন-মোহন রূপে শুধু মায়েরই ছবি! দৃষ্টিতে মাতৃদৃষ্টি, অধরে বাৎসল্য-উৎস, কণ্ঠে করুণা মমতায় গলান যে সুধারস স্বতঃই উৎসারিত—সে যেন জগতেরই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে সমর্থ। এ মায়ের পাশে সেই মা! বিতৃষ্ণায় মন তাহার বিকল হইয়া গেল।

মনোরমা লক্ষ্য করিল, অজিতের মুখে কি যেন একটা দৃপ্ত গাম্ভীর্য্যের ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে। গতি তাহার রেলগাড়ির এঞ্জিনের মতই বেগবান্ ছিল। ছুটাছুটির চোটে হাত পা তাহার ছড়াকাটা কোন দিন বন্ধ থাকিত না। আজকাল সেটা প্রায় ঘুচিয়াছে। দরজা সে ধাক্কা দিয়া খুলিয়া ধড়াস্ করিয়া বন্ধ করিত,—এর জন্য মৃদু তিরস্কার-লাভেও স্বভাব শোধ্‌রায় নাই,—আজকাল তাহার চালচলনে সব সময়েই যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক ভব্যতা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষ করিয়া মায়ের সঙ্গে সে এমন করিয়া ভক্তি সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, যে, সে দেখিয়া মনোরমা হাসি চাপিতে না পারিলেও, মনের মধ্যটা ইহাতে তাহার অসহ্য বেদনায় ব্যথা অনুভব না করিয়া পারা যায় না। আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা অতি তীক্ষ্ণ ছুরিকার সূক্ষ্ম ফলার মত এই শিশুর মনটাকে যে নিয়তই কাটিতেছে, ইহাতেই তাহার খেলা ধূলা ঘুড়ি নাটাই বন্ধু সমপাঠী, মায়ের উপর আব্দারের অত্যাচার, ভুলাইয়া তাহাকে এই অকাল প্রৌঢ়ত্ব প্রদান করিতেছিল, ইহাতে সে নিঃসংশয়ই ছিল। একদিন কথায় কথায় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে, সেই যে চিঠিখানা লিখেছিলি, তার উত্তর এসেছে?" মা যে এ প্রশ্ন কোন দিন না কোন দিন করিবেন, এ ভয় অজিতের মনে ছিল। তথাপি জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার অন্তর-সঞ্চিত নিবিড় বেদনা চঞ্চল হইয়া উঠিল। মুখখানা পাশের দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া, নত-চক্ষে সবেগে

মাথা নাড়িয়াই, সে দ্রুতপদে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ডাল নাড়া দিলে যেমন পাতায় ভরা জল ঝরঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে, মায়ের মুখের ঐটুকু কথাতেই তেমনি করিয়া তাহার গোপন-সঞ্চিত অভিমানাশ্রুরাশি বাহিরে আসিবার জন্য উদ্দাম-বেগে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনের এই সর্ব্বপ্রথম সফলতার আনন্দময় দিনে জীবনকে এত বড় ব্যর্থতার বেদনায় ভরাইয়া নিরানন্দ করিয়া তুলিতে যে পিতৃ-হৃদয় একবিন্দু সঙ্কোচমাত্র করিল না, সেই পিতাকেই যে সে দেবতার উর্দ্ধে স্থান দিয়া রাখিয়াছিল, আজীবন ইঁহার নিকট তীব্র অবমাননা লাভ করিয়াও সে যে তাঁহার দত্ত লাঞ্ছনাকে তাঁহারই গরিমারূপে কল্পনা করিতে ছাড়ে নাই, সেই পিতার এই এত বড় নিষ্ঠুর পরিচয় কেমন করিয়া সে আজ সহ্য করিবে? সামান্য একটা কাগজে কয়েকটা অক্ষর টানিয়া পাঠাইলে যদিই তাঁহার ব্রতভঙ্গ হইত, তা না হয় না-ই পাঠাইতেন। যাহার অন্তর তাহার প্রতি বিদ্বেষের বহ্নিতে অগ্নিময়, তাহাকে অজ্ঞাতে স্পর্শ করিয়াও যে হস্ত অস্পৃশ্য স্পর্শের সঙ্কোচে কুঞ্চিত হইয়া উঠে—সেই হাতের চিঠি তাহাকে পাঠাইয়া অবহেলার চরম দেখাইবারও কি তাঁহার প্রয়োজন ছিল?

চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

কথং রাজা স্থিতো ধর্ম্মে পরদারান্ পরামৃশেৎ?
রক্ষণীয়া বিশেষেণ রাজদারা মহাবল ॥

—রামায়ণম্।

নসিরুল্লা সাহেব ও বড় বিবির মৃত্যু হইয়াছিল। ছোট বিবি তাঁহার ছেলে-মেয়েদের লইয়া নিজের ভাইয়ের কাছে রংপুরে চলিয়া গিয়াছেন। খাঁ-সাহেবের অত বড় বাড়ীখানা এখন কেবল রাবেয়া, হামিদ্ এবং উহাঁদের

জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তসির, এই তিনজনের অধিকৃত। তসির এম-এ পাশ করিয়া ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটশিপ্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সম্প্রতি সেই পরীক্ষা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। ব্যবস্থা এই রকমই হইয়া আছে, যে, যদি তসির পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া চাকরী পায়, তা' হইলে ইহাদের সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইবে। যদি না পায়, পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী করিমের তত্ত্বাবধানে ইহাদের এইখানেই রাখিয়া তাহাকে আরও একটা বৎসর কলিকাতায় ফিরিয়া আইন পড়িতে হইবে।

আষাঢ় মাসের প্রথমেই ছোটখাট একটা বাদ্‌লার মত হইয়া ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। এখন বর্ষণ-ক্ষান্ত ভাঙ্গাচোরা মেঘ আকাশের চারিদিকে শশব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দামোদর এখান হইতে বহুদূর নহে; মেঘের ছায়ায় নদীজল কোথাও বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে; কোথাও বা মেঘাপসৃত রৌদ্র-সম্পাতে আগুনের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ইহার পরপারবর্ত্তী বালুকার উপর রৌদ্র-ছায়ার যুগপৎ সমাবেশ নিস্তরঙ্গ নদীজলের উপর থাকিয়া থাকিয়া মেঘজালের পরিব্যাপ্ত ছায়ায় মসী-কৃষ্ণ কালিমার ঘনীভূত হওন, এবং উদ্যানে ঘনপল্লব বিপুলকায় পাকুড় গাছে পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা, সমস্তই আসন্ন বর্ষণের সূচনা করিয়া আছে। ক্লান্তি-অপনোদনকারী গুমোট্‌কাটা অল্প বাতাসে স্নান-আর্দ্র আষাঢ়-সন্ধ্যার সুবিপুল মেঘজালের ন্যায় নিতম্ব-চুম্বিত দীর্ঘ কেশভার মেলিয়া দিয়া, শয়ন-গৃহের বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া, রাবেয়া একটা ভেল্‌ভেটের জুতায় ফিতার ফুল সেলাই করিয়া বসাইতে বসাইতে, বারে বারে যেন উতলা হইয়া সেই দিগন্ত-প্রসারী মেঘের দিকে চাহিতেছিল; ভাবে বোধ হয় যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে।

দ্বারের বাহিরে মস্ মস্ শব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া সেলাই হাতে লইয়াই রাবেয়া ঘাড় ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হইল, জুতার শব্দটা পাশের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তখন থাকিতে না পারিয়া সে ব্যগ্র হইয়া ডাকিল, "হামিদ্!"

শব্দ ফিরিল।

"ওঃ! তুমি এইখানে?"—হামিদের পরিবর্ত্তে তসির আসিয়া ঘরে ঢুকিল দেখিয়া, নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া লইয়া, রাবেয়া আবার পূর্ব্বকৃত গোলাপি ফিতার পাপ্‌ড়ি সূতা-পরানো সূচির সাহায্যে অর্দ্ধ-প্রস্তুত গোলাপ-ফুলের অঙ্গে যোজনা করিয়া দিয়া, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইল।

গৃহপ্রবিষ্ট তসির ইহা লক্ষ্য করিল। এই সুস্পষ্ট অবজ্ঞায়, তাহার বুকটা কে যেন দুই পা দিয়া মাড়াইয়া ধরিয়াছে, এম্‌নি একটা তীব্র ব্যথায় এক মুহূর্ত্তে তাহার হাসিমুখ বিবর্ণ পাংশু হইয়া আসিল। তথাপি আভ্যন্তরিক বেদনার কোন চিহ্নই বাহিরে প্রকাশ না করিয়া, অগ্রসর হইয়া গিয়া সে রাবেয়ার সম্মুখে অদূরে দাঁড়াইয়া, সংযত-স্বরে কহিল, "আমি এসেছি বলে তুমি বিরক্ত হয়েছ, না?"

রাবেয়া ফুলের মধ্যে পুষ্পরেণু তৈরি করিবার জন্য ছুঁচে হল্‌দে রেশম পরাইবার জন্য জান্‌লার সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, নত-মুখেই উত্তর দিল, "হলেই বা উপায় কি?"

মুখের উপর এই উত্তরে আবার একবার তসিরের সুগৌর মুখমণ্ডল বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ক্ষণকাল মাত্র নীরব থাকিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আমার সেখানে কি সুখে দিন রাত কাটে, তা' কি একটুও ভেবে দেখবার বিষয় বলে তোমার মনে হয় না রাবেয়া?"

রাবেয়া এ কথার জবাব এড়াইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

তসির গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল, "হোক্ না হোক্, তোমার তার জন্য কি আসে যায়? এই তো মেস্ থেকে বাড়ী আসার জন্যই রাগ করেছ। দু'দিন পরে যখন—"

আকাশভরা মেঘের কাজলমাখা অন্ধকারে ঘরের মধ্যটা ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছিল, সূচীর সূক্ষ্ম রন্ধ্রের সন্ধান স্বল্পালোকে না পাইয়া, রাবেয়া তখন

তাহাদের পরিত্যাগ করিবে কি না, এই কথাটাই ভাবিতেছিল,—তসিরের এই সাভিমান উত্তরে সে স্চটা ভেল্‌ভেটে বিঁধিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল ; এবং অনতিকাল পরেই খাবারের প্লেট্ হাতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তসির তখনও ঠিক্ তেমনই করিয়া, সেই জায়গাটাতেই জানালার বাহিরে চোখের দৃষ্টি রাখিয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখ দুইটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত, মুখখানাও তেম্‌নি ম্লান। দেখিয়া, রাবেয়ার স্বাভাবিক মমতাপূর্ণ চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া, খাবারের থালাটা সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া, হাসিয়া বলিল, "থাক্, হয়েচে, আর রাগ করতে হবে না—এখন খাবে এসো দেখি।"

তসির কহিল, "না, আমার ক্ষুধা নাই।"

"তা নাই থাক্, কিছু তো খাও।"

তসির পুনশ্চ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া খাইতে বসিল ; এবং ক্ষুধার জ্বালা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলে, অভিমানের যন্ত্রণাটাও সেই সঙ্গে সামান্য পরিমাণে কমিয়া আসিল। তখন নিজের খাদ্যশূন্য থালা এবং রাবেয়ার কৌতুকহাস্যে বিমণ্ডিত মুখ দেখিয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, যে, সে রাগ করিয়া বলিয়াছিল, তাহার ক্ষুধা নাই। লজ্জিত হইয়া সে হাত গুটাইতেছিল। আরও কিছু খাদ্যদ্রব্য পাতে ফেলিয়া দিয়া, রাবেয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "তবে না কি তোমার ক্ষিধে পায় নি?"

তসিরও তখন লজ্জা চাপিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল।

খাওয়া দাওয়ার পর পানের বাটা খুলিয়া রাবেয়া পান সাজিতে বসিয়াছিল। তসির আসিয়া কাছেই একটা বেতের মোড়া টানিয়া আনিয়া বসিয়া পড়িল ; বলিল, "আজ তোমার সঙ্গে আমার গোটাকয়েক কথা আছে। কথাগুলো আমায় একবার শেষ অবধি বল্‌তে দিও, প্রথম থেকেই তাড়া দিয়ে জড়িয়ে দিও না, দোহাই তোমার।" এই বলিয়াই সে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ টিপু-সুলতানের বংশধর দুই হাত যোড় করিল।

মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হইলেও, বাহিরে মনোভাব যথাসাধ্য দমনে রাখিয়া, রাবেয়া জাঁতির দ্বারা কেয়াখয়ের কুচাইতে কুচাইতে সকৌতুকে হাসিয়া কহিল, "তোমার তো সেই পচা পুরানো সলোমনের আমলের সেই একই কথা। সে রোজ রোজ শুনতে ধৈর্য্য আর থাকে কই?"

তসির ও একটুখানি রঙ্গের লোভ ছাড়িতে পারিল না;—হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "ভাল কথা, উচিত কথা, পচে না। দেখ্‌চো তো কোরাণ সেই কবে লেখা হয়েছিল,—আজও তার বয়েৎ মোস্‌লেম-জগৎ মাথায় করে বইছে। যা' নিত্য নূতন, সেই-ই চির-পরিবর্ত্তিত।

"তুমি তা'হলে আবার নূতন ক'রে কোরাণের বাণী শুনাতে এসেছ? বেশ, শুনতে ধৈর্য্য থাকে, শুন্‌বো। ঐ যা! বৃষ্টি এসে গেল। হামিদ্‌টা এখনও বাড়ী ফির্‌লো না, এমন ছেলেটা হয়েছে।"

তসির সেই বড় বড় ফোঁটার দিকে চাহিয়া কিছু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "এ বৃষ্টি তো সহজে ছাড়বে না। সে গেছে কোথায়?"

"অজিতদের ওখানেই হবে। অজিত প্রথম হ'য়ে পাশ হ'য়েছে ব'লে, আজ ওদের বাড়ী তার বন্ধুদের নেমন্তন্ন ছিল কি না। হামিদও যে একদিন তার বন্ধুদের ফলটল পাঠাতে চায়,—আর দু'চারজনকে খাওয়াবেও বল্‌ছিল।"

তসির বলিল, "বেশ তো, কিন্তু তা'হলে আর দেরি ক'রে কাজ নেই। আমাদের তো শীঘ্রই এখান থেকে যেতে হবে। সাত দিনের মধ্যেই আমার খুল্‌নায় পৌঁছান চাই?"

পান মুড়িতে মুড়িতে, মোড়া বন্ধ করিয়া রাবেয়া বিস্মিত-চোখে চাহিল। তাহার চোখের ঘন পল্লবের মধ্যে সে বিস্ময়লেখা পাঠ করিতে গিয়া, তসিরের মুগ্ধ দৃষ্টি অকস্মাৎ আর ফিরিতে পারিল না। নির্জ্জন-কানন-বিহারিণী এই অপরূপ উদ্যানলতার অলৌকিক রূপের পরিমলে সে অন্ধ অলি আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, আকাশের যে তড়িৎ মেঘের মধ্যে

মুহুর্মুহু চকিত হইতেছিল, তাহার সে ত্রস্ত লুকোচুরি বুঝি শুধু ইহাকেই মুখ দেখাইবার লজ্জায়!

মুহূর্তে রাবেয়া তাহার সে দৃষ্টি অনুভব করিয়া সচকিতে মুখ নত করিয়া ফেলিল। গাঢ় রক্তে তাহার আললাট চিবুক কে যেন আপেলের মত রঙ্গাইয়া দিল। মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া এই কথা সে ভাবিল, যে, এ পোড়ার মুখে খোদা যে কি ছাই খোদ্‌গারী ক'রে রেখেছেন, তা তিনিই জানেন! প্রকাশ্যে এই ভাবটাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য, নিজেকে তৎক্ষণাৎ কথা কহাইবার জন্যই তাড়াতাড়ি করিয়া কহিল, "খুল্‌নায় এখন কি কর্‌তে যাবে? সেখানে কে আছে?"—তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া লইয়া, হাসিয়া বলিল, "বউ আন্‌তে যাবে বুঝি?"

তসিরের গম্ভীর মুখ অধিকতর গম্ভীর হইয়া আসিল। সে ব্যথিত ভর্ৎসনার সহিত কহিল, "তোমার মুখে এ বিদ্রূপ সাজে না রাবেয়া!"

রাবেয়া কহিল, "তা'ছাড়া আর কার মুখে সাজে তসির?"

"তা আমি জানি নে; কিন্তু তুমি সব জেনে শুনেও, নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত ওই তামাসা যখন তখন কি ক'রে করো, বল দেখি? একটু দয়া-মায়াও শরীরে নেই কি আর?"

রাবেয়া কঠিন-মুখে চাহিল। বলিল, "না, নেই। কি ক'রে থাকবে? খোঁচায় খোঁচায় তুমিই যে আমার মনটাকে কড়া পড়িয়ে দিয়েছ। কোমল তো থাক্‌তে দাও নি।"

"আর আমার তুমি কি ক'রেছ বলো দেখি?"

"তোমার—তোমার আমি কি করেছি? কিছু না! ঈশ্বর আমায় তোমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী গড়ে পাঠিয়েছেন, আমি আজও ঠিক্ তাই আছি। তুমি বুদ্ধির ভুলে বুঝ্‌তে না পার, সে দোষ তোমার বিকৃত বুদ্ধির।"

তসির মাথা হেঁট্ করিল। তার পর মনে মনে কি গড়িয়া লইয়া, সহসা যেন একটা বলের সঙ্গে মুখ তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "ওসব

তোমার হিন্দু-সংসর্গের ফল রাবেয়া,—তা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নিজেকে ভগ্নী পদবীতে দাঁড় করিয়ে তুমি যখন তখন আমায় লজ্জা দিতে চাও, সে আমি কি বুঝিনে? কিন্তু আমাদের সমাজ-ধর্ম্ম হিন্দুদের সঙ্গে ঠিক্ এক নয়, এ কথাটাই বা তোমার ভুলে গেলে চল্‌বে কেন? বিধবা বিয়ে, আত্মীয় বিয়ে মুসলমান-সমাজে নিন্দনীয় নয়, সে তুমিও তো জানো।"

"জানি বৈ কি। আত্মীয়-বিবাহ সম্বন্ধে আমি কোন দিন কোন কথা তোমায় তো বলিও নি। কিন্তু বিধবা বিয়ে তুমি যে বলো আমাদের সমাজে নিন্দনীয় নয়;—তা জিজ্ঞাসা করি তোমায়,—বলো তো তুমি,—সে সমাজটা কাদের নিয়ে? তুমি, ক'জন শাহাজাদি, ক'জন বাদ্‌শার বেগম, ক'জন মৌলভীর স্ত্রীকে দু'বার বিয়ে কর্‌তে শুনেছ?—ছি ছি, তসির, ছি ছি! তোমার লজ্জা করে না? আমি যে মনে হ'লে লজ্জায় মরে যাই! তুমি এসব কথা মুখে আনো কি ক'রে? তোবা, তোবা, মানুষ কি ছাগল না ভেড়া?"

বলিতে বলিতে গভীর লজ্জায় আকপোল কণ্ঠ আবীরমাখা হইয়া উঠিল। মসলার কৌটার ঢাকনি বন্ধ করা ছাড়িয়া, দুই করতল দিয়া সে নিজের সেই লজ্জারক্ত মুখখানা ঢাকা দিল।

অকস্মাৎ তাহার ব্যবহারের অসঙ্গতিজনিত এই নিদারুণ লজ্জার গভীর ক্ষোভ তসিরের মনের অঙ্গে যেন তপ্ত লৌহের ডাঙ্গস্ হইয়া ঘা মারিল। সহসা সেই চকিতে দেখা লজ্জারুণ মুখের প্রদীপ্ত শিখা তাহার বুকের মধ্যে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া লজ্জার জ্বালা জ্বালাইয়া দিল। নিজের লজ্জায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গিয়া, সে ঘরের হাওয়া বাতাস শুদ্ধ যেন ভরাইয়া দিতেছে, এমনি তাহার মনে হইল। কতক্ষণই যে সে তাহার সম্মুখবর্ত্তিনীর সেই তাহারই লজ্জায় লজ্জিত মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না, তাহার ঠিকানা নাই। অনেকক্ষণ পরে যখন চারিদিক হইতে মুষলধারায় বৃষ্টি-পতনের শব্দ ক্রমশঃ হ্রস্ববেগ হইয়া অবশেষে শান্ত হইয়া আসিল,—

জন-বিহীন স্তব্ধ পুরীমধ্যে শুদ্ধ ঝিল্লীমুখর নীরবতা মাত্র বিরাজমান হইয়া রহিল,—আকাশের মেঘস্তর ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া, তাহার মধ্য হইতে অবসান-বেলার পীতাভ শেষ রৌদ্র এক ঝলক স্বর্ণ-বৃষ্টির মত সলিলার্দ্র গাছে, পাতায়, পথে, প্রাসাদে সর্ব্বত্র ঝলমল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—জীবনের সমস্ত ভুল ভ্রান্তি চুকাইয়া দিয়া যেন অশ্রুধৌত নির্ম্মলতার উপর দিয়া দেবতার সুপ্রসন্ন আশীর্ব্বাদধারা প্রকাশিত হইল, তখন সচমকে মুখ তুলিয়া চারিদিকে, এবং স্তব্ধ স্থির তসিরের অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চকিত কটাক্ষক্ষেপ করিয়া লইয়া, রাবেয়া ত্রস্তভাবে সাজা পানগুলা আঁজলা পুরিয়া ডাবরে ফেলিল, এবং মসলাপাতির কৌটাগুলা ত্বরিতহস্তে বাটায় ভরিয়া দিল। তারপর উঠিবার উদ্যোগ করিয়া, আর একবার সেই একই অবস্থায় অবস্থিত তসিরের মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া, তাহার মুখের যথাপূর্ব্ব বিহ্বল বিষণ্ণতায় ক্রুদ্ধ হইয়া, অত্যন্ত কঠিন তিক্ত স্বরে কহিয়া উঠিল,—"তসির! তসির! তুমি আমি হাজারও ভুলে যাই, তবু ইতিহাসের ধারা বদল হবে না। টিপু-সুলতানের রক্ত থেকে ওই দেহটাকে যখন বঞ্চিত করা সম্ভবই নয়, তখন এই ছার জন্মটায় মনের মধ্যে যতবড় দানবকেই বাসা দিয়ে রেখে থাক,—বাহিরেও অন্ততঃ সেই রক্তের খাতিরটাও বজায় রাখ্‌তে চেষ্টা করো। আর যে খোদাতালা তোমায় আমায় জোলা মালার ঘরে না পাঠিয়ে, সুলতান-বংশরক্তে জন্ম দিয়েছেন, তাঁকে গুণে হাজারবার করে অভিসম্পাতের পয়জার মেরো। কাজটা তিনি নিঃসন্দেহই ভাল করেন নি। আমরা যার ইজ্জৎ রাখবার যোগ্য নই, সেখানে আমরা যে কি করতে আসি, তা যিনি পাঠান, সেই তিনিই জানেন। কি দরকার ছিল এমন মর্য্যাদা দেবার, যা আমাদের পক্ষে পায়ের বেড়ি মাত্র হবে?"

বিদ্যুতের মত একটা অসহনীয় লজ্জার তড়িৎ তসিরের পদনখ হইতে উঠিয়া মাথায় চুলের গোড়া পর্য্যন্ত বহিয়া গেল। সে আরক্ত-মুখে,—

"রাবেয়া"—বলিয়া, কি বলিতে গিয়া, দ্বিগুণিত লজ্জায়, ভাষা হারাইয়া ফেলিয়া, স্তব্ধ হইয়া গেল। জ্ঞানের উন্মেষাবধিই যে সে এই জ্যোতির্ম্ময়ীর পশ্চাতে উল্কার মত ছুটিয়া ফিরিতেছে;—অনেক উপদেশ, অনেক অনুনয় অনেক ভর্ৎসনাই ইহার মুখ হইতে সে নিজেকে সর্ব্বস্বান্ত করার পরিবর্ত্তে ফিরিয়া পাইয়া 'দেওয়ানা' হইতে বসিয়াছে, তথাপি জীবনের এ খর মধ্যাহ্নেও সে আশার নেশা তাহার ছুটে নাই। কিন্তু আজ অকস্মাৎ এতবড় লজ্জার বান কোথা দিয়া তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের একটানা স্রোতের মুখে ঘা দিয়া ফিরাইল? যেখানে শুধু তরতরে নদীর জল ছিল, ঢেউএর পর ঢেউ সেখানে আঘাত দিয়া দিয়া এ কি কর্দ্দম বাহির করিল? সমস্ত জলটাই বুঝি ঘোলাইয়া উঠে।

রাবেয়া কিন্তু এ ভাবের কোন সন্ধানই পায় নাই। সে তাহার মুখে এমন আবেগ-রুদ্ধ গদ্‌গদ্ স্বর যে অনেকবারই শুনিয়াছে,—কেমন করিয়া অন্য প্রকার সন্দেহ করিবে? সে প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বাধা প্রদান করিল—"হাঁ, কেনই যে শূকরের পায়ে মুক্তা তিনি পরিয়ে বসেন, এ যদি আমি কোন মতেই বুঝ্‌তে পারি! যারা নিজের দেহ মনটাকে প্রবৃত্তির স্রোতে ভেলার মতন ভাসিয়ে দেওয়াটাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য জ্ঞান করে,—দিলেই হ'তো তাহাদের ক্যাওরার ঘরে পাঠিয়ে। নিবৃত্তি ব'লে জগতে যে একটা শব্দ আছে, তা কাণেও কোন দিন শুন্‌তে হোতো না। যারা বোনের স্নেহ সেবা সব তুচ্ছ ক'রে, তার দেহখানার দিকেই লোলুপ-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, আমার মতে সেই রক্তমাংসের লোভে অন্ধদের বাঘ-ভাল্লুক হ'য়ে জন্মালেই সব চাইতে বেশি শোভা পেত। আর যদি ইংরেজ রাজত্ব না হ'য়ে, মুসলমানের সেই বিগত গৌরব অতীতের কথা মাত্র না হ'তো,—আমিরদের স্থান আজ সমাজের কোন্ স্তরে হ'তো তসির? সেখানে সেই হায়দার-আলির রাজসিংহাসনের তলায় দাঁড়িয়ে তুমি তোমার বিধবা বোন্‌কে নেকা কর্‌বার কথা মুখ দিয়ে বার কর্‌তে পার্‌তে কি তসির?

আজ মাথায় তোমার ঘা, সেই ঘায়ের বিষে সর্ব্বশরীর জরে গেছে, পঙ্গু হ'য়ে পথের ধারে পড়ে আছে, তাই না বৃত্তিও অমন হীন হ'য়ে পড়েছে! যারা নিজের মর্য্যাদা হানি করে, পিতৃ-পুরুষের মর্য্যাদা নাশ করে—"

"বাস্তবিকই তারা জাহান্নমে যাবার যোগ্য।—রাবেয়া! রাবেয়া! সত্যই তুমি শাহাজাদি। আজ তোমার মর্ম্মঘাতী কথার মধ্য দিয়ে আমি যেন পূর্ব্বপুরুষের অধিকৃত সম্মানের সেই উচ্চ সিংহাসন মনের চোখে দেখ্‌তে পাচ্চি। আর সেই গৌরব-সিংহাসনে আসীনা দেখ্‌ছি মহামহিমময়ী সুলতানা রাবেয়া রূপে তোমাকে। আমার মোহ যে আজ লজ্জায় মুখ লুকুতে কোথাও আড়াল পাচ্চে না রেবা! এত দিন এত ধৃষ্টতা দেখিয়েছি যে, সে সব কথার ক্ষমা চাইতে যাওয়া আজ ধৃষ্টতার মাত্রা কেবল বাড়িয়ে তোলা। শুধু এইটুকু বলেই শেষ কর্‌তে চাই যে, আজ থেকে আমি তোমার ভাই; তুমি আমার বোন্। আর কোন হীনতা তুমি তোমার বংশের রক্তে দেখ্‌তে পাবে না।"

"তসির! সত্যি এ কথা?"

"আমারও শরীরে টিপু-সুলতানের গায়ের রক্ত আছে তো রাবেয়া!"

"তসির, ভাই, অনেক কটু কথা বলেছি,—তুমিও আমায় ক্ষমা করো ভাইটী আমার! তা'হলে ছোটমার ভাইঝির সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক্ কর্‌তে ছোটমাকে চিঠি দিই?"

অত্যন্ত বিষণ্ণ হাস্যে তসিরের কমনীয় মুখ প্লাবিত হইয়া গেল। "আর ত্বরা সইছে না? ওঃ, বুঝেছি! এখনও তুমি আমায় ভাল ক'রে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌চো না, না? তা যা কর্‌লে আমি তোমার কাছে বিশ্বস্ত হ'তে পারি, তাই না হয় করো! আর আমার তো চাইবার বেশি কিছু নেই।"

"খোদাতালা নিশ্চয় তোমার ভালই কর্‌বেন তসির! আমাকে তুমি যে আজ কি যন্ত্রণা হ'তে মুক্তি দিলে ভাই, সে শুধু তিনিই জানেন। আমার জন্য তোমায় সর্ব্বদা অসুখী দেখে দেখে, সত্যি বল্‌চি তোমায়, বাঁচতে আর আমার একদণ্ডও সাধ ছিল না।"

তসির উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল, "এখন আবার সাধ হ'চ্ছে বোধ হয়? না হ'লে নতুনবৌ ঘরে তুলবে কে? যা হোক্, আমি খুল্নায় ডেপুটি কালেক্টর হ'য়েছি,—সাত দিনের মধ্যে সেখানে যেতে হবে, তার ব্যবস্থা করো।"

রাবেয়াও হাসিমুখে উঠিয়া পড়িল, "সত্যিই ত সুরু ছেলেমানুষ,—তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে গড়ে দেবার জন্যেও তো একজন মন্ত্রী চাই।—কি রে হামিদ্, এলি? ও হামিদ্! হামিদ্! শুনে যা, তসির পাশ হ'য়ে খুল্নায় ডেপুটি হয়েছে।"

রেলগাড়ির বাঁশীর সুরে এক তীক্ষ্ণ আনন্দ-চীৎকার ছাড়িয়া হামিদ্ আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"আমাকে তা'হলে এই মাসেই একখানা সাইকেল্ কিনে দিতে হবে। তুমি বলেছিলে দেবে।"

"এখনও তো দেবো না বলি নি। যাবার পথে কল্‌কেতা থেকে কিনে নিস্। কেমন? খুসী?"

তসির হাসিয়া বিদায় লইল। রাবেয়ার কণ্ঠ হইতে একটা লঘু নিঃশ্বাস বহিয়া গেল।

একচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

ধ্বংসেত হৃদয়ং সদ্যঃ পরিভূতস্য মে পরৈঃ।
যদ্যমর্ষ প্রতিকারং ভুজালম্বং ন লম্বয়েৎ॥
—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

অজিতের মনের সুখস্বপ্নটুকু শরতের ক্ষীণ মেঘের মত চঞ্চল হইয়া উবিয়া গিয়া, তাহার সমস্ত দেহ মনের উপর রৌদ্রতপ্ত একটা দারুণ গুমোটের মত করিয়া রাখিল। কিন্তু বয়সের ধর্ম্মে তাহাকে ইহার জন্য ক্লান্ত না করিয়া

বরং আর একদিক্ দিয়া ভাবের বন্যায় তাহার নবজীবনকে ভাসাইয়াই লইয়া গেল ;—নৈরাশ্যের পঙ্ক-শয্যায় ফেলিয়া গেল না। বয়সে বালক মাত্র হইলেও, অবস্থার অভিজ্ঞতায় এবং পুস্তকের শিক্ষায় তাহাকে সাধারণ বালক অপেক্ষা অল্পদিনের মধ্যেই যেন এই সরল মাধুর্য্য-মণ্ডিত কৈশোর হইতে একেবারেই উত্তপ্ত যৌবনের মধ্যভাগে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। সে যেদিন মাতার অবিরল অশ্রুপ্রবাহের স্রোতে ভাসিয়া আরক্ত-মুখে অশ্রুস্পন্দিত অন্ধ-নেত্রে নিতাইচরণের সহিত একটা বিছানার মোট ও পিসিমাদত্ত ষ্টীল ট্রাঙ্কটি সঙ্গে লইয়া কোলাহলমুখরিত ঈডেন হিন্দু-হোষ্টেলের দ্বারদেশে অবতরণ করিল, সেদিন সেই সদ্য-মাতৃক্রোড়-ভ্রষ্ট বিচ্ছেদ-ব্যাকুল, দুঃখার্ত্ত বালকের আধিক্লিষ্ট ম্লান মুখচ্ছবিতেও একটা অটল প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও তেজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। যখন মায়ের আদরের দুলাল, অঞ্চলের নিধি, আত্মীয় বান্ধব পরিশূন্য, জনকোলাহলমুখর কর্ম্মকঠোর কঠিন রাজধানীর নির্ব্বান্ধব ছাত্রাবাসের সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি শূন্য কক্ষে, ততোঽধিক শূন্য অন্তঃকরণ লইয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন সেই কাতর অন্তরের মাঝখানে মায়ের অশ্রুপরিপ্লুত করুণ মুখের ছবিখানা একান্তই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। সারাদিনের পুঞ্জীভূত গোপন অশ্রুর রুদ্ধ ধারা যখন এই নিঃসঙ্গ নিরালোক অন্ধকারে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, নয়ন-পল্লব সিক্ত করিয়া ধারায় প্রবাহিত হইয়া শেষে মাথাবালিসটাকে আর্দ্র করিয়া দেয়, তখনও অবসাদক্ষিন্ন কাতর চিত্তে চিরদুঃখিনী জননীরই বিদায়-বেদনায় পরিম্লান মুখচন্দ্রমা একান্তচিত্তে ধ্যান করিতে থাকে। ধ্যানের তন্ময়তায় অবশেষে কখন গণ্ডপ্রবাহি অশ্রুর ধারা থামিয়া যায়, আর্দ্র হৃদয় শান্ত হইয়া সুপ্তির শান্তিতে সমস্ত তাপদাহ জুড়াইয়া দেয়, জানিতেও পারে না। অহোরাত্রের মধ্যে এই সময়টুকুই অজিতের পক্ষে সব চেয়ে আরামের। তাই এইটুকুর জন্য সে যেন কাঙ্গালের মত ব্যাকুল হইয়া পথ চাহিয়া থাকে। নিদ্রার আবেশে স্বপ্নের ঘোরে প্রত্যহই সে মাকে দেখিতে পায়। স্বপ্নের

জননী স্বপ্নের মত রহস্যময়ী নহেন ;—বাস্তবেরই মত, সেই একান্ত তাহারই মা। ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াও তাই সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতেই পারে না যে, স্বপ্ন কোন্‌টা ? এই যে এতক্ষণ সে চিরদিনের মতই চিরপরিচিত মায়ের কোলের মধ্যে শুইয়া, মায়ের গলা জড়াইয়া, তাহার স্নেহ হাস্যে বিভাসিত মুখে চুমা খাইয়া কত আব্‌দার আদর জানাইতেছিল, মা যে তাহার মুখে ভাতের গ্রাস তুলিয়া দিতেছিলেন, স্নান করাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিলেন, দু'জনে হাসি কথার বিরাম ছিল না, সেইগুলাই কি যত মিথ্যা ?—আর এই শব্দহীন বিশাল অট্টালিকার একতলার একটা ছোট্ট কোণের ঘরের মধ্যে সরু খাটের নিঃসঙ্গ শয্যায় মায়ের বুকের পরিবর্ত্তে শীতল একটা পায়ের বালিস জড়াইয়া ধরিয়া সে যে এই পড়িয়া আছে, পাশের আর একখানা খাটিয়া হইতে তাহার গৃহসঙ্গী অপর একটী যুবকের নাসিকা-গর্জ্জন, নির্জ্জন অন্ধকারে শিশুচিত্ত আকস্মিক ভীতি উৎপাদনেও অসমর্থ নয় ;—এই সবগুলাই কি সব চেয়ে বড় সত্য ? অজিত আর সহিতে পারে না। প্রাণপণে কান্না চাপিতে গিয়া সে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে থাকে। এ পৃথিবীতে মা ব্যতীত আর যে তাহার কেহ নাই। সেই মাকে দূরে ফেলিয়া আসিয়া কেমন করিয়া সে একা, একেবারে অসহায় বালক, একাকী এই প্রাণহীন, হৃদয়হীন কলিকাতার বন্দীশালায় দীর্ঘ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবে ?

অতীতের স্মৃতিগুলি আজ অজিতের মানসনেত্রে সন্ধ্যাতারার মত সমুজ্জল মূর্ত্তিতে একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া তাহার দুঃখাহত হৃদয়ে আনন্দের চকিত স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যায়। কবে তাহাকে কে কি বলিয়াছিল। কাহার উপরোধ শুনা হয় নাই। তাহার কোন্ অপরাধের জন্য মা তাহার কোন্ এক সুদূর দিনে দুঃখ করিয়া কি একটা কথা বলিয়াছিলেন—অমনি বুক চিরিয়া চিরিয়া কৃত কার্য্যের অনুশোচনায়, আত্মগ্লানির প্রচণ্ড ধিক্কার তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়াকে যেন রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহে। অতি

ক্ষুদ্রতম কীটাণুটিও যেমন অণুবীক্ষণের তলায় বৃহদাকৃতি লাভ করে, প্রতিদিনের অতি তুচ্ছাদপিতুচ্ছ ব্যাপারটুকুও আজ এই গৃহহীন বালকের চক্ষে তেমনি করিয়া একটা বিশেষ আকার ধরিয়া দেখা দিতে লাগিল। খাইতে বসিয়া অনভ্যাস-প্রযুক্ত মাছের কাঁটা আঙ্গুলে বিঁধিয়া যায়, গলায় বেঁধে, পাচকের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন বিতৃষ্ণায় পাতের উপরেই পড়িয়া থাকে। জলখাবারের জোগাড় করিতে একটি দিনও স্মরণ থাকে না। আর সকল সময়েই পড়াশোনা, খাওয়াপরা—সব চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া—যন্ত্রণার্ত্ত প্রাণটা তাহার কচিছেলের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগল হইয়া গিয়া অনবরত ডাকিতে থাকে, মা, মা, মা! এ ধ্বনি তাহার ব্যথাহত অন্তরের অন্তস্তলে সে কোনমতেই চাপিয়া রাখিতে পারে না;—কেমন করিয়া পারিবে? এইটুকুই যে তাহার স্বজনত্যক্ত নিরালোক জীবনের একটি মাত্র আলো। আবার এই মাকেই স্মরণ করিয়া সে অসহ্য বেদনায় বিক্ষত চিত্তকে সুস্থির করিয়া ভবিষ্যৎটাকে আশার আলোয় সমুজ্জল করিতে বইএর বোঝা টানিয়া লইয়া সেই আলোতেই পড়িতে বসে। মন যখন অবাধ্য ঘোড়ার মত রাশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বর্দ্ধমানের চিরপরিচিত গৃহাভ্যন্তরেই ছুটিতে চায়, তখন স্নেহে শাসনে অটল ধৈর্য্যময়ী মাতৃদৃষ্টিই তাহার ভিতরটাকে লজ্জায় চমকে চাবুক মারিয়া শিষ্ট সংযত করিয়া রাজ্যের কেতাব ও নোট্‌বুকের গাদার মধ্যেই ঠাসিয়া ধরে। বাহিরের মাকে আড়াল করিয়া ভিতরের মা যে এমন করিয়া জাগিয়া উঠিতে পারেন, এ যে ধারণারও অতীত ছিল! আজ এই চরম দুঃখের দিনে পরম পরিতৃপ্তির মতন করিয়া সে এই মানসী-মায়ের ছবিখানাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া, শুধু তাঁহারই মুখ চাহিয়া সীমাহীন দুঃখ-সমুদ্রে নিজের ক্ষুদ্র ভেলাটুকু ভাসাইয়া দিল,—যদি কখনও কূল পায়, তবেই তাহার জন্ম-দুঃখিনী মায়ের মুখে সে হাসি ফুটাইতে পারিবে। আর এটুকুও যদি সে না পারে? ভগবান্! সেই কুপুত্রবতীকে অপুত্রকা করিও,—সংসারের অনেক দুঃখের মত এ দুঃখটাও তাঁহার সহিবে।

নিজের মনের অসহ্য ব্যথায় মার কথা তাহার প্রথম প্রথম বেশি করিয়া মনে হইল না। যখন হইল, তখন সে ভাবিল, মার দুঃখ বুঝি তাহার অপেক্ষাও অধিক। সে তো তবু দশটা চারটেয় কলেজ করে, ভাল লাগুক্ আর না লাগুক্ তবুও পড়াশুনা কিছু কিছু করিতেই হয়। কিন্তু সেখানে জন্মাবচ্ছিন্নে সে একটা দিনের জন্যও মায়ের কোলছাড়া হয় নাই, জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আজ এই পূর্ণ চৌদ্দটি বৎসর নিরবচ্ছিন্ন যেখানে অনন্যসহায় হইয়াই শুধু মায়েরই বুকে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইখানের আশ্রয় হইতে এই যে সে উৎপাটিত হইয়া উঠিয়া আসিল, এর অভাব যার বুক জুড়িয়া শিকড়ের জাল বুনা হইয়া গিয়াছিল, তাহার যত হইবে—সেই শিকড়-ছেঁড়া বুকের বেদনা কি গাছের অভাবের সহিত তুলনীয়?

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া এই কথাটাই অশ্রুজলের মধ্য দিয়া ভাবিতে গিয়া বর্দ্ধিত বিস্ময়ে সহসা তাহার স্মরণ হইল, বর্দ্ধমানে থাকিতে সকাল-বেলায় সাত বার না ডাকিয়া মা কখনও তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিতেন না। এখনও তো সূয্যি ওঠে নি, ওমা, মা গো, আর একটু ঘুমুই না মা! এম্‌নি কত কি আদর-কাড়াকাড়ি,—মায়ের সস্মিত মুখের সেই তিরস্কার "হনুমান ছেলে, নবাবী ঘুমটুকু বেশ পেয়েছেন!" এইটুকু শুনিয়াই আবার পাশবালিসের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওন মনে পড়িয়া গেল। আজকাল তাহার সেই অসাড় নিদ্রাই বা গেল কোথায়? বর্ষারাত্রে যখন আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বজ্রের হুহুঙ্কার সহস্র কামান দাগিয়া ফেরে, ভীষণ কলরোলে ঝটিকা গর্জ্জিয়া উঠে, আর সেই ভীষণ রণাঙ্গনে বিজয়মদে মাতিয়া উঠিয়া রণবাদ্যের কর্ণবধিরকারী ধ্বনির ন্যায় ঝমাঝম্ শব্দে বর্ষণ চলিতে থাকে,—তখন মাতৃক্রোড়ভ্রষ্ট ভীত বালক আড়ষ্ট হইয়া বিছানার মধ্যে জাগিয়া পড়িয়া, মায়ের স্নেহতপ্ত আলিঙ্গনের দৃঢ়পাশ নিজের কুঞ্চিত রোমাঞ্চিত শরীরের উপর অনুভব চেষ্টা প্রাণপণ শক্তিতেই করিতে থাকে। এমন বর্ষারাতে মায়ের কোলের ভিতর ঢুকিয়া গিয়া তাঁহাকে এমন করিয়া

জড়াইয়া সে তুরু-তুরু-বক্ষে মেঘগর্জ্জন শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া থাকিত, যে, সারারাত্রি মাকে সেই একটি পাশেই যাপন করিতে হইয়াছে। এ মা তাহার কেমন করিয়া বাঁচিবেন?

কালের ব্যবধানে সকল শোকেরই হ্রাস হয়। মানব-চিত্তের ধর্ম্মই এই যে, যত বড় দুঃখই হোক্, চিরদিন ধরিয়া সেই একই অসহ্য যন্ত্রণা তাহাতে অনুভূত না হইয়া ক্রমেই ইহার বেগ মন্দীভূত ও সহ্য-সীমার অন্তর্নিহিত হইয়া যায়। অজিতের বিচ্ছেদবেদনাতুর চিত্তও দিনের পর দিনে, মাসের পর মাসে অল্পে অল্পে একটু একটু করিয়া শান্ত হইয়া আসিল। অভ্যাসেই সব করে, বিশেষতঃ ক্ষুধার জ্বালা জিনিষটাকে খুব তুচ্ছ করাও চলে না। পাচক-ব্রাহ্মণের অবহেলাদত্ত অপরিচ্ছন্ন থালায় ছড়ান, অন্ন ব্যঞ্জন আজকাল আর বেশির ভাগই পড়িয়া থাকে না। বর্ষা শরৎ কাটিয়া শীতেরও অন্ত হইয়া আসিল। মেঘের ডাক এখন কদাচিৎ, আর সে ডাক এখন তেমন করিয়া অজিতের বুক কাঁপাইয়া তুলে না। ঘুম এখনও খুবই ভোরে ভাঙ্গে, তবে রাত্রের নিদ্রাকে সুনিদ্রাই বলা চলে। ভোরের আলোকে মায়ের স্মৃতিভরা তপ্ত-অশ্রু উপহার না দিয়া এখন সে ঐ সময়টিতেই ইংরাজি সাহিত্যের বাছা বাছা পাঠাগুলি লইয়া পড়িতে বসে। মার বরাবর সাধ ছিল, সে ভোরের বেলা উঠিয়া পড়া করে; সে তাহার মায়ের কাছে শুনিয়াছিল যে, এই সময়ে পড়া করিলে সময়ের গুণে চিত্তস্থৈর্য্য বশতঃ উহা অধিকতর ফলদায়ক হইয়া থাকে। মায়ের বুকের চেয়ে মায়ের মুখের দিকে চাহিতেই, এক্ষণে তাহার মাতৃ-বৎসল চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। কুলপুরোহিতের পরামর্শ-মত গায়ত্রীর অনুরূপ একটি মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া মা একদা উহা অভ্যাস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।—দুটি বেলা কাচা-কাপড়ে সেই মন্ত্রটী সে আট্রিশ-বার করিয়া জপ করিত। সে যে এ রকম করিত, তাহা দেবতুষ্টির উদ্দেশ্য নয়, শুদ্ধ মায়ের আদেশ বলিয়াই তাঁহার তৃপ্তির জন্য করিত। অথচ মা এ সব দেখিতেও আসিতেছেন না, সে কথাও সে জানে। পিতৃ-সম্বন্ধে

অনেক দিন হইতেই অজিত মনের রাশখানাকে টানিয়া ধরিয়াছিল। পিতার কথা লইয়া মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে গেলেও, চারিদিকের আঘাত-দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্ত বীণার তার কাটিয়া পাছে তাহাতে আবার কিছু বেসুর বাজিয়া উঠে, এই ভয়ে সে তাঁহার চিন্তাটাকে যেন একটা পাথর-ঢাকা কবরের মত সমাহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল এবং সাধ্যপক্ষে সেটাকে যতদূর এড়াইয়া চলিতে পারা যায়, তেমনি করিয়াই চলিত। সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, অপরিচিত পিতার রহস্যময় পরিচয়কে সে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অতীতের যে গৌরবোজ্জ্বল উদার ও মহিমান্বিত পিতৃমূর্ত্তি সে মার নিকট হইতে পাইয়াছিল, সে ছবি, অরবিন্দের কনভোকেশনের ক্যাপ্ ও গাউন-পরা সেই বি এ পাশের সময়ের ছবিটার মতই অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এখন যে পিতার পরিচয়ের দিকে তাহার আহত অভিমানের বেদনা, বুদ্ধি বিবেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া দেখিতে চায়, সে যেন 'এক্সরে'র মত মাংস ত্বক্ সব বাদ দিয়া, শুধু অস্থি-পঞ্জরটাকেই দেখাইতে চায়। কিন্তু মানুষের না কি ঐ স্থানটাই সবচেয়ে কুশ্রী,—আর ভীষণ; কাজেই চোখ সেদিকে ফিরাইয়া আতঙ্কে আধমরা হওয়ার চাইতে দৃষ্টিটাকে অন্যত্র রাখাই সুবিবেচনার কার্য্য। সে জানিত, মা যদি তাহার এই মানস বিদ্রোহের এতটুকু খবর পান, বুক তাঁহার ফাটিয়া যাইবে। মাকে ছাড়িয়া আসিয়া অজিত মাকে চিনিয়াছে। সরল অজিত জটিল সংসারপথে পা দিয়াই আজ কুটিল হইয়া উঠিল কি? যদি তাই হয়, তবে তার জন্য একমাত্র ভাগ্যই তাহার দায়ী।

বার্ষিক একজামিন হইয়া গ্রীষ্মের ছুটী আসিয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া অজিত মা দিদিমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়ে উভয়েই একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "ওমা! এর মধ্যে কতখানি লম্বা হয়েছিস্ রে! মা গো মা! আর তেমনি কি রোগা হ'য়েছিস্! ও অজিত! এমন হ'লি কি ক'রে রে? পেটভরে খাস্ না বুঝি?"

দুর্গাসুন্দরীর বুকের অসুখ শীতে কম থাকিয়া আবার গ্রীষ্মের দিনে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অজিতের কুশল-প্রশ্নের উত্তরে, তিনি বড় দুঃখের একটি ফোঁটা হাসি হাসিয়া দুর্ব্বল-কণ্ঠে জবাব দিলেন, "কেমন আর আছি দাদা! দেখ্‌চোই তো দখ্‌ড়াগাছির কুড়ুলের মত আধপোঁতা হয়েই রইলুম। বাঁচ্‌বোও না, মর্‌বোও না, শুধু তোমাদের জ্বালাবো।" শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া দুটি বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অজিত তখনি সযত্নে কোঁচার খুঁটে উহা মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে পাখাখানি তুলিয়া লইয়া বিছানার একধারে বসিল। চেঁচামেচি করিয়া উঁহার এমন কথাটারও কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। দেখিয়া মনোরমা সবিস্ময়ে মনে মনে বলিল,—"অজু এখন সত্যি সত্যিই বড় হ'য়ে গ্যাছে। কিন্তু ওর মুখখানি অমন গম্ভীর দেখলে আমার বুক যেন কর্‌কর্‌ করে ওঠে। আহা! ও যে আমার বড় ছেলেমানুষ!"

দ্বিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

বরমসিধারা তরুতলে বাসো বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে পতনং ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধবশরণম্‌॥

—পঞ্চসংগ্রহ।

দুর্গাসুন্দরীর জীবন-প্রদীপ নিবিল, কিন্তু বড় অসময়ে। অজিতের "ফাষ্ট আর্টস্‌' একজামিনেসনের যখন একদিন মাত্র বাকী, তেমন সময় নিতাই-মামার মুখে দিদিমার সাংঘাতিক রোগ-সংবাদ উপস্থিত হইয়া তাহার অধ্যয়নের স্রোতে নিমজ্জিত মনকে একেবারে বিপরীত-মুখে টানিয়া লইয়া গেল। কোনমতে শেষ দিনের পরীক্ষাটা দিয়া বাড়ী ফিরিল এবং সেখানে তাহাকে যে সব ভীষণ দৃশ্য দর্শন এবং ভয়াবহ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইল,

তাহার পর কয়েকদিন শোকভারাতুর-চিত্তে এই যে ক্ষতি তাহার হইয়া গেল, সেটাকে সে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ করিতে থাকিলেও, দিদিমার বিচ্ছেদ-দুঃখ যেমন একটু একটু করিয়া অসহ্যাবস্থা হইতে সয়ের দিকে ফিরিতে লাগিল অমনি ভবিষ্যতের স্বর্ণছবি মায়া-মরীচিকার মতই তাহার অপরিসীম বেদনা-হত অন্তরের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। অজিত ফেল হয় নাই বটে, কিন্তু একেবারে থার্ড ডিবিসনেরও অনেকখানি নীচে নামিয়া গিয়াছে। গভীর দুঃখে মনোরমা তখন ভূমিশয্যায় পড়িয়া ছিল। দিনের পর রাত্রি কোথা দিয়া যে তাহার কাটিয়া যাইতেছে, সে খবর সে জানিতেও পারিতেছে না। সমস্ত বিশ্বসংসার তো অনেক দূরের কথা,—এমন কি, অজিত যে তাহারই মাথার কাছে দুই চোখ ভর্ত্তি জল লইয়া নিঃশব্দ বেদনায় নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে, বোধ করি ইহাও তাহার অসাড়-চিত্তে সাড়া আনিতে পারে না। মা সবারই মা ; কিন্তু তাহার মা তো শুধু তাহার গর্ভধারিণীই নহেন। জীবনের এই যে দীর্ঘ—বড় দীর্ঘ একত্রিশটা বৎসর তাহার কাটিয়াছে, সে যে মায়ের কোলেই। অজিতকে ছাড়িয়াও যে এই দুই বৎসর সে শুধু রুগ্না মায়ের সেবা লইয়া নিজের অভাব ভুলিয়া ছিল। আজ এই বিপুল জগৎ বাস্তবিকই তাহার পক্ষে কর্ম্ম-বিমুখতায় শূন্যময়।

অজিতের বিদায়ের দিন কাছাকাছি হইয়া আসিলেও, কত বড় সঙ্কটের মধ্য দিয়া যে তাহার গতিপথ আরম্ভ করিতে হইবে, সে দারুণ কথাটা সে মায়ের কাছে ভাঙ্গিতে পারে নাই ;—মনোরমাও নিজের মানসিক বিপ্লবে এম্‌নি উদ্‌ভ্রান্ত যে, আর কোন কথা যেন মনেই আসে না।

দু'চার দিন ইতস্ততঃ করিবার পর, একদিন প্রাণপণ-বলে নিজেকে কঠিন করিয়া তুলিয়া, অজিত মাকে আসিয়া বলিল, "এই হপ্তার মধ্যেই আমাকে যেতে হবে মা, আস্‌চে সোমবার থেকে কলেজ খুল্‌বে।" মনোরমার আধ-ঘুমন্ত মনটা তখন যেন চমকিয়া জাগিল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, পূর্ণ-দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিতেই, সেই শুষ্কমুখের

ম্লান বিবর্ণতা তাহার চোখ-দুটাকে যেন তপ্ত লৌহের সাঁড়াশি দিয়া টানিয়া বাহির করিতে চাহিল। মাতৃ-হৃদয়ের এই অনবধানতাটুকু মনোরমাকে নিজের কাছেই অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী করিয়া তুলিল। তাড়াতাড়ি কাছে সরিয়া আসিয়া, ছেলের মাথায়, মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে, অশ্রু-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি হ'য়ে গেছিস্ অজি! এমনও আমার কপাল, এক-দিন তোকে ভাল করে দেখলুম না।" তার পর অনেকক্ষণ পরে দু'জনেরই মনের উচ্ছ্বাস কাটাইয়া কাজের কথা হইল। মনোরমা বলিল, "আমায়ও তুই নিয়ে চল্ না অজিত, এখানে কি ক'রে থাক্‌বো আমি?"

মা যে কেমন করিয়া এই নিঃসঙ্গ শূন্য পুরীতে বাস করিবেন, নিজের সকল চিন্তার উপর এই চিন্তার গুরু-ভারটাই অজিতের বুকের উপর সবচেয়ে কঠিন হইয়া বাজিতেছিল। কিন্তু মাকে লইয়া কলিকাতায় যাওয়া যে আরও কতখানি কঠিন, সে কথাও সে এত বেশি করিয়া বুঝিয়াছে যে, তত বড় কঠোর কথা মুখ ফুটিয়া মাকে জানাইবার মত মনের বল তাহার নাই। কোনমতে জানাইল যে, এখন সেরূপ করিতে গেলে এখানের জমিজমা হইতে যাও-বা পাওয়া যায়, তাহাও যাইবে না, এবং উহা ব্যতীত কলিকাতায় গিয়া বাস করা একরকম অসম্ভব!

এইবার যথার্থ করিয়াই পরিপূর্ণ সঙ্কটের মধ্য দিয়া অজিতের জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। মায়ের চুড়ি বিক্রির অবশিষ্ট কয়েকটা টাকা বই কিনিতেই ফুরাইয়া গেল। তারপর বারমাসের খরচের টাকার জন্য বর্দ্ধমানে থাকিতে যে উপায় সে স্থির করিয়াছিল, সেই চেষ্টায় কলিকাতার অলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও সে একটা টিউসনিরও জোগাড় করিতে না পারায়, চারিদিকে আশাহীনতার গাঢ় অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল। উপায়? ব্যাকুল হইয়া নিজের মনকেই সে শতশতবার কাতর প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তবে কি পড়া ছাড়িয়া দিবে? বিশেষ হিন্দু-হোষ্টেলে থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে খরচ তো বড় অল্প নয়! কোথা হইতে অজিত ইহার খরচ

চালাইবে? মায়ের হাতে যে আর সিকি পয়সাও নাই, তা তাঁহার গলার কড় ও পরিহিত সাড়ীতে সেলাই ও তালির সংখ্যাধিক্যেই প্রমাণিত হইতেছে। মাকে সে যে বড়-গলা করিয়া আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে যে, কলিকাতায় টিউসনির অভাব নাই। গেলেই সে নিশ্চয় একটা ভাল দেখিয়া যোগাড় করিয়া লইবে। কিন্তু তাই বা জুটিতেছে কই? কত লোক ধনী আত্মীয়ের প্রসাদে, তাঁদের সাহায্যে পড়িতেছে। তাহার তাই বা কোথায়? থাকিবার মধ্যে এক আছে নিতাই-মামা,—তা তাঁহার কাছেই বা সে নিজের দুঃখ জানাইতে গিয়া কি করিবে? তিনি যে গরীব। নিতান্তই গরীব। ষাট্-সত্তর টাকা মাত্র তাঁহার উপার্জ্জন। ইহারই মধ্যে দেশে মা আছেন, এই কলিকাতায় নিজের একটি ছোট বাসা আছে। বাসায় নিজে, স্ত্রী ও কয়েকটি কন্যা। আবার কন্যাদায়ের মহা চিন্তায় চুলেও পাক ধরিতেছে। ছিঃ! তাঁহাকে কি এর উপর আবার অজিতের নিজের দায় ঘাড়ে লইবার জন্য পীড়ন করা যায়? এর চেয়ে অজিতের পড়াশুনা ছাড়িয়া দেওয়াও ভাল।

তা এ ভিন্ন আর উপায়ই বা কি? কলেজের মাহিনা বার টাকা, হোষ্টেলের খরচ প্রভৃতিতে অন্ততঃ আর গোটা পঁচিশ টাকারও তো দরকার। সাঁইত্রিশ টাকার কমে কিছুতেই যে চলে না। তবে একটা উপায় আছে। প্রেসিডেন্সি-কলেজ ত্যাগ করিয়া সিটি বা আর কোথাও সে যদি ভর্ত্তি হয়, এবং একটা সাধারণ গরীব কেরাণী প্রভৃতির মেসে থাকে, তো কম খরচে চলিতে পারে। কিন্তু হায় রে! অজিতের মনে যে এখন দুরাকাঙ্ক্ষা কানায় কানায় ভরা। এবারের এ অকৃতকার্য্যতা তাহার ভাগ্যদোষে,—এ ত তাহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের ফল নয়। শেষদিনে সে যে পরীক্ষা দিয়াছিল, সে নেহাৎ তাহার দায় বলিয়াই। সেদিন যদি সে স্থির মস্তিষ্কে লিখিয়া পূর্ব্ব কয় দিনেরই ন্যায় পূরা নম্বর পাইত, তো, হয় ত লজ্জিত চিত্ত নিজের মনুষ্যত্বে সন্দিহান হইয়া নিজেকে ধিক্কার প্রদান

করিত। ঐটুকু মানবান্তঃকরণের কোমল আভাস মনের মধ্যে স্থান দিতে পারিলে 'মানব'ত্বের দাবী রাখা চলে না যে। সে যিনি পারেন, হয় ত তিনি দেবতা হইলে হইতে পারেন; কিন্তু মানুষ নহেন। এখনও অজিত আশা করে, যদি কোন প্রকারে বি-এ'টা সে এখানে ভাল প্রফেসরদের কাছে পড়িতে পায়। বিশেষতঃ, সেদিন উহাদের প্রিন্সিপাল নিজে যে তাহার এই অবনতির জন্য দুঃখিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছেন যে, সে যদি সন্ধ্যার পর তাঁহার গৃহে যায়, তো, তিনি তাহাকে নিজেই একটু করিয়া পড়াইবেন। বি-এ'টা ভাল করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, অভাব অনেকটা ঘুচিবে; এবং—এবং তখন নেহাৎ না চলে, চাকরীর বাজারেও স্থান কথঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিবে। আর যদি ভাল স্কলারশিপ্ জুটিয়া যায়, এম্-এ, পি-আর-এস হইয়া সে নিজের বংশের নাম রক্ষা করিবে। আর—আর—এই একমাত্র উপায়েই সে তাহার নিষ্ঠুর, অবিবেচক ঠাকুরদাদার অবিচারের প্রতিশোধ লইয়া, সেই স্বর্গীয় ব্যক্তিকে জানাইয়া দিবে যে, দরিদ্রকন্যার গর্ভেও বংশের উপযুক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ! বিবাহের উদ্দেশ্য যদি বংশরক্ষাই হয়, তবে তাহার জন্য টাকার পুঁটুলীর কিছুমাত্র আবশ্যক করে না। কিন্তু হায়, কে কাহার উপরে আজ শোধ লইবে? পিতামহের দত্ত দণ্ড আজ অজিতের মাথায় সত্যই যে দণ্ডোদ্যত করিয়াছে। জীবনের অকৃতকার্য্যতা যে শুধু অজিতের দুঃখ নহে, তাহার গ্লানি,—তাহার পরাভব! সে যে বসুবংশেরই সন্তান, একদিন দূর ভবিষ্যতে তাহারই পরিচয়ে সমস্ত বসুবংশ নিজেকে সম্মান-মুকুটে ভূষিত বোধ করিবে,—তাহার পিতামহের, এমন কি, তাহার বিদ্যা-খ্যাতি-সম্পন্ন, দয়া-দাক্ষিণ্য-দানের যশে যশস্বী পিতাও এই আজিকার নিরবলম্বন, নিঃস্ব অজিতের পিতৃ-পরিচয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত অনুভব করিবেন।—এ কি আকাশ-কুসুম অজিতের? ভিখারিণী-পুত্রের রাজ-সিংহাসনের স্বপ্ন যে!

কলেজে তাহার সঙ্গে একটি নূতন ভর্ত্তি হওয়া দরিদ্র বালকের ভালবাসা

জন্মিয়াছিল। ছেলেটী এবারের গণিতশাস্ত্রে প্রথম-স্থান অধিকার করিয়াছিল। একদিন কথায় কথায় সে উহাকে বলিল, "আমার কি ভাই পড়া-শুনা কিছু হ'তো? ভাগ্যে আমাদের বাড়ীর পাশে অরবিন্দবাবুরা 'ছিলেন, তাই,'—নৈলে সংসারই অচল,—পড়বো কোথা থেকে!"

অজিতের বক্ষ-শোণিত ক্ষণিক দ্রুত হইয়াই, পরক্ষণে যেন থমকিয়া নিশ্চল হইয়া আসিল। সে বিহ্বল-নেত্রে সঙ্গীর মুখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁরাই তোমার পড়বার সব খরচ দিয়েছিলেন? ভাল তো।"

ছেলেটী উৎসাহ-সহকারে বলিতে লাগিল, "ভাল বলে ভাল! স্বামী স্ত্রী দু'জনেই খুব ভাল। শুধু কি আমাকেই—এমন কত ছেলে কত কলেজে স্কুলে ওদের পয়সায় পড়চে, তার কিছু ঠিক্ নাই। ছাত্রদের সাহায্য উনি বড্ড করেন,—একবার জানালেই হ'লো। অবশ্য যদি দে'বার যোগ্য বোধ করেন। ওঁর স্ত্রী আবার একটা মেয়ে-স্কুল ক'রে দিয়েছেন। দিনকত নিজেও খুব দেখা শোনা করতেন। এখন না কি কোথায় গেছেন,—কল্‌কাতায় প্রায় সাত আট মাস থেকেই তাঁরা নেই। বড়লোক অমন হয়, প্রায় দেখা যায় না।"

অজিত উৎসাহ প্রদান করিতে পারিলে, এই কৃতজ্ঞ ছেলেটি নিজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার উৎস আরও কিছুক্ষণ পর্যন্ত উৎসারিত রাখিতে পারিত। কিন্তু তাহাকে নিরুৎসাহ ও বিমনা দেখিয়া অগত্যাই সে নিজের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া লইল।

তবে কি অজিত তাহার পিতার দ্বারেই আবেদনের ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া গিয়া দাঁড়াইবে? ক্ষতি কি? সন্তানের পিতা ভিন্ন গতিই বা কি? মাথা যদি নত করিতে হয়, তো তাঁহার পায়ে করাই তো ভাল।—অথবা দাতা তিনি, সে ভিক্ষুক,—এই হিসাবে কোন ছদ্ম নামের আশ্রয়ে গোপনে থাকিয়া কিছু—অজিতের অন্তরের সুপ্ত সিংহ-শিশু গর্জ্জিয়া জাগিল।—যে পিতা নিজের পিতৃত্ব পর্য্যন্ত একটি দিনের জন্য স্বীকার করিলেন না, তিনি

পিতা হইলেও তাহার পাতা নহেন। অজিত কলিকাতা মহানগরীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার পাত্র হস্তে পর্য্যটন করিয়া ফিরিবে, কেবল তাহার নিজের পিতার রাজ-প্রাসাদের দরজাটাকেই বাদ দিয়া।

অজিতকে ভিক্ষাপাত্র লইতে হইল না। শীঘ্রই পর পর তিনটা টিউসনি জুটিয়া গেল। পনের, দশ, এবং আরও একটা দশ। এর কমে অজিতের চলে না। তিনটাই সে গ্রহণ করিল। নিজের স্বাস্থ্য, সময়, আনন্দময় ছাত্র-জীবনের ও কৈশোর-সুখের সমুদায় মধুচ্ছ্বাস অন্তর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, প্রাণান্ত পরিশ্রমে দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষার চরণে কিশোর অজিত আপনাকে বলি দিল। নিজের চারিদিকে সে কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তাহাতেই আত্মাহুতি প্রদান করিল।

ত্রিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

মহতস্তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে।
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধোঽপেক্ষ ইব স্থিতঃ॥

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

তখনকার দিনে ইডেন হিন্দু-হোষ্টেলের ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে একটা সাহিত্য-সভা নিজস্বরূপে ছিল। সমস্ত বৎসর ধরিয়া উক্ত সভার কার্য্য তেমন জোরের সঙ্গে চলুক আর নাই চলুক, ইহার বার্ষিক উৎসবটা বড় মন্দ হইত না। শুধু ছেলে ছোকরা দলের কথা নয়। জজ গুরুদাস-বাবু নিজেই তাঁহার ছাত্র-প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ, উহাদের উৎসাহিত করিয়া তুলিবার জন্য, এই কিশোর সভার সভাপতিত্ব বেশীর ভাগ নিজেই করিতেন। প্রতিযোগিতা পরীক্ষার কবিতা-নির্ব্বাচনে গুণীর গুণের পুরস্কার প্রদত্ত ও

ভবিষ্যৎ কাব্য সাধনার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইত। লেখক কয়টি ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার চেয়ে এই কাব্য-পরীক্ষার জন্য স্বল্প যত্ন লইত না, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কে যে কে কতখানি অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, তাহার সংবাদ তখনকার সেই বার্ষিক পুরস্কারের নির্ব্বাচিত কবিতাবলী-সমন্বিত ছাপা চটি বইগুলি হইতে, অথবা আধুনিক কবিদলের জীবনী-বিশ্লেষণ করিয়া, সবিশেষ জানিতে পারা যায় না। তা, গাছে যতগুলি ফল ফলে, সবগুলিই যে পাকিবে; এমনও তো কোন বিধি নাই।

এবারে গুরুদাস-বাবু কলিকাতায় উপস্থিত নাই। কিন্তু ঐ তীক্ষ্ণধী ও সহৃদয় লোকটীর সকল কার্য্যই যেমন সুসংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, তেমনি এ বিষয়েও তাঁহার কিছুমাত্র ক্রটী ঘটিতে পারে নাই। ছেলেদের বার্ষিক সভার অধিবেশনের সময় আগত জানিয়া, উহার মত ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। সভাপতি তাঁহারই একটি প্রিয় শিষ্য,—নামটি যে কি, তাহা ইহারা এখনও শুনে নাই। তবে যিনি এই ব্যক্তিকে তাহাদের জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি অটুট্ শ্রদ্ধায় ছেলেরা এ সম্বন্ধে ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করে না!

সেদিন বসন্ত-প্রভাত। তরুবীথির শাখায় শাখায়, মুঞ্জরিত রক্তাভ পত্রাবলীর অন্তরালে অন্তরালে, পাখীরা প্রাণের সবটুকু আনন্দ ক্ষুদ্রকণ্ঠে ভরিয়া তুলিতেছে। অজিত পটলডাঙ্গার ছাত্রটির বাড়ী হইতে সেদিন সকাল সকাল বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অধরে তাহার মৃদু হাসির রেখা,—মেঘলা দিনের বর্ষণের পর দিনান্তের বৃষ্টিধৌত অম্লান রৌদ্রটুকুর মতই সে হাসি মধুর। আয়ত-নেত্রে গভীর দৃষ্টি তৃপ্তির আনন্দে উজ্জল; বিষাদের কণাগুলি অশ্রুলেখায় ধৌত হইয়া গিয়া, আজ হাসির আলোকে হীরকদ্যুতির ন্যায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বিচ্ছুরিত আভা অজিতের প্রতিভা-দীপ্ত নেত্র-তারকায়, তাহার সুপ্রশস্ত শুভ্র ললাটে, বৈদুর্য্য মণিপ্রভায় জলিয়া উঠিয়াছিল। গতবর্ষের এই বিগত উৎসব-

তিথিটি স্মরণে আনিয়া সারা-বৎসরের তিক্ত ক্লান্তি অবসাদ যেন পুলকের বন্যাপ্লাবনে ভাসাইয়া লইতেছিল। সেবারে তাহার কবিতা পদগৌরবে খুব উচ্চ হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু লোক-চরিত্র-বিশ্লেষণে পটু যে সম্মানিত প্রবীণ উহার নির্ব্বাচক ছিলেন,—অঙ্কুর দেখিয়া বৃক্ষ নির্ণয় করিবার শক্তি তাঁহার অপ্রচুর নয়। তিনিই সেদিন অম্লান-কৌমুদীর মত সুন্দর ষোড়শ-বর্ষীয় বালককে বিশেষ একটু উৎসাহ দিয়া বলিয়াছিলেন, যে, আগামী বর্ষের নির্ব্বাচনে সে-ই যে প্রথম-স্থান অধিকার করিবে, এ বিশ্বাস তিনি অন্তরের সহিতই করিতেছেন। সেই কথাটাই আজ ক'দিন ধরিয়া ফাল্গুন সবুজের প্রথম উন্মেষের মত, আকাশ-ভরা আলো বাতাসের মধ্যে তরুণ জীবনের নবীনোন্মেষিত বসন্ত-মাধুরীর মত, নব আশার দীপক রাগিণীতে অগ্নিদীপ্ত সুরের ঝঙ্কারে তরুণ অজিতের কিশোর জীবনের সমুদয় নির্ব্বাণো-ন্মুখ আশার বাতিগুলি পুনঃ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। এই-টুকু উৎসাহের বাতাসে তাহার ছোট প্রাণটির চারিপাশ হইতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ও ধূলি-জঞ্জালের আবর্জ্জনারাশি অপসৃত হইয়া গিয়া, সেখানে গোধূলির স্বর্ণরাগে যে আশার জ্যোতিরুৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। হায় রে! কিশোর প্রাণের সোণার কাঠি!

সভা সাজান প্রভৃতির ভার আরও দশজন ছেলের উপর ছিল,—এ সব বিষয়ে সরমকুণ্ঠিত, পুস্তককীট অজিতের কোনই হাতযশ নাই। ইংরেজী অভিনয়ে হ্যাম্‌লেট সাজিতে তাহার বাধে না,—সেখানে অভিনয়ের ত্রুটি ঢাকা পড়ে বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণে। কিন্তু কোনখানে লতাপাতা কেমন করিয়া সাজানয় বাহার খুলে, রাঙ্গা সালু কি ভাবে জড়াইলে কম খরচে মানায় ভাল—সে সব বৃত্তান্ত উহার মাথার মগজে প্রবেশপথ পায় না। অত কথা কি—এবারকার এই সভায় যে একজন নূতন সভাপতি হইবেন, এত বড় দামী খবরটাই এখনও পর্যান্ত অজিতের কাছে উত্তর মেরুর মত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। তাহার ঘরের দ্বিতীয় 'সিটে'র ছাত্রটি আবার

উহার চাইতেও [illegible] সে ছেলেটির পূর্ব্ববঙ্গে অতি নিরীহ স্বভাবের ছেলে। নিজেকে পশ্চিমবঙ্গের মহারথীদের হাস্য-কৌতুকের তীক্ষ্ণ শরাঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সে বেচারি সদা শঙ্কিত থাকে, দশের খবর রাখিতে যাইবে কোথা হইতে? তবে দু'জনে মিলিয়া এইটুকু খবর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল যে, এবার কবিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি সোণার ও রূপার দুইটি মেডেল পুরস্কার পাইবে। প্রতিযোগীরা সকলেই এবারে ইহারই জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছিল।

যিনি এবারকার সভাপতি হইয়া আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া ছেলেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, লোকটার কি রকম চেহারা সুন্দর দেখেছ! ঠিক্ যেন সাহেব!—অপর একজন ছেলে—বোধ করি সাহেবের মূর্ত্তিই তাহার চক্ষে রূপের আদর্শ নয়; সে পূর্ব্ব-বক্তাকে চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "ধ্যাৎ তোর! সাহেবের মতন ওর কোন্‌খানটা বল্ তো শুনি? হ্যাঁ, আর্য্য চেহারা বটে!" অজিত আসিয়া এক পাশ হইতে কৌতূহলী হইয়া ইঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়াই তাহার অন্তরের মধ্যে যে উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন সূর্য্য-কিরণে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, স্তিমিত সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে তাহা নিবিয়া গেল। সভাপতির আসনে আসীন যিনি, তাঁহাকে দেখিয়া কেহ যে ম্রিয়মাণ হইয়া মুখ ফিরাইবে,—তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা তেমন কুদর্শন করিয়া তাঁহাকে তো গড়েন নাই; অধিকন্তু, ইহার সাধারণাপেক্ষা একটু বিশেষত্ব-পূর্ণ উন্নত শরীর ও ধবলগিরি-সন্নিভ শুভ্র বর্ণ, বিশেষতঃ, শান্ত গাম্ভীর্য্যময় গভীর দৃষ্টি এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটির উপরে একটু সম্মানের ভাবই জাগ্রৎ করে, এবং এ ক্ষেত্রেও যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তাও নয়,—সেও তো পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতেই প্রমাণ হয়। কিন্তু অজিতের মনে হইল, সে এ সংসারের মধ্যে যে দু'একজনের কাছে একটুখানি ভাল জিনিষ পাইয়াছিল, তাহাদেরই একজনকে ঠেলিয়া ওই লোকটি তাহাকে যেন আজ বঞ্চনা

করিতেই আসিয়াছেন। মন তাহার অপরিচিতের উদ্দেশে অকারণেই ঈষৎ বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল।

একে একে অনেকগুলি কবিতা পাঠ করা হইয়া গেলে, লজ্জা নিবিড় অরুণ লেখায় আপ্রান্ত মুখ রঞ্জিত করিয়া, অজিত নিজের লেখা কবিতা পাঠ করিবার জন্য দাঁড়াইল। এ লেখাটা যদি নিজের না হইত, এত লজ্জার সঙ্কোচে কণ্ঠ ওষ্ঠ তাহার কাঁপিতে থাকিত না। স্কুলে ও কলেজে অনেক আবৃত্তিই তো সে করিয়াছে,—এমন দুর্দ্দশা তাহার আর কখন হয় নাই। বিশেষ এই অস্বচ্ছন্দকর নূতন লোকটিকে শ্রোতা মনে করিতেই, তাহার মন হইতে সকল উদ্যমই যে চলিয়া গিয়াছিল।

সভাপতির সঙ্গে আর একটি প্রবীণবয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আর একটিবার পড়তো বাবা,—বড় মিষ্টি লাগ্‌লো যে। রেসিটেশনের শক্তিটিও তো চমৎকার!"

অজিতের রঞ্জিতমুখে আবার যেন কে খানিকটা আবির মাখাইয়া দিল। কোনমতে উদ্বেলিত কণ্ঠস্বরকে স্বভাবে আনিবার চেষ্টা করিয়া সে পাঠ করিল—

"ঋষি-শাপে সিন্ধুতলে আছ নিমজ্জিতা,
দুষ্টজন-অপবাদে পতিত্যক্তা সীতা,—
তবু চির-পতিপ্রাণা; কায়মনোপ্রাণ,
পতি-দেবতার পদে করিয়াছ দান।
নদী কভু না'রে, ফিরাতে সে জলধারা
দে'ছে যা' সিন্ধুরে।
আজি মাতা তুমি,
পাশরিলে যত ব্যথা সন্তানেরে চুমি।
হেরি পলে পলে,
ধ্যেয়-দেবতার রূপ এ মুখমণ্ডলে।

তাই বুঝি চাও অনিমেষে
আপনার বক্ষনীড়ে ? তৃপ্ত হাসি হেসে,
ঢেলে দাও অন্তরের সুধা-সিন্ধুসার,
অতুলা মায়ের স্নেহ, জননী আমার !
সুপবিত্র সতী-প্রেম গলিয়া ক্ষরিয়া,
মাতৃস্তন্য সুধাসাথে পড়েছে ঝরিয়া,
অবোধ শিশুর পানে। ত্রিদিব-বন্দিতা !
অয়ি, মম স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা !"

"ওহে বোস্‌জা ! ঐ 'মা' শীর্ষক কবিতাটাকেই ফার্ষ্ট প্রাইজ দিয়ে দাও। ঐ তো একটুখানি ছেলে,—ওর পক্ষে ও বেড়ে লিখেছে বল্‌তে হবে ! আর একটিও তো ওর জোড়া দেখি নে।"

সভাপতি মহাশয় বাকি কয়টি কবিতা পাঠের প্রতি একেবারেই মনোযোগী হইতে পারেন নাই। অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়া, তিনি একদৃষ্টে অজিতেরই মুখের দিকে কি এক রকম বিস্ময়বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। সে যখন কবিতা পাঠ সমাধা করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া গেল, পাশে গিয়া দাঁড়াইল, তখনও তাঁহার দু' চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি যেন পথ হারাইবার মহা ভয়ে, একান্ত ভীত অসহায় পথিকের মত, উগ্র ব্যাকুলতায় ব্যগ্র হইয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া সেই তরুণ অরুণেরই ন্যায় উজ্জ্বলমূর্ত্তি ছেলেটী যখন নিজের এতক্ষণকার নত মুখখানি উন্নত করিয়া পূর্ণচক্ষে তাঁহারই দিকে চাহিয়া দেখিল, তখন তাঁহার সমস্ত গায়ে একটা শিহরণ আনিয়া দিয়া হঠাৎ তাঁহার যেন মনে হইল, তিনি এতক্ষণ ধরিয়া যেন একটা অজ্ঞাত অগ্নিশিখাকে অনুসরণ করিতেছিলেন। উপরে তার একটুখানি ছাই-চাপা ছিল, সেইটুকুই এক্ষণে উড়িয়া গিয়াছে। ইহাকে ছোট একটি ছেলে তো কোনক্রমেই মনে করিতে পারা যায় না; বরং তীক্ষ্ণধার, ঝক্‌ঝকে একখানা তরবারির সহিত এই ক্ষীণকায়, উজ্জ্বলবর্ণ,

দীপ্ত-আয়ত-চক্ষু ছেলেটাকে তুলনা করা যায়। স্বচ্ছ রক্ত অধর তাহার দৃঢ়তায় উদ্‌ভাসিত, প্রদীপ্ত চক্ষুদুটি যেন জগতের সমস্ত বস্তু এবং সমুদয় ব্যক্তিকেই তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া, জগদতীত কাহার পানে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকে। তাঁহার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া কিসের দীর্ঘশ্বাস কাহার উদ্দেশে মুহুর্মুহুঃ বৃথাই ভাসিয়া উঠিল। ইতোমধ্যে পরীক্ষার্থী বাকি ছেলেরা—বেশি বাকি ছিল না,—দু' তিনজন কবিতা শুনানো শেষ করিয়াছে; এবং সভাপতির সহকারী মহাশয় পূর্ব্বোক্তমত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।—ভাগ্যে ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনা হইয়াছিল।

চট্‌কা ভাঙ্গিয়া সভাপতি বন্ধুর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "হাঁ, আমিও তাই স্থির করেছি। দ্বিতীয় হবার যোগ্য কা'কে মনে ক'র্‌ছেন?"

"এই দেখ না, আমি এই পর পর নম্বর দিয়ে যাচ্চি, এখন তুমি নিজে দেখেই যা ভাল মনে হয়, স্থির করো।—" এই বলিয়া প্রবীণ সাহিত্যসেবী আদিত্যবাবু কবিতার কাগজ কয়খানি তাঁর বন্ধুর দিকে ঠেলিয়া দিলেন। তাঁহার বন্ধুও প্রত্যেকটির উপর আর একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া গিয়া নম্বর দিয়া দিল এবং মন্তব্য করিল, "দ্বিতীয় পুরস্কার 'বুদ্ধদেবের' কবি প্রভাতমোহনকেই দেওয়া যাক্। অবশ্য আরও দু' চারজনের লেখাও বেশ উল্লেখযোগ্য হয়েছে এবং এ'ও আমি অন্তরের সহিত আশা কর্‌ছি যে, ভবিষ্যতে এঁদের দ্বারাই একদিন বঙ্গীয় কাব্যকলার শ্রীসম্পদ্ বৃদ্ধিই পাবে। এ সম্বন্ধে যা' আমার বক্তব্য, তা' আমি পরে বল্‌ছি। আপাততঃ এই পুরস্কৃত দু'জনকে তাঁদের ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। প্রথম পুরস্কৃত 'মা' কবিতার কবিটির নাম? নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কৃত করার নূতন ব্যবস্থা হওয়ায় নামটা তো মেডেলে খোদাই করা হয় নি।"

পুরস্কার-গ্রহণোদ্দেশ্যে সমীপে এবং সম্মুখে আগত অজিত এতক্ষণের পরে একটুখানি সশ্রদ্ধভাবে নবীন সভাপতির মুখের দিকে চোখ তুলিয়া

চাহিয়া, হাসি হাসি মুখে সাম্‌নের ছোট টেবিলটার একেবারে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে নিজেই এই জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করিল।—"শ্রীঅজিতকুমার বসু।"

সভাপতির হাত হইতে ঠক্ করিয়া সোণার মেডেলটা টেবিলে এবং সেখান হইতে গড়াইয়া সেটা মাটিতে পড়িয়া গেল। অনেকগুলা দেহ কুড়াইবার জন্য নত হইয়াছিল, কিন্তু নিজের পায়ের তলা হইতে কুড়াইয়া লইয়া আদিত্যবাবুই ইহা অসাড়, অস্পন্দ সভাপতি মহাশয়ের হাতের মধ্যে জোর করিয়া গুঁজিয়া দিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, "ওহে অরবিন্দ! এতে তো দেখ্‌ছি, পিন্‌ও নেই, কার'ও নেই,—পরিয়ে দেবে কি ক'রে? তা' দাও, শিশু-কবির হাতেই দাও। যেমন সব কাণ্ড কারখানা তোমাদের! দেখে শুনে তো নাও না কিছু গোড়ায়—"

"অরবিন্দ!" বাঁশীর তানে কুরঙ্গ যেমন উৎকর্ণ হইয়া ফিরে, তেমনি করিয়া, শব্দমুগ্ধ অজিত স্বপ্নমুগ্ধেরই ন্যায় পুরস্কার-প্রদানোন্মত তাহাদেরই নিমন্ত্রিত অতিথির পানে বিস্ফারিত দুই নেত্রে চকিত কুরঙ্গের মতই চাহিল। একটি নিমেষের জন্য তাহার বিস্ময়ালোড়িত বক্ষের তলে তলে বহু দিবসান্তের শ্রান্তিভারাতুর সুপ্তিময় আনন্দের স্রোত কল-কল্লোলে জাগ্রৎ হইতে গিয়াছিল,—একটি নিমেষের মধ্যে তাহার অবিশ্বাসের তীব্রতাপে তপ্ত উন্নত মস্তক নম্রভক্তিভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়া, কাহার চরণতলের পুণ্যক্ষেত্রে আপনাকে লুণ্ঠিত করিয়া দিবার লোভে নত হইয়া পড়িতেছিল;—মনের প্রাণের সে উদ্দাম উচ্ছ্বাসের অব্যক্ত লহর একটি মুহূর্ত্তেরই মধ্যে দেওয়ালি রাত্রের আলোর লহরেরই মত, নিশীথ রাত্রের উজ্জ্বল তারকার ন্যায়, তাহার দুই আশ্চর্য্য আয়ত চক্ষের ভিতর দিয়া, তাহার প্রভাত আকাশের মত স্বর্ণমণ্ডিত উন্নত ললাটের মধ্য হইতে, ফুৎকৃত আগুনের দুইটি স্ফুলিঙ্গেরই মত সহসা দীপ্তগণ্ডযুগলের যুগ্মপথে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু হায়! সে শুধু নিমেষেরই জন্য।—নিমেষমাত্র পরেই ঝড়ে-নেবা ঝাড়ের আলোর মত

একসঙ্গে সমস্ত ঔজ্জ্বল্য নিঃশেষ হইয়া গিয়া, তাহার মুখখানাকে নির্ব্বাপিত-শিখ দীপের মতই ম্লান করিয়া দিল। ঠিক্ সেই সময়ে বিদ্রোহ-জাগ্রৎ উষ্ণতায় তাতিয়া উঠা নিজের হাতে কাহার অত্যন্ত শীতল, ঘর্ম্মাপ্লুত অনিচ্ছা-কম্পিত হস্তের স্পর্শ অনুভূত হইতেই,—সে নিজের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে—বলিতে পারা কঠিন,—নিজের হাতখানা চম্‌কাইয়া উঠিয়া টানিয়া লইয়া, পিছনদিকে দু'পা হটিয়া গিয়াছিল। তার পরই যে কি করিয়া কি ঘটিল,—নিজের সেই আগুনজ্বলা মাথার মধ্যে ঠিক্ তাহার অনুভূতি সে পায় নাই—শুধু এইটুকুই বুঝিতে পারিল, যে, আদিত্যবাবুর পুনঃপুনঃ অনুরোধে যে থরকম্পিত হাতখানা তাহাকে পারিতোষিক দিবার জন্য উদ্যত হইয়া আসিয়াছিল, নদীতাড়িত বেতসের ন্যায় সর্ব্বশরীরে কম্পিত, তাহার অধি-কারীর উঠিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য সেই সময় বোধ করি ঠিক্ ছিল না। তার উপর কিসের জন্য কি হইল বলা যায় না—হঠাৎ তিনি ঘর্ম্মপরিপ্লুত-শরীরে নিজেরই পরিত্যক্ত কেদারাখানায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞাহারা এলায়িত দেহ কেহ সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

চতুশ্চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

ধিঙ্কষ্টমিতি নিঃশ্বস্য রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
মূর্চ্ছিতো ন্য পতত্তস্মিন্ পর্য্যঙ্কে হেমভূষিতে ॥

—রামায়ণ।

ব্রজরাণী বাড়ী ছিল না। সান্ধ্য-সমিতির একটা নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। সেখানের মেয়ে-মজলিসে সে সময় গানবাজনায় হাস্যকৌতুকে আসর সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। ব্রজরাণীর এক বাল্যসখী—তাহার বেথুন স্কুলের

পাঠসঙ্গিনী—অনেকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন,—সে তাঁহারই সহিত গল্পে বিভোর হইয়া আছে,—এমন সময়ে বার্ত্তাবহের মুখে বিনা-মেঘে বজ্রপাতেরই ন্যায় দুঃ-সংবাদ সেখানে প্রচারিত হইল।

যখন বাড়ী আসিল, ততক্ষণে ভৃত্য ও স্থানীয় ডাক্তারের সহায়তায় আদিত্যবাবু অর্দ্ধচেতন, অর্দ্ধবিহ্বল অরবিন্দকে বিছানায় শোয়াইয়াছেন। ডাক্তারটি যন্ত্রতন্ত্র-সহযোগে রোগীর হৃদ্‌পিণ্ডের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। দেখা শেষ হইতেই কহিল, "না, বুকে কিছু নেই।"

ব্রজরাণী কহিল, "তবে কি ?"

"কোনরকম সক্'ই লেগে থাক্‌বে। তা হ'তে পারে, সেটা শরীরের, হ'তে পারে মনের।"

আসিবার সময় পথেই আদিত্যবাবু ছেলেদের দিয়া ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন; উহারাও আসিয়া পৌঁছিয়া এই ডাক্তারটির সহিত প্রায় একই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, বর্ত্তমানের বন্দোবস্তে মনোযোগী হইলেন। কোনরূপ আকস্মিক আঘাতেই এরূপ হইয়াছে, খুব সম্ভব, পতনের ফলেই মস্তিষ্ক আহত হইয়াছে। শুধু শুধু পড়িয়া যাওয়ার কারণ? বলা যায় না। মনে কোনও রকম আঘাত লাগিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়া, অথবা টেবিলে পা বাধিয়া স্রেফ সোজাসুজি পতন।—মূলে কারণ যাই থাক্, আপাততঃ কার্য্যফলে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিশেষ অনিষ্টাশঙ্কা আছে। 'আপোপ্লেক্সি' 'প্যারালিসিস্'—কি যে দাঁড়ায়—বলা যায় কি? দুটি ছেলে সাহায্যের জন্য বরাবর সঙ্গে আসিয়াছিল। ছেলে দুটি যখন বিদায় লইতে যায়, ব্রজরাণী বাহিরে আসিয়া তাদের জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছিল ?"

ছেলে দুটি যেটুকু জানিত, বলিল। এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিবার কতিপয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই যে তাহারা ইঁহার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কত-বড় উদার আলোচনা করিতে বসিয়া গিয়াছিল, সে কথাটাও বাদ দিয়া

বলিল না। কখন যে কার জন্য কি আসিতেছে, একটি মাত্র নিমেষ পূর্ব্বেও ইহা জানা যায় না। মানুষ যে কত অল্পজ্ঞ, শুধু এইটুকুই প্রমাণ করিয়া দেয়। শেষকালে ছেলেটী বলিল, "যেমন তিনি মেডেলটা ওর হাতে দিতে গেলেন, অমনি সে কি রকম যেন ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল, আর উনিও অমনি ধপ্ ক'রে বসে পড়েই, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে ঢলে পড়লেন। ডাক্তাররা বল্লেন বটে, যে, পড়ে গিয়ে 'সক্' লেগেছে ; কিন্তু আমার মনে হয়, আগে থাকতেই ওঁর শরীরটা ভাল ছিল না। তুমি দেখনি প্রফুল্ল! প্রথমবারই যখন মেডেলটা ওঁর হাত থেকে পড়ে যায়, হাতটা তখনই কি রকম কাঁপ্‌ছিল ?"

ব্রজরাণীর ললাটে মুক্তাবলীর ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সে ভয় প্রথমাবধিই তাহার মনে অস্পষ্টভাবে ছিল, সেইটাই যেন এক্ষণে আকার ধরিয়া উঠিল। মৃদু-নিক্ষিপ্ত-শ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই ছেলেটীর নাম ?"

"কার ?—ওঃ, অজিতের কথা জিজ্ঞেস্ ক'রচেন ? অজিতকুমার বসু। না ; তার জন্যে কিছু না। তার কোন রকম ব্যাভারে, কি তাকে দেখে,—ওঃ, নাঃ,—সে আপনি মনেও ক'র্‌বেন না। সে দেখ্‌তে ভা—রি সুন্দর। আর ছেলেও সে খুবই ভাল।"

অপর ছেলেটী কহিল, "গরীব বেচারা।"

অনেকক্ষণ আর কেহ একটি কথাও কহিল না। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার গাঢ় হইয়া গৃহাধিষ্ঠিতদের মুখ পরস্পরের নিকট অস্পষ্ট করিয়া দিল। ছেলে দুটি তখন বলিয়া উঠিল, "আমরা আজ যাই, আবার কাল সকালে এসে খবর নিয়ে যাব।"—বলিয়া তাহারা চলিয়া যাইতেছিল,—বারান্দাটা প্রায় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে,—পিছনে অস্পষ্ট ডাক শুনিল, "শুনে যাও।"

ব্রজরাণী কাছে আসিয়া বলিল, "সেই ছেলেটীকে গিয়েই একবার পাঠিয়ে দিতে পার্‌বে ?"

উহারা প্রথমে ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া, একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে বলিল, "অজিতকে? সে কি আস্‌বে? সে কোথাও বড় একটা যায় না। এই আমাদেরই ওখানে ক'জনের সঙ্গেই বা কটা কথা সে কয়! আগে যা'ও বা ছিল, এই বছরখানেক থেকে, একজামিনের রেজল্টটা খারাপ ক'রে ফেলার পর থেকেই, একরকমের হ'য়ে গেছে। তা ছাড়া তার সময়ই বা কোথায়? তিন তিনটে টিউসনি ক'রতে হয়।"

ব্রজরাণী বিশেষ ব্যগ্রতা করিয়া বলিল, "এ কাজটি তোমাদের করতেই হবে বাপু! তাকে গিয়া ডাক্তারদের মন্তব্য জানাবে। জীবন যে এঁর কতখানি সঙ্কটময়—সে খবর সে—সে খবর পেলে না এসে কেউ কখন থাক্‌তে পারে? গাড়ি তৈরি করিয়ে দিচ্চি—সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে ব'লে ক'য়ে পাঠিয়ে দিও বাবা, দিও।"

এমন মিনতি করিয়া ঘরের পরের কাহার কাছে ধনী-কন্যা আদরিণী ব্রজরাণী কবে কি যাচ্ঞা করিয়াছে? কিন্তু আজ তাহার দায়। কত বড় দায়, তা, শুধু সে-ই বুঝিতেছে। স্বামী হারাইতে বসিয়া স্বামীর সুখ-দুঃখটাকেই আজ সে যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, নিজের মানমর্য্যাদার উপরে নজর রাখা আজ তো আর মোটেই চলে না।

সে যখন স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিল, তখন সেড্-আড়াল-করা ম্লানালোকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই, তাহার বুকের মধ্যের প্রবল-বেগে-ঠেলিয়া-ওঠা রোদনের বন্যা যেন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। নূতন শিকারী নিজের শিকার-করা পাখীর দিকে যে দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, সেই রকম বদ্ধ-দৃষ্টিতে সে তাঁহার শয্যা-লুণ্ঠিত স্তব্ধ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে প্রলয় ঝঞ্ঝার মত অপরিসীম ভীষণ আগ্নেয় ঝড়ে তাহার অশ্রুপরিপ্লুত অন্তরটাকে যেন শুষ্ক তপ্ত করিয়া দিল। মনে হইল, এতটুকু একটু স্ফুলিঙ্গ লাগিলেই এখনই এক বস্তা বারুদের মত বুকখানা তাহার ফাটিয়া পড়িবে।

অরবিন্দ চোখ চাহিয়া এদিকে ওদিকে কি যেন একটা হারান জিনিষ হাতড়াইয়া খুঁজিতেছে বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু যিনি ডাক্তার সে ঘরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, "আইস্-ব্যাগ'টা একটুও বন্ধ করবেন না,—দেখচেন না, রোগী কি রকম রেষ্টলেস্ হ'চ্চে!"

বাহিরে কে আসিয়া ডাকিল।—আর কেহ নয়, তাহাদেরই মোটর-চালক মাদ্রাজী সোফারটা। হাতে ছিল—আর কাহারও নয়, সেই প্রফুল্ল—না পরিতোষ নামীয় ছেলেটীর পত্র। লেখা শুধু এইটুকু।—

"শ্রদ্ধাস্পদাসু,

অজিতকে পাঠান সম্ভব নয়, সে বড় একরোখা। বলে বড়-লোকের বাড়ী তাহার কোনই দরকার নাই। আপনার এই সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষা করিতে না পারিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। মাপ করিবেন।

বিনীত—

পরিতোষচন্দ্র নাগ।"

ব্রজরাণী ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর মাথার কাছে বসিয়া, বরফ দিবার রবারের থলিটা তুলিয়া মাথায় দিতে, অরবিন্দ আবার একবার চোখ চাহিয়া, এবার স্পষ্টই যেন কাহাকে অন্বেষণ করিল। মাথার শীতল স্পর্শ বোধ করি এতক্ষণের পরে অনুভূতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। চোখ তুলিয়া শুশ্রূষাকারিণীর মুখ দেখিবার জন্য চেষ্টা করিল। চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধি-ভ্রংশের বিহ্বল ভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও, একটু যেন জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রত্যাবর্তন করিতেছে, অনুমান হয়। ব্রজরাণী প্রাণপণে আত্মদমনের চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছ একটু?"

অরবিন্দ ইহার কোন জবাব দিল না, দৃষ্টিও ফিরাইল না, অনেকক্ষণ পরে একটা প্রচণ্ড তপ্ত নিঃশ্বাস মোচন করিয়া আত্মগতই কহিল, "এ তো কচি-ছেলের কলমের লেখা নয়, এ যে মর্ম্ম-পীড়িতের বুকের রক্ত ঢেলে সে-ই ছবি আঁকা! কে এ ছেলেটী? কে,—রে?"

ব্রজরাণী প্রাণপণ-বলে দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া কাঠের মতন শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। ডাক্তারের সেই শরীর অথবা 'মনের আঘাতের' কথাটা শ্রুতিপথে তাহার ফিরিয়া ফিরিয়াই বাজিতে লাগিল।

ডাক্তারটি মন্তব্য করিলেন, "এই যে 'ডিলিরিয়ম'ও আরম্ভ হ'লো দেখছি! তা' একে এখন এক রকম মন্দেরও ভাল বলতে হবে।"

বিপদের কালরাত্রি ক্রমে ক্রমে অবসান হইয়া আসিল; ভোরের আলো সার্শির কাঁচের মধ্য দিয়া পাণ্ডুরাভ রোগীর মুখের উপর উৎকণ্ঠা-শঙ্কিত-মুখে চাহিয়া দেখিল, ব্রজরাণী সেই মুখ দেখিয়া আর একবার যেন ঘুরিয়া পড়িতে গেল। সুগভীর ও অব্যক্ত দুঃখে তাহার অন্তরের মধ্যটাকে নিঃশব্দেই সে মুখের ছবি ভস্ম করিতে লাগিল। স্বামীর এই অবস্থার জন্য সে তো আজ জোর করিয়া নিজের ভাগ্যবিধাতাকেও দোষ দিতে পারিল না। অথবা ভগবানের নিকট একাগ্র আবেদনে ইঁহার আরোগ্য ভিক্ষা করিতেও তাহার মনে তো কই ভরসা আসিল না। তাহার বুক-জোড়া নৈরাশ্যের ঘন মেঘস্তর বিদীর্ণ করিয়া করিয়া কেবলি যে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার বিদ্যুতে বজ্র হানিয়া বলিতে লাগিল, তোর এই দুর্ভাগ্যের জন্য—ভাগ্য নয়, ভগবান নয়,—শুধু তুই নিজে দায়ী রে, শুধু তুই নিজে দায়ী! বুক ফাটিয়া তাহার একটিবার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল; কিন্তু কান্না ছাড়িয়া একটা নিঃশ্বাসও আজ জোর করিয়া সে বুকের বাহিরে আনিতে সক্ষম হইল না। ঘরের মধ্যে দিনের আলো যতই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, অকথ্য লজ্জার তাড়নায় ততই যেন তাহার হেঁট-মুণ্ড হেঁট হইয়া আসিল। তাহার সমস্ত শরীরের রক্তটাকে শীতল বরফখণ্ডে পরিণত করিয়া দিয়া সমস্তক্ষণই যেন কাহার নির্ম্মম কঠিন কণ্ঠ তাহার কাণের কাছে ঝড়ের গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া বলিতেছিল, "পতিঘাতিনি! গলায় ছুরি না বসাইলেই যে হত্যা করা যায় না, তা নয়,—এইবার অ-সপত্ন আধিপত্যটা ভাল করিয়াই ভোগ করিয়া নে।" পাছে মুখ তুলিলেই এই গৃহবাসী ডাক্তার, ভর্ত্তা এবং

বন্ধুবর্গের চোখের দৃষ্টি হইতেও এই ভীষণ অভিযোগের কঠোর ঘৃণার লেখা চোখে পড়িয়া যায়, তাই দাঁতে দাঁতে চাপিয়া সে মাটির দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। মুখ তুলিয়া কাহারও দিকে চাহিতে পারিল না।

পঞ্চচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনম্।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্ম্মাণনফলং
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতম্॥
—মালতীমাধব।

ভোর তখনও ঠিক্ হয় নাই। মহানগরীর অগণ্য প্রাসাদলহরীর অন্তর-পথে স্বর্ণময়ী, লোহিতাম্বরা দেবী উষার চরণপদ্ম তখনও প্রকটিত হইতে পারে নাই। মাথার সোণার টোপরের রাঙ্গা চুণীগুলিই শুধু সৌধ-শিরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। রঘুবীরপ্রসাদ চৌবে অকাল-জাগ্রৎ, বিরক্ত-মুখে এক চৌ-গোঁফ্ফা অযোধ্যাবাসীর সঙ্গে আসিয়াই অজিতদের রুদ্ধদ্বারে রুদ্র করাঘাত করিয়া, ঢক্কানিন্দিত-কণ্ঠে হাঁকিল,—"অজিবাবু! হো অজিবাবু! তোমারা নাম্‌সে একঠো চিঠি আস্‌ছে। শিগ্‌ঘর তুমি কোয়াড়ি খোল্ দেও।"

কয়েকবার ডাকাডাকির পরে ধড়াস্ করিয়া দোরটা খুলিয়া গেল; এবং দরজার সাম্‌নে বাহির হইয়া আসিয়া সকোপ দৃষ্টি হইতে অগ্নিকণা ছড়াইয়া দিয়া, অজিত কহিল, "ব্যাপার কি রঘুবীর! কার আমি কি চুরি ক'রে এসেছি যে, ভোর না হ'তে হ'তেই এ রকম জুলুম লাগিয়েছ?"

রঘুবীরের মেজাজ ভাল ছিল না। কড়া প্রশ্নের উত্তরে সেও চড়া-

গলায় জবাব দিল, "কোথায় কি চুরি করিয়েছে, সে কি হামাকে বোলে করিয়েছে? লেকেন হেই আদ্‌মিটো হামাকে যাকে ধোল্লে, সেইজন্যি হামি আস্‌তিছি।"

প্রাতঃকালে উর্দ্দিয়াই বিনা পারিতোষিকের এই কাজটা করিতে একেই তাহার ভাল লাগে নাই; গন্‌গন্‌ করিতে করিতে সে স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। অজিতও ফিরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে যাইতেছিল—ছোট্টু সিং পকেট্ হইতে লেফাফাখানা বাহির করিয়া সাম্‌নে ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "এই চিঠ্‌ঠি ঠো বহুমা-জি আপ্‌কো ভেজা থা।"

অজিত কহিল, "কোই দোস্‌রাকো হোগা—হামারা নেহি।"

ছোট্টু কহিল, "জি, আপিকো হ্যায়। অজিবাবু আপিকা নাম হ্যায়।" এই বলিয়া সে চিঠিখানি অজিতের হাতে দিতে গেল। সে হাত পাতিল না দেখিয়া, অগত্যাই তাহার গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া, যোড়হাত করিয়া কহিল, "গোস্তাকি মাপ কিজিয়ে বহুমা-জি কহথা, আপকো আজ চল্‌নেহি হোগা। বাবুকে তবিয়ৎ বহুৎ খারাবি হ্যায়। আপকো খোঁজ কর্‌তে থেঁ—"

হঠাৎ সে অবাক্ হইয়া গিয়া দেখিল, তাহার সাম্‌নের দোরটা ঝনাৎ করিয়া বন্ধ হইয়া, ভিতর হইতে দরজায় খিল পড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর, বহুক্ষণ নিঃশব্দ প্রতীক্ষার শেষে, বেলা আটটারও পরে যখন সে গাড়ী চড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন পর্য্যন্ত ভিতরের কোন খবরই জানা গেল না। পরিতোষ ও প্রফুল্লও তাহার পক্ষে ওকালতি করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু ভিতর দিক্ হইতে একটা জবাব পর্য্যন্ত না পাইয়া, ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়াই ফিরিয়া গেল।

পূর্ব্ব-সন্ধ্যায় আর একবার এই রকমই আর একটা অভিনয় হইয়া গিয়াছে। সেবারেও এই প্রফুল্ল পরিতোষের ডাকাডাকিতে দ্বার খুলিয়া, অজিত এই গৃহ-প্রবেশের পথ আটক করিয়া, এম্‌নিই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, উহাদের দৌত্য চেষ্টা অবজ্ঞার তীব্র হাস্য ও তিক্ত বাক্যে নিষ্ফল করিয়া

দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া যায়। উহার সঙ্গী সেদিন বাড়ী গিয়াছে। সেই যে তাহার ঘরের দরজা বন্ধ হইয়াছিল, ভোরের বেলা এই দ্বিতীয় অভিনয়ের পূর্ব্বে আর খুলে নাই। খাবার ডাক পড়িলে, মাথা ধরিয়াছে, জবাব দিয়াছিল। সাধ্য সাধনা করিয়া খাওয়াইবার সে জায়গা নয়; , বিশেষ, বামুন চাকরেরা আর তো বকৃশিষ্ পায় না। নিরুপদ্রবেই সময় কাটিতেছিল।

আজ রবিবার—সবার শেষে দুটি হাতে ভাতে করিয়াই, এক সময় সে নিজের ছেঁড়া ছাতাখানার আড়ালে মুখ ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এদিক্ সেদিক্ কতকটা উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে যখন একটা জায়গায় সে দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন মধ্যাহ্নের সূর্য্য প্রায় অস্তগামী। নিজের চারিদিকে চাহিয়া সে বিস্মিত হইয়া দেখিল; কলিকাতার জনতা ও কোলাহল ইহার কোন দিকেই দৃষ্ট হয় না। তৎপরিবর্ত্তে কচিৎ দু'একজন লোক বা বড়লোকের বাড়ীর দু'একখানা গাড়ী চলাচল করিতেছে। আর কলিকাতার পথের উভয়পার্শ্বস্থ অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা বিপর্য্যস্ত দোকান-শ্রেণীর স্থলে সযত্নরক্ষিত সুবৃহৎ উদ্যানশ্রেণীর মধ্যস্থ অট্টালিকার কোন-খানে কিয়দংশ, কোথায়ও বা সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে। বিস্ময়ে অজিত যেন চমকিয়া উঠিল। নিজেরও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এ কোথাকার কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে কে তাহাকে টানিয়া আনিল? রাজধানীর তপ্ত বায়ুক্লিষ্ট দেহ মন, ক্লান্তিকর অসংখ্য দৃশ্য দর্শনে শ্রান্ত চক্ষু যেন এখানকার এই নবনির্ম্মল শ্যামলতায় ডুবিয়া স্নিগ্ধ হইয়া গেল। ধূমভারাতুর স্বল্প দৃষ্ট ধূসর আকাশের পরিবর্ত্তে, মাথার উপরে সুদূর-বিস্তৃত আকাশের ছবি উদার এবং মহিমমণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। পথি-পার্শ্বের একটা নারিকেল গাছের তলায় তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর বসিয়া পড়িয়া, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে অজিত সহজ মুক্তির শ্বাস গ্রহণ করিল। ব্যাকুল বদ্ধ বায়ুর চাপে তাহার বিদ্ধ অন্তঃকরণ যেন এতক্ষণ কেবল রুদ্ধ হইবারই উপক্রম করিয়াছে।

শ্রান্ত অজিত যেখানে বসিয়া পড়িল, ঠিক্ তাহারই সামনের দিকে পশ্চিম-দিগন্ত পর্য্যন্ত খুব খানিকটা খোলা মাঠ। সেখানে বসিতেই অজিতের চোখে পড়িল, অস্তসমুদ্রের চলোর্ম্মি-মণ্ডিত পশ্চিম-সাগরের আলোকিত বেলাভূমে মৃত্যু-শয়ান অস্ততপনের নিষ্প্রভ মূর্ত্তি। হঠাৎ তীব্র চমকে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া, অজিত দুই হাত দিয়া দু চোখ ঢাকা দিল। এই জ্যোতিঃ-পরিশূন্য সায়াহ্ন-সূর্য্য তাহার উদ্ধত, অশান্তিপীড়িত চিত্তে আর একখানা মুখের ছবি সহসাই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। ঠিক্ অমনি উজ্জ্বল আলোকময় রূপ বিগত অপরাহ্নে একটী নিমেষের ভিতরে সেও ঠিক্ এই একই রকম মৃত্যু-ম্লানিমায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। অজিতের আচ্ছন্ন, অভিভূত প্রাণে কে যেন অগ্নি-তপ্ত শেলাঘাত করিল। সে দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়াও সে এখন পর্য্যন্ত একটিবারের জন্যও ফিরিয়া সংবাদ পর্য্যন্ত লয় নাই,—একবার ছুটিয়া গিয়া সেই অস্পন্দ, অচেতন দেহের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, প্রাণ ভরিয়া, যে নাম ধরিয়া একটিবার ডাকিবার জন্য আজীবন অজিতের তৃষ্ণা-শুষ্ক কাতর বক্ষ ফাটিয়া গিয়াছিল, সেই পিপাসা-শান্তিকর "বাবা" নামে চীৎকার করিয়া ডাকিতে চাহে নাই। সে কিছু করে নাই, সে কিছু করে নাই!—বরং সেখানকার ব্যাকুল আহ্বানকে বারেবারেই অবমানিত, প্রত্যাখ্যাত করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। কি দুরদৃষ্ট রে—কি দুরদৃষ্ট সে!

অজিতের ক্ষিপ্ত রোষ ক্রমে বেদনার অবসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার উৎক্ষিপ্ত, পীড়িত চিত্ত যেন আর একটা নূতন ব্যথার ভারে অভিভূত হইয়া পড়িতে চাহিল। সে এ কি নিষ্ঠুর বিপ্লবের মাঝখানে জড়াইয়া পড়িয়াছে? যে মহিমময় দেব-মূর্ত্তি সন্তানের নিষ্ঠা-পবিত্র বক্ষে ভক্তি-শতদলে অর্চ্চিত ছিলেন, সেই পূজনীয় দেবতা আজ যখন উভয়ের চিরব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া এত কাছে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার দীপ্তি-প্রাখর্য্যে সে কি অন্ধ হইয়া গেল না কি? বরণীয়কে চরণে ধরিয়া তো কাছে পাইতে চাহিল না। আত্মাভিমানের

মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে স্বেচ্ছাচারের স্রোতে আত্মঘাত করিয়া বসিল যে! অজিতের অপরাধী হৃদয় দুঃসহ লজ্জার তাড়নার ক্ষিপ্ত আলোড়নে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এ কি করিল সে? কেন এমন করিয়া ফেলিল? সমস্ত দর্শকদল যখন ভয়ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, সে হতভাগ্য একা শুধু অস্পৃশ্যের মত সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হইয়াই এক পাশে সরিয়া ছিল। সেই অচেতন, এলায়িত শরীর তাহার চক্ষের সম্মুখেই আরও দশ জনে উঠাইয়া লইয়া গেল,—তাহাকে কেহ একটিবার এতটুকু সাহায্য চাহিয়া ডাকিলও না,—তখন বুকের মধ্যটা তাহার যে কিরূপ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল,—ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত সেই জনসঙ্ঘের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তাহাদের হস্ত মুক্ত করিয়া, তাহার নিজের জিনিষ নিজের বুক পাতিয়া লইবার জন্য অসংবরণীয় দারুণ লোভে তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা বুকের বন্ধন ছিন্ন করিয়াই যে ছুটিতে চাহিয়াছিল।—আগ্রহ-ক্ষিপ্ত দুই চোখের তারা অগ্নিকণার ন্যায় ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া, হাত-পায়ের সমুদায় আঙ্গুলগুলা চঞ্চল অগ্নিশিখার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া, মুহুর্মুহুঃই যে নিজেদের উন্মত্ত আবেগ প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছিল। কিন্তু কিসের সঙ্কোচ বিরাট্ ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া, সে শত শত কৌতূহলী নেত্রের পরিহাস-প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ইঙ্গিত-কল্পনায়, তাহার সেই অদম্য আবেগকেও প্রাণপণে ঠেলিয়া রাখিলে,—তাহাকে তাঁহার সেই তেমন অবস্থায়ও স্থাণুবৎ অচল করিয়া রাখিল। বুকের মধ্যে তাহার তুফান উঠিতেছিল, তথাপি বাহিরে তাহার এতটুকু একটুখানিও সে প্রকাশ করিতে পারে নাই। যদি চোখ চাহিয়া দেখিয়াই ওই মুদিত দুটি চোখের তারায় ঘৃণার লেখা এত লোকের সাক্ষাতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে!—যদি—যদি—বিস্ময়ে ঘৃণায় শিহরিয়া এই জনসঙ্ঘের মধ্যস্থলেই তিনি বলিয়া উঠেন—'এ কি! তুমি কেন? তোমায় তো আমি কোন দিনই ডাকি নাই?'—তাই—কান্নার বেগে বুক ফাটিয়া গিয়াছে; সেই উত্তপ্ত অশ্রু-নির্ঝরের মুখ চাপিয়া ধরিয়া সমুদ্রে বাড়বানলের সৃজন করিতে হইয়াছে।

স্তব্ধ, নিঝুম, চিন্তামগ্ন অজিত সহসা মাথার উপরকার নারিকেল-বৃক্ষের পত্রান্তরালে লুক্কায়িত একটা চিলের কর্কশ চীৎকারে চমকিত হইয়া চাহিল। পশ্চিম-দিগন্তে তখন আর মুমূর্ষু তপনের অন্তিম ছবি অঙ্কিত নাই ;—তাহার পরিবর্তে কৃষ্ণা-দ্বিতীয়ার চন্দ্র চিতাগ্নি-ভস্ম-লিপ্ত রক্ত-ধূসর পশ্চিমাকাশের প্রান্তভাগে দেখা দিয়াছে। সেও তেম্‌নি অবসাদ-ক্লিন্ন, রোগ-পাণ্ডুর, ম্রিয়মাণ। এখনই আর একখানা পাণ্ডু মুখের ছবি অজিতের বুকের আকাশে উদিত হইল। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিজের অবমানিত, আহত অন্তরের অভিমান-পঙ্ক মাখাইয়া কাহাকে সে বিচার করিতে বসিয়াছে? তিনি যে পিতার সন্তান, সে ব্যক্তির মত ভাগ্যবান দশরথের (যদিও তুলনা করা উচিত নয়,) পর এ সংসারে ক'জন জন্মিয়াছে? আজ তিনি পিতৃ-কর্ত্তব্যের স্বর্গচ্যুত,—কিন্তু যদি পিতৃ-ভক্তির কোন অক্ষয়লোক থাকে, সেখানকার স্বর্গভোগে স্বয়ং দেবতারাই কি তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন? অজিত কার ছেলে? মার শিক্ষা অজিত কি সব ভুলিয়া গেল?

ষট্‌চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।
—গীতা।

সেদিন যখন খানিকদূর আসিবার পর, 'ওল্ড বালিগঞ্জ রোড্' লেখা সাইনবোর্ডটা চোখে পড়িল, তখনি অতি-মাত্রায় চমকিত হইয়া, এই অপরিচিত রাজ্যে কিসের আকর্ষণ যে টানিয়া আনিয়াছে, সে কথা বুঝিতে

অজিতের আর বিলম্ব ঘটিল না ; এবং এই নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই, তাহার মাথার মধ্যে হয় ত যেটা সূক্ষ্মভাবে সুপ্ত ছিল, সেই ইচ্ছাটাই ক্ষিপ্রবেগে জাগিয়া উঠিল।

বালিগঞ্জ জায়গাটা নেহাৎ ছোট নয়। নবজাগ্রৎ উৎকণ্ঠিত-উত্তেজনার বশে আসন্ন সন্ধ্যায় সে এই স্থানটার প্রায় সবটাই প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইল। যেখানে যত ছোট বড় উদ্যান-বাটিকা দেখিতে পায়, অমনি অজিতের সঙ্কোচ-বদ্ধ অন্তর অপরিসীম আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠে। আবার যেমনি প্রাচীর-লগ্ন মার্ব্বেল-খোদিত অথবা কাষ্ঠফলকে লিখিত গৃহস্বামীর অপরিচিত নামটা চোখে আসিয়া পড়ে, অমনি নিরাশ্বাসের ক্ষোভে তাহার ক্লান্তি-নিপীড়িত প্রাণ অভিভূত হইয়া পড়ে। এমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সে বালিগঞ্জ ছাড়াইয়া প্রায় লোয়ার সারকুলারের কাছা-কাছি আসিয়া পড়িল। মাথার উপর চন্দ্রমা তখন প্রদীপ্তাভ হইয়া উঠিয়াছেন ;—চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত হইয়া দুই পাশের বাগানগুলি বসন্ত-শোভা-সম্পদের উপর আরও এক অভিনব শ্রী লাভ করিয়া, যেন স্বপ্ন-পুরীর ন্যায় শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে। পত্রে, পুষ্পে, আকাশে, বাতাসে, আলোকে সর্ব্বত্রই একটা পুলক-সঞ্চার হইয়াছে। আম্র-মুকুলের গন্ধে, কোকিলের কুহুরবে মোহময় নিবিড় নেশায় যেন আবিষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। ইহারই উচ্ছ্বাসময় স্পর্শে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই যেন কিসের একটা ভাবোন্মাদনায় আকুল হইয়া চাহিয়া ছিল। ইহার অজ্ঞাত স্পর্শে ধরণীর বুকেও পুলক-রোমাঞ্চরূপে সহস্র কুসুম প্রস্ফুটিত করিয়াছিল। ইহারই দীপ্তিমান শিখা উর্দ্ধপথে জ্যোতিঃ-মেখলা-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অজিতের সুনিবিড়, শূন্য বুকে ইহারই মোহস্পর্শ বারংবার আকুল হইয়া আঘাত করিতে লাগিল। এমন করিয়া কাঙ্গাল হইয়া পথে পথে ফিরিয়া বেড়ান যখন অসহ্য হইয়া আসিল, মনের মধ্যে অপরিতৃপ্তির কাতর ক্রন্দন কলরোলে জাগিয়া উঠিয়া, প্রায় নিশ্চল চরণ দুটাকে টানিয়া আনিয়া,

একটা স্বল্পালোকিত উদ্যান-বাটিকার প্রাচীর-পার্শ্বে শ্রান্ত দেহটাকে ঠেলিয়া দিল। অমনি সেই রজত-শুভ্র জ্যোৎস্নালোক-ধারায় অভিষিক্ত প্রাচীর-গাত্রে সাদা মর্ম্মরের উপর বড় বড় কালো হরপে চোখে পড়িল—'অরবিন্দ বসু'—আরও যে কি লেখা ছিল, পড়িবার অবসর হইল না।—মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রান্তি-মথিত দেহটার সমুদয় ক্লান্তি নিঃশেষে বিতাড়িত করিয়া, অজিতের সর্ব্বশরীরের স্নায়ু-কেন্দ্রের মর্ম্মে মর্ম্মে যেন তড়িতের ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল। সে যেন নিশ্চল, স্তম্ভিত হইয়া গিয়া, বিহ্বল, ব্যাকুল নেত্রে, আবদ্ধ চক্ষে সেই লেখাটার দিকেই চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার চারি-পাশের সমস্ত পৃথিবীটা তাহারই অন্তরের মত আকুল শিহরণে শিহরিয়া উঠিয়া, তাহার চারিদিক্ হইতে দূরে,—বহুদূরে সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। আর তাহারই সম্মুখে তাহার পিতার প্রাসাদসদৃশ প্রকাণ্ড অট্টালিকাটা একটা প্রকাণ্ড নিষ্ঠুর দৈত্যের মত তাড়িতালোকের দুইটা উজ্জ্বল নেত্র বিস্তৃত করিয়া, তাহার বেদনাহত হৃদ্‌পিণ্ডের ক্ষরিত শোণিত পান করিবার করাল উল্লাসে রুদ্র তাণ্ডবে অট্টহাস্য করিতেছে। অজিত সভয়ে চোখ মুদিল।—

হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অজিতকে ভাল ছেলে বলিয়াই জানিতেন। ইদানীং ইহার সম্বন্ধে দু'একটা অস্ফুট সমালোচনা তাঁহারও কর্ণগোচর হইতে বাকী ছিল না বটে; তৎসত্ত্বেও ইঁহার পূর্ব্ব-বিশ্বাস অটুটই ছিল। আজ যখন তিনি অজিতের মধ্য-রাত্রাবধি অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, তখন অজিতের নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত স্তব্ধ ও নিরুত্তর মুখ তাঁহার চিত্তকে এই প্রথম তাহার বিরুদ্ধে সন্দিহান করিল। নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া তিনি তাহাকে একটু কঠিন করিয়াই উপদেশ ও আদেশ জানাইয়া এই প্রথম অপরাধের জন্য—অপরাধ গুরুতর হইলেও শুধু জরিমানা করিয়া—বিদায় করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে এমন ভাষায় কেহ কিছু বলিলে অভিমানী অজিতের বুঝি বা সমস্ত জীবনব্যাপী কালেও সে লাঞ্ছনার আঘাত ভুলাইতে

পারিত না। কিন্তু আজ সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রে উষ্ণ উত্তেজনার প্রবাহ লইয়া, জীবনের এই প্রথম ধিক্কৃত অবমাননাকে বুঝি ভাল করিয়া অনুভব করিয়া উঠিতেও সে পারে নাই। কোন মতে নিজের ঘরে পৌঁছিয়া, অবসাদক্লান্ত শরীরটাকে বিছানার উপর ঠেলিয়া ফেলিল। তারপর তাহার চারি পাশের ঘূর্ণায়মান পৃথিবী রূঢ়তাপূর্ণ বিস্বাদ নিরানন্দময় বিশ্ব-জগৎ সমুদায়টাই গভীর অন্ধকারের গহ্বরে ডুবিয়া গেল; অপরিসীম দৈহিক ও মানসিক শ্রম শ্রান্তিভারাচ্ছন্ন অজিত গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া জুড়াইল।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। বৈচিত্র্য-নবীন, কোলাহলময় কর্ম্ম-জগতের রথচক্র অবিরাম যাত্রার পথে ঘর্ঘর-রবে পথ কাটিয়া চলিল। সেই সঙ্গে অজিতের দিন রাতও বিশ্ব-নিয়মের বাঁধা ধারায় উদয়াস্ত হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে তাহার চিরাভ্যস্ত কর্ম্ম-শৃঙ্খলার বিধিবদ্ধ নিয়মের বিধি আগাগোড়া খুঁজিলেও আর মিলিত কি না সন্দেহ। ভোরের বেলা পাখীর কাকলী না জাগিতে জাগিয়া উঠিয়া, কচি অজিত মায়ের বুকে হাসির লহরে আনন্দের কল্লোল-গান জাগাইয়া তুলিত। শিশু অজিত ভোরের আলোর ঐ বন্দনা গান গাহিয়া আজও সেই অভ্যাসেরই বলে দিবা-উদয়ের প্রথমালোকে দিবসারম্ভের প্রথম পাঠ সারিয়া রাখিত। তারপর দু'জায়গায় টিউসনি সারিয়া ফিরিয়া যাইয়া, খাইয়া কলেজ যাওয়া এতই তাহার নিয়মিত ছিল যে, ঘড়ির কাঁটাগুলাকেও হোষ্টেলবাসী ছেলেরা তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করিত না। অপরাহ্ণেও একটী ছেলে-পড়ান সারিয়া কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-সাতটার সময় সে নিজের বই লইয়া বসিয়াছে। আজকাল এই সাত দিনের মধ্যে দু'দিন অনুপস্থিতি; দু'এক দিন সারারাত্রি বারান্দায় উঠানে পাইচারি করিয়া বিনিদ্র কাটাইয়া, সারাদিন কলেজ কামাই পূর্ব্বক নিদ্রা দেওয়া এবং বাকী দিন দুই তিনটারও কলেজের সময়টা বাদ দিয়া বাকী সময়টার ইতিহাস সকলকারই নিকটেই সন্দেহে, লাঞ্ছনায়, বিদ্রূপের কুটিলহাস্যে অবজ্ঞাত তো বটেই; অজিতের নিজের কাছেও বুঝি ইহার সমস্তটাই, খাপছাড়া বেহিসাবী

গোলমালে খেইহারা, জটিলতার জালে জট্‌পাকান। ইহার যেন কোন ধারাবাহিকতাই নাই।

সপ্তচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

অঙ্গাদঙ্গাৎ সৃত ইব নিজো দেহজঃ স্নেহসারঃ
প্রাদুর্ভূয় স্থিত ইব বহিশ্চেতনাধাতুরেব।
সান্দ্রানন্দ ক্ষুভিতহৃদয় প্রশ্রবেনেব সৃষ্টো
গাত্রং শ্লেষে যদমৃতরস স্রোতসা সিঞ্চতীব॥

—উত্তরচরিত।

সন্ধ্যার পরই ফটক বন্ধ হইয়া যায়। তা' হইলে কি হয়,—উদ্যান-বেষ্টিত প্রাচীর যথেষ্ট উচ্চ নহে। কয়েকদিনের ভীষণ দ্বন্দ্ব-দোলায় দুলিয়া দুলিয়া শেষকালে একদিন কৃত-সঙ্কল্প অজিত বাগানের পিছনদিকের প্রাচীরে চড়িয়া বাড়ীর মধ্যে নামিয়া পড়িল। না আসিয়া কোন মতেই সে যেন থাকিতে পারিতেছিল না। কিসে তাহাকে যেন টানিতেছে।

সে রাত্রিটা বড় ভাল ছিল না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশপথে শুক্লপক্ষের চন্দ্রকিরণ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কোয়াসার ন্যায় তরল অন্ধকারের জালে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। গগনস্পর্শী নারিকেল-বৃক্ষগুলা উতলা হাওয়ায় করুণ মর্ম্মরে ব্যাকুল বেদনা চারিদিকেই জাগ্রৎ করিতেছিল। বাদলের সূচনায় গৃহবাসিগণ বোধ করি সে রাত্রে সকাল সকাল খাওয়া সারিয়া বিছানায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মধ্য-ফাল্গুনেও ঝড়ের উত্তরে হাওয়া শীতের শিহরণ আনিতেছিল।

চাঁদের আলো নাই,—উপর নীচের কোন ঘরের জানালার কাঁকের

আলোবিন্দুও চোখে পড়ে না। এতবড় প্রকাণ্ড বাড়ীটার কোন্ ঘরে তাহার অভীষ্ট ব্যক্তি আছেন, কেমন করিয়া এই অনভিজ্ঞ চোর তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে? সেদিন শুধু মালির কাছে এই খবরটুকুই সে পাইয়াছে, যে, তিনি এখন পর্য্যন্ত নীচের ঘরেই শয়ন করিয়া থাকেন। শুধু এই সংবাদটুকুর সম্বলেই সে এতবড় একটা দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাম্‌নের বারান্দায় একটা লোক আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিল। নিরুদ্ধশ্বাস অজিত তাহার পাশ কাটাইয়া পার্শ্বস্থ একটা খোলা দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে ঘরটা কতকগুলা চৌকি টেবিল ও আলমারিতে পূর্ণ,—জনমানব কেহ সেখানে নাই। পাশে আর একটা ঘরেরও দরজা খোলা। যদিও উভয় কক্ষমধ্যস্থ মুক্ত দ্বারের উপরকার অত্যন্ত স্থূল সবুজ পর্দ্দার আবরণে ভিতরটা ইহার অদৃশ্যই রহিয়াছে,—তথাপি পর্দ্দার উপরকার খোলা অংশ দিয়া পার্শ্বের আলোকিত কক্ষের নেটের মশারি-সমেত পালঙ্কের চওড়া ফ্রেম দৃষ্ট হইতেছিল। পর্দ্দার পাশে অল্পক্ষণ কাণ পাতিয়া থাকিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প অজিত সামান্য ইতস্ততঃ করিয়াই স্পন্দিত-বক্ষে সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইল। ঘরের দেওয়ালে একটিমাত্র আলো জ্বলিতেছে। ইহাও যথেষ্ট উজ্জ্বল না হয় এজন্য ঘষা রঙ্গিন কাচের আবরণে আবদ্ধ। তথাপি সেই স্বল্পালোকিত কক্ষে যথাযথ বস্তু নির্ণয়ের কোনই ব্যাঘাত হয় না। ঘরের ঠিক্ মাঝখানে মেহগ্নি পালঙ্কে মল্লিকা শুভ্র বিছানায় অরবিন্দ নিদ্রিত। অজিত শঙ্কিত সতর্ক নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—নিকটে বা আশে পাশে দ্বিতীয় প্রাণী কেহ কোথাও নাই। কেবল ইহার মত আর একটা মুক্তদ্বার কক্ষে আর একখানা পালঙ্কে আরও কেহ নিদ্রিত আছে;—সে অনুমান করিল, ইনি তাহার বিমাতা।

চোরের মত সাবধানে পা ফেলিয়া অজিত আসিয়া পিতার মস্তক সন্নিধানে দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল, যেন অজস্র রজত-কিরণ বন্যায়

উদ্ভাসিত হইয়া ধ্যানমগ্ন মহাদেব সেখানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বিস্ময়-বিহ্বল মুগ্ধ দৃষ্টিতে, অপলক-নেত্রে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন যখন অপরিচিত সভাপতিকে তাঁহার মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্তি-রঞ্জিত সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া দেখিয়াছিল, তখন সে তো তাঁহাকে তাহার পিতা বলিয়া দেখে নাই। তাই সে দেখায় দর্শন-পিপাসা তাহার শান্ত হইবে কেমন করিয়া?—তারপর যখন দেখিয়াছিল,—সে কি মুখই দেখিয়াছিল! আজ এ-কয়টা দিনের উদয়াস্তে কেবল যে সেই রক্তহীন, বর্ণহীন মুখের ছবি সে বিশ্বজগতের প্রতি স্তরে স্তরেই ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। কোথাও স্বস্তি পায় নাই।—এ মুখ, যদিও ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পাণ্ডুতায় প্রভাত-চন্দ্রের মতই নিষ্প্রভ, রোগ-যাতনায় ক্লিষ্ট মুখ; তবু অজিতের মনে হইল, এমন বুঝি আর কখন সে দেখে নাই! অপরিতৃপ্ত বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার দুঃখ-নৈরাশ্য-ভরা প্রাণে যেন তৃপ্তির পরশ বুলাইয়া গেল। শান্ত, সুপ্ত পিতৃমুখে চাহিয়া চাহিয়া নিজেকে তাহার অত্যন্ত ছোট বলিয়াই বোধ হইল। এই সংযত নিষ্ঠার পুণ্যময় মহত্ত্ব, অন্তর্দাহে দগ্ধ হতভাগ্য মূঢ় সে কি বুঝিবে? পিতৃ-চরণে লুণ্ঠিত হইয়া নিজের ধিক্কারাহত ক্ষুব্ধ অন্তরের সমুদায় অপরাধ-কালিমা ধৌত করিয়া ফেলিতে, অপরাধী অজিতের নির্ব্বেদপূর্ণ চিত্ত যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। অসংবরণীয় লোভে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই সে পিতার পদপ্রান্তে আসিয়া তাঁহার পা দু'খানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া দুই পদতলের নীচে মাথা রাখিল; এবং দেখিতে দেখিতে চির-অনাদৃত বালকের বুকের জমাট্‌বাঁধা বিরাট্ মেঘস্তরকে কাল-ঝঞ্ঝার বলে ফাটাইয়া দিয়া শ্রাবণের ধারার সৃষ্টি করিল। প্রাণপণে অশ্রু সম্বরণ করিতে করিতে সে সেই দু'খানা পায়ের উপরেই উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

শরীরের স্পর্শে যত না হোক্, চোখের জলের তপ্তস্পর্শে কতকটা সজাগ

হইয়া অরবিন্দ নড়িয়া উঠিল। পা টানিতে যাইতেই, সবেগে পায়ের আঘাতটা অজিতের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। অসহ্য যন্ত্রণায় অর্দ্ধস্ফুট কাতর-ধ্বনি করিয়াই ত্রস্ত-উদ্বেগে অজিত পা ছাড়িয়া দিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সেই যন্ত্রণা-ব্যক্ত শব্দটুকু ততক্ষণে পীড়িতের বুকের উপর ধ্বক্ করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে।

"কে রে? কা'কে মারলুম?" বলিতে বলিতে দুর্ব্বল শরীর কষ্টে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেই, সমস্ত অবস্থাটা এক মুহূর্ত্তে চোখে পড়িয়া গিয়া, নিদারুণ ভয়ের আতঙ্কে অজিতের পদতল হইতে মস্তকের কেশগুচ্ছ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে যে এখন কি করিবে, অথবা কিছু করিবে না,—ইহার কোন স্থিরতাই করিতে না পারিয়া, নিমেষকালমাত্র স্থির হইয়া থাকিল। পরমুহূর্ত্তে ভীষণ লজ্জার চমকে চমকিত হইয়া উঠিয়া ক্ষিপ্রবেগে ছুটিয়া গিয়া আলোর সুইচ্ টিপিয়া দিতে ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। তারপর, তেমনি করিয়া ছুটিয়া, যে পথে যেখান দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথেই সে বাহির হইয়া গেল। পিছনে দুর্ব্বল স্বরের অসহায় আহ্বান তখনও তাহার কাণে তীরের ফলার মত বিঁধিতে লাগিল। "রাণি! রাণি! রামফল! রামফল!"—

দ্বারের সম্মুখে বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তিটিই বোধ করি রামফল। প্রগাঢ় অন্ধকারে ব্যস্ততা-প্রযুক্ত অজিত তাহার ঘাড়ের উপরেই হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছিল,—অনেক কষ্টে সাম্‌লাইয়া লইয়া, সদ্য-জাগরিতের সদ্যভঙ্গ ঘুমের জড়তা না কাটিতেই, এক লাফে সাম্‌নের সিঁড়ি-কয়টা অতিক্রম পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

বাহিরে তখন দুর্য্যোগের রাত্রি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চারিদিকের অন্ধকার বিরাট্ ও সূচীভেদ্য। মাত্র তড়িতের বিকাশ, অন্ধকারের সেই জমাট্ বুক্‌খানাকে খান্‌খান্ করিয়া কাটিয়া কুচাইতেছিল, এবং তাহাতে সমস্ত আকাশের, বাতাসের, পৃথিবীর, প্রকৃতির বুকের কোন্ মর্ম্ম-

বিদারি হাহারবে ঝড়ের গর্জ্জনে দিকে দিকে প্রলয়সঙ্ঘাত বাধাইয়া গুমরিয়া গর্জ্জিয়া ফিরিতেছিল। মর্ম্মাহতের মর্ম্মঘাতনার সেই কাতর বিলাপের তালে তাল মিলাইয়া ওদিকে সমস্ত বিশ্বজগতের বুক-ভাঙ্গা প্রাণের কান্না প্রচণ্ড-বেগে ধরণীর বুকের উপরে আছাড় খাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সে দুর্য্যোগের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। অশান্ত-প্রকৃতির নিজের অপরিমেয় ব্যথিত ক্রন্দন-রবে ঘুমন্ত জগতের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ধ্বনিটুকুও কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু অজিতের কর্ণে সেই ঝড়ের প্রলয় গর্জ্জন ছাপাইয়াও সদ্যজাগ্রৎ ভৃত্যবর্গের 'চোর চোর' শব্দ ও কুকুরের উন্মত্ত চীৎকার হাজারটা কামান-গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি তুলিয়া তাহার প্রায় নিশ্চল হৃদ্‌পিণ্ডের উপর মৃত্যুশেল হানিতে লাগিল। অরুন্তুদ মর্ম্মব্যথাভরা বিশ্বের এত বড় যন্ত্রণা-কাতর শোকের চেয়েও তাহার বিদ্ধ বুকের যন্ত্রণা যেন আরও অসহনীয়, আরও মর্ম্মান্তিক বলিয়া মনে হইল। পথভ্রষ্ট শীতার্ত্ত ভয়ত্রস্ত অজিতের একবার মনে হইল, আর সে পারে না—পলায়নে বিরত হইয়া এইখানেই দাঁড়াইয়া থাকে। চোর বলিয়া না হয় তাহাকে ধরে ধরিলই। সত্যিই তো আর সে চোর নয়। তাহাকে ধরিয়া তাহার পিতার কাছেই তো লইয়া যাইবে। যতই হউক, কলিকাতার লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের গৃহ ফেলিয়া অজিত যে এই বিপ্লবময়ী নিশীথে এতখানি পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারই ঘরে চুরি করিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এ কথাটা তিনি, বিশ্বাস না করিলে নাও তো করিতে পারেন? কিন্তু, না,—জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না। অজিতের এই দীনহীন মূর্ত্তি, অস্বাভাবিক কার্য্য, তাঁহার মনে যে এ সংশয়ের রেখাপাত করিতেও পারে না, এমন কথা আজ নিঃসংশয়ে ধারণা করিয়া লইতে অজিতের নিজের মনেই বা কতটুকু ভরসা আছে? সত্য চোরের সহিত তাহার ব্যবধানই বা আজ কতটুকু? উনি তাহার জানেনই বা কি? কেনই বা মনে না করিতে পারেন যে, চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ অজিত তাহার চির-অপরিচিত পিতৃগৃহের ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া চুরি

করিতেই আসিয়াছিল।: এ বাড়ী, ক'টা দিনমাত্র পূর্ব্বেও কি তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতই ছিল না ?

অজিতের ঝটিকা-বিক্ষিপ্ত বিপর্য্যস্ত-চিত্তে পরস্পর বিরোধী ভাবের দ্রুত-সংঘর্ষণে তড়িত-প্রবাহ বহিতে লাগিল। তাহার জ্বালাভরা চিত্তে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। যদি তিনি নিমেষমাত্র দৃষ্ট চিরপরিত্যক্ত এই অভাগা সন্তানকে চিনিতেই না পারিয়া কঠোর লাঞ্ছনার শেষে তাহাকে পুলিশের হস্তেই অর্পণ করেন ? সে কি তখন নিজের অবিশ্বাস্য পরিচয় তাঁহাকে জানাইতে যাইবে ?—না, ফাঁসি দিলেও না। –এই নিশাচরবৃত্ত দুর্ভাগ্য ভিখারী অরবিন্দ বসুর পুত্র, অজিতকুমার বসু ! এ কথা শুনিতে পাইলে যে বসুবংশের আদিপুরুষ পর্য্যন্ত সেই দূরাদপি-দূর পিতৃলোকে লজ্জায় শিহরিয়া উঠিবেন ! পিতার শরীর, অস্পৃশ্য কৃমি-কীট-সদৃশ চোরের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া, ঘৃণায় কণ্টকিত হইবে, তাঁহার উচ্চ মস্তক সেই মুহূর্ত্তে মাটিতে মিশিয়া যাইবে যে ! এবং—এবং চাহি কি, নিজের সে লজ্জা ঢাকা দিতে. তিনি তাহাকে অস্বীকার করিলেও কি করিতে পারেন না ? তাই বা কে জানে ?—হাজত,—জেলখানা,—দ্বীপান্তর—ওঃ, ভগবান ! ঐ রকমই একটা আশ্রয়—একটা কঠোর বন্দিশালাতেই তাহার জন্য একটুখানি স্থান তুমি করিয়া দাও ! যেখানে বসিয়া অজিত প্রাণপণ ইচ্ছা-সত্ত্বেও নিজের এই অন্তর-বাহিরের দুঃখ-দারিদ্রের রাশিকৃত বোঝা লইয়া, তাহার ধনী পিতার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের আশেপাশে লুব্ধ তস্করের ন্যায় চৌম্বকাকর্ষিত খণ্ড অয়সের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে না। পাথর ভাঙাইয়া, লোহা পিটাইয়া, ঘানি টানাইয়া, নির্দ্দয় শরীর শ্রমে পিষিয়া ফেলিয়া, তাহার এই অহরহঃ অশান্তি অনলে দগ্ধ ক্রন্দন-মুখর এই উন্মত্ত হৃদয়টাকে একান্ত অবসন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলেই আর তো কোনরূপ উদ্দাম দুশ্চিন্তার অবসর সে পাইবে না। এই এতটুকু,—হে নারায়ণ ! এতটুকু দয়া কি তাহাকে করিতে পার না ? দাও তাহার মধ্যের এই ঘাতপ্রতিঘাত-

জর্জ্জর দুরন্ত দানবটাকে শান্ত করিবার একমাত্র পথ—তাহার জীবনের এই একটিমাত্র অভিশাপ ;—তাহার এই অনাহত স্বাধীনতাটুকু সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লও,—কাড়িয়া লও।—আর যে সে পারে না গো,—পারে না গো, পারে না।—

সহসা মার মুখ—দুঃখ-ক্লিষ্ট, অথচ কি নম্র, কি ধৈর্য্য স্থৈর্য্যভরা, সংযম-গৌরবে উজ্জ্বল মহিমায় বিমণ্ডিত দুঃখিনী মায়ের মুখ মনে পড়িয়া গেল! এ ক'দিন মাকে সে একেবারেই কি ভুলিয়াছিল?—তখন দুঃসাহসী অজিতের বুকের দাবানলে একসঙ্গে অনেক রকম ভয় ভাবনার ছোট বড় স্মৃতি জড় হইয়া উঠিয়া, অসহায় বেদনাশ্রুরূপে ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। তখন মনোরমার বুকের নিধি, স্নেহের দুলাল বাহুস্পৃষ্ট একটা কোমল কলাঝাড়কে মায়ের বুকের মতই প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া, অবিরল বৃষ্টিধারার সঙ্গে সমানভাগে ভাগ করিয়া লইয়া নিজের অফুরন্ত প্রাণের কান্না কাঁদিয়া উঠিল।

সে সময় তাহার পিতার প্রাসাদ-গৃহে প্রায় পঁচিশজন সদ্যজাগরিত দাসদাসী, দ্বারবানে মিলিয়া পলায়িত তস্করের সম্বন্ধে গভীর উৎসাহ-সহকারে আলোচনা চালাইতেছিল, রামফল সকলের কাছেই দম্ভ করিয়া বলিতেছিল যে, ভাগ্যে তাহার গায়ে পা বাধিয়া চোর শালে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছিল,—নতুবা এতক্ষণ কি কাণ্ডটাই যে ঘটিত দেখিতে! শালে চোরকে সে তো একপ্রকার ধরিয়াই ফেলিয়াছিল। কিন্তু কি করিবে? ছোটু সিং প্রভৃতি ঘুমাইলে তো আর বাঁচিয়া থাকে না,—চীৎকারে গলা ফাটাইয়াও কাহারও সাড়া পাওয়া গিয়াছিল কি?—অত-বড় একটা জঙ্গী জোয়ান্ পালোয়ান্‌কে অনেকক্ষণ ধরিয়া জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া রাখা কি আর একা বুড়া-মানুষ তাহার সাধ্য? তবু সে রাখিত, যদি না বিদ্যুতের আলোয় সেই চোগোঁপ্পা ভোজপুরীটার হাতের প্রকাণ্ড পাঁঠা-কাটা ছুরিখানা বিদ্যুতের মতই ঝিলিক্ মারিয়া উঠিত। বাপ্‌রে

বাপ্! এ-বয়সে চোর ধরিতে গিয়া সে কি অপঘাতে জানটাই দিয়া ফেলিবে না কি ?

অরবিন্দ বলিল, "কেন ওরা অমন ক'রে চেঁচামেচি করচে ? ওদের বারণ করো রাণি, সে তো চোর নয়।"

ব্রজরাণী বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়া উজ্জ্বল আলোয় স্বামীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। "চোর নয় ? কি তবে ?"

অরবিন্দ ক্ষণকাল শ্রান্তি-নিমীলিত-নেত্রে চুপ করিয়া থাকিয়া, ক্লিষ্টকণ্ঠে, এ ক'দিনে যেমন দুর্ব্বল স্বর তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্বরেই জবাব দিল, "স্বপ্ন।"—

"স্বপ্ন ?"—

"হ্যাঁ, স্বপ্ন !—কি স্বপ্ন দেখছিলুম জানো রাণি ? কার যেন খুব নরম নরম একখানা ছোট্ট মুখ,—যেন আমার এই পা দু'খানার ওপোর পড়ে রয়েছে। তার গরম গরম চোখের জলও যেন আমার পায়ে ঠেকেছিল।—আচ্ছা, তুমি হাত দিয়ে দেখ তো রাণি,—সত্যি কি না ?"

ব্রজরাণী বিস্মিত হইয়া স্বামীর পায়ে হাত দিল। পায়ের তলাটা যেন কিছু ঠাণ্ডা ও ঈষৎ আর্দ্র বোধ হইল বটে।—কিন্তু ঘাম ভিন্ন ইহাকে অশ্রু বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষতঃ, না চোর, না স্বপ্নের মানুষ—এতদুভয়ের একতম কাহাকেও তাহার স্বামীর পায়ে নিঃশব্দে অশ্রু-বর্ষণের যোগ্য বলিয়া তাহার ধারণা হয় নাই; তাই সে নিরুত্তরই রহিয়া গেল।

তখন গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া অবসাদ-ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে অরবিন্দ আপনা আপনিই বলিলেন, "তবে, বোধ হয় স্বপ্নই হবে।"

ব্রজরাণী সহসা কহিল, "স্বপ্নই যদি হবে, তা'হলে আলো নিবিয়ে দিলে কে ?"

"ঠিক"—

বলিয়া অরবিন্দ পুনশ্চ আর একটা নিঃশ্বাস অত্যন্ত বড় করিয়া ফেলিল। মনে হইল, তাহার দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডের গতি-ক্রিয়া বুঝি ইহার পর আপনাকে চালনা করিতে একেবারেই অপারগ হইয়া যাইবে—এমনি আর্ত্ত হাহাকারে ভরা সে নিঃশ্বাসটা।

অষ্টচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

অসমা নানাহারিঃ শৈনং শব্দাশ্চ কিমমুনানাহারি।
অপি তে নানাহারি ভ্রান্তভূষণমপাস্ত নানাহারি॥

—নলোদয়।

ইহার পরদিন কলিকাতা-মহানগরীর মাথার আকাশে মেঘজালছিন্ন-মার্গে প্রভাতের প্রথমোদিত অরুণালোক ধরণীর মুখে যখন প্রথম কৌতুক নেত্র-পাত করিল, তখনই সেখানকার নগ্ন বীভৎসতায় তাহার সোণার বর্ণ মলিন হইয়া গেল। গলির তো কথাই নাই—বড় বড় রাস্তাগুলাতেও দধি-কাদায় সাতটা আছাড় খাইয়া লোক চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে, রথচক্রের আবর্ত্তনে সেই কর্দ্দম-পিচ্ছিল পথ সমধিক বিচিত্রতর হইয়া উঠিল। বড় বড় গাড়ী, মোটর নিজেদের দর্পিত গতিফলে পথচারী ব্যক্তিগণের সর্ব্বশরীরে চক্রমথিত কর্দ্দম মাখাইতে মাখাইতে, এবং নিজেরাও সেই সঙ্গে সুচিত্রিত মূর্ত্তি ধরিয়া, অনবরত গালি খাইতে খাইতে চলিল। আরোহিবর্গ 'পেটে খাইলে পিঠে সয়' এই মহাবাক্যের সার্থকতা বুঝিয়া, নিঃশব্দে সাধারণের বিরক্তি পিঠ পাতিয়া লইয়া সুখে চলিয়াছিল। কিন্তু পথে চলা যে আজ কত বড় বিড়ম্বনা, সে কেবল সহরের বাসিন্দারাই ভাল করিয়া বুঝে। জুতা আজ পায়ের পরিবর্ত্তে সাড়ে-পনেরো-আনা পথিকেরই হাতে।

কতক্ষণ পরে কেমন করিয়া যে অজিত বালিগঞ্জের সেই বাগান-বাড়ীটা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মেঘ-ছিন্নালোকে পথ চলিতে আরম্ভ করে,—ভোরের বেলা আপার-সার্কুলার রোডের একটা দ্বিতল বাটীর বারান্দায় ঢুকিয়া, একটা কুণ্ডলীপাকান পথের কুকুরের পাশেই আচ্ছন্ন, অভিভূত হইয়া শুইয়া পড়ে, এবং সেই ভিজা-কাপড়ে, ভিজা-মাথায়, তৎক্ষণাৎ তাহার অবসাদ-ক্লান্ত দেহ এলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দেয়;—সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যখন দেখিল, চারিদিকে রৌদ্র বেশ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে,—তখন আর সে সব কথা স্মরণ করিয়া দেখিবার অবসর তাহার আদৌ ছিল না। দু'বারকার রোল কলেরই সময় অতীত হইয়া গেল—কৈফিয়ৎ দিবার তাহার কিছুই নাই। এইবার তাহার জীবনের যে এক সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্ত প্রতি পলে বিপলেই তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে,—যে জীবনে অতর্কিতে এক উদ্দাম চপল ঝঞ্ঝা সবেগে ছুটিয়া আসিয়া—গত নিশীথে যেমন করিয়া ধরণীর বুকের লজ্জা-বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া দুর্দ্দান্ত ঝড়ের হাওয়ার উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতার ছন্দোহীন ভীষণ তাণ্ডব দেখাইয়া দিয়াছে,—তেমনি করিয়াই তাহাকে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্যই উদ্যত হইয়া আসিতেছিল। অকথ্য লজ্জায় মাটির সঙ্গে মাথা মিশাইয়া, বিশ্বের ঘৃণা বহন করিয়া, এইবার পথে বাহির হইয়া পড়িবার পালা।—মা কি তাহার সহিতে পারিবেন? অজিত যদি স্কুল-প্রমোশনে প্রথমের স্থলে কদাচিৎ একবার দ্বিতীয় হইয়াছে, তো মায়ের হাসিমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে যে!—সেই অজিত,—তাঁহার সেই প্রাণান্ত শিক্ষায় শিক্ষিত অজিত, আজ সাধারণের ঘৃণা অবজ্ঞার পাত্র,—উপহাসাস্পদ!—অজিতের আজ সব সহে,—কিন্তু মা?

হোষ্টেলের অভিভাবক বেশি কথা বলিলেন না,—তাঁহার যা বলিবার ছিল, সেই প্রথম দিনেই বলা হইয়া গিয়াছে। কমিটির বিচারে যে ব্যবস্থা হইবে, সে তো আর অজিতের অজ্ঞাত নয়! অতএব পূর্ব্ব হইতেই—

অর্থাৎ এই মুহূর্ত্ত হইতে যত শীঘ্র হয়, তাহার হোষ্টেল ত্যাগ তাঁহাদের বাঞ্ছনীয়। রুক্ষ দীর্ঘকেশ রক্ত-চক্ষু, ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত জামা কাপড়, রুধির-চিহ্নিত, আহত স্ফীত নাসা,—এই সমুদয় চরম অধঃপতনের পূর্ণ চিহ্নে চিহ্নিত সঙ্কুচিত লজ্জা-ক্ষুব্ধ, অজিতের পদাঙ্গুলী হইতে মস্তকাবধি ক্ষমাহীন, কঠোর দৃষ্টি হানিয়া, তিনি দাঁতে দাঁতে চাপিয়া অস্ফুট গর্জ্জনের ধ্বনিতে কহিলেন, "এটা গাঁজা মদের আড্ডা নয়, অজিত!—ভদ্রলোকের ছেলেদের থাক্‌বার জায়গা। এখানে বসে তোমার ও-সব ছোটলোকী কাণ্ড তো চল্‌বে না বাপু! তুমি যখন এতবড় নির্ল্লজ্জই হ'য়ে উঠেছ, তখন সেই রকম জায়গাও একটা খুঁজে নিতে তুমি পার্‌বে,—কলেজেও তো আর যাও টাও না।"

অজিত যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘর হইতে বাহির হইয়া, নিজের তিন বছরের অধিকৃত কোণের সেই ছোট ঘরটির দিকে চলিয়া গেল, তখন তাহার আশে পাশে অনেকগুলাই কৌতুক-দৃষ্টি উঁকিঝুকি মারিতেছিল; দ্বারের পাশেও বেশ একটা ভিড় জমিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া অনেকেই একটু সরিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু কেহই, নিজেদের অযথা কৌতূহল ধরা পড়ায়, লজ্জা পাইয়াছে এমন বোধ হইল না। সে কোন দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া, অবনত-শিরে নিজের গন্তব্য-স্থানাভিমুখে নিঃশব্দেই চলিল। কিন্তু না চাহিয়া দেখিয়াও, নিজের অপূর্ব্ব বেশভূষায় ভূষিত দেহটা যে এই সকল দর্শকের দৃষ্টি-ক্ষুধার কত বড় খোরাক্ যোগান দিতেছে, তা' সে দিব্যদৃষ্টিতেই দেখিতেছিল। অজিতের দু'চোখ দিয়া আগুনের দুইটা হল্কা বাহির হইতে গেল। কিন্তু তাহা আবার মুহূর্ত্তে সংযত হইয়া ফিরিয়া, রুদ্ধ তাপে তাহারই শরীরাভ্যন্তরের সমস্ত শিরাগুলির মুখে মুখে, শরীর রক্তের ধারায় ধারায় কেরোসিন-লাগান আগুনের মত লহরে লহরে নর্ত্তিত হইয়া, শিখায় শিখায় জ্বলিয়া উঠিল।—হ্যাঁ, এইবার বিখ্যাত বসুবংশে জন্মটা তাহার সার্থক হইয়া উঠিল বটে! দুর্দ্দশার যেটুকু বাকি

ছিল, সে দিনের সেই শুভলগ্নে জন্মদাতার সহিত সাক্ষাতের ক্ষণেই সেটা পুরাপুরি রকমে পূর্ণ হইয়া গেল। মন্দ নয়। কালও সারারাত্রি সেই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া সে সেই পিতারই একটি নিমেষের দর্শন-পরশন মাগিয়া লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়াছে! ধন্য সে! ইহারা তাড়াইয়া দিল,—দিক্। কিন্তু আজ গিয়া দাঁড়াইলে, পাগলা-গারদের কর্ত্তৃপক্ষ যে আদর করিয়া তাহাকে ডাকিয়া লয়, তাহাতে কিছুমাত্রও সংশয় নাই। পাগল নহে তো সে কি?

পিছনে কয়েকটা অবমাননাসূচক শব্দও শ্রুত হইল।

"এঃ, এটা একেবারে জানোয়ার বনে গেছে রে! জানোয়ার বনে গ্যাছে!"

"দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি বওয়াটে হ'য়েই উঠ্‌লো! একটু লজ্জা সরমও কি রৈলো না?"

"এরই মধ্যে অমন মাতাল হ'লো কেমন ক'রে, তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হচ্চি! চোখ দুটো দেখেছিস্?"

"হয় ত কোকেন খায়।"

"পা দুটোও বেশ টল্‌চে!"

"আহা, বিধবার ছেলে!"

শেষ-কথাটাই অজিতের ঠিক্ মর্ম্মস্থলে বজ্রবলে গিয়া বিদ্ধ হইল। মা! অজিতের মা, বিধবা?—অজিত অনাথ, অভাগা, ভিখারীরও অধম সত্য।—মা তাহার অনাথিনীর চেয়েও অনাথা, তাও নিশ্চিত;—কিন্তু তাঁহাকে বিধবা বলিল ইহারা কি সাহসে? তার রাজরাজেশ্বরী মায়ের ঝলমলে সিঁথার সিঁদুরটুকুই যে তাঁহার মহান্ সম্পদ, শোভা এবং শ্রী। কিন্তু তথাপি তিনি বিধবা ভিন্ন আর কি কিছু?

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তাহার ঘরের অন্য ছেলেটী আর একটি ছেলের সহিত উত্তেজিত স্বরে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল,—খুব সম্ভব তাহারই কথা

সে ঘরে ঢুকিতেই, দ্বিতীয় ছেলেটী বক্র কটাক্ষে অজিতের দিকে চাহিয়াই, একটুখানি মুচ্কি হাসি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অপর ছেলেটী তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহানুভূতির সহিত সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "তোমার নামে ওরা অনেক সব রটনা ক'রে বেড়াচ্চে, অজিত,—আমি কিন্তু ওর একটা কাণাকড়িও বিশ্বাস করি নে। কেষ্টধনকে সেই কথাই আমি এই এতক্ষণ ধরে বল্‌ছিলাম।"

অজিত সহসা ভীষণভাবে রাগিয়া উঠিয়া, চীৎকার করিয়া বলিল, "কেনই বা তুমি বিশ্বাস করো না, কেন? সবাই যখন করে, তখন তোমারই বা কিসের অবিশ্বাস?—আমি কারুর কাছ থেকে সিকি পয়সারও সহানুভূতি চাই নে, তা জানো?"

মুটের মাথায় বিছানার মোট ও ট্রাঙ্কটা চাপাইয়া দিয়া, অভুক্ত অজিত সেদিন যখন নিঃসম্বলে, নিঃসহায়ে কলিকাতা রাজধানীর জনারণ্যমধ্যে একাকী বাহির হইয়া দাঁড়াইল, তখন একবারের জন্য নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিলেও, দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে তাহাকে যেন ভিতর হইতে একটা বন্ধন-মুক্তির তীব্র আনন্দে একেবারে ভরপুর করিয়া দিল। বাঁচা গেল! আঃ! ধার-করা ভদ্রয়ানার খোলস্ খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার কাছে কড়াক্রান্তির হিসাব শোধ করিয়া দিয়া, এইবার সে স্বস্তিতে ঘুমাইয়া বাঁচিবে! তিনটা টিউসনী, একটা পাশ করায় কঠোর শ্রম, চিন্তা আর উপর অধীনতার নাগপাশে আগাপাশতলা সমস্তটা আঁটিয়া বাঁধা!—এতগুলা উপদ্রবের হাত হইতে আজ সে রক্ষা পাইল। আর তার চেয়েও বড় রকম রক্ষা পাইল, তাহার এই নূতন নেশাটার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া। এই পাপ কলিকাতা হইতে বিদায় লইয়া নিজের সেই চির-স্নেহের, চির-শান্তির নীড়ে—মাতৃক্রোড়ে ফিরিতে পারিলেই তাহার জীবনের গতিও সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া যাইবে। সেখানে রাজ-সরকারে একটা পঁচিশ টাকা মাহিয়ানার চাকরীও কি তাহার জুটিবে না? মায়ের কোলে

থাকিয়া দুঃখের অন্ন দু'জনে সুখ করিয়া খাইবে,—আর কি দুঃখ? আঃ, বাঁচা গেল রে, বাঁচা গেল!

কিন্তু,—কিন্তু, মাকে গিয়া সে জবাবদিহি কি করিবে?—মিথ্যা বলিতে পারিবে না—সত্যই বা বলিবে সে কেমন করিয়া? অবমাননায়, লাঞ্ছনায় আপাদমস্তক পরিপূর্ণ করিয়া কুকুরের ন্যায় বিতাড়িত অজিত তাহার পুণ্যময়ী জননীর পবিত্র অঙ্ক কলঙ্কিত করিতে যাইবে আজ কোন্ মুখে?—না—না, এ কলঙ্কের কালি মাখিয়া সেখানে আর তো তাহার স্থান নাই। মায়ের কোলের একমাত্র সান্ত্বনার স্বর্গ অজিতের পক্ষে আজ যে চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মুটিয়া বিরক্ত হইয়া গজগজ করিতে লাগিল,—"ভালা এক বউড়াহা বাবুকা পাল্লামে পড় গিয়া। কভি বোল্‌তা হ্যায় ইষ্টেসন,—কভি বোল্‌তা হ্যায় 'নেহি নেহি।' বাত্‌কো কুছ্ ঠিকানা হ্যায় নেই। দিজিয়ে হাম্‌রা মজুরি—হাম্ চলা যাতা হ্যায়।"

পটলডাঙ্গা-ষ্ট্রীটের সরু গলির মধ্যের একটা অতি দরিদ্র মেসের একখানা সেঁৎসেঁতে ঘর ভাড়া লইয়া কপর্দ্দকশূন্য অজিত যখন কুলির মজুরির দামের পরিবর্ত্তে নিজের একটিমাত্র কলেজ যাইবার ছিটের কোটটি তাহাকে দিয়া বিদায় করিল এবং বিছানাটা ঘরের মেঝেয় যেমন তেমন করিয়া বিছাইয়া লইয়াই শুইয়া পড়িল, তখন তাহার প্রবল-বেগে কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। মাথায়, ঘাড়ে, বুকে, পিঠে সর্ব্বশরীরে অসহ্য—অসহ্য যন্ত্রণায় সহস্র সূচী বিঁধিয়া বিঁধিয়া উঠিতেছে। হাত পায়ের কামড়ে, কম্পের বেগে, তৃষ্ণার নিদারুণ কণ্ঠশোষে চোখের জ্বালায় অসহনীয় কষ্টে আর্ত্তস্বরে সে কিছুক্ষণ মা,—মা,—মা,—বলিয়া বৃথাই কাতর-কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া হঠাৎ এক সময় গভীর তন্দ্রাচ্ছন্নবৎ নীরব হইয়া গেল।

তার পর তার যখন প্রথম জ্ঞানোদয় হইল, তখন সে মেডিকেল-কলেজ হাসপাতালের শত শত রোগীর মধ্যে একখানা খাটিয়ায় পড়িয়া। চোখ

মেলিতে গেল,—কিন্তু চেষ্টাসত্ত্বেও চোখের পাতা খুলিতে পারিল না। পাশ ফিরিতে গেল,—বোধ হইল, সর্ব্বশরীরে যেন এতটুকুও শক্তি নাই। তখন সর্ব্ববিধ চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, শুধুই একটা কাতর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তেমনি স্থির হইয়াই পড়িয়া রহিল। মনের অবস্থাও প্রায় শরীরের মতই বিকল,—কোন কথা স্মরণও হয় না, স্মরণ করিবার চেষ্টাও নাই।

তার পর আরও একদিন দুইদিন এইরূপ তন্দ্রা-জাগরণের সন্ধিস্থলে কাটাইয়া, অল্পে অল্পে ঈষৎ সবল হইলে, সে প্রথম যেদিন চোখ চাহিল,—সর্ব্বপ্রথম তাহার মনে হইয়াছিল, তাহার মুখের উপর নত হইয়া তাহার কপালে ঠাণ্ডা জলের পটি বসাইয়া দিতেছেন—তাহার মা। দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া সে তাঁহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া, সেই বিশ্বাসেই সাগ্রহে 'মা' বলিয়া ডাকিল। কোন সাড়া আসিল না। উপরন্তু ধৃত হস্তখানা ঈষৎমাত্রায় আকৃষ্ট হইল। অজিত প্রাণপণে সেখানা ধরিয়া রাখিয়া—নিজের রুদ্ধ নিঃশ্বাসের চাপে

আনিল। তাহার মুখের দিকে কৃষ্টে

"মা! মা! মা!"

হায়, কোথায় মা? সে মূর্ত্তি মাতৃত্বের .

দৃষ্টি এক ইয়োরোপীয় বা ইউরেশিয় নার্সের। প্রৌঢ়া নারী বিরক্ত-ঝঙ্কারে হাত সরাইয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, "বাই জোভ্! ছোঁড়াটা পাগল না কি? না, ব্রেন 'কম্‌প্লেন' আবার জোর করলে!" নির্ব্বাক্ অজিত নিজের বুভুক্ষিত ক্ষীণ দৃষ্টি দ্বারা কক্ষের শেষ-প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই নারীমূর্ত্তির অনুসরণ করিল। তাহার ব্যথিত পীড়িত দুর্ব্বল দেহ মন কি একান্ত কামনাতেই যে মায়ের স্পর্শ খুঁজিতেছিল, তাহা ওই মাতৃজাতির মমতাবিহীন স্পর্শটুকু হইতেই তাহার কাঙাল চিত্ত যেন আরও বেশী করিয়াই বুঝিতে পারিল। নারী আর কয়েকটি রোগীর উপরেও নিজের 'ডিউটি' সম্পন্ন করিয়া লইয়া,—তেমনি বিকার-বর্জ্জিত-

মুখে অবিচলিতভাবে চলিয়া গেল। কম্বল-শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া, অজিতের দুই চোখের কোণে জল ভরিয়া ছাপাইয়া উঠিল। রোদনবিহীন নিরুদ্ধ কান্নার বেগে বুক ভর্ত্তি হইয়া উঠিতে থাকিলেও, শক্তির অভাবে তেমন করিয়া সেই অসহায় রোদনের উৎস তাহার অশ্রুধারায় উৎসারিত হইতে পারিল না। পারিলে হয় ত সে বাঁচিয়া যাইত।

যত দিন যাইতে লাগিল, মায়ের কথা, মায়ের উৎকণ্ঠা মনে করিয়া অজিতের নির্জ্জীব অবসাদগ্রস্ত অন্তর যেন অসহ্য আবেগের উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। সে যখন স্বেচ্ছাচারের নির্ভীক উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া গিয়া, উন্মাদ হইয়া, মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছিল, সেই মরু-বালুকার দুঃস্বপ্নঘোরে মায়ের মঙ্গলমুখ তাহার নিকট তখন যেন স্বপ্ন হইয়া গিয়াছিল! আজ যখন সাহারার রুদ্র মরুপ্রান্তরের অসহনীয় উত্তাপ-তেজে তাহার ভিতর বাহির সমস্ত ঝলসিত হইয়া গিয়াছে, আজ জীবন-মৃত্যুর মহা-দ্বন্দ্বের মাঝখানে সংশয়াবর্ত্তে বিঘূর্ণিত, ভীত, ত্রস্ত, অসহায় বালক উদ্‌ভ্রান্ত বেদনায় সেই দূর অতীতের ক্ষীণালোক দীপ-শিখাটির পানেই নিজের স্তিমিত দৃষ্টির সমস্ত আকর্ষণ জড়ো করিয়া আনিয়া কাতর-নেত্রে চাহিয়া আছে। সম্ভবিগতের অসহ্য তাড়িতালোক জ্বালা, সহস্র উন্মাদনাময় আলোর লহরী, আজ তাহার চক্ষে শুধু সর্প-জিহ্বার সূচী বিদ্ধ করে নাই,—তাহার প্রাণটাকে শুদ্ধ তেমনি বিষ-জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে।

নিদারুণ দুঃখ নৈরাশ্যাহত দুরবস্থার দিনগুলায়, তীব্র বেদনায় আলোড়িত-বক্ষে—এই কথাটাই তাহার সকল সময়েই প্রায় তোলপাড় করিতে থাকিত,—এই যে, এই পিতাই তাহার জীবনের শনিগ্রহ! তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না ঘটিলে, ভদ্র-সন্তান অজিত আজ যেমন হোক্ একটা সম্মানের আশ্রয়েই পড়িয়া থাকিতে পারিত। দাতব্য-চিকিৎসালয়ে শত শত দরিদ্র ভিখারী, কুক্রিয়া-নিরত কুৎসিত রোগগ্রস্তের মাঝখানে আজ নির্ব্বান্ধব অবস্থায় তাহাকে মরণ-শয্যা পাতিতে হইত না। যদি মরণও আসিত,

তাহাকে মায়ের কোল হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া ছিনাইয়া লইতে হইত। আর এখানে যে-ঘৃণায় সে-ও তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া গেল। একটা পিপীলিকা মরিলেও যে অজিত একদিন কাঁদিয়া খুন হইয়াছে, আজ সেই অজিতই মৃত্যুর ভীষণ লীলারঙ্গ, মুমূর্ষুর মৃত্যু-কাতরতা ছুটি বেলায় নিজের আশে পাশে প্রত্যক্ষ করিতেছে!—ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃতের সহিত একত্র অবস্থিতি করিতেছে। এর চেয়ে তাহার পক্ষে আর বেশী কিছু শাস্তি আছে কি? এ কি সেই অজিত?

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

বরমেকস্য ভীতস্য প্রদাতুর্জীবিতং ফলম্।
ন চ বিপ্রসহস্রেভ্যো গোসহস্রং ফলং লভেৎ॥

—দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা।

আঠারো দিনের পর অজিত উঠিয়া বসিল, চব্বিশ দিনের দিন সে এখান হইতে বিদায় পাইল। বাহিরে আসিয়াই তাহার মনে হইল, ভিতরেই সে বরং ছিল ভাল।

অনেক কষ্টে পথ হাঁটিয়া, যে মেসে বিছানা ট্রাঙ্ক-সমেত আশ্রয় লইয়াছিল, সেইখানে আসিয়াই শুনিল, তাহার মত মারাত্মক লোকের কোন দায়িত্বই উহারা রাখিতে ভরসা করে না। অতএব ঐ কঙ্কালশীর্ণ মূর্ত্তি লইয়া তাহাকে তাহারা নিজেদের চৌকাট পার হইতে দিতেও অসমর্থ।—জিনিসপত্র? জিনিসের তাহারা জানে কি? সে সব সেই—যেদিন তাহাকে ডুলি চড়াইয়া বিদায় করিয়া দেয়, সেই দিন, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে সব জাল জঞ্জাল

তাহারা বাহির করিয়া দিয়াছে। সেই অচৈতন্য মরা-মানুষ যে আবার হাস্‌পাতালের পথ্য-সেবা উপেক্ষা করিয়াও জ্যান্ত ফিরিয়া সে সবের দাবী তুলিবে, সে কথা উহারা জানিবে কেমন করিয়া? কোন্ ভদ্রলোকেই বা ইহা বিশ্বাস করিতে পারে?

রাজধানীর পথে পথে ভিক্ষাপাত্র-হস্তে পর্য্যটন ব্যতীত অজিতের আজ আর দ্বিতীয় পন্থা কোথায়? কোথায় যাইবে সে? বর্দ্ধমানে? মায়ের কাছে? মা কি আজও তাহার বাঁচিয়া আছেন! যদিই থাকেন, নিশ্চয়ই নিরুদ্দিষ্ট অজিতের অনুসন্ধানে বিরত হইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া নাই! অজিতের অধঃপতনের ইতিহাস ও তাহার পরিণাম সবই এতদিনে তাঁহার কাণে উঠিয়াছে। অজিত সেখানে গিয়া দাড়াইয়া, মায়ের চোখের উপর চোখ রাখিবে কোন্ অধিকার লইয়া? তিনি তো অজিতের শুধু গর্ভধারিণী মা-ই নন, নিজের মুখের অন্ন, বুকের রক্ত দিয়াই তো শুধু অজিতকে তিনি জীয়াইয়া রাখেন নাই, নিজের অকলঙ্ক পুণ্যজ্যোতিঃ দিয়া তাহাকে নির্ম্মল শুদ্ধ সত্ত্ব করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রাণপণ করিয়াছিলেন যে। তাঁহার সেই তত দুঃখে গড়িয়া-তোলা অজিত, এই কলঙ্কের চিহ্নে চির-চিহ্নিত পতিত অজিত! না—না, অজিতের সর্ব্বহারা মা চিরদিনের মতই পুত্রহীনা হইয়াছেন! অজিত আর এ জীবনে মাকে মুখ দেখাইবে না।

কে, ও! নিতাই-মামা না?—নিতাই-মামা!—নিতাই-মামা!

দুঃসহ বিস্ময়ে চমকিত হইয়া, ফিরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া, নিতাই-চরণ বলিয়া উঠিল, "কে, রে? অজিত! তুই কোথা থেকে রে? এতদিন ছিলিই বা কোথায়? হতভাগা ছেলে! আমায় কি তুমি কম ভোগানটা ভুগিয়েছ! কেন অমন ক'রে লুকিয়েছিলি বল্ তো? কোথায় ছিলি?"

অজিতের চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছিল,—পতনোম্মুখ অশ্রু কোনমতে রোধ করিয়া সে গাঢ়স্বরে বলিল, "হাস্‌পাতালে।"

নিতাইকে কে যেন মারিয়াছে এমনি করিয়াই লাফাইয়া উঠিয়া সে

বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া বলিল, "বটে! তাই জন্যেই কোথাও সন্ধান পাই নি। কি হ'য়েছিল? কতদিন ছিলি? কি ভয়ানক চেহারা হয়েছে। অ্যাঁ! আমার কাছে না গিয়ে তুই হাস্‌পাতালে গেলি কি ব'লে? হ্যাঁ রে, পাজি ছেলে?"

আর বুঝি সামলান যায় না। পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার ভারে অশ্রুভারাতুর স্তম্ভিত-কণ্ঠে অজিত কহিল, "আমি যাই নি, মেসের ওরা আমায় ফেলে দিয়ে এসেছিল।"—বলিতে বলিতে এইবাবে সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাতে দুই চোখ চাপা দিল।

"ওরে, না—না, থাম্, থাম্! আয়, আমার সঙ্গে আয়, কবে এসেছিস্? আছিস্ কোথা? খাওয়া হয়েছে?"

সব কটা প্রশ্নের মধ্যে মাত্র প্রথম প্রশ্নের জবাব শুনিয়াই সমুদয় অবস্থাটা বোধগম্য করিয়া লইতে অধিক সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল না। সঙ্গে করিয়া আনিয়া, তাহাকে একটা হিন্দু-হোটেলে কিছু খাওয়াইয়া, ট্রামে চাপাইয়া তাহাকে নিজের ধর্ম্মতলার বাসায় লইয়া আসিল। পথে অনেক চেষ্টায় মুখ খুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মামা! আমার মা?"

নিতাই ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তার সেই ম্যালেরিয়া জ্বরটা চল্‌ছিলই,— সে তো বন্ধ হয় নি।—তার উপর হঠাৎ তোমার এই সব ব্যাপার! সেই সময় মা'টা, সবাই তীর্থ কর্‌তে বা'র হ'লেন,—সেও যেতে চাইলে, আমি আর না বল্‌তে পার্‌লুম না। একটু চেঞ্জও হবে, আর ততদিনে তোমারও একটা খোঁজ খবর পাওয়া যাবে—এই সব সাত পাঁচ ভেবে চিন্তে—"

"তা'হলে, তা'হলে, মা এসব জানেন না?"

"উহুঃ, তাকে কি আমি বল্‌তে পেরেছি! হঠাৎ একদিন মায়ের চিঠি পেলাম যে, অজিতের ক'দিন চিঠিপত্র আসে নি, মনোরমা কেঁদে কেটে খুন হ'চ্চে, তুমি শীগ্‌গির একবার তার কাছে যাবে। গেলুম, গিয়েই তো চক্ষু

স্থির! কিন্তু কি করি, এদিকে রোজ একখানা করে চিঠি আসচে, যে, মনো না খেয়ে পড়ে আছে—কেন তোমরা চিঠি লিখ্‌চো না। ভাবলুম, মিথ্যেই বলি। সত্যি বল্‌লেই যখন হতভাগী বুক ফেটে গিয়ে মরে যাবে, তখন অমন সত্যি বলি কি করে? লিখ্‌লুম, তার 'অ্যানুয়েল' এক্‌জামিন—এই সব পাঁচটা কথা লিখে দিয়ে, তোমার খোঁজে দু'বেলা বার হ'তে লাগ্‌লুম। কেউ কিছুই বল্‌তে পারে না। আমার চেনা একটি দোকান-দার, কি রকম করে সে তোমায়ও চেনে, সে বল্‌লে ক'দিন ধরে সে তোমাকে যখন তখন সারকুলার রোড ধরে দক্ষিণ দিক্ পানে যেতে দেখে-ছিল। একদিন সন্ধ্যের পর কোথা থেকে আস্‌ছিল, দেখে যে তুমি বালি-গঞ্জের একটা বাগানবাড়ীর পাঁচিলের ধারে চুপ্‌টি করে বাড়ীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছ। ডাক্‌তে যাচ্ছিল,—তোমার চোখ দিয়ে জল পড়চে, দেখ্‌তে পেয়ে নিঃশব্দে সরে গেল। হ্যাঁ রে, কি কি হ'য়েছিল বল্ দেখি? অমন সব কথা উঠেছে কি জন্যে?"

অজিত দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া, নতমুখে নিঃশব্দে কাঠের মত কঠিন হইয়া রহিল,—একটি কথারও সে জবাব দিল না। কিন্তু মা যে এখন পর্য্যন্ত কোন কথা জানিতে পারেন নাই, এই সান্ত্বনাটুকু বুকে ধরিয়াই তাহার এতদিনের এতবড় দুঃখের তাপদাহ অর্দ্ধেকখানি প্রায় জুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেল। বুকের উপর হইতে একখানা বিশমণ পাথর যেন খসিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ তেম্‌নি করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ যেন চট্‌কা-ভাঙ্গা হইয়া, সে নিতাইএর পায়ের তলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। নিতাই ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি রে?"

"আমি যে তোমায় প্রণাম কর্‌তে ভুলে গেছলুম, নিতাই-মামা! তাই কর্‌চি।"

এই বলিয়া সে শিশুর মত হাসি-হাসি-মুখে নিতাইএর ধূলিলাঞ্ছিত জুতার ধুলা বারবার করিয়া তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মাখিল।

নিতাইএর ক্ষুদ্র বাসা-গৃহে স্ত্রী ও দুইটি কন্যাকে সে আনিয়াছিল। ইহারা অজিতের অপরিচিতা নয়। মামীর যত্নে স্নেহে অজিত অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন সে নিতাইকে বলিল, "মামা, এইবার আমায় একটা চাকরী জোগাড় করে দাও! বর্দ্ধমানেই যদি হয় তো ভালই হয়;—নেহাৎ না হয় যদি, তো, ভবানীপুর, কাশীপুর টুর এমনি কোথাও,—কল্‌কাতায় নয়।"

নিতাই বিস্মিত হইয়া উঠিল, "সে কি রে! আর পড়বি না?"

অজিত ঘাড় নাড়িল, "না।"

নিতাই বলিল, "কেন অনর্থক নিজের আখেরটা নষ্ট কর্‌রি, অজিত! অন্ততঃ বি-এটাও পাশ ক'রে নে। আর একটা বছর বৈ তো নয়।"

অজিত কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, ছলছল দুটি চক্ষু নিতাইএর মুখে স্থাপন করিয়া রুদ্ধ-প্রায় স্বরে কহিল, "না, মামা! আমি এবার থেকে মার কাছে থাক্‌বো। কল্‌কাতায় আর থাক্‌বো না।"

নিতাইএর মনে হইল, যে সব কুসঙ্গে পড়িয়া সোনার অজিত আজ কলঙ্কী অজিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাই এড়াইবার জন্য সে কলিকাতা ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। হয় ত সে যাহা স্থির করিয়াছে, ইহাই ভাল। চরিত্রই যদি হারায়, তবে বিদ্যা লইয়া কি হইবে? আর উচ্ছৃঙ্খলতা বিদ্যাই কি অর্জ্জন করিতে দিবে? প্রকাশ্যে বলিল, "আচ্ছা মা ফিরে আসুক্—তার যদি মত হয় তো, সে-ই করিস্।"

অজিত যেন এইবারে অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া উঠিতে লাগিল। দৈহিক দুর্ব্বলতা অনেকখানিই বিদূরিত হইয়াছে,—মানসিক শান্তি সম্পূর্ণরূপেই ফিরিয়া আসিতেছে। এখন যা কিছু উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা—সে শুধু মা'র জন্য। মাকে যেন এক যুগ সে দেখে নাই। সময় মোটে তিন মাস, কিন্তু ইহার ভিতর অজিতের জীবনের মধ্যে যে বিপ্লব-সংঘর্ষময় যুগান্তর ঘটিয়া গেল!

অজিতের কাজ নাই, পড়া নাই,—বই পর্য্যন্ত একখানা তাহার নাই।—নিতাইএর ঘরে দু'একখানা ডিটেকৃটিভ উপন্যাস মধ্যে মধ্যে আসে।—উহাতে আসক্তি জন্মাইবার মত মনের অবস্থা অজিতের নয়। সে রাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া অনির্দ্দিষ্ট দৃষ্টিতে জনপ্রবাহের দিকে চাহিয়া থাকে। ছায়াবাজির ন্যায় বিচিত্র দৃশ্যের পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া যায়,—কদাচিৎ কোন পরিচিত সহপাঠীকে দূরে দেখিলেই ভীষণ লজ্জায় সে মুখ ফিরাইয়া বসে—দু'চোখ ভর্ত্তি করিয়া অভিমান-বেদনার অশ্রু বক্ষ বিমথিত করে। অতদিন একসঙ্গে থাকিয়াও কেহ তাহাকে চিনিল না! শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়াই অনায়াসে তাহাকে কালির পরে কালি মাখাইয়া দিল।—দিক্, তাহার কাহারও উপরে কোন দাবী নাই। যেখানে দাবী নাই, সেখানে অভিমানই বা কিসের? দুঃখই বা কি? যাহার নিজের পিতাই—! অতি ধীরগতিতে চালিত একখানা জানালা খোলা প্রকাণ্ড ল্যাণ্ডো-গাড়ির ভিতরের দিকে চাহিয়াই অজিত সহসা সর্ব্বশরীরে তাড়িতাঘাত খাইয়া, ত্রস্ত চকিত হইয়া উঠিল। গাড়ি ঘোড়া ও ইহার সহিস্ কোচ্ম্যানকে সে বালিগঞ্জের বাগানবাড়ীতে অনেকবারই দেখিয়াছিল বলিয়া চিনিত। তা ভিন্ন আরোহীর পাণ্ডুমুখ চিনিতেও তাহার বাধে নাই,—সে মুখ যত কম সময়ের জন্যই তাহার দেখা হোক্ না কেন, হাজার লোকের মধ্যেও সে তাহা খুঁজিয়া লইতে পারে।—ইহা তাহার পিতার মুখ! ঔৎসুক্য, আনন্দ,—আরও যে কি কি তাহার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠনালীটাকে প্রায় চাপিয়া ধরিল, তাহা সে যেন ভাল করিয়া অনুভব করিতেও পারিল না। সেই মুহূর্ত্তে পিতৃদত্ত সমুদয় দুঃখ তাহার যেন সার্থকতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাহার দুঃস্বপ্নময় সদ্য-বিগত অতীতটাকে তাহার দুঃখাহত চিত্ত হইতে বিস্মরণের প্রলেপ দিয়া যেন একেবারেই মুছিয়া দিল। অপরিসীম পুলকোচ্ছ্বাস-চঞ্চল হইয়া উঠিয়া অজিত আবদ্ধ চক্ষে 'পিতা' দেখিতে লাগিল। গাড়িখানা কখন যে তাহার চক্ষের সম্মুখ

হইতে অপসৃত হইয়া নিজের গন্তব্য-পথে চলিয়া গেল, ইহাও সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জানিতে পারিল না। কেবল এই আনন্দে বিভোর হইয়া রহিল যে, আবার সে তাহার সেই মুমূর্ষুপ্রায় পিতাকে জীবিত দেখিল!

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

অহং গমিষ্যামি বনস্থদুর্গমং
তবৈবৈ পাদাবপগৃহ্য সম্মতা॥
—রামায়ণ।

অরবিন্দ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া সে চলিয়া ফিরিয়াও বেড়াইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা—সেই সবল সুস্থ দেহ, স্বাস্থ্যের অটুট লাবণ্য, আর সে ফিরিয়া পাইল না। সংসারে এমন অনেক জিনিষ আছে, হারাইলে যাহা আর পাওয়া যায় না। ডাক্তার বৈদ্য এই হারানিধি ফিরাইবার জন্য তাঁহাদের সনাতন ব্যবস্থাপত্র টানিয়া বাহির করিয়া ব্যবস্থা দিল, চেঞ্জে যাইতে হইবে। রোগীরও ইহাতে আপত্তি ছিল না। এখন গোলযোগ বাধিল, স্থান নির্ব্বাচন লইয়া। ডাক্তারেরা বলিলেন, সিমলা, দার্জ্জিলিং। আত্মীয়-স্বজন আরও দু'চারটার নাম করিল,—কিন্তু রোগী এতদুভয় মতের বহির্ভূত নিজের এক অদ্ভুত মত জাহির করিয়া বসিলেন। তিনি সিমলা-দার্জ্জিলিংকেও যেমন, পুরী-ওয়ালটেয়ার আল্‌মোরাকেও তেমনি প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়া বলিলেন, যে, তিনি পণ্ডীচারী যাইবেন।—অথবা যদি ভাল লাগে, তো জাহাজে সমুদ্রেই ভাসিয়া বেড়াইবেন। শুনিয়া ব্রজরাণী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।—আপত্তি জানাইয়া প্রতিবাদ

করিল যে, সে রকম করিয়া বেড়ান এ বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার উপযোগী হইবে না। তার চেয়ে ধর্ম্মশালা কি কাশ্মীর?—অরবিন্দ অবজ্ঞার দৃঢ় হাস্যের দ্বারা যুক্তিটাকে মধ্যপথেই খণ্ডিত করিয়া দিয়া কহিল, "আমি থাইসিস্ রোগী নই, যে, ধর্ম্মশালায় যাব। নাঃ, জাহাজে থাকাই স্থির।"

ব্রজরাণী চুপ করিয়া গেল। সে বেশ বুঝিয়াছিল, তাহার জিদের দিন ফুরাইয়াছে। বরাবরই অরবিন্দ বড় বড় বিষয়ে নিজের ইচ্ছার অধীনেই চলিতে অভ্যস্ত। তবে, নেহাৎ ছোটখাট মতগুলাকেও তেমনি উহার মতের খাতিরে বর্জ্জন করিতে ঔদাস্যেরও তাহার অভাব ছিল না। কিন্তু আজিকালি প্রতি ছোটবড় খুঁটিনাটিতেই সে নিজের জিদ্ বজায় রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয়ে ব্রজরাণী দ্বিরুক্তি পর্য্যন্ত করে না। তাহার অভিমানী চিত্ত ব্যথিত, পীড়িত, পিষ্ট—হইতে থাকে, তথাপি প্রাণপণ চেষ্টায় সে আপনাকে সংযত করে। ডাক্তার বলিয়াছেন, এ রোগীর চিত্ত-শান্তিই একমাত্র চিকিৎসা।

সমুদ্র-যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। ব্রজরাণী সেই বিলাতিজাহাজে কেমন করিয়া যে বাস করিবে, এই এক ঘোরতর দুশ্চিন্তায় তাহার মুখে যেন অন্নজল রুচিতেছিল না। রাঁধিবার লোক, আরও দু'জন চাকর সঙ্গে যাইবে, এ ব্যবস্থা অরবিন্দ নিজেই করিয়াছেন। তাহার একজন দাসীও না হয়, সঙ্গে চলিল। কিন্তু তবু কি?—তা যাই হোক্, এ লইয়া মন তাহার যতই খুঁৎ খুঁৎ করুক, মুখ ফুটিয়া এতৎ-সম্বন্ধীয় একটি কথাও সে স্বামীর কাণে তুলিবে না, ইহা স্থির। যদি তিনি হঠাৎ বলিয়া বসেন,—থাক্, তবে তোমার গিয়া কাজ নাই!

কিন্তু একদিন তাহার দুঃস্বপ্ন সফল হইয়া উঠিল। সত্যপ্রসন্ন,—হাইকোর্টের উকিল, ব্রজরাণীর দাদা,—তিনি বেড়াইতে আসিয়াছিলেন,—কি কথায় কথায় কথা উঠিয়া শেষে এক সময় ব্রজরাণী বলিয়া ফেলিল, "আমরা চলে গেলে, দাদা, তুমি এক আধবার এসে আমাদের বাড়ীটা দেখে

শুনে যেও ভাই! নৈলে যে সব লোকজন,—ওরা কি আর কিছুর যত্ন নেবে।"

সত্যপ্রসন্ন বলিল, "তা বেশ তো।"

অরবিন্দ আশ্চর্য্যের স্বরে কহিল, "তুমিও কি কোথাও বেড়াতে যাচ্চো না কি ?"

ব্রজরাণী কথাটার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিয়া, পরে যা-তা একটা বুঝিয়া লইয়া উত্তর করিল, "আমরা যখন জাহাজে বেরুবো, তখনকার কথা বল্‌ছিলাম।"

অরবিন্দ কহিল, "তুমি কেমন ক'রে যাবে ?"

রাণী তাহার মুখের দিকে বিস্মিত জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিয়া রহিল। ব্রজরাণীর দাদা কহিল, "আমিও তো সেদিন রাণুকে ঐ কথাই বল্‌ছিলাম। তা ও' শুনে মহা রেগে গেল। বল্লে, 'ওঁর ঐ শরীরে একলা পাঠিয়ে দিয়ে আমি টেক্‌তে পার্‌বো মনে করেছ ? তুমি এ কথা বল্লে কি ক'রে ?' তা এটাও একটা ভাব্‌বার কথা বৈ কি। একাটি কখন এতবড় একটা বাড়ীর মধ্যে থাক্‌তে পারে। ক্ষেপে যাবে যে!"

অরবিন্দ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা'হলে না হয় কিছুদিন উষাকে এনে রাখো,—না হয় তো কিছুদিন বা ভবানীপুরে গিয়েই থাক্‌লে, এম্‌নি করে—"

ব্রজরাণী মনে মনে অসহিষ্ণু ও ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইতেছিল। সে নিজের গলার স্বরের ঝাঁঝটুকু গোপন রাখিতে না পারিয়াই, তিক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমার কথা চুলোর দোরেই যাক্,—আমার জন্যে কেউ যেন দয়া ক'রে না ভাবে।—কিন্তু সম্পূর্ণ পরের হাতে তোমার সেবা যত্নের কি কোনই ত্রুটি হবে না ব'লে মনে হয় ? তা যদি না হয়, তা'হলে,—বেশ তো,—তাই হবে।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার নাকের ডগা স্ফীত ও আরক্ত হইয়া

উঠিল এবং অধর স্ফুরিত হইতে লাগিল। দাদার সাক্ষাতে পাছে আত্ম-সংবরণে অক্ষম হয়, সেই ভয়ে সে তৎক্ষণাৎ নিজের আসন হইতে উঠিয়া, সামনে যে দরজাটা দেখিতে পাইল, সেইটে দিয়াই বাহির হইয়া গেল। চোখের জল আর চাপা থাকিতেছিল না। কিন্তু স্বামী যে কোথাও না গিয়া কলিকাতাতেই বসিয়া থাকেন, ইহাও সে ভরসা করিতে পারিতেছিল না। বরং যতই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন, লোকজনের যাতায়াত তাঁর কাছে যত বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার মনের গোপন-চিন্তা বর্দ্ধিত হইতে থাকিল।

যে রাত্রে তাহাদের বাড়ী চোর আসে, তাহার পরদিন বাড়ীর একপাল দাসী চাকরদের আলোচনার মধ্যস্থ একটা কথা কাণে আসিতেই, ব্রজরাণী হঠাৎ ত্রস্ত-বিস্ময়ে উৎকর্ণ হইয়া উঠে। রামফলের সেই ষণ্ডামার্ক ভীষণাকৃতি চোরের বর্ণনায় বৃথা প্রতিবাদ চেষ্টা করিয়া, সব্জী বাগানের নতুন মালিটা বলিতেছিল যে, চোর জঙ্গী জোয়ান্ ভোজপুরী পালোয়ান্ নহে—সে বাবু!—মূর্ত্তি তাহার মোটেই ডাকাতের মত নয়; বরং এত ক্ষীণ যে, বোধ করি বাতাস বহিলেও সে দেহ কচি বাঁশের ডগাটির মত মাটির উপর নুইয়া পড়ে। কয়দিন সে তাহাকে তাহাদের বাগানের আশে পাশে ঘুরিতে দেখিয়াছিল। এমন কি, একদিন সে তাহাকে ডাকিয়া—বাবু কেমন আছেন, কোন্ তালায় কোন্ ঘরে তিনি শয়ন করেন, কাছে কেহ থাকে কি না ইত্যাদি·· এই সব ঘরের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। অবধান-মালি ভালমানুষ।—বিশেষতঃ কলিকাতার বাবুদের যে চৌর্য্যবৃত্তি অভ্যস্ত আছে, কেমন করিয়াই বা সে জানিবে? তাহাদের পুরীধামে তো এরূপ নাই। তাই যতদূর জানা ছিল,—সেই গৌরবর্ণ, কুঞ্চিত কেশ, ক্ষীণতনু বালকাকৃতি ভদ্র ছেলেটীর প্রশ্নের উত্তরও দিয়াছিল। নিঃসন্দেহ, তাহারই এই কীর্ত্তি!

শুনিয়া ব্রজরাণীর পদনখ হইতে মস্তকের কেশগুচ্ছ পর্য্যন্ত আগ্রহ-চঞ্চল

হইয়া উঠিল। যে আশা সে সেদিন ছোটু সিংয়ের নিষ্ফল দৌত্যশেষে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছে মনে করিয়াও—সময়ে অসময়ে, অকারণে, নৈরাশ্যে অভিমানে নিঃশব্দে পুড়িয়া মরিতেছিল, সেই মুমূর্ষু আশালতা যেন আবার এই সংবাদের বারিবর্ষণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। স্বামী তাহার তবে ভ্রান্ত হন নাই?—তাঁহার পায়ের তলায় সে অশ্রুকণা,—ব্রজরাণীর মাতৃ-বক্ষ সহসা উচ্ছ্বসিত—সুগভীর আবেগে ও উচ্ছ্বাসে অননুভূত যন্ত্রণায় স্পন্দিত হইতে লাগিল।—গত নিশার সেই ভীম দুর্য্যোগ, মেঘের প্রলয় হুহুঙ্কার, বৃষ্টিধারার অবিরাম ও দুর্জ্জয় করতালধ্বনি, ঝটিকার রুদ্র-তাণ্ডব—সেই সব স্মরণে আসিয়া তাহার বুকের মাঝখানটাকেও যেন ঠিক্ তেমনি করিয়া ঝমাঝম্ দমাদম্ শব্দে ফাটাইয়া, ঝরাইয়া, ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া খান্‌খান্, লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। যে ভীষণ নিশীথে স্বর্গ মর্ত্ত্য সমস্ত একাকার হইয়া গিয়া, রুদ্ধ দ্বারের মধ্যেও প্রতিক্ষণে হানা দিয়া যাইতে ছাড়ে নাই, যখন সহস্র অশনির কড়্কড় নিনাদ, ঝড়ের উন্মাদ চীৎকার প্রাসাদ-গৃহেও অনিশ্চিত বিপদের বার্ত্তা বহন করিয়া ফিরিতেছিল, প্রকৃতির সেই উদ্দাম মত্ততায় মধ্যভাগে এতটুকু একটুখানি শিশু,—না জানি, তাহার মনে কতখানি মত্ততাই জাগাইয়া তুলিয়া, এতবড় দুঃসাহসের ব্রতে ব্রতী হইতে পারিয়াছিল?—ওরে দুঃখিনীর ধন! কিসের নেশায় জীবনের মমতাটুকু পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া, তুই পাগল হইয়া গিয়া এই প্রলয় তাণ্ডবে যোগ দিয়াছিলি রে? ওরে ও পাগল! ওরে, মনে যদি তোর এতই ছিল, কেন তবে,—না—না, ভুল,—ভুল! ব্রজরাণীর মনের এ কি বিষম ভ্রান্তি!—এতদিনেও সে কি তাহার স্বামীকে চিনে নাই?—ঐ পিতারই পুত্র তো সে! দুর্দ্দম ভালবাসার সমান ওজনে দুর্জ্জয় অভিমান যে উহারা বুকের মধ্যে পুষিয়া লইয়া, সমস্ত জীবনটাকেই তুচ্ছ একটা ক্রীড়নকের মত অনায়াস অবহেলায় অপব্যয় করিয়া ফেলিতে পারে। অথচ এ প্রচণ্ড অভিমানের বাড়বানল নিজেকে দগ্ধ করা ভিন্ন জগতের অপর, আর কোথায়ও এতটুকু একটু

স্ফুলিঙ্গপাতও করে না। এমন কি, ইঁহাদের সেই জীবনঘাতী অভিমানের পাত্রই, ইঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম—পূজ্যতম। তাই অতটুকু একটু ক্ষুদ্র শিশুও মরণোন্মাদ প্রলয়-ভেরীর সমুদায় গর্জ্জন-নিনাদকেই নিজের নির্ভীক অন্তরের অদম্য শক্তি দ্বারা উপেক্ষায় তুচ্ছ করিয়া দিয়া, নিজের সেই প্রিয়,—সেই নিষ্ঠুর উৎপীড়কেরই চরণে অভিমানাশ্রু-ধৌত ভক্তি-শ্রদ্ধার পূত অঞ্জলিটুকু ঢালিয়া দিয়া নিঃশব্দ-আরাধনায় পূজা সমাধা করিয়া চলিয়া গেল। এ কি বিচিত্র রে! এ কি রহস্যময়! এ কি,—

ব্রজরাণীর অনুশোচনার বৃশ্চিক-দংশনে বিক্ষত অন্তর চিরিয়া চিরিয়া ব্যথার বিদ্যুৎ অশনি হানিতে লাগিল। হায়, তাহার লক্ষ লক্ষপতি শ্বশুর যদি হাজার-কয়েক টাকার মায়ায় পাগল না হইতেন। বাপের যদি মেয়ের অঙ্গে হীরার প্রাচুর্য্যকেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বোধ না থাকিত, তা হইলে আজ অজিতের পিতার এই পরিণত-যৌবনেই জরাজর্জ্জর-দেহে শয্যা লইতে হইত না; এবং অজিতকেও এমন করিয়া কাঙাল হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে হইত না। আইবুড়-বেলায় মরেও তো অনেক মেয়ে। সে একজন মরিয়া গেলে তো আর নিয়ন্ত্রী-শক্তির এতখানি ঘোরপ্যাঁচ্ বাহির করিতে হইত না!—বিধাতারও কি সকলি বিড়ম্বনা?

সে যেন ঠিক্ পাগল হইয়া গিয়া, তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসী লোক দিয়া গোপনে সংবাদ জানিতে পাঠাইল, সেই ঝড়জলে ভিজিয়া অজিত আছে কেমন? বার্ত্তাবহ যে বার্ত্তা বহন করিয়া ফিরিল, সে সংবাদে সংশয়কে নিঃসন্দেহ করিয়া দিয়া, ব্রজরাণীর বক্ষে কে যেন দমাদম্ হাতুড়ির ঘা মারিতে লাগিল।

'দুশ্চরিত্রতার জন্য অজিত হোষ্টেল হইতে বিতাড়িত। তাহার সংবাদ কেহ কিছুই বলিতে পারিল না।' অজিত বিতাড়িত! চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল সে? ব্রজরাণীর চিত্ত ঘৃণায় ভরিয়া উঠিতে গিয়া, মধ্যপথে সহসা বিবেকের তীব্র আঘাতে আহত হইয়া বিপরীত-মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বুকের মধ্যে একটা বিপুল বেদনার প্রবল তরঙ্গ হুহু শব্দে ছুটিয়া আসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া

আছড়াইয়া পড়িল।—যে রাত্রে তাহাদের গৃহে তাহার আবির্ভাব সে কল্পনা করিতেছে,—সেই দুর্যোগ-রাত্রির শেষে, রাত্রে অনুপস্থিত অজিতকে হোষ্টেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিয়মানুসারে অবমানিত লাঞ্ছনার সহিত দূর করিয়া দিয়াছেন।—ইহাতে কি বুঝায়, অজিত চরিত্র হারাইয়াছে? ওগো ভগবান্! কোথায় তুমি? তুমিও কি মানুষের মত মানুষের শুধু বাহিরের দিক্‌টাই দেখিতে পাও? 'ডিসিপ্লিন ভঙ্গ' তোমার কাছেও কি মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড় অপরাধ? তবে কেমন করিয়া তোমার ভক্ত সন্ন্যাসী— যে গার্হস্থ্য জীবনের সমুদয় নিয়মের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে,— তোমার উদ্দেশ্যে ধন জন বন্ধু পত্নী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, তাহাকে তুমি ক্ষমা করিবে? ভক্ত বালকের সেই অকৃত্রিম, নিষ্কাম সাধনার এই পুরস্কার তুমি কি করিয়া অনুমোদন করিলে?—কি করিয়া করিলে? বিমাতার চেয়েও কি তোমার প্রাণ কঠিনতর?

অজিত কলেজে যায় না—অন্য কোন কলেজে সে ভর্ত্তি হয় নাই।— এক আশা,—বর্দ্ধমানে সে হয় ত ফিরিয়া গিয়া থাকিবে।—না—তা'ও না।—অনিশ্বসিত দুশ্চিন্তার রুদ্ধ চাপে ব্রজরাণীর বুক যেন চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। অব্যক্ত নিঃশব্দ রোদনের অবরুদ্ধ ভারে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া, সে অশ্রুভারাতুর তড়িৎ-স্পন্দিত স্তব্ধ মেঘের ন্যায় হইয়া রহিল। পাছে স্বামী জানিতে পারেন, পাছে তাহার অনুসন্ধান-ফল কোন প্রকারে উঁহার কর্ণগোচর হইয়া যায়, এই ভয়ে—চোর যেমন করিয়া চোরাই মাল বেচে,—তেমনি সাবধানে সে এই অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। কিন্তু ফলে হতাশ্বাসের গ্লানিমাত্র লাভ ভিন্ন আর কোন লাভই হইল না।— নিশ্চয়,—তবে নিশ্চয়ই—নিদারুণ ঘৃণ্য নির্ব্বেদের বশে, অসহ্য অবমাননায় অবমানিত অভিমানী বালক গঙ্গায় ডুবিয়া সকল কষ্ট এড়াইয়া গিয়াছে।— তা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ওরে অজিত! কাঙালিনীর ধন রে! কেন এমন করিয়া নিঃশব্দে আসিয়া, শুধু এতটুকু একফোঁটা স্মৃতির শিশিরে

একটি নিমেষের পরিচয় সমাধা করিয়া দিয়া, ভোরের ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকুর মত, চিরনিশীথের বুকের মধ্যেই অনন্তকালের জন্য অস্ত হইয়া গেলি? ওরে অভিমানি! কত বড় দুঃখের অশ্রু তুই সেদিন ওই পাষাণ-চরণে অর্ঘ্য দিয়া গিয়াছিস্, সে যে আজ আগুনের শিখা হইয়া এই পাষাণীর বুকে জ্বলিতেছে! যদি তোর এই রাক্ষসী বিমাতা সেদিন মরিতে পারিত, তা হইলে তো তুই শয্যালুণ্ঠিত, আতুর পিতাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতিস্ না? কেন সে মরিল না,—কেন সে মরিল না!

এই প্রাণভরা হাহাকারকে বুকের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দুরারোগ্য রোগের মত নিঃশব্দে পুষিয়া লইয়া, নিজের বাঁচিয়া থাকাটাকে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণার চক্ষে দেখিতে দেখিতে, ব্রজরাণীর অশান্ত জীবনের প্রবাহ বহিয়া যাইতে লাগিল। পাছে স্বামী কোনদিন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই চির-অনাদৃতের সংবাদ লইতে চাহেন,—পাছে নিরুদ্দিষ্টের সকল সংবাদ দৈবাৎ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় আতঙ্কিতা ব্রজরাণী স্বামীকে লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পলাইবার জন্য তাই উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

হা পুত্রকাঃ কুত্র গতাঃস্থ দীনদৃষ্টের্মোসেহ্মপাস্য দূরং।

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

জাহাজের কেবিন-ভাড়া প্রভৃতি সমুদয় বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গিয়াছে। যাত্রার দিন এখনও গুণ্তির হিসাবে খুব নিকট হইয়া আসে নাই বটে, কিন্তু ব্রজরাণীর মনে হইতেছিল, তাহার চক্ষের একটি পলক-ফেলার জন্যই যেন

সেই 'সাতাশে মে' দিনটি শুধু অপেক্ষা করিয়া আছে। স্বামীর হৃদয়হীন অবিচারে অভিমানের নিঃশব্দ তুষানলে দগ্ধ হইতে হইতে সে মৌন-বিদ্রোহে স্তব্ধ হইয়া আছে। যখন চিত্ত তাহার ব্যাকুল বেদনায় লুণ্ঠিত হইতে থাকিত, যখন প্রাণের কান্না চাপিয়া রাখা দায় হইয়া উঠিত, তখন মনে মনে এই বলিয়া সে তাহার অবুঝ মনটাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত, যে,—উনি যদি আমায় ছাড়িয়া গিয়া শান্তিতেই থাকেন, তবে উঁহাকে সুখী করিতে আমি না হয় দুঃখই পাইলাম। এই তো আমার সতীন—মনোরমা,—সে কেমন করিয়া আছে? আমারই কি সব অনাসৃষ্টি না কি? বেশ পারিব, কেন পারিব না। এই বলিয়া, সে স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোথায় কোথায় কোন্ ঠাকুর দেখিতে যাইবে, তীর্থ ব্রত উপবাস কি কি করিবে; খুব ঘটা করিয়া এই সকলের ফর্দ্দ করিতে বসিয়া যায়; এবং তালিকাটা বেশ যখন বড় হইয়া উঠে, এম্‌নি সময়ে আচম্‌কা সেখানা টান দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গিয়া, কোথাও একটা নির্জ্জনতার মধ্যে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে বসিয়া কাঁদে। তাহার যে স্বামী ব্যতীত সকলই শূন্যময়! তাঁহাকে ছাড়িয়া কি লইয়া সে এ পৃথিবীর বুকে হাঁটিয়া বেড়াইবে? এখনি—এ কথা মনে করিতেই যে তাহার হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

ঊষা এখন মুন্সেফ-বাবুর স্ত্রী। দাদার অসুখের সংবাদে একবার আসিয়াছিল, দাদার জলযাত্রার সংবাদে ছেলেমেয়ে সঙ্গে আবার ভাইএর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বৌদির মুখ দেখিয়া তাহার বুকে আঘাত লাগিল। ব্রজরাণীকে ত্রিশ বৎসরের মনে না হইয়া যেন পঞ্চাশ বছর বয়সের মানুষ মনে হইতেছিল। ঊষা দেখিল, শুধু বাহিরে বলিয়া নয়, মনটাও কি করিয়া তাহার তেম্‌নি করিয়া দেহের সঙ্গে সমান হিসাবেই বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই সৌখীন ব্রজরাণী,—মাথার চুলের চাক্‌চিক্যে যাহার মুখ দেখা যাইত, ঢাকাই শান্তিপুরে সাড়ীর নীচে যে অঙ্গে স্থান দিত না, সেই ব্রজরাণী কাঁচির মোটা মোটা নরুণপেড়ে ধুতী পরিয়া থাকে,

চুল কোন দিন বাঁধে, কোন দিন বাঁধেও না। আগে গায়ের গহনা তাহার নিত্য বদল হইত। হীরা মুক্তা চুণী পান্নায় না সাজিলে বৈকালের সাজ তাহার অঙ্গহীন মনে হইত ;—আজকাল সেই যা—চুড়ি কয়গাছা হাতে আছে, গলায় একটু সরু হার, এ ভিন্ন আর কোথাও কিছু নাই। ঊষা রাগ করিতে লাগিল, খোসামোদ করিতে লাগিল, শেষকালে নিজের গায়ের গহনা অভিমানে খুলিয়া ফেলিতে গেল। ব্রজ অশ্রু-স্তম্ভিত-চক্ষে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নিবারণ করিল। তাহার কম্পিত অধর কোন শব্দোচ্চারণই করিতে পারিল না। মনে মনে সে বলিল, "ধিক্ থাক্ আমার গয়না-পরায়! আমার এই গয়না পরার জন্যই তো আমার বাপ, জেনে শুনেও একটা লোকের সর্ব্বনাশ করে, তার জায়গায় আমায় বসিয়েছিলেন। আমি এ গয়না না পর্‌লে তো আর বাছা আমার অমন ক'রে দুঃখ পেয়ে চলে যেতো না। আমি তাকে গর্ভে ধরিনি, তাই আজ মুখে অন্নজল দিচ্চি ;—কিন্তু গয়না গায়ে দিয়ে সাজবো আমি আজ কি সুখে? যত বড় পাষাণই হই,—আমিও যে তার মা।

ঊষার সঙ্গ ব্রজরাণী আর সহিতে পারে না। শরৎকে এই সব দিনে তাহার কতখানি করিয়াই যে মনে পড়িত! শরৎ অমন অসময়ে চলিয়া না গেলে হয় ত এতদিন একটা কিছু ভাল ঘটিত। অমন উদারচরিত্র ননদকেও সে কত বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়াছে।—শরতের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী বাস করে, ছেলেটী শিবপুরে ভর্ত্তি হইয়াছে—তাদের নাড়াচাড়া করিয়াও দিন কাটাইবার উপায় নাই। ঊষার সঙ্গ যেদিন লোভনীয় ছিল, ব্রজরাণীর সেদিন আজ কোথায়? সেই সব গয়নার ক্যাটালগ লইয়া নাড়াচাড়া, জ্যাকেটের নূতন নূতন ফ্যাসান আবিষ্কার, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, ইডেন-গার্ডেনে কন্‌সার্ট শুনিতে যাওয়া,—অমুকের 'টি পাটিতে' নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া কি কি দেখিয়া আসিয়াছে, অমুকের 'অ্যাট্ হোমে' কোন্ পোষাকে গেলে মানসম্ভ্রম বজায় থাকিবে,—ঊষাকে উপলক্ষ করিয়া বাড়ীতে বিলাতী ধরণের পাটি,

দেশী ধরণের নিমন্ত্রণ দিয়া ধুমধাম আমোদ আহ্লাদ করা,—এই সব হাসি আমোদের মধ্য দিয়াই যে তাহাদের তুই সখীতে চিরপরিচয়। দুঃখের আদান প্রদান, যেটুকু এ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে, সে কেবল কাল্পনিক দুঃখের। স্বামীর ভালবাসাবাসি, উহাদের মান অভিমান,—ব্রজরাণীর না হয় এর চাইতে আর এক ধাপ উপরে—অর্থাৎ সতীনকে পাছে স্বামী মনে মনেও পূজা পাঠান, ইহারই চৌকিদারী করিতে যে কষ্ট, তাহাই ছিল সেকালের প্রধান দুঃখ।—কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় চিরদিন এম্‌নি বজায়ই থাকুক,—উষার দিন সেই এক রকমই যাইতেছে,—কিন্তু ব্রজরাণীর দুঃখ যে আজ তাহার ধারণারও অতীত! তাহার এ দুঃখের কেহ সমদুঃখী নাই, সান্ত্বনাও নাই। ইহা প্রকাশের যেমন ভাষা নাই, তেমনি উপায়ও নাই। এ অকথ্য মহাদুঃখের ভারে প্রাণ তাহার ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া যাইবে, তথাপি জগতের একটি প্রাণীর নিকটেও সে তাহার এ অনির্ব্বচনীয় দুঃখের পশরা কোন দিনই নামাইতে পারিবে না।

স্বামীর সম্বন্ধেও রাণীগিরীর শেষে যে তাহার বাঁদীগিরী আরম্ভ হইয়াছে, এসম্বন্ধে নিজে নিঃসন্দেহ থাকিলেও, সে আভাস সে সখীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। কারণ, সে জানিত, তাহার এ বয়সে এই যে স্বামীর উপর প্রতিপত্তিহীনতা, ইহা যৌবন-স্বপ্নের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক বিকার মাত্র নহে, ইহা তাহার সত্যকার দুরবস্থারই চিহ্ন।

তাই উষা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "দাদাকে একলা ছেড়ে দিয়ে তুই থাক্‌তে পারবি বৌদি ?"

তখন মনের ভিতরে তাহার যতই তোলা পাড়া থাক্, মুখে সে দ্বিধাশূন্য দম্ভের সহিত উত্তর করিল, "তার আর কি হয়েছে ? সেখানের বন্দোবস্ত খুবই ভাল, ওঁর কোন বিষয়েই অসুবিধে হবে না যখন, তখন আমার যাওয়া না যাওয়া সমান। বিশেষ সে সব সাহেবী-জাহাজে চব্বিশ-ঘণ্টা থাকা বাবু আমাদের হিন্দুর মেয়ের পক্ষে কিছুতেই পোষায় না, আর

আচার-বিচারও তাতে মোটে থাকে না,—তা যতই সঙ্গে লোক থাক্ না কেন।"

আর একহপ্তা মাত্র "কিন্নরী"-জাহাজ ছাড়িতে বাকী। সেদিন যখন ব্রজরাণীর দাদা কোন এক সদ্য-মৃত ধনী ব্যক্তির উইল বিভাগের মামলা লইয়া কথায় কথায় হঠাৎ বলিয়া বসিল, "এইসব কাণ্ড দেখে আমি তো স্থির করেছি কালই একখানা উইল করিয়ে এইবেলা ছেলেপিলের সব অধিকার টধিকার দিয়ে টিয়ে ঠিক্‌ঠাক্ করে রেখে দেব। বেটাদের বাপ, মরতে তর সয় না গো! বাপের শ্রাদ্ধ তুলে রেখে দিয়ে, বাপের বিষয় ভাগ নিয়ে ঝুটোঝুটি লাগিয়ে দিলে। ওহে ভাগ্নী! তুমি উইল্ টুইল্ কিছু করেছ তো? তোমার তো ব্যাপারটি এম্‌নিতেই বেশ একটু ঘোরাল।"

খামখেয়ালি সত্যপ্রসন্ন কোন কিছু না ভাবিয়াই, খেয়ালের ঝোঁকে আপনার মনেই এই বিস্মৃত কর্ত্তব্যের অধ্যায়টুকু ভবিষ্যতের অ-লিখিত পৃষ্ঠাটা হইতে কল্পনার চশমা পরিয়া পড়িয়া লইল। অরবিন্দ শুনিয়া ভাল মন্দ কিছু না বলিয়াই, ঔদাস্যের সহিত অনির্দ্দেশ্য-নেত্রে জানালার মধ্য দিয়া সদ্য সূর্য্যাস্তের সোনালী আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। এমন মূল্যবান্ উপদেশটা কাণে পৌঁছিয়া দিয়া ভগিনীর উপকার করিতে পারিয়াছে কি না, জানিতে না পারায় সত্যপ্রসন্নের মন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেও, হঠাৎ বোনের মুখের উপর চোখ পড়িতেই সে যেন দারুণ বিস্ময়ে চম্‌কাইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সেই মুহূর্ত্তে যেন কোন গুপ্ত ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরী তাহার সেই তেজস্বিনী ভগিনীটির হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে আমূল প্রবেশ করিয়া দিয়া, আবার ভীষণ বলে উহা সে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার সমস্ত মুখখানা মরণাহতের মত বিবর্ণ পাংশু হইয়া গিয়া শীতার্ত্তের ন্যায় সর্ব্বশরীর কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া ঠেকিয়া যাইতেছে। সত্যপ্রসন্ন তড়াক্ করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল।

"রাণি! অমন করছিস্ কেন রে? অসুখ করছে?"

"হুঁ" বলিয়া ব্রজরাণী নিজের কম্পিত হস্তদ্বারা নিজের চেয়ারের হাতাটা চাপিয়া ধরিল। তার পর অল্প একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া আস্তে-আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল। সত্য বলিল, "তোমার অসুখে খেটে খেটে ওর শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। ওর পক্ষেও একটু 'চেঞ্জের', একটু 'রেষ্টের' দরকার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেখ্‌ছি।"

অরবিন্দ সংক্ষিপ্ত-উত্তর দিল "হাঁ।"

ইহার দিন-তিনেক পরে একটা অপরাহ্নের কিছু পূর্ব্বে অরবিন্দ বাহিরের ঘরে অনেকক্ষণ কাটাইয়া আসিয়া, বিশ্রাম-গৃহে ক্লান্ত-শরীরে শুইয়া পড়িল; এবং ব্রজরাণীকে ডাকাইয়া আনাইয়া, একটা কাগজের বাণ্ডিল তাহার হাতে দিয়া বলিল, "এই উইল্‌খানা, ভাল ক'রে আয়রণ-চেষ্টের মধ্যে বিশেষ দরকারী দলিল-পত্রের বাক্সে তুলে রেখে এসো দেখি।"

ব্রজরাণী স্থির দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখে উহা স্থাপন করিল। শান্তস্বরে কহিল, "উইলের কি দরকার?"

অরবিন্দ কহিল, "দরকার আছে—সে কথা তোমার দাদাই তো সেদিন মনে করিয়ে দিলেন। ভুলে গেছ?"

ব্রজরাণী উষ্ণ হইয়া কহিল, "কে কি কখন বলে না বলে, অত মনে ক'রে রাখবার দরকার তো আমি কিছু দেখ্‌তে পাই নে।"

তাহার রাগ দেখিয়া অরবিন্দ ঈষৎ হাসিল। একটুখানি বিদ্রূপের সুরেই কহিয়া ফেলিল, "দেখ্‌তে সবাই সব পায় গো! যাক্, এখন এটা তো তুলে রাখো।"

স্বামীর বাক্যে কিসের বিষাক্ত শ্লেষ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া মুহূর্ত্তে ব্রজরাণীর দুই চোখে ধক্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার এই হীন-ব্যক্তি অপমান করিয়া সেদিনের সেই আকস্মিক চিত্ত-বৈকল্যের প্রকৃত তথ্য যখন জানিতে দিবার উপায় নাই, তখন এ কলঙ্ক নিঃশব্দেই মাথা [illegible] লইতে হইবে—এই মনে করিয়া মুহূর্ত্তে সেই অগ্নিদীপ্ত

চোখের তারা সে মৃত্তিকালগ্ন করিয়া ফেলিল। বজ্রাগ্নি যেখানেই পতিত হোক্, ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিয়াই শীতল হয়। উহার নয়নাগ্নিও বোধ করি ঐরূপে শান্ত হইতে পারিয়া থাকিবে। অল্পক্ষণ পরেই যখন সে আবার মুখ তুলিল, তখন চোখের মধ্যে কোনরূপ দাহিকা-শক্তির আবির্ভাব দেখা গেল না। কাছে আসিয়া কাগজখানা তুলিয়া লইল। মনে মনে আদ্যোপান্ত সমস্তটা পাঠ-শেষে, স্থির-দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইখানাই আসল ?"

অরবিন্দের চক্ষে কি এক প্রকার উৎকট ব্যঙ্গমিশ্রিত মৃদু হাস্য প্রকটিত হইতেছিল। সেও তেমনিভাবে উত্তর করিল, "এইখানাই আসল। এর নকল আছে, রেজিষ্টারের আফিসে।"

"সেখানা আমার চাই।"

"সেখানা ফেরৎ দেওয়া তো তাদের নিয়ম নয়।"

ব্রজরাণীর ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। সে ঘোর রক্তবর্ণ-মুখে কহিল, "এ রকম উইল তুমি কি আমাকে শুধু অপমানিত করার জন্যেই করো নি, এ কথা বলতে পারো ? তোমার স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি,—নগদ বার লাখ টাকা, বাৎসরিক নব্বুই হাজার টাকা আয়ের জমিদারী—সমস্তই তুমি আমার নামে কেন লিখে দিয়েছ ? আমি চেয়েছিলুম ?"

অরবিন্দ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির সে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ সুর, ব্রজরাণী যদি একটুখানিও প্রকৃতিস্থ থাকিত, তো, তাহার ক্রোধকে শতগুণে বর্দ্ধিত না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে উন্মাদের হাস্য সন্দেহে তাহাকে চিন্তান্বিতই করিত।—হাসিতে হাসিতে অরবিন্দ কহিল, "তবে আর কাঁকে দিয়ে যাবো ?"

ব্রজরাণীর সর্ব্বশরীরের রক্ত উন্মত্ত-বেগে ফুটিয়া উঠিল; সেও তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণস্বরেই বলিয়া উঠিল, "আমি ছাড়া তোমার কি আর কেউ কোথাও নেই ?"

অরবিন্দের হাসি তখনও থামে নাই। সে তেমনি করিয়া হাসিয়াই জবাব দিল, "আছে বলেই না দানপত্র করে তোমায় দিতে হ'লো! তা না হ'লে তো আইনের বলেই তুমি পেতে। এখন রাগ করচো,—এর পরে বুঝতে পারবে, টাকার তোমার দরকার ছিল কি না। আমি মরে গেলে, আইনের হাতে তোমার যে শুধু খোরপোষ ছাড়া আর কিছুই পাওনা নাই, তার খবর রাখো কিছু?"

ভীষণ অবমানিত কোপে ব্রজরাণীর শুভ্র মুখের সমস্তখানাই উদয়োন্মুখ সূর্য্যের অরুণ বর্ণ ধারণ করিল। তথাপি সে অচঞ্চল দৃষ্টি স্বামীর মুখে তুলিয়া ধরিয়া অত্যন্ত সংযত-কণ্ঠে কহিল, "আমার বাপ মায়ে তোমার এই টাকার লোভেই তোমার গলায় আমায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, সে আমায় তোমার জুতোর ঠোকর মেরে মেরে মনে করিয়ে দে'বার দরকার নেই। মনের ভেতর আগুন হ'য়ে সে আমার রাতদিনই জ্বলচে। কিন্তু মা বাপের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিও কিছু কম করচি নে। সে যাক,— দুঃখ তোমায় আমরা যা দিয়েছি তা দিয়েছি,—আমার চিন্তায় নিজের পরলোকের পথে কাঁটা দিয়ে যাবার আর তোমার দরকার নেই। সে পাপটা থেকে আমি তোমায় রেহাই দিচ্চি।—জীবন থাকতে না পারলে নাই পারলে, মরণের পরেও ওদের সঙ্গে শত্রুতা সেধে যাবার দরকার তোমার নেই। আর আমি তাদের যত বড় শত্রুই হই, আমিও তা তোমায় দিয়ে করাতে পারব না। দোহাই তোমার,—আমার হবিষ্যির বন্দোবস্ত তুমি ক'রো না। আমার যদি সেই কপালই হয়, তা'হলে আমার বাবার দেওয়া যে কটা টাকা আছে, তা'তেই আমার কুলিয়ে যাবে।"—এই বলিয়াই সেই উইল-লেখা শক্ত কাগজখানা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিল; এবং বিদ্যুতের মত ছুটিয়া আসিয়া, স্বামীর দুই পায়ের গোড়ায় দুম্‌দুম্ করিয়া মাথা ঠুকিয়া, ছেলেমানুষের মত ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। চোখের জলে দুই পা ভাসাইয়া দিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "উঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি! দয়ামায়া

তোমার মনে একেবারে নেই! লোকে একটা পাখী পুষলে, তার উপর মায় মমতা জন্মায়, একসঙ্গে এই সতের বছর ঘরকন্না করেও তার সিকিটুকুও কি তোমার হয় নি? না'হলে এমন ক'রে তুমি আমায় দুঃখ দিতে কখনই পারতে না।"

অরবিন্দ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। ভাল মন্দ কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

তস্যাং গতায়াং স পিতুরন্তেবাসিতয়া তয়া।
অতিষ্ঠৎ সংযতোধীমন্নর্কস্থ বারুণং পুরা।

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

অজিতকে আবার এই এক নূতন নেশায় পাইয়া বসিল। সারাদিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়া, অপরাহ্ণের আলো যতই দীপ্তিহীন হইতে থাকে, তাহার বুকের রক্ত ততই বেগের সহিত আলোড়িত হয়। প্রথম প্রথম রাস্তার ধারে বসিয়া, সেই একটি নিমিষের দেখা গাড়িখানার আরোহীর দিকে অর্দ্ধ-নিমিষের চকিত দৃষ্টিটুকুই তাহার সমস্ত দৃষ্টি-ক্ষুধা শান্ত করিয়া রাখিত। কিন্তু দিনে দিনে তৃষ্ণা প্রবল হইয়াই উঠে। অজিতেরও আর শুধু ততটুকু দেখায় তৃপ্তি হয় না। সে মৃদুমন্দচালিত শকটের অনুসরণে চলিয়া ইডেন-গার্ডেনে গিয়া উঁহাদের গতিবিধি বুঝিয়া আসিল; এবং উপর উপর কয়েকদিন এই উপায় অবলম্বন করিয়া যখন দেখিল, প্রায় প্রত্যহই ইঁহারা গঙ্গার ধারে এই একটি নিরিবিলি জায়গাতেই নিজেদের সান্ধ্য-ভ্রমণের

স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছেন, তখন কয়েকদিন সে বেলাবেলি বাহির হইয়া আগে হইতে আসিয়া একটা গাছের তলায় বসিয়া থাকিত; সেখান হইতে অরবিন্দের মুখ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। সে যে কদাচিৎ দু'একটা কথা কয়, তাহাও তাহার কাণে আসে। পিতার সেই উন্নত শরীর এই কয়টি মাসের ভিতর কিরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! সুন্দর বর্ণ কি ম্লান হইয়াছে! চলনে বলনে কি দারুণ দুর্ব্বলতাই আত্ম-প্রকাশ করিয়া উঠিতেছে!—সে দেখে, তাহার বিমাতা একান্ত মনোযোগে তাহার পিতার প্রত্যেক খুঁটিনাটি সুবিধাটুকুর উপরেই চোখ রাখিয়াছেন,—উঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে, একটুখানি হাসাইতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হইতেছে, ইহাও সে বুঝিতেছিল। পিতা তাহার যেন আত্ম-বিস্মৃত, উদ্‌ভ্রান্ত। হাসিলে যাঁহাকে অমন সুন্দর মানায়, তাঁহার মুখে হাসি প্রায় দেখাই যায় না, যদিই বা কদাচিৎ দেখা দেয়, তো, সেও সেই তড়িৎ-স্ফূর্ত্তির মতই অচিরস্থায়ী। মধ্যে মধ্যে উঁহাদের গাড়ী এ'পথ দিয়া চলে না। সেদিন অজিতের অন্তরাত্মা ভরিয়া যেন বিষাদের তরঙ্গ উঠিতে থাকে। প্রকৃতির সমুদয় শোভা সম্পদ শুষ্ক ও ম্লান হইয়া যায়। পরদিন বাগানে না গিয়া, রাস্তার ধারেই সে চুপটি করিয়া, সন্দেহ-শঙ্কিত দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া থাকে। গাড়ীখানা দেখা দিলে হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন তাহার আনন্দে দোল খাইয়া নাচিয়া উঠে। এমনি করিয়া অজিতের দুঃখময় দিনগুলা যেন একটা স্বপ্নের মোহের মধ্য দিয়া সূর্য্যাস্ত-রঞ্জিত স্বর্ণচ্ছটায় মণ্ডিত হইয়াই কাটিতেছিল। দিনের পর দিন সে যে পিতার মধ্যে নিজের জীবনটাকে কেমন করিয়াই পাকে পাকে জটিল করিয়া জড়াইয়া তুলিতেছিল, নিজেও যেন সে তাহা ভাল করিয়া অনুভব করিতেও পারে না। সারা দিন-রাত্রি যখনই একান্ত হইতে পায়, স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া বসিয়া একনিষ্ঠ-চিত্তে তাঁহার সেই করুণ মহিমায় মণ্ডিত মুখের ছবি সে ধ্যান করে। যে কয়টি কথা তাঁহার মুখ-নিঃসৃত হইতে শুনিয়াছে, সেই কয়টি যেন তাহার জপমালা হইয়াছিল। এক এক-

বার অন্তরের অন্তর-মধ্যে সাধ জাগিয়া উঠিত যে, যদি মাকে আনিয়া একবার সে দেখাইতে পারিত! কিন্তু না, মায়ের চক্ষে তো এ দৃশ্য তুলিয়া ধরিবার নহে। তাহার মায়ের অধিকার তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া ঐ যে অনন্যসেবাপরায়ণা পতিব্রতা নারী নির্ণিমেষে ইঁহার মুখের পানে চাহিয়া আছে, ওই দাহিকাশক্তিসম্পন্ন দৃষ্টি মার কি সহ্য হইবে? তার চেয়ে কল্পনার স্বর্গে মা তাহার ভালই আছেন।

মধ্যে মধ্যে অপরা এক অপরিচিতা নারী ইঁহাদের সঙ্গে আইসে, আর আসে একটি সুকুমার শিশু। ছেলেটিকে দেখিলে মনে হয়, যেন অনেকটা অজিতেরই মত। তাহার সুগৌর বর্ণ, আয়ত চক্ষু, কুঞ্চিত কেশ, অজিতের পিতার সাদৃশ্য টানিয়া আনে,—নাম শুনিতে পায়, তড়িৎ। খুব সম্ভব, এটি অজিতেরই ছোট ভাই।—বড় দুরন্ত চঞ্চল শিশু। কিন্তু জীবনের তেজে পরিপূর্ণ, তীক্ষ্ণধী, ও আনন্দময়। অজিতের মনে পড়ে, তাহার নিজের শৈশবও যেন ঐ রকমই সুখ-চঞ্চল, ও হাস্যমুখর ছিল। নদী-তরঙ্গের মতই চপল উচ্ছ্বাসে অজিতের জীবনকুল প্লাবিত করিয়াই বহিত। সেদিন আজ তাহার কোন্ স্বপ্নস্মৃতিভরা অতীত কথাতেই পর্য্যবসিত হইয়া গেল! ছেলেটিকে বুকে টানিয়া আনিয়া, তাহার হাস্য-স্ফুরিত আরক্ত অধরে চুম্বন করিতে অজিতের তৃষিত সারাচিত্ত লোভ-চঞ্চল হইয়া উঠিত। আহা, অতটুকু কচি লাবণ্যময় ভাইটি তাহার!

আবার কত সময় পিতার জানুর উপর উপবিষ্ট, তাঁহার নিবিড় আলিঙ্গনে নিবদ্ধ, তাঁহার স্নেহ-চুম্বনে চুম্বিত শিশুর প্রতি চাহিয়া অজিতের দুই চোখের তারায় আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া, শরীরের প্রতি শিরা উপশিরার মধ্য দিয়া উষ্ণ শোণিতের ধারা তরল অগ্নির ন্যায় সবেগে ছুটিয়া ফিরিয়াছে। দুই করতলে মুখ ঢাকা দিয়া সে দৃশ্য সে নিজের দৃষ্টি হইতে প্রত্যাহার করিতে চাহিয়াছে। দারুণ অভিমানে বেদনায় মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়া তাহার মনে হইয়াছে যে, ঐ শিশুরূপী দস্যু তাহার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া লইয়া

যেন অনধিকারেই উহার উপরে এতবড় অধিকার স্থাপন করিয়াছে! ঐ আদর, চুম্বন, স্নেহের বাণী—ও সবই যে অজিতের; একান্তই যে অজিতেরই পাওনা।

একদিন সন্ধ্যা কাটিয়া রাত্রি আসিল; বালিগঞ্জের গাড়িখানা সেদিন সে-পথে দেখা দিল না। বিমনা অজিত ঘরে ফিরিয়া দেখিল, রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। লজ্জায় মুখ নত করিয়া, কোনমতে দুইটা খাইয়া লইয়া, অন্ধকারে ঘরের মধ্যে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। নিতাইএর স্ত্রীর অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার মনের বুকে কাঁটা বিঁধাইতেছিল। সে দৃষ্টি দিয়া তিনি যে তাহার মুখে কি খুঁজিতেছিলেন, সে কথা বুঝিতেও তাহার বাকি ছিল না। এ তো আর সে শিশু সরল বালক অজিত নয়। এ যে সংসারের প্রতিঘাত প্রতিহত কলঙ্কী অজিত। পরদিন রবিবার। পূর্ব্বে কোন ব্যবস্থা না থাকিলেও, হঠাৎ সেদিন খুব সকালে উঠিয়াই নিতাই বাড়ী চলিয়া গেল। অজিত বাড়ী হইতে এক পা-ও নড়িবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া, বেলা তিনটা না বাজিতেই, রাস্তার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। চারটা না বাজিতেই ইডেন-গার্ডেনের সমস্তটা চক্র দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল।—তবে কি তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া আর কোথাও চলিয়া গিয়াছেন? অথবা শরীর তাঁহার সুস্থ নাই? সে রাত্রেও ঘণ্টার হিসাব না রাখিয়াই অজিত বাড়ী ফিরিল, এবং মুখে তাহার অন্নজল রুচিল না।

সোমবার প্রাতে ফিরিয়া আসিয়া নিতাই সংবাদ দিল, যে, আজি সে যখন ডাউন-পঞ্জাব মেলে চড়িতে যাইতেছে, সেই মুহূর্ত্তে তীর্থ-প্রত্যাবৃত্ত যাত্রীর দলকে সেই গাড়ী হইতেই নামিতে দেখিয়া আসিয়াছে। অজিতের বুকের মধ্যে অনেকখানি রক্তের স্রোত যেন চমকিয়া ছলাৎ করিয়া উঠিল। সে বিহ্বল আনন্দে উত্তেজনাপূর্ণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মাকে কেমন দেখলেন, মামা? একটু কি সেরেছেন?"

নিতাই বিষণ্ণ-মুখে ঘাড় নাড়িল,—"না অজিত, তাকে যেতে দিয়ে

হয় ত ভাল করি নি। বড় দুর্ব্বল, রোগ-কাতর বলেই তাকে মনে হ'লো। অবশ্য ভাল ক'রে আমি দেখ্‌তে সময় পেলাম না।"

অজিতের মুখের প্রদীপে আলোকের যে চঞ্চল শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, বাতাসের এতটুকু ফুৎকারেই তাহা নিবিয়া গেল। বহুক্ষণ মৌন-নত-মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অবশেষে সে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি আজই বর্দ্ধমানে যাবো, মামা।"

নিতাই এই কথাই শুনিতে চাহিতেছিল। খুসী হইয়া বলিল, "বেশ তো, তাই যা। এই টাকা ক'টা রেখে দে। আর দেখ্, যতদিন না অন্য কিছু জোগাড় হ'চ্চে, ততদিনের জন্যে ওখানের সব-জজ রসিকবাবুর দুটি ছেলেকে দু'বেলায় ঘণ্টা-তিনেক পড়াবার ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। তাঁরা তোকে মাসে কুড়ি টাকা ক'রে দেবেন বলেছেন। তা' যা পাওয়া যায়, মন্দ কি? কি বলিস্?"

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় অজিতের চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। এ পৃথিবীতে কপর্দ্দকমাত্রবিহীন অজিতের ঐ কুড়িটি টাকাই কি কম? নিতাইএর কাছে একটুখানি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বড় ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু সঙ্কোচে মুখ ফুটিল না। প্রকাশ করিবার ভাষা ভাবের চেয়ে যখন অনেক নীচে নামিয়া আসে, তখন প্রকাশের চেয়ে অপ্রকাশের গৌরবই যে বেশি।

যাত্রার আর উদ্যোগ কি? বাড়ীতে বিদায় লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াই অজিতের মতলব ফিরিয়া গেল। মনে হইল,—এই তো কতকালের মতই কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে, কবে ফিরিবে, কখনও ফিরিবে কি না, কে বলিতে পারে? যাইবার পূর্ব্বে হয় ত বহু দিনের মত, হয় ত—চির-দিনের মত তাঁহাকে কি একবার দেখিয়াও যাইবে না? হয় ত অসুস্থ তিনি; তাঁহার কুশল না জানিয়াই সে কি চলিয়া যাইবে? মানুষে কাড়িয়া লইলে কি হয়, এ'যে বিধাতার দেওয়া অধিকার,—সে তো ছাড়িতে পারে না।

অজিত ফিরিল। বালিগঞ্জের সেই বাগানবাড়ীর ধারে পৌঁছিয়া দেখিল,

অনেক মালপত্র বোঝাই-করা দু'খানা ভাড়াটে গাড়ি, আরোহী মাত্র একজন —উহারা কর্ম্মচারী শ্রেণীরই লোক—ফটক হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। ব্যাপার কি কিছুই না বুঝিয়া অজিত হতভম্বের মত চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। একটা ছোক্‌রা চাকর মাথার চুলে লম্বা টেরি কাটিয়া, ফরসা চুড়িদার জামাগায়ে ও পাম্পস্থ পায়ে দিয়া ছড়ি হাতে বাহির হইল দেখিয়া, সেও তাহার অনুসরণ করিল। বড়লোকের বাড়ীর সৌখীন চাকর, ময়লা কাপড়-পরা দরিদ্র বালকের সহিত কথাই কহিতে চাহে না।—এমন তো তাহাদের বাড়ী প্রতিদিন সতের গণ্ডা আসা যাওয়া করিতেছে। ভিক্ষাই এ'দের জীবিকা, তবে ঝুলিটা একটু বড়, এই যা।

মোট্ ঘাট্ কোথায় চালান যাইতেছে—এই প্রশ্নের উত্তরে অজিত জানিতে পারিল যে, আগামী কল্য তাহাদের বাবু বিলাতী ষ্টীমারে পণ্ডিচেরী না এম্‌নি কোথায় যাইবেন। সঙ্গে যাইবে? তাঁহার ভৃত্য রামফল ও কানাই সিং এবং পাচক আশু। আর কেহ? না, কেহ না। অজিতের মনে হইল, সে যদি অজিত না হইয়া, কানাই সিং হইতে পারিত? ফিরিবেন কতদিনে? কিছুই স্থিরতা নাই। হয় তো দু'মাস, নয় তো ছ'মাস—বেশি দিন হইলেও হইতে পারে! কে বলিতে পারে? কয়দিন বেড়াইতে যান নাই কেন? বড়লোকের খেয়াল কখন কোন্ পথে চলে, সে কি কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চলে? আজ, হ্যাঁ, আজ তো এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই উহারা বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কোন্ পথে? সে কি সেই দেখিবার জন্য চোখ মেলিয়া বসিয়াছিল তবে—হ্যাঁ, দিদিমণির শ্বশুরবাড়ী যাইবার কথা একবার যেন কাণে গিয়াছিল।

অজিতের বক্ষের মধ্যে অদম্য বলে হৃদ্‌পিণ্ডের ঘাত-প্রতিঘাতে রক্তশোণিত তোলপাড় করিতে লাগিল। চলিয়া যাইবেন! কতদিনে ফিরিবেন কিছুই স্থিরতা নাই! আর কি তবে অজিতের সঙ্গে দেখা হইবে না? আজও না!—

সে নিজেও যে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া চিত্ত তাহার যেন কি একটা গভীর শূন্যতার খাদে, অতলস্পর্শের মধ্যে গড়াইয়া পড়িল। না—না, একবার না দেখিয়া সে তো যাইতে পারিবে না।

'দিদিমণি' বলিতে কি বুঝায়, সে খবর অজিত জানে না। বিমাতার কি কন্যা আছে? তাহারই শ্বশুরবাড়ী কি? সেও না হয় সেইখানেই যাইত,—কিন্তু সে কোথায়?

বিহ্বল অজিত নিরুপায় ক্ষোভে রাত্রি প্রায় আটটার পর শেষ আশাটুকু বিসর্জ্জন দিয়া অগত্যা হাবড়া ষ্টেশনের মুখে যন্ত্র-চালিতের মত চলিতে অরম্ভ করিল। নিতাইমামার বাসায় ফেরা এখন অসম্ভব! বিশেষতঃ, যে উদ্দেশ্যে সে বহুদিনের অদর্শনের পরেও মাতৃ-দর্শনের সুযোগকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সেই সুযোগই যখন ভাগ্য তাহাকে দি না, তখন আর কিসের আশায় সে সেই আনন্দটুকুও পরিত্যাগ করিবে?

……ছোট একটা গলির মোড় ফিরিতেই একটা ভীষণ দৃশ্য তাহার চোখে পড়িয়া গেল। সে দেখিল, দৈত্যের মত প্রকাণ্ড দুইটা কালো ঘোড়া, তার একটা একখানা গাড়ীর যোং ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া, সেই ভাঙ্গা যো-শুদ্ধ প্রচণ্ড-বেগে লাফাইতেছে। অপরটারও সেই চেষ্টা। বিশেষের মধ্যে, কাঁধের বোঝা ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টার অভাব তাহার না থাকা সত্ত্বেও, কাজে এখনও সেটা সে ঘটাইয়া তুলিতে সক্ষম হয় নাই। গাড়ীর মধ্য হইতে নারীকণ্ঠের অসহায় আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই যে, শুনিবার লোকের সেখানে একান্তই অভাব। কোচ্‌ম্যানটা সাত হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া আছে। সহিস্ দুইটা উন্মাদ ঘোড়া সাম্‌লাইতেই বিব্রত। তা' না হইলে এতক্ষণ হয় ত গাড়ীখানা উল্টাইয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইত।—

ভদ্রলোকের ভিড় নয়, ছোট লোকের সামান্য একটু ভিড় জমিয়াছিল।

ইহাদের মধ্য হইতে অজস্র-ধারায় উপদেশ বর্ষিত হইতেছিল। কিন্তু সাহায্য-চেষ্টা আদৌ উত্থিত হয় নাই। অজিত দ্রুতপদে আসিয়াই গাড়ির দরজাটা কোনমতে খুলিয়া ফেলিয়া উঁচু-গলায় ডাকিয়া বলিল, "আমার হাতটা চেপে ধরে শিগ্‌গির আপনি নেমে আসুন, ভয় কর্‌বেন না।" এমন করিয়া কথা বলিতে তাহার লজ্জা বা সঙ্কোচ কিছুই যেন তখন মনে হইল না। গাড়ির মধ্যে কে আছে, কি আছে, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। অবসর নাই।

অজিতের প্রসারিত হস্ত স্পর্শ না করিয়াই ব্যগ্র-ব্যাকুল-কণ্ঠে নারী কাঁদিয়া উঠিল, "আমার জন্য কিছু ভাবনা নেই,—ইনি রোগামানুষ,—এঁকে কেমন করে বার কর্‌বো,—আপনি যদি একটু সাহায্য করেন।

অজিতের বুকে প্রবলবেগে ঘা পড়িতে লাগিল। তাই বটে! ওই তো, সেই দুইটা হাতির মত কালো ঘোড়া, আর সেই প্রকাণ্ড গাড়ীখানা!

তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সবেগে বিদ্যুৎ-শিখা ছুটিয়া গেল। কিন্তু ইহা তাহাকে অবসাদ-ক্লান্ত না করিয়া, তাহার ক্ষীণ-দেহে ও শ্রান্ত-চিত্তে, প্রভূত শক্তির যোগান আনিয়া দিল। সে এক লাফে গাড়ির মধ্যে উঠিয়া, অরবিন্দের এলান শরীর দুই হাতে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া, প্রাণপণ-শক্তিতে তাঁহাকে মাটিতে নামাইয়া আনিল। তাঁহার সঙ্গিনী ততক্ষণে আপনিই নামিয়া আসিয়াছেন। অরবিন্দ সম্পূর্ণ অচেতন না হইলেও, অজিত ব্রজরাণীকে বলিল, "আপনি বসুন,—ওঁর মাথা আপনার কোলে রেখে ওঁকে একটু শুতে দিন,—আমি জল নিয়ে আসি।"

পল্লীটা নেহাৎ দরিদ্রের। উহারই মধ্যে একটু ভদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে পাখা ও এক গ্লাস জল চাহিয়া আনিয়া অরবিন্দের মুখে সিঞ্চন করিয়া দিতে দিতে একদিকে যেমন অপূর্ব্ব পুলকোচ্ছ্বাসে অজিতের বক্ষ দুরু দুরু করিতে লাগিল, অপর পক্ষে আবার উহার ক্লান্তি-নিমীলিতনেত্র, রক্তবিহীন পাংশু মুখ দেখিয়া আশঙ্কায় ও উদ্বেগে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল।

ব্রজরাণী চামচটা হাত হইতে টানিয়া লইতে গেল, সস্নেহ মিনতির কণ্ঠে

কহিল, "থাক্, আর কষ্ট করতে হবে না,—আমায় দাও। বাছা, তুমি আমাদের জন্যে অনেক কষ্টই তো স্বীকার করেছ, আরও একটুখানি না করে তো পার পার্বে না।' একখানি গাড়ী যদি দয়া করে ডেকে দাও।"

অজিত চামচ্খানা চাপিয়া ধরিয়া, হাতের কম্পন যথাসাধ্য নিরোধ-চেষ্টার সহিত অর্দ্ধব্যক্তস্বরে কহিল, "না—থাক্, আপনি বাতাস দিন্ না, গাড়ী আমি আন্তে পাঠিয়েছি।"

অজিতের ইচ্ছা করিতেছিল, সারারাতই সে ইঁহাদের লইয়া এইখানেই কাটাইয়া দেয়। জীবনের একটা রাত্রিও তো তবু তাহার সফল হোক্। কিন্তু হায়, বামনের চন্দ্র-ধারণ-জন্য উদ্বাহু হওয়ার ন্যায়, এও যে তাহার দুরাশা মাত্র! কোথায় সে পরান্নভোজী, নিঃসম্বল, ভিখারী অজিত, আর কোথায় এই বিখ্যাত ধনী মৃত্যুঞ্জয় বসুর পুত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি ও কীর্ত্তিখ্যাতি-সম্পন্ন সম্মানিত অরবিন্দ বোস।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

চক্ষুর্ভ্যাং ত্বাং ন পশ্যামি কৌশল্যে ত্বং হি মাং স্পৃশ
যমক্ষয়মনুপ্রাপ্তা দ্রক্ষ্যন্তি ন হি মানবাঃ॥
এতন্মে সদৃশং দেবি যন্ময়া রাঘবে কৃতম্।
সদৃশং তত্তু তস্যৈব যদনেন কৃতং ময়ি॥

—রামায়ণম্।

গাড়ী আসিয়া যখন দাঁড়াইয়াছে, অরবিন্দও ততক্ষণে সাম্লাইয়া উঠিয়াছিল। সে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া স্খলিত-কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "তড়িৎ!—" সেই 'তড়িৎ' শব্দটা তড়িৎবেগে অজিতের কর্ণে গিয়া মূর্চ্ছনায় বাজিয়া উঠিল— "অজিত!" তাহার হাত কাঁপিয়া জল পড়িয়া গেল। উত্তর জিহ্বামূলে

আসিয়াও পৌঁছিয়াছিল ; কিন্তু ততক্ষণে স্বামীর মুখের উপর আগ্রহভরা মুখ নত করিয়া ব্রজরাণী বলিয়া উঠিল,—"তড়িৎ তো আমাদের সঙ্গে আসে নি : সে যে ওদের বাড়ী রইলো। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।"

হায় রে, হতভাগ্য মূঢ়! তুই কি উঁহাদের তড়িৎ, যে, অচেতন্ন পিতার মনের মধ্যেও সূক্ষ্ম অনুভূতির তপ্তধারা তোরই অভিমুখে উৎসারিত রহিবে? তুই একজন অপরিচিত নগণ্য ভিখারী মাত্র যে! মাত্র দৈব-প্রেরিত হইয়া এতটুকু কাজে লাগিয়াছিস্।

গাড়ীর মধ্যে পিতাকে সন্তর্পণে হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিয়া, অজিত যখন দ্বারের সাম্‌নে দাঁড়াইল, এবং অনতিদূর হইতে রাস্তার আলোর একটা প্লাবন আসিয়া তাহার মুখের উপর তরঙ্গিত হইতে লাগিল, তখন অনেক-খানি নিশ্চিন্ত হওয়ায়, ব্রজরাণীর দৃষ্টি উহার দুটি অশ্রুপূর্ণ চোখের উপর এই প্রথম বার ভাল করিয়া পতিত হইতেই, তাহার মনে হইল, ওই দুটি বিকচ কমলপত্রবৎ সজল নেত্র ও এই মুখ বুঝি তাহার পরিচিত। কিন্তু কোথায় ইহাকে দেখিয়াছে, সে কথা স্মরণ হইল না।

উপকারকের কাছে মুখের কৃতজ্ঞতা সে বারেবারেই স্বীকার করিয়াছে। এখনও তাহাকে বেশভূষায় দরিদ্র বুঝিয়া, একটু প্রত্যুপকারের ইচ্ছায় সে অজিতের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কি বলে যে তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বো? তোমার কি মা আছেন? তা থাকুন, আর নাই থাকুন,—আমায়ও তুমি আজ থেকে তোমার মা বলেই জেনো। তোমার নাম কি বাবা?"

অজিত কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া, গাড়ির দরজাটা নিজেকে সাম্‌লাইবার জন্যই বোধ করি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল এবং যেমন ছিল তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিল। এদিকে কোচ্‌ম্যানটা পূর্ব্ব-আদেশ-অনুসারে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসাইয়া দিয়াছে;—ইতোমধ্যে গাড়িও চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রজরাণী তখন তাড়াতাড়ি অজিতের হাতের মধ্যে নিজের অঙ্গুলি হইতে মোচন করিয়া হীরার আংটিটা জোর করিয়া গুঁজিয়া দিয়া, ব্যগ্রতায় স্বরে

কাঁদিয়া উঠিল, "কিছু মনে করো না,—অতি সামান্য! তোমার নাম,—ঠিকানাটা ?"

সর্পদষ্টের ন্যায় চম্‌কাইয়া উঠিয়া, মৃত্যু-বিবর্ণ-মুখে অজিত হাত টানিয়া লইয়া, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন বহুমূল্য অঙ্গুরীটি চলন্ত গাড়ীর মধ্যেই ছুঁড়িয়া দিল;—ত্রস্ত, ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "নিতে পার্‌বো না, মাপ্‌ কর্‌বেন;—মাপ কর্‌বেন।" এই কথা বলিয়াই কশা-লাঞ্ছিত জানোয়ার দুইটার চেয়েও যেন আহত-চিত্তেই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

"তোমার নাম,—ঠিকানাটা ?"—

ততক্ষণে অজিত তাহাদের সান্নিধ্য হইতে অনেক দূরেই চলিয়া গিয়াছে।

যখন ব্রজরাণীর বাহুস্পর্শ করিয়া, এতক্ষণ পরে কথা কহিয়া, অরবিন্দ বলিয়া উঠিল, "বৃথা কেন ওকে খুঁজ্‌চো রাণি, ও তো আস্‌বে না।"

তখন জানালার বাহির হইতে বিদ্যুদ্বেগে মুখ ফিরাইয়া আনিয়া, সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর মুখ দেখিতে না পাইয়া, অধিকতর অধীর হইয়া উঠিয়া ব্রজরাণী কহিল, "তুমি এ কথা বল্লে কেন? তবে কি তুমি ওকে চেনো?"—আগ্রহে, আবেগে তাহার সমস্ত দেহের সহিত গলার স্বরও থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল।

অরবিন্দ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিল; তার পর ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "চিনি।"

ভীষণ সন্দেহের দ্বন্দ্বদোলায় ব্রজরাণীর সর্ব্বশরীর মত্ত আবেগে দুলিয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বাসরুদ্ধ-স্বরে কোন মতে কহিয়া উঠিল, "তবে আগে আমায় বলো নি কেন?"—এই বলিয়াই, আবার সে সেই চলন্ত গাড়ির জানালার মধ্য দিয়া যতখানি পারা যায় ঝুঁকিয়া, প্রাণপণ-শক্তিতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "অজিত!—অজিত!—অজিত!"

কেহ সাড়া দিল না। অজিত তখন কতদূরে চলিয়া গিয়াছে, কে বলিতে পারে?—হৃদ্‌পিণ্ডের অস্থির আলোড়ন-উৎপাতে ব্রজরাণীর কণ্ঠ

বুজিয়া গলার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল ; আকুল অনুযোগে স্বামীর দিকে ফিরিয়া রুদ্ধশ্বাসে সে বলিয়া উঠিল, "তুমি ওকে চিনতে পেরেও চুপটি করে রইলে ! ও গো ! তুমি মানুষ না কি গো !"

অরবিন্দ কিছু না বলিয়া বোধ করি শুধু একটুখানি হাসিল। হাসির সেই শব্দটা দীর্ঘশ্বাসের মতই শুনায় বটে, কিন্তু সেটাকে চোখে দেখিলে লোকে নিশ্বাস না বলিয়া হাসিই বলিবে।—কিন্তু ব্রজরাণীর নিকট স্বামীর অন্তস্তলের এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অপরিচিত নয়। তখন সে প্রাণপণে নিজেকে অনেকখানি সংযত করিয়া লইয়া, ধৈর্য্যের সহিত যথাসাধ্য শান্তভাবেই কথা কহিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "হয় ত চিন্‌তে পারো নি। সেই তো একটি-বারমাত্র তাকে দেখেছ ?"

অরবিন্দ কহিল, "তুমিও যদি ওকে কখন একটিবার দেখ্‌তে, তো, ভুল্‌তে না। সে কথা যাক্, সমস্ত শরীরটাই ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌ছে। বাড়ী গিয়ে পৌঁছতে পার্‌লে হয়।"

অজিত বাঁচিয়া আছে, এইটুকু জানিয়াই ব্রজরাণীর অপরাধ-পীড়িত, শোকার্ত্ত অন্তর পুলকের বিপুল প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছিল। স্বামীর এই শেষ-কথায় সে আনন্দ তাহার স্থায়ী হইতে অবসর পাইল না। নূতন কোন বিপদের আবির্ভাব-ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

দূরপথ সহজে কি ফুরাইতেই চায় ! বাহিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টি শুধু ব্যথিত হইয়া উঠে।—অবশেষে বাড়ী আসিল। গাড়ী হইতে রোগীকে নামাইয়া, তাঁহাকে বলকারক ঔষধ খাওয়াইয়াই ব্রজরাণী ডাক্তারকে টেলিফোঁয় খবর দিতে ছুটিল।

উল্লাসে এবং আতঙ্কে যুগপৎ হর্ষ-বিকম্পিত ও শঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া, সে স্বামীর নিকট যখন আবার স্পন্দিত-বক্ষে ফিরিয়া আসিল—তখন দেখিল, বিছানার উপর অরবিন্দ উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে জোর করিয়া মুখ ঢাকিয়া আছে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের অনিয়মিত দ্রুতবেগে সর্ব্বশরীর তাহার থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মধ্যে যে একটা ভীষণ যন্ত্রণার ঝড় বহিতেছিল, তাহা উপর হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ পশু মৃত্যু-যাতনায় কাতর হইয়া যেমন করিয়া লুটায়, এ যেন সেই! সুপ্ত আগ্নেয়গিরির ন্যায় বাহ্য-গাম্ভীর্য্যে সাধারণের বিস্ময়-কেন্দ্র সে অরবিন্দ যেন এ, নয়! ব্রজরাণী নিঃশব্দ সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া পাশে বসিতেই, অরবিন্দ যন্ত্রণা-কাতর-স্বরে বলিয়া উঠিল, "বুকে কি ভয়ানক ব্যথা ধরলো রাণি! আবার বুঝি সেই রোগ ফিরে এলো। এবার বোধ করি, এইতেই আমার শেষ।"

ব্রজরাণী বাণবিদ্ধের ন্যায় ঘুরিয়া পড়িতে গিয়া, নিমেষে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া স্বামীকে দু'হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল। মৃত্যুশরাহতের শেষ আর্ত্তনাদের মতই কাহার কণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইয়া গেল, "অমন কথা বলো না গো,—ওগো, আমার যে আর কিছুই নেই!"

বলিতে বলিতেই তখনি আবার উঠিয়া, মালিসের শিশি আনিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। ওষুধ আনিয়া বুকে মালিস করিতে গেলে, বাধা দিয়া অরবিন্দ কহিল, "থাক্,—থাক্, সময় যদি এসেই থাকে, তবে আজ আমায় ছুটি দিয়েই দাও না রাণি!"

তারপর বহুক্ষণ পরে চোখ চাহিয়া, মুখ তুলিয়া যখন দেখিল, ওষুধের শিশি হস্তে লইয়া ঠিক্ তেমনি করিয়াই ব্রজরাণী বসিয়া আছে,—আর তাহার দু'চোখ দিয়া নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে, তখন ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ বেদনায় তাহার মুখের দিকে স্থির-চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া, সহসা অরবিন্দ ডাকিল, "রাণু!"

ব্রজরাণী চমকিয়া স্বামীর চক্ষে আহ্বান বুঝিয়া কাছে গেল। স্বামীর কণ্ঠে বিপুল স্নেহের উচ্ছ্বাস অনুভব করিয়া ব্রজরাণীর নারীচিত্ত কান্নার বেগে যেন এইবার বিদীর্ণ হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সে স্বামীর বুকের

পাশে নিজের ব্যথিত মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ তাহার অভিমানের অশ্রু নয় ; মর্ম্মপীড়িতার অন্তরের বাঁধভাঙ্গা কাতর ক্রন্দন !

"রাণি ! রাণু ! স্থির হও। আমি আর সইতে পারচি নে। বসো,— গোটাকতক কথা তোমায় বলে যাবার আছে। এই বেলা বলে নিই।— কি জানি, কি হয় ? বড় যন্ত্রণা হচ্চে !—আমার বুকের ঐখানটায় মাথা রাখো। এসো, আরও কাছে এসো—আজ তোমায় প্রাণভরে আদর করে নিই।—কোনদিন তোমায় আমি ভালবেসে সুখী করতে পারি নি। বরাবরই আমার প্রেমে তুমি সন্দেহ করে এসেছ। তা নিয়ে অনেক দুঃখও তুমি পেয়েছ। তোমার কি অপরাধ ? তোমায় আমি অবজ্ঞা করতে চাই নি, দুঃখ দেবো মনে করে দিই নি।—এ তুমি বিশ্বাস করো।—কিন্তু তবু হয় ত অদৃষ্ট-দোষে দিয়ে ফেলেছি—হয় ত বলচি কেন ? তুমি যদি একাই আমার হ'তে, আর যদি কারু আগুনের লেখা স্মৃতির দহন তোমার মাঝখানে অনির্ব্বাণ হ'য়ে না থাকতো, তা'হলে নিশ্চয়ই—তা'হলে আমি তোমায় এর চাইতে অনেক বেশি সুখী দেখতে পেতুম। বলবে, এমন অবস্থায় তোমায় বিয়ে করা অমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু তা নয়,—তোমায় বিয়ে—আমি তাকে কোনদিন ভুলতে পারবো না জেনেই করেছিলুম। তা না করলেও তো আমার আর এক রকমে নিষ্কৃতি ছিল না। বিয়ে না করলে এমনি কষ্ট আমায় দিতে হ'তো,—আমার বাপের মনে। আমার ভাগ্যলিপিই যে ঐ।"

বাধা দিয়া আকুলস্বরে ব্রজরাণী কহিয়া উঠিল, "ও কথা কেন বলচো তুমি ? তোমায় পেয়ে আমি যা পেয়েছি, এ সংসারে ক'জন রাজার রাণীতে তা পায় ? আমি রাক্ষসী,—অভিমানে অন্ধ হ'য়ে, হিংসায় পুড়ে মরেছি—সে দোষ তোমার নয়।"

অরবিন্দ ক্ষণকাল তীব্র যন্ত্রণার ভীষণ আক্রমণে নিশ্চেষ্টবৎ থাকিয়া পরে আবার বলিল, "তারপর আমার নিজের কথা,—সে আর বলে কি দরকার ;

জীবনটাকে আমি বাঁধা দিয়েছিলুম,—কিন্তু একটা জীবনেই যে জীবের সব শেষ, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে। আর ঐ আশ্বাসটুকু সম্বল করেই দিনগুলোকে শেষ করে আন্‌তে পেরেচি।"

শ্রান্ত হইয়া অরবিন্দ পুনশ্চ নীরব হইল। স্বামীর যন্ত্রণাহত বক্ষের উপর লুন্ঠিত হইতে হইতে ব্রজরাণী অশ্রুহীন শোকের মর্ম্মান্তিক বিলাপপূর্ণ-স্বরে কহিল, "তোমার দুঃখ আমি একদিনের জন্যেও যদি বুঝ্‌তে চাইতুম, তা'হলে হয় ত এমন করে তোমায় আজ—"

"তোমার হৃদয় আছে,—তুমি বোঝ নি যে তাও নয়। তোমার কি অপরাধ?—যাক্—সে সব অপ্রতিবিধেয় জটিলতার তো আজ শেষ হ'য়েই এসেছে।—আজ আমাদের মধ্যের জটিল সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে, নিজের অন্তরের মধ্য থেকে বিচার করে দেখো, কেন আমার চিত্ত তোমার মত স্ত্রীকেও তার উপযুক্ত পাওনা দিতে পারে নি। আমার মত অভাগাও জগতে খুব বেশী নেই, রাণি, এইটা স্মরণ রেখে আমায় তুমি বিচার করো। আর পারো যদি তবে ক্ষমা কোরো।—উঃ, ক্রমেই ব্যথাটা বাড়চে।—"

"না, না, না, ব্যস্ত হ'য়ো না। শীঘ্রই হয় ত সকল কষ্টের অবসান হবে। আরও কি তুমি আমায় সইতে বলো? আরও? অজিত,—আমার নিষ্পাপ, পবিত্র, সোণার অজিত—তাকে আজ আমি,—এই লক্ষপতি অরবিন্দ বসু,—তাকে আজ আমি ভিখারীর সাজে দেখেছি। তুমি জানো না, রাণি, কি সহ্য আমি করেছি।—মৃত্যুঞ্জয় বসুর একমাত্র বংশধর আজ পিতার পাপে অকলঙ্কে কলঙ্কিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, বিতাড়িত। আর সে কেন, তা কি তুমি জানো?—এই ঘরের মধ্যে এক দুর্য্যোগ-রাত্রে চোর আসা তোমার মনে পড়ে? সে চোরও নয়, সে স্বপ্নও নয়, সে আমার সর্ব্বস্বধন অজিত!"

"কে এ কথা তোমায় জানালে? আমি তো তোমায় জান্‌তে দিই নি।"—ব্রজরাণী বিস্ময়ের আবেগে যেন চাবুক খাইয়া উঠিয়া বসিল।

অরবিন্দ আবার তাহার সেই চিরাভ্যস্ত বিষাদ-প্রচ্ছন্ন মৃদুমন্দ হাসিটুকু

হাসিল। "আমি যে দেশ ছেড়ে বহু দিনের জন্য সরে যাচ্ছিলুম, সে, শুধু, এই জন্যে। আমি থাকতে যে তার মঙ্গল হবে না। সে যে আমার পিছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্চে। তোমরা দেখ নি, কিন্তু আমি যে তার ছায়া দেখে চিনতে পারি। আমি কি তাকে এক দণ্ড, এক পল, এক নিমেষের জন্যও আমার বুক থেকে বিদায় দিতে পেরেছি, রাণি? আগুন দিয়ে তার মুখখানা যে আমার এই বুকের মাঝখানে আঁকা রয়েছে। তবু কি তুমি আরও আমায় বাঁচতে বল্‌বে? এ যে ব্যথা, এ কি জানো,—এ শুধু সেই আগুনেরই দহন!"—

"স্থির হও! ওগো একটু স্থির হও,—অন্য সময় বলো, আমি সব শুন্‌বো—শুন্‌তে যদি বুক ফেটে যায় আমার, তাও আমি সইবো। তুমি অত সয়েছিলে, আমিও কম সইচি না, আরও সইতে পার্‌বো। এখন একটুখানি ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করো।"

"না, আর না! আমার যা বল্‌বার ছিল, হ'য়ে গেছে। শুধু এই শেষ-কথা,—আমার মৃত্যুর পর আমার শেষ-কৃত্যটুকু সেই যেন করে। তোমার মনে দয়া আছে, রাণি; তাই তোমায় বলে যাচ্চি। আমার প্রাণাধিককে—আমার এই পরিত্যক্ত দেহটার অধিকার দিলে, তা'তে হয় ত আমার এবং তোমার স্বর্গগত পিতৃদেবরা অসন্তুষ্ট হবেন না! কি বলো রাণি? এতে তো কারো কোন ক্ষতি নেই।"

বাহিরে মোটরের দ্রুত শব্দ শ্রুত হইল। ডাক্তার!—নিশ্চয়ই ডাক্তার আসিয়াছেন!

রোগীর শরীরে বিন্দুমাত্র চেতনা নাই।

খুব সম্ভব প্যারালিসিস্! দ্বিতীয় বারের আক্রমণ প্রথমাপেক্ষা ভীষণই হয়। জীবনের আশা জোর করিয়া কে করিতে পারে? হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল, নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোককর্শিতাম্।
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রহর্ষয়ন্॥
অভিবাদ্য সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ যশস্বিনীম্।

—রামায়ণম্।

কলাবশেষ কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ ও প্রভাহীন মায়ের মুখে চোখ রাখিয়া অজিতের চোখের জল নিঃশব্দেই ঝরিতে লাগিল। ছেলের শুষ্ক, শীর্ণ, মলিন মুখ দেখিয়া মনোরমার আবেগও কোন বাধাই মানিতে চাহিল না। দু'জনে দু'জনের কণ্ঠলগ্ন হইয়া অনেক দুঃখ-বেদনা-বিজড়িত, অশ্রুজলে গুরুভারাক্রান্ত উভয়ের হৃদয় ধৌত করিয়া দিল।

মনোরমার শরীরে আর কিছুই নাই, শুধু একখানা পাতলা চামড়ায় ঢাকা একটি নরকঙ্কাল যেন বিছানায় মিলাইয়া আছে। 'এই শরীরে কেন তীর্থ করিতে বাহির হইলে?'—এ প্রশ্ন অজিতের বুকফাটা রক্তের মত মুখ দিয়া অন্ততঃ হাজার বারও বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। না গেলেও কি মা তাহার বাঁচিতে পারিতেন? অজিতের অধঃপতন-কাহিনী, অজিতের নিরুদ্দেশ, তাঁহাকে যে এর অনেক আগেই হত্যা করিয়া ফেলিত। কেন এই মাতৃঘাতী অজিত মায়ের কথা বিস্মৃত হইয়া, নির্ম্মম পিতার পশ্চাতে উন্মাদ হইয়া ছুটিয়াছিল? শীতল নির্ঝর ত্যাগ করিয়া মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিলে এই দশাই ঘটে। তাহার নিরুপায় অন্তরের সমুদায় ক্রোধের জ্বালা তাঁহার উপরেই পতিত হইল, যিনি নিতান্তই অনাবশ্যকে,

হতভাগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেই মাত্র তাহাকে এ জগতে আনিয়া দিয়া সকল দায় মুক্ত হইয়াছেন! মূর্খ, উন্মাদ সে; তাই তাহার জন্মশত্রু সেই জনকেরই জন্য নিজের সমস্ত জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশানন্দময় সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সবই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। অসহায় জীবন-তরীর একমাত্র ধ্রুবতারা আজ এই যে বিশ্বজননীর চেয়েও অধিকতর বরেণ্যা, মূর্ত্তিমতী দেবী তাহার মা—সেই মাকেই সে হারাইতে বসিয়াছে, সেও তো সেই তাঁহারই জন্য।

তাহার এই চিরদুঃখিনী মায়ের প্রতিই বা তাঁহার কি ব্যবহার? পিতার আদেশ! যদি পিতৃবিদ্বেষে দুঃখীর মেয়েকে নিরপরাধে বিদায় দিয়া তিনি শ্রীরামচন্দ্রের মত তাঁহার স্মৃতির ধ্যানে জন্ম কাটাইতেন, নিশ্চয়ই তিনি আজ বিশ্বের বরণীয়,—সাধারণের সকরুণ সহানুভূতির পাত্র,—অজিতের ঈশ্বর। কিন্তু পিতার আদেশে তিনি কি করিয়াছেন? না, অগ্নি-দেবতা সাক্ষ্যে বেদমন্ত্রে গ্রহণ করা সাধ্বী সতীর মস্তকে বৃথা কলঙ্কের পশরা চাপাইয়া তাহাকে নিঃসহায়ে জন্মের মত ঠেলিয়া ফেলিয়া, সুন্দরী ধনি-কন্যার সাহচর্য্যে পরমানন্দে জীবন যাপন করিতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র যখন লোকাপবাদে সীতাবর্জ্জন করিয়াছিলেন, হিরণ্ময়ী জানকী-মূর্ত্তি দ্বারা উঁহার পরে তাঁহার প্রেম ও শ্রদ্ধা সহস্রগুণেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। আর ইনি? স্বার্থ,—আত্মতৃপ্তি,—এই কি ত্যাগের রূপ? এই অজিতের পিতা? এর চেয়ে মাতৃগর্ভে অজিত মরে নাই কেন?

…নিতাই ঘোষের মা ঘোষ-গৃহিণী, মনোরমাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে যত্ন করেন। উহার পথ্য ও অজিতের জন্য ভাত লইয়া আসিয়া খাওয়াইয়া গেলেন। মনোরমাকে বলিলেন, "এই তো মা, তোর ছেলে পেয়েছিস্। নে' এখন শীগ্‌গির করে ভাল হ'য়ে উঠে, ছেলে নিয়ে ঘরকন্না কর্।"

মনোরমার শীর্ণ অধরে অতিক্ষীণ হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। "আর

আমি ভাল হ'য়েছি, মাসিমা! তা' না হ'লেও কোন দুঃখ ছিল না, যদি অজুর একটা কিনারা দেখে যেতুম।"

ঘোষ-গৃহিণী কহিলেন, "বালাই, ষাট্! ও কথা কি মুখে আনে মা! এত যে কষ্ট ক'রে ছেলে মানুষ করলি মনো, তা ওর একটি বে'থা দিয়ে নাতির মুখটি দেখ,—অজিতের একটি ভাল চাকরী হোক্। তবে তো তোর দুঃখ পাওয়া সার্থক হবে মা!"

মনোরমার চোখে জল আসিল, "মরণ কি অত সুবিধে দেখে আসে মাসিমা;—তার সময় হ'লেই সে টেনে নেবেই। তা নিক্ মা, কিচ্ছু ক্ষতি নেই। তবে অজিত যে আমার একেবারেই অনাথ হবে, এই ভেবে মরবার আনন্দেও আমার বাধা পড়ে।"—মনোরমার গাল বাহিয়া ছোট দুইটি বিন্দু অশ্রু নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল; সে তাহা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি ক্ষীণ হাসি হাসিল।

অজিতকে মনোরমা এক সময় বলিল, "প্রয়াগে গিয়েই জ্বরটা খুব বাড়াবাড়ি হ'য়ে ওঠে। ডাক্তার আনালে তিনি বলে যান যে, হয় ত কোন্ সময় 'হার্ট ফেল্' করবে। ওঁরা তোকে 'তার' করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তা অনর্থক কেন তোকে কষ্ট দেবো,—কলেজটাও মিথ্যে কামাই হবে। একলা অত দূরে তুই যাবিই বা কি করে? এই সব ভেবে চিন্তে আমিই বারণ করলুম। তা' সেখানে মরলে তো খুবই ভাল হ'তো অজিত! কিন্তু, তোকে একটিবার চোখে না দেখে মরণও তো আমার হ'লো না বাবা! তাই আবার মরতে মরতেও এই অগঙ্গার দেশে ফিরে এলুম।"

অজিত কিছু না বলিয়া মা'র বুকে মুখ লুকাইয়া রহিল। বুকের মধ্যে তাহার কি অনুশোচনার আগুনই যে জ্বলিতেছিল। কেন সে মাকে দারুণ রোগ শোকের মাঝখানে একা ফেলিয়া রাখিয়া বি-এ পড়িতে কলিকাতায় চলিয়া গেল? পূজার ছুটীতে আসিয়াও যখন মাকে ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ-পীড়িত দেখিল, তখনও যদি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন

দিয়া, মাকে লইয়া কোথাও একটু স্বাস্থ্যকর স্থানে যেমন তেমন একটা চাকরী লইয়া চলিয়া যাইত, তো, আজ সে মাতৃহীন হইতে বসিত না। তাহার এ দুঃখ যে লোকসমাজে প্রকাশেরও অতীত।

ছেলের মুখ দেখিবার দুরন্ত লোভে যে শক্তি এই দুর্ব্বল-শরীরে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া, মনোরমা কষ্টবহুল দীর্ঘ-পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতেই, ইচ্ছা-শক্তির প্রবল উত্তেজনার বলে বলীয়ান্ চিত্ত তাহার এককালেই যেন ততোঽধিক হাল ছাড়িয়া দিয়া, তাহাকে একেবারেই অতলে তলাইয়া দিল। মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ সে নিজের অত্যন্ত দুর্ব্বল-শরীরে একান্তভাবেই অনুভব করিয়া, সতৃষ্ণ-চোখে কেবল ছেলের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিল। আর যে একটা গোপন বাসনা অন্তরের অতি নিভৃত কন্দরে লুক্কায়িত ছিল, সেই প্রবল ও একান্ত বাসনা-বেগে তাহার মৃদু স্পন্দিত হৃদ্‌পিণ্ড মধ্যে মধ্যে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ নীরব দ্বিধায় কাটাইয়া, অবশেষে মনোরমা স্তব্ধ অজিতের কণ্ঠে নিজের বলহীন বাহু বেষ্টন করিয়া, অন্য হস্তে তাহার চিবুক ধরিয়া, আনত মুখখানা তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "না, তুমি অমন ক'রে থেকো না অজুমণি! তোমার ও-রকম মুখ আমি যে সইতে পারি নে। হ্যাঁরে অজিত! আমি যখন চ'লে যাবো, বড্ড কি তুই কাতর হবি? না বাবা আমার! ধন আমার! বেশি কান্নাকাটি ক'রে শরীরটাকে মাটি করিস্ নে গোপাল! কেই বা তখন দেখ্‌বে তোকে!—তাই ভাবি।"

অজিত আর পারিল না, মায়ের বুকে অবোধ শিশুর মত মুখ লুকাইয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"বৃথাই কুসন্তান জন্মেছিলাম মা! তোমায় শেষ পর্য্যন্ত শুধু ভবালাম; কিছুই যে তোমার ক'র্‌তে পার্‌লাম না।"

মনোরমা ধীরে ধীরে অজিতের মাথায়, পিঠে, আঙ্গুল বুলাইয়া দিতে দিতে ধীরকণ্ঠে কহিল, "আমার জন্য তুই কিছু কর্‌তে চাস্ অজিত?"

চকিতে অশ্রুপরিপ্লুত মুখ উঠাইয়া, অজিত জিজ্ঞাসু-নেত্রে মার প্যানে চাহিল,—“কি কর্‌বো, ব’লে দিন্‌?”

মনোরমার ক্ষীণ-কণ্ঠ বাধিয়া থামিয়া গেল। সচেষ্টায় সেই রুদ্ধ স্বর ফুটাইয়া তুলিয়া, ছেলের দৃষ্টি হইতে নিজের দৃষ্টি প্রত্যাহার করিয়া লইয়া মনো কহিল, “শেষ-সময়ে একবার আমায় তাঁকে এনে দেখাতে হবে। আর একদিন তুই আমার কাছে প্রতিশ্রুত হ’য়েছিলি,—কিন্তু তখন ঠিক্‌ সময় হয় নি—এখন হ’য়েছে। পার্‌বি, অজিত?”

অজিতের শিথিল বিকল স্নায়ুতন্ত্রী উত্তপ্ত শোণিতের খরস্রোতাহত হইয়া অর্দ্ধ-নিমেষে সজাগ সচেতন হইয়া উঠিল। তাহার বিশাল কৃষ্ণ নেত্র-তারকার মধ্য হইতে,—কাল কয়লা যেমন অগ্নিবর্ণ হইয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি করিয়া এক পশলা অগ্নিবৃষ্টি হইয়া গেল। মুমূর্ষু জননী একমাত্র সন্তানের হাতে ধরিয়া আগ্রহ ব্যাকুলকণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, “বল্‌ অজিত, জন্মের শোধ একবার তাঁকে—আমার ইষ্টদেবকে আমায় এনে দেখাবি? আজ আঠারো বৎসর হ’য়ে গেল দেখি নি রে—শেষের দিনটা তাঁর পায়ে মাথা রেখে মরণটাকে সার্থক করে যাই। একি তুই পার্‌বি নে, বাবা?”

আসন্নবর্ষী ভীমকান্তি জলদমধ্য হইতে পতনোন্মত অশনি যেমন করিয়া গর্জ্জিয়া উঠে, তেম্‌নি করিয়া এই মৃতকল্পার করুণ আবেদনের উত্তর আসিল—“পার্‌বো না, মা!”

আহত মরণাপন্নকে যদি তাহার আঘাত-ক্ষতের উপর আবার কোন নির্ম্মম আঘাত করা যায়, তবে সে যেমন করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, ঠিক্‌ তেমনি মৃত্যু-বিলাপের অর্দ্ধোক্তিতে মনোরমার মুখ দিয়া বাহির হইল, “অজিত! অজিত!”

কিন্তু অজিত তখন মা-হারাণোর আসন্ন শোকে অকস্মাৎ পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। পিতাকে তাহার মায়ের সকল দুর্দ্দশার মূল এবং তাঁহাকে

তাহার মাতৃঘাতী মনে করিতেই, তাঁহার উপরে বিজাতীয় বিদ্বেষে সে যেন ক্ষিপ্ত অধীর হইয়া উঠিয়া, চীৎকার করিয়া বলিল, "মা মা, সে হবে না। কিসের জন্যে তাঁর পায়ে মাথা তুমি রাখ্‌তে যাবে? যিনি তোমার এই দশা ঘটিয়েছেন—তাঁকেই তুমি দেবতা বলে পূজো করো?"

সম্মুখে আবির্ভূত প্রেতমূর্ত্তির পানে আতঙ্কিত দর্শক যেমন চাহিতেও পারে না এবং সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরানোও যেমন অসম্ভব হয়, তেমনি করিয়া প্রাণাধিক সন্তানের মুখের দিকে বিস্ময়াতর্ক-নিবদ্ধ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া, বিহ্বল কাতর কণ্ঠে মনোরমা কহিল, "আমি ফিরে এসেই তোমায় দেখে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, যে, আমার সে অজিত আর নেই! অজিত! দেবতাকে দৈত্য বল্লেই তাঁর দেবত্ব লোপ পায় না, নিন্দুকেই নিজে দুঃখ পায়।"

অজিতের সর্ব্বাঙ্গে তখন বিদ্যুতের ঝঞ্চনা বাজিয়া উঠিয়াছে। দুই কর্ণ ভরিয়া শুধু প্রলয়ের ঝড়ের গর্জ্জন ব্যতীত আর কিছুই সে শুনিতে পাইতেছিল না। তাহার দুই চোখের সম্মুখে মায়ের পাংশু বিবর্ণ মুখ, আর্ত্ত-ব্যাকুলতা-ভরা আহত দৃষ্টি,—সমস্তই যেন অন্ধের চক্ষে জগতের মত অন্ধকারের ঝাপ্‌সায় মিলাইয়া গিয়া, তাহার স্থলে অগ্নিময় লেখার অক্ষরে তাহার পিতৃগৃহের রাজৈশ্বর্য্যের মাঝখানে সম্পদ-স্বর্গে প্রতিষ্ঠিতা বিমাতার মুখ ফুটিয়া উঠিয়া তাহার চোখ দুইটাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছিল। যে মানুষ নিজের বিবাহিতা দুই স্ত্রীর মধ্যে এতবড় পার্থক্য রাখিতে পারে, দেবতার আসন আজ তাঁহারই প্রাপ্য? এতবড় ছলনার খেলা অজিত ছেলে হইয়া মার সঙ্গে কেমন করিয়া খেলিবে? যিনি তাহার মায়ের মুখ চাহেন নাই, যাঁহার অবিচারের দণ্ড মাথায় বহিয়া মা তাহার, শুধু অন্তরেরই নয়, সাংসারিক দারুণ দৈন্যেরও আঘাতে আঘাতে আজ এই অকাল-মৃত্যুর দ্বারে সমাসীনা,—সেই তিনি দেবতা? অজিতের তিনি যত ক্ষতিরই কারণ হোন্, অজিত তাহা হয়ত ভুলিলেও ভুলিতে পারে; কিন্তু মায়ের এই অনাহারে

মৃত্যু,—সে কি জীবনে কখনও ভুলিবার ?—উত্তেজিত তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "কা'কে তুমি দেবতা বলো মা ? আমি যে নিজের চোখে তাঁর সমস্তই দেখে-এসেছি। তোমায় এমনি কোরে ডুবিয়ে দিয়ে, যিনি সুখৈশ্বর্য্যে অমন করে ডুবে আছেন, কেমন করে তাঁকে দেবতা মনে করবো আমি ?"

"অজিত ! দেবতাকে যে মাটি-পাথর দিয়েও গড়ে নে'ওয়া যায়। নির্ভর ক'রে নিজের মনের নিষ্ঠায়,—বাবা !—বাইরের উপাদানে নয়। কিছু কাছে গিয়ে তাঁর বাইরের সম্পদটাই চোখে দেখতে পেয়েছ ; কিন্তু অন্তরের শূন্যতাটা তো আর চোখ দিয়ে দেখা যায় না। আমি যে দিবারাত্রি ধরে তাঁর সেই নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ মর্ম্মব্যথা নিজের মনের মধ্যে অনুভব করচি ! অজিত ! অজিত ! ওরে, মরবার সময় তুই এমন ক'রে আমার বুক ভেঙ্গে দিবি, এ আমি যে কোন দিন স্বপ্নেও জানতাম না। বিশ্বনাথ ! মা অন্নপূর্ণা !—তোমাদের ছেড়ে আমি যে অন্ধ-স্নেহে মত্ত হ'য়ে ছেলের কাছে মরতে এসেছিলাম, এ তারি উচিত শাস্তি আমায় দিলে !"

...একখানা ভাড়াটে গাড়ী হইতে নামিয়া মোটা রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী-পরা, বিছানার বোম্বাই-চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃতা একটি নারী সেই জনবিরল ভগ্ন-গৃহের প্রত্যেক ঘরে ঘরে নিজের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, শেষে এই করুণ দৃশ্যের মাঝখানে পৌঁছিয়া, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। গৃহ পূর্ণ-দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক সজ্জাবিহীন ; শয্যা মলিন এবং তাহারই উপর সকাল-বেলার ধূসর আকাশে নিষ্প্রভ নক্ষত্রবিন্দুর মত জ্যোতিঃলেশহীনা অতুলনীয়া রূপসী নারীর নিস্পন্দ বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া এক অসহায় বালক দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে, আকুল-ক্রন্দনে সমস্ত ঘর ভরাইয়া দিয়া ডাকাডাকি করিতেছে—"মা, মা গো ! ওমা ! মা :—"

আগন্তুকা ক্ষণকাল বজ্রাহতবৎ নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকিয়া, আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। তার পর কাছে আসিয়া অজিতের হাত ধরিয়া, উহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "অমন করে শুধু বুক ফাটিয়ে ডাকলেই

কি মাকে জাগাতে পারবি বাবা ? যা দেখি, একটু দুধ কি জল নিয়ে আয় দেখি।”

অজিত কাঁদিতে কাঁদিতে আজ্ঞা পালন করিয়া ফিরিয়া আসিল। দেখিল, অপরিচিতা চিরপরিচিতার মত তাহার মায়ের অবসাদ-লুণ্ঠিত মস্তক নিজের অঙ্কে তুলিয়া লইয়া, মুখের উপর আঁচলের বাতাস দিতে দিতে তাঁহার কাণের কাছে নত হইয়া প্রীত মধুর-কণ্ঠে ডাকিতেছেন, “দিদি ! দিদি !”

অজিতের ভয়ার্ত্ত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—“ভয় কি বাবা, তোমার মার মূর্চ্ছা হয়েছে বৈ ত না ! ও এক্ষুণি সেরে যাবে।”

এই বলিয়া তিনি নিজের সেবা-কুশল ক্ষিপ্রতার সহিত অজিতের মার মূর্চ্ছাতুর অবসন্ন শরীরের প্রতি একান্ত মনোযোগ প্রদানপূর্ব্বক অজিতকে চমৎকৃত, বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিলেন।

ক্ষণপরে সুদীর্ঘ ক্লান্ত শ্বাস কষ্টের সহিত মোচন করিয়া মনোরমা পাশ ফিরিয়া শুইল ; এবং ইহারও আর একটু পরে, তাহার দলিত গোলাপ পাপ্ড়ীর মত শুভ্র অধরে ঈষৎ শোণিতাভা ফুটিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধস্ফুট ক্ষীণ স্বরে নির্গত হইল—“অজিত !”

“মা, মা, আর আমি কখনও আপনার মনে কষ্ট দেবো না মা, এইবারটি শুধু আপনি আমায় ক্ষমা করুন।—” এই কথা বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া, অজিত মায়ের অর্দ্ধ-শীতল পা দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া, তাহারই মধ্যে মুখ লুকাইল। এ দৃশ্য দর্শনে অপরিচিতা নারী সর্ব্ব দেহ মনে চমকিয়া উঠিয়া, সাশ্রুনেত্রে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

“দিদি ! দিদি ! আমি যে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছিলুম,—তার জন্যে এতটুকু অবসরও আমায় তুমি দিলে না ভাই ?”

“তোর তো কোন পাপ নেই, রাণি ! প্রায়শ্চিত্ত তুই কিসের করবি ; না—না, অমন করে কাঁদিস্‌নে বোন,—আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই তোর উপর—ঈশ্বর জানেন—কোন দিনই আমি এতটুকু বিদ্বেষ করি নি

আজও এই অন্তিম আশীর্ব্বাদ অন্তরের সঙ্গেই করে যাচ্চি,—তুমি সাবিত্রীর সমান হও।”

ব্রজরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে সপত্নীর মৃত্যু-যাতনায় ক্লিষ্ট শুষ্ক অধরে চামচে করিয়া জল দিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, “আমি বড় আশাতেই নিরাশ হ'লেম!—আমি আর তোমায় কি বল্‌বো দিদি, তোমার পায়ের ধূলো যেন একটুখানি পাই। তাঁকে কি আর আমি এ আঘাতের পর বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বো? তাঁর অন্তর যে তোমাতেই ভরা।”

“রাণি! বোন্‌টি আমার! নিশ্চয় তাঁর ভালবাসার অর্দ্ধেকটা তুমিই পেয়েছ। তিনি তো কারুর সম্বন্ধে অবিচার কর্‌তে পারেন না ভাই!”

ব্রজরাণী ক্লিষ্ট শ্বাস পরিত্যাগ করিল। তার পর সহসা মুগ্ধ-স্বরে, মুক্ত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “দিদি! আজ বুঝ্‌লাম, তোমায় আমায় প্রভেদ কোন্‌খানে!—আজ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বল্‌ছি ভাই, যদি ঈশ্বর থাকেন, পরলোক সত্য হয়, তা'হলে জন্ম-জন্মান্তরে বা লোক-লোকান্তরে তোমার স্বামী একমাত্র তোমারই থাক্‌বেন। শতকোটী ব্রজরাণীর সাধ্য হবে না যে, তাঁকে তোমার কাছ থেকে আর একচুলও সরিয়ে নেয়।—তা ভাই আমার ভাগ্যে তাতে যা থাকে হোক্‌,—আমি যেন তোমার সঙ্গে স্বামী নিয়ে আর ভাগাভাগি না কর্‌তে যাই,—এই আমার বলো”—বলিতে বলিতে এই স্বামিগতপ্রাণা নারীর দু'চোখ দিয়া হুহু শব্দে জলের ঝরণা ঝরিয়া পড়িল; এবং তাহার অপত্যবিহীন শূন্য জীবনটাকে, যেন শুধু আজিকার মতই নয়, অনাগত সমুদায় ভবিষ্যৎকালটার জন্যই, গভীর অবসাদ-গ্রস্ত মহাশূন্যতায় শূন্যময় এবং একান্তই অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। ইহার পর আর যেন তাঁহার ইহপরলোকে কোথাও কিছু আর বাকি থাকিল না।

মনোরমার স্তিমিত নেত্র-প্রদীপেও তাহার সেই বর্ণহীন, ক্লিষ্ট মুখের মৃত্যু-পাণ্ডুতা প্রতিভাসিত হইল। সহানুভূতি ও স্নেহে পরিপ্লুত হইয়া

তাহার প্রায়-নিশ্চল হৃদ্-তন্ত্রী আবার একবার নিজের সর্ব্বশেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রাণপণে বাজিয়া উঠিল। কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিয়া মনো কহিল, "কেন বোন্, মনে তুমি কুণ্ঠা রাখ্ছো? এ জন্মে যা হবার সে তো হ'য়েই গেছে। এবার আমরা দুটি বোনে পাশাপাশি বসে যে তাঁর দুই চরণের সেবা কর্বো ঠিক্ করে রেখেছি। এখন এই বাকি দিন ক'টার জন্য এই নে ভাই, তোর ছেলেকে তুই একবার কোলে নিয়ে বোস্, দেখে আমি চোখ মুদি।—অজিত! তোর ছোট-মাকে প্রণাম কর্লি নে?"

পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্ অজিত স্বপ্ন-মুগ্ধের মত নিকটে আসিতেই, তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া ব্রজরাণী কহিয়া উঠিল, "প্রণাম থাক্—যদি তোমার এই রাক্ষসী মা'কে যথার্থই তুমি ক্ষমা কর্তে পেরে থাক অজিত! তা'হলে একবারটী আমায় তুমি 'মা' বলে ডাকো। তোমার মুখে ঐ নাম শুন্বার জন্যে সেই তোমায় প্রথম দেখার দিন থেকে আজ এই সাত বৎসর ধ'রে আমি যে পাগল হ'য়ে বেড়িয়েছি।"

তখন মাটিতে—ব্রজরাণীর পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া গদ্গদ-স্বরে অজিত ডাকিল—

"মা!"

সমাপ্ত